ঢাকা সমগ্র ১

মুনতাসীর মামুন

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৫

প্রকাশক · নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা - ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭/এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা - ৭০০০০৬

কম্পিউটার টাইপসেটিং মা দুর্গা লেজার
৩৭ জি. সি. ঘোষ রোড। কলিকাতা - ৭০০০৪৮

উৎসর্গ

ডা. গোলাম নবী

ডা. শামসুন নাহার

আমার স্নেহের দুই বড় কুটুম্ব-কে

ভূমিকা

আমার জন্ম বটে ঢাকার ইসলামপুরের অন্ধকার গলি আশেক লেনে, কিন্তু বাল্য-কৈশোর কেটেছে পাহাড়-সমুদ্রে ঘেরা চট্টগ্রামে। হ্যাঁ, শৈশবের কয়েকটি বছর কাটিয়েছি স্বামীবাগে। সবুজ, খোলামেলা চট্টগ্রাম থেকে মাঝে মাঝে ছুটিতে মা'র সঙ্গে আসতাম ঢাকায়। এই শহরের আকর্ষণ তখন আশেক লেনে জমজমাট আমার নানার বাড়ি। এক ডজন খালা-মামা ও নানা-নানীর সস্নেহ প্রশ্রয়ে কাটতো কয়েকটি দিন। মাঝে মাঝে এক আনা বা দুই আনার কুট্টি বিসকুট নিয়ে বসতাম ৬২ ইসলামপুরে নানার লাইব্রেরি ইউনিভার্সেল লাইব্রেরিতে। অবশ্য, তখন তার পড়ন্ত অবস্থা। কখনওবা কোন খালার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি বা রিকশায় যেতাম আত্মীয়ের বাড়িতে। কখনও বা কোন মামার সঙ্গে বাকল্যাণ্ড বাঁধে ঘুরতাম বা সিরাজউদদৌলা পার্কে ক্রিকেট খেলতে যেতাম। আমার বড় চাচা থাকতেন সেগুন বাগিচায়। মেজ চাচা এস. এম. হলে। তাঁরাও মাঝে মাঝে নিয়ে বেরুতেন। তবে, বেড়াবার চৌহদ্দিটা ছিল ফুলবাড়িয়া রেললাইনের ওদিকটায়ই। একবার কার সঙ্গে যেন, তেজগাঁয়ে অন্যতম দ্রষ্টব্য ছবির মতো বাড়িটা দেখতে এসেছিলাম যার সামনে ছিল শিল্পী নভেরা আহমদের ভাস্কর্য। আরেকবার বড়ো মামি নিয়ে গিয়েছিলেন মিরপুর মাজারে। জগন্নাথ কলেজের সামনে থেকে বাসে উঠলাম, মুড়ির টিন বলা হতো যেগুলিকে। বাস চলছে তো চলছেই। শেষে লালমাটির এক গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছলাম। মাজারের সামনে একটি গাছ। সেখান থেকে বাসে উঠে আবার ঢাকা। আরেকবার মনে আছে দাদার সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে প্রথম বারের মতো প্লেনে চড়ে এলাম ঢাকা। ছত্রিশ টাকা বোধ হয় ছিল টিকেটের দাম। আমার নিশ্চয় অর্ধেক, আঠার টাকা। প্লেন নামল তেজগাঁয়। তারপর আগাছা, জঙ্গল, রেললাইন পেরিয়ে মেঠোপথ দিয়ে পৌঁছলাম ফুপুর বাড়ি। পরে শুনেছিলাম সেটি নাকি মনিপুরি পাড়া। একদম গ্রাম।

১৭তে পা দিয়ে এলাম ঢাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। সেই থেকে ঢাকায় আছি। তখন থেকে ছুটিছাটায় গেছি চট্টগ্রাম যেখানে বাবা-মা থাকতেন। উনসত্তরের উত্তাল দিন পেরিয়ে পৌঁছলাম 'জয়বাংলা' পর্যায়ে তারপর মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীন বাংলাদেশে যোগ দিলাম সাপ্তাহিক পত্রিকায়। তারপর যোগ দিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরি মধ্যে ঢাকার অলিগলি, রাস্তাঘাট চলে এসেছে নখদর্পণে। হেঁটে, সাইকেলে ঘুরে বেড়িয়েছি পুরোটা শহর। ঢাকা হয়ে উঠেছে নিজের এক প্রিয় শহর।

২

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলে এক আধটু গবেষণা করতে হয়। আমার গবেষণার বিষয় ছিল পূর্ববঙ্গ। এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে গুরুত্ব পায় এর প্রধান শহর ঢাকা। এদিক সেদিক পেতে থাকি নানা তথ্য। ঐ সময় কলকাতার ওপর বেশ কিছু বই বেরিয়েছিলো। আমি ছিলাম বিনয় ঘোষের ভক্ত। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, যোগাযোগও ছিল। তিনি আমাকে উৎসাহিত

করেন সংবাদ সাময়িকপত্র গবেষণায়। তখন মনে হয়, কলকাতার মতো ঢাকা নিয়ে আলাদা গবেষণা হবে না কেন? ঢাকা বিষয়ক বই খুঁজতে গিয়ে দেখি, আহমদ হাসান দানীর বইটিই সম্বল। সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরের বইটি দুষ্প্রাপ্য। যতীন্দ্র মোহনের বইয়ের একটি কপি আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে। এসব সম্বল করে এগোই। পুরনো সংবাদ সাময়িকপত্র, (পরে) ব্রিটিশ লাইব্রেরি, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, দিল্লির অভিলেখগারে কাজ করে পেতে থাকি বিভিন্ন সূত্র। ঢাকা বিষয়ক গবেষণার মাল-মশলা জমতে থাকে।

ঢাকা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রাথমিক ভাবে কিছু বাধার সম্মুখীন হই। আমি কাদের জন্য লিখব? প্রথম থেকেই আমার লক্ষ্য হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ, গুটিকয় নাক উঁচু পণ্ডিতদের জন্য লিখতে আমি কখনও আগ্রহ বোধ করিনি। গবেষণা ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল অদ্ভুত। যেমন, ইংরেজিতে লিখতে হবে, বই বা সাময়িকী দেখতে হবে অনুজ্জ্বল, ভাষা জটিল ও কঠিন। বাংলায় ভাল গবেষণা হয় না। যদি কোন বই বেশি বিক্রি হয় তাহলে তার মূল্য হ্রাস পায়।

স্বাধীনতার পরপর আমাদেব তরুণদের চিন্তাচেতনা ছিল অন্য রকম। মনে হয়েছিল, এদেশের কাছে আমরা ঋণী। তাই এদেশের ইতিহাসের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এদেশের সাধারণ মানুযের জন্য লিখতে হবে সে ভাষায় যে ভাষা তারা বোঝে। এটি সামাজিক দায়িত্ব। তা ছাড়া, একটি বিষয় বুঝতে আমি অক্ষম যে, দলিলপত্রের ওপব ভিত্তি করে গবেষণালব্ধ ফলাফল যদি সাধারণ বাংলায়, পত্রিকায় লিখি তাহলে তা গুরুত্বহীন হবে কেন? আমি তো ফিকশন লিখছি না।

এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে আমি লিখতে শুরু করি। বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক সিবাজুল ইসলাম আমাকে তখন উৎসাহিত করেছিলেন। লেখার বাহন হলো তখনকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'। 'বিচিত্রা'র সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। 'বিচিত্রা' ঢাকা বিষয়ক অনেক 'প্রচ্ছদ কাহিনী'ও প্রকাশ করে। বিষয় হিসেবে ঢাকা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

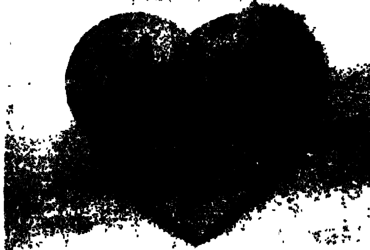
আমরা অনেকেই এতে উৎসাহিত বোধ করি। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে গঠিত হয় ঢাকা নগর জাদুঘর বাস্তবায়ন কমিটি। শিল্পী হাশেম খান ও আমি আমাদের সংগ্রহের মূল্যবান কিছু চিত্রকর্ম বিক্রি করে শুরু করি ঢাকা নগর জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কাজ। কবি, স্থপতি রবিউল হুসাইনও এক্ষেত্রে পালন করেন বিশেষ ভূমিকা। আমরা ঢাকা বিষয়ক অনেকগুলি প্রদর্শনী করি, 'ঢাকা গ্রন্থমালা' নামে ঢাকা বিষয়ক ১৪/১৫টি বই প্রকাশ করি। ঢাকা বিষয়ে ঢাকাবাসী উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। দশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সিটি কর্পোরেশনের ছয়তলায় আমাদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় ঢাকা নগর জাদুঘর।

গত দু'দশকে এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার নানা বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছি। কিছু লেখা হারিয়েও গেছে। নিজের লেখা ও সম্পাদনায় প্রায় তিরিশটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে এ সময়। তবে, এখানে বলে রাখা ভালো, আমি যে মৌলিক কিছু লিখেছি বা নতুন আলোয় শহর বিশ্লেষণ করেছি তা নয়। পূর্বসুরিদের রচনা ও খুঁজে পাওয়া তথ্যাবলী দিয়েই সাধারণ কিছু রচনা করেছি। ফলে, সেদিক থেকে বিচার করলে আমার গবেষণা বা ঢাকা বিষয়ক গ্রন্থসমূহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

৩

আগেই উল্লেখ করেছি গত দু'দশকে ঢাকা বিষয়ক আমার কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এতে পুনরাবৃত্তি আছে। ঢাকা বিষয়ক কোষগ্রন্থ 'ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী'তে অনেক রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যে সব বই ছাপা নেই তার অধিকাংশই আর ছাপা হবে না। অন্যদিকে, অনেকে পুরনো বইগুলি এখনও খোঁজাখুঁজি করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'অনন্যা'র স্বত্বাধিকারী মনিরুল হক আগ্রহী হয়ে সিদ্ধান্ত নেন 'ঢাকাসমগ্র' নাম দিয়ে ঢাকা বিষয়ক আমার রচনাগুলি প্রকাশ করবেন।

সূচি



হৃদয়নাথের ঢাকা শহর

মুনতাসীর মামুন

ঢাকার আর্মেনি সম্প্রদায়

ঢাকা শহরে এখনও আর্মেনিদের কথা মনে করিয়ে দেয় আর্মেনিটোলা এবং জীর্ণ, ম্লান আর্মেনি গির্জা। এ-শহরে এখন আর আর্মেনি সম্প্রদায়ের কেউ নেই। ১৯৮৪ সালে খোঁজ নিয়ে দেখেছি তখনও স্টেফান নামে একজন আর্মেনি বেঁচে ছিলেন। বসবাস করতেন নারায়ণগঞ্জে। কিছুদিন আগেও আর্মেনি গির্জাটির দেখাশোনা করতেন তিনি, সম্প্রতি স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় স্মৃতিভারাক্রান্ত গির্জায়ও আসেন না তিনি আর।

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, অতি ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা শহরে ছিলেন আর্মেনিরা প্রভাবশালী। কারণ, তাদের ছিল বিত্ত। অষ্টাদশ শতকে লবণ ব্যবসা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া। লবণ উৎপাদন ও বিতরণের জন্য কোম্পানি নিয়োগ করত ঠিকাদার। আর পূর্ববঙ্গে লবণের ঠিকাদারদের অধিকাংশই ছিলেন আর্মেনি। ঠিকাদারি ছাড়াও পান, পাট ও কাপড়ের ব্যবসায় ছিল তাদের কর্তৃত্ব। জমিদারিও ছিল অনেকের।

আর্মেনিরা ঢাকায় এসেছিলেন কবে জানা যায় নি। তবে ধরে নিতে পারি, মুঘল আমলে ভাগ্য বদলাতে দেশ-বিদেশ থেকে যখন অনেকে এসেছিলেন ঢাকায়, আর্মেনিরাও এসেছিলেন তখনই। তেজগাঁও পর্তুগিজ গির্জায় কবর আছে কয়েকজন আর্মেনিয়ানের, যাঁদের মৃত্যু হয়েছিল ১৭১৪ থেকে ১৭৯৫ সালের মধ্যে। সুতরাং, ধরে নিতে পারি সপ্তদশ শতকেই আর্মেনিরা দু-একজন করে আসতে থাকেন ঢাকায়। এবং বসবাস শুরু করেন এ-অঞ্চলে। সেই থেকে এ-অঞ্চল পরিচিত আর্মেনিটোলা নামে। তাইফুর জানিয়েছেন, সব আর্মেনি যে আর্মেনিটোলায় বাস করতেন এমন নয়। কেউ কেউ বাস করতেন মৌলবিবাজার ও নলগোলায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন আর্মেনিরা এবং যতই হয়ে উঠেছিলেন বিত্তবান ততই প্রভাবশালী। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকা শহরে তাঁদের প্রভাব কতটুকু ছিল তা বোঝা যাবে একটি উদাহবণ দিলে।

দোলাই খালের একটি অংশ আর্মেনিটোলার মাঝে পরিণত হয়েছিল বদ্ধ এক ঝিলে। শহরের নিকৃষ্টতম অঞ্চলগুলির মধ্যে এটি ছিল একটি। শহরের সমস্ত আবর্জনা, মলমূত্র ফেলা হত সেখানে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় এই ঝিলের তীরে কবরও দেয়া হত। আর্মেনিদের তখন টাকা-পয়সা হয়েছে, নিজেদের অঞ্চলটুকু স্বাভাবিকভাবেই

তাঁরা পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যাতে করে শহরের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এ-অঞ্চলের পার্থক্য থাকে। তাঁরা গিয়ে ধরনা দিলেন শহরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। ঢাকা শহরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন কাজ-পাগল ডস। শহরের উন্নয়নের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ঢাকা শহরের অন্য কোন গরিব অঞ্চলের লোকেরা বললে তিনি কী করতেন জানি না, কিন্তু ধনী আর্মেনিদের অনুরোধ সঙ্গে সঙ্গে তিনি রেখেছিলেন। এখানে সরকারি অর্থ ব্যয়ে তিনি কোন কার্পণ্য করেন নি। কীভাবে উন্নয়ন করেছিলেন ডস অঞ্চলটির?

ডস ঠিক করেছিলেন একটি খাল কেটে বুড়িগঙ্গার সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দেবেন ঝিলের। সব সময় পানি চলাচল থাকলে ঝিলটি আবর্জনামুক্ত হয়ে উঠবে। ১৮১৬ সালে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে ৭২৩ ফুট দীর্ঘ, ১৮ ফুট প্রস্থ ও ১৬ ফুট গভীর সংযোগ-খালটি কাটা হয়েছিল এবং চলাচলের জন্য তার উপর নির্মাণ করা হয়েছিল পুল। বাবুবাজার থেকে মিটফোর্ড যাবার পথে যে-পুলটি কয়েকদিন আগেও ছিল, যা এখন ভেঙে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে, অনুমান করছি, সেটাই ছিল ঐ পুল। (খালের পুরানো খাত বরাবর কিছুদিন আগে নির্মিত হয়েছে রাস্তা)।

উনিশ শতকের ঢাকায় পরিচিত ও প্রভাবশালী পরিবার হিসেবে যে-ক'টি আর্মেনি পরিবারের নাম পাওয়া যায় সেগুলি হল— পোগজ, আরাতুন, পানিয়াটি, কোজা মাইকেল, মানুক, হার্নি এবং সার্কিস। এঁদের বিত্তের ভিত্তি ছিল জমিদারি এবং ব্যবসা। বিদেশী হয়েও জমিদারি কেনার আরেকটি কারণ থাকতে পারে— আভিজাত্য অর্জন এবং সমাজের শীর্ষে থাকা। ১৭৮১ সালে কোম্পানির এক চিঠিতে জানা যায় পানিয়াটি আলেকজান্ডার চাটগাঁ ও ভুলুয়াতে (নোয়াখালী) লবণ বিক্রি করে পেয়েছিলেন ৬৪৫০ টাকা। লবণের ঠিকাদারি করে বড়লোক হয়েছিলেন পানিয়াটি। আরেকটি চিঠিতে জানা যায়, কোজা মাইকেল ১৭৮৬ সালে কিনেছিলেন দক্ষিণ শাহবাজপুরের জমিদারি (ভোলা)। আরাতুনের জমিদারি ছিল পরগনা হুসেন শাহিতে। লুকাস ছিলেন দৌলত খাঁর জমিদার। ১৮৬৮ সালের ঢাকার জমিদারদের এক তালিকায় দেখা যায়, ছ-জন ইউরোপীয় জমিদারের মধ্যে পাঁচ জনই ছিলেন আর্মেনি। এঁরা হলেন - জে. জি. পানিয়াটি, জে. স্টেফান, জে. টি. লুকাস এবং ডব্লিউ. হার্নি।

এ-সব ধনী আর্মেনিয়ান ঢাকায় তৈরি করেছিলেন নিজেদের থাকার জন্য প্রাসাদতুল্য সব বাড়ি। ফরাশগঞ্জের বর্তমান রূপলাল হাউস ছিল আরাতুনের। বর্তমান আণবিক শক্তি কমিশন ভবনের স্থানে ছিল তাঁর বাগানবাড়ি। মানুক থাকতেন সদরঘাটে। বর্তমানে 'বাফা' যে বাড়িতে, আদতে সেটি ছিল নিকি পোগজের। পরে, আর্মেনিটোলায় নির্মিত হয়েছিল 'নিকি সাহেবের কুঠি।' এ-বাড়িটি তখন কিনে নিয়েছিলেন নীলকর ওয়াইজ। ঢাকার সিভিল সার্জন ডা. ওয়াইজও কিছুদিন ছিলেন এ-বাড়িতে। পরবর্তী কালে এটি ছিল ঢাকার নবাবদের চিফ ম্যানেজারের বাড়ি। আনন্দ রায় স্ট্রিটে ছিল স্টেফানের বাড়ি। তাজমহল সিনেমার জায়গাটিতে ছিল পানিয়াটির অট্টালিকা। কাচাতুরের বাড়ি ছিল বাবুবাজার পুলের

উত্তর-পশ্চিমে। আজকের কাজী আলাউদ্দিন রোডের মোড়ে অবস্থিত পশু হাসপাতালটির জায়গায় ছিল তাঁর বাগানবাড়ি।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি অনেক আর্মেনি ঝুঁকে পড়েছিলেন ব্যবসার দিকে। ধরে নিতে পারি, ঢাকায় প্রথম ইউরোপীয় জিনিসপত্র বিক্রি করার জন্য দোকান খুলেছিলেন, জি. এম. সিরকোর, ১৮৫৭ সালে। শাঁখারিবাজারে স্থাপিত এ-দোকানটির নাম ছিল 'সিরকোর এন্ড সন্স'। সি. জে. মানুক, জে. এ. মিনাস এবং আনানিয়া দোকান খুলেছিলেন পাটুয়াটুলি, বাংলাবাজার, দিগবাজারে। 'মেসার্স আনানিয়া এন্ড কোম্পানি' ছিল প্রতিষ্ঠিত মদ ব্যবসায়ী। জি. এম. সিরকোর যে-সব মহার্ঘ দ্রব্য বিক্রি করতেন তার একটি ছিল চা। ১৮৫৬ সালে সিরকোরই প্রথম ঢাকায় চালু করেছিলেন ঘোড়ার গাড়ি, যা পরিচিত ছিল তখন 'ঠিকাগাড়ি' নামে। সিরকোরের ঠিকাগাড়ির ব্যবসা বেশ জমে উঠেছিল। এবং কালক্রমে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঢাকার প্রধান যানবাহন। এক হিসাবে জানা যায়, ১৮৬৭ সালে 'ঠিকাগাড়ি'র সংখ্যা ছিল ঢাকায় ষাটটি। ১৮৭৪-এ তিনশ। এবং ১৮৮৯ সালের দিকে সে-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ছ-শতে।

১৮৪০-৫০-এর দিকে অনেক আর্মেনি আবার পার্টনারশিপ ব্যবসায়েও যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৪৬ সালে স্থাপিত ঢাকা ব্যাংকের একজন পরিচালক ছিলেন জে. জি. এন. পোগজ। কমিশন এজেন্সিতে (মাল সরবরাহ) প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন জে. লুকাস, এ. এম. ডেভিড, এ. থমাস এবং জে. মিনাস।

পাটের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা আর্মেনিরাই প্রথম বুঝেছিলেন। পাটের ব্যবসায় তারাই পালন করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। ১৮৬০-৭০-এর দিকে পাট ব্যবসায়ে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তাঁরা হলেন – আব্রাহাম পোগজ, এম. ডেভিড, জে. সি. সারকিস, এম. কাচাতুর, এ. থমাস, জে. জি. এন. পোগজ, মাইকেল সারকিস এবং পি. আরাতুন। এঁদের মধ্যে ডেভিড ছিলেন প্রধান। তাঁকে বলা হত 'মার্চেন্ট প্রিন্স অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল'।

তবে উনিশ শতকের শেষার্ধে (ষাট-সত্তরের দশক থেকে) সম্প্রদায়গতভাবে আর্মেনিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পেয়েছিল।

১৮৩২ সালে হেনরি ওয়ালটার্সের উপাত্ত থেকে জানা যায়, ঢাকায় আর্মেনিয়ানদের মোট বাড়ির সংখ্যা ছিল ৪২টি। মোট আর্মেনির সংখ্যা ছিল ১২৬ জন। ষোল বছরের উপরে পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৯ ও ৩৭ জন এবং বালক-বালিকার সংখ্যা ছিল ২৫ ও ১৫ জন। ১৮৪০ সালে টেলর লিখেছিলেন, ঢাকায় বসবাস করতেন ৪০টি আর্মেনি পরিবার। হাণ্টার জানিয়েছেন, সত্তর দশকে খুব দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল ঢাকায় আর্মেনিদের সংখ্যা ও সম্পদ। ১৮৭১ সালে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল একশরও নিচে। এঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন জমিদার। চার জন দোকানদার (ব্যবসায়ী), আর বাকিরা নিয়োজিত ছিলেন অন্যান্য পেশায়। ১৮৭২-এর আদমশুমারি অনুযায়ী সম্পূর্ণ ঢাকা জেলায় আর্মেনিদের সংখ্যা ছিল একশ একুশ জন। হাণ্টার আরও লিখেছিলেন, এমনিতে আর্মেনিরা খুব রক্ষণশীল কিন্তু ঐ সময় চলছিল একটি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া।

অর্থাৎ আর্মেনিরা তখন ঝুঁকেছিলেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে। এক কথায় বলা যেতে পারে, অনেকের জমিদারি গিয়েছিল হাতছাড়া হয়ে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তারা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই এঁদের অনেকের জমিদারি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। আরাতুনের উত্তরাধিকারীরা খাজা আলিমউল্লাহর কাছে জমিদারি বিক্রি করে চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়, লুকাস জমিদারি বিক্রি করে দিয়েছিলেন আনন্দচন্দ্র রায়ের কাছে, পোগজ জমিদারি বিক্রি করে চলে গিয়েছিলেন লন্ডন। অনেকে আবার ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে গ্রহণ করেছিলেন অন্য পেশা। উদাহরণস্বরূপ ১৮৭০ সালে ঢাকার একটি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন দেখা যাক

'ঢাকা নগরীর মেঃ জে. সি. এন. পোগজ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মেঃ গ্রেগরী জে. পোগস সাহেব যিনি বিলাতে শিক্ষিত হইয়া, ব্যারিষ্টারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং যিনি এতদিন আগ্রা ও এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের কার্য্য করিতে ছিলেন, সম্প্রতি তিনি ঢাকায় আগমন করিয়া অত্রস্থ ফৌজদারী ও সেশন আদালতে কয়েকটি মোকদ্দমায় কার্য্য করিয়াছেন। মোকদ্দমাকারীগণ তাঁহাকে কোন মোকদ্দমায় নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে ঢাকাস্থ পানিয়াটি সাহেবের গল্লিতে তাহার বাসস্থান অনুসন্ধান করিবেন।'

তবে অনেকে শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিলেন বা ফিরে এসেছিলেন ঢাকায়। এমনি একজন ছিলেন জে. ডি. বাগনার। তিনি আর্মেনীদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে তোলার জন্য ১৮৯২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেছিলেন মাসিকপত্র আরা। কিন্তু পরের বছরই পাততাড়ি গুটিয়ে চলে এসেছিলেন ঢাকায়। এবং তখন (১৮৯৩) থেকে 'সাহিত্য, আর্মেনীয় ইতিহাস ও রাজনৈতিক বিষয়ক মাসিকপত্র' আরা প্রকাশিত হত ঢাকা থেকে। পত্রিকাটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল কুড়ি। বার্ষিক চাঁদা দু-টাকা। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল আট আনা। বিজ্ঞাপনের হার ছিল প্রতি পাতা আট টাকা, অর্ধেক পাঁচ টাকা।

ঢাকা শহরের বিভিন্ন কাজকর্মে, সভা-সমিতিতে আর্মেনীয়রা যুক্ত করেছিলেন নিজেদের। নিকি পোগজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পোগজ স্কুল। আরাতুন ছিলেন ঢাকা নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ। তাঁর আমলে নর্মাল স্কুল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। একটি সংবাদে জানা যায়

'অন্যান্য নর্ম্মাল স্কুল হইতে বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষায় ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল উৎকৃষ্ট নম্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা ও হুগলীর বালকগণ পূর্ব্বদেশীয় বালকগণ অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় অধিকতর পটু বলিয়া আমাদিগের যে সংস্কার ছিল, এতদ্বারা তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে?'

ঢাকার প্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে ছিলেন সার্কিস। ১৮৭৪-৭৫ সালে, ঢাকা পৌরসভার ন-জন কমিশনারের মধ্যে দু-জন ছিলেন আর্মেনী জে. জি. এন. পোগজ এবং এন. পি. পোগজ।

আর্মেনিটোলায় থিতু হয়ে বসার পর আর্মেনীরা এখানে নির্মাণ করেছিলেন তাদের গির্জা। বর্তমান আর্মেনিটোলায় আর্মেনি যে-গির্জাটি আমরা দেখতে পাই তা নির্মাণ করা হয়েছিল ১৭৮১ সালে। তবে খুব সম্ভব এর আগে তাদের ছোট একটি উপাসনাগার ছিল। এখন যে-জায়গায় গির্জাটি দাঁড়িয়ে আছে ১৭৮১ সালে সেখানে ছিল আর্মেনিদের গোরস্থান। গির্জা নির্মাণের জন্য গোরস্থানের আশেপাশে যে-বিস্তৃত জমি তা দান করেছিলেন আগা মিনাস ক্যাটচিক। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, জানিয়েছেন ফার্মিঙ্গার, গির্জাটি নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন চার জন— মাইকেল সার্কিস, অকোটাভাটাসেতুর সিভর্গ, আগা এমনিয়াস এবং মার্কার পোগজ। গির্জাটি লম্বায় সাড়ে সাতশ ফুট, দরজা চারটি, জানালা সাতাশটি। এর পাশেই ছিল একটি ঘড়িঘর। এটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন জোহানস কারুপিয়েত সার্কিস। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ভেঙে গিয়েছিল ঘড়িঘরটি। গির্জার পনের ফুটের মধ্যে ছিল একটি স্থূল বর্গাকার টাওয়ার, চূড়ায় চারটি শঙ্খিল মিনার। চার দেয়ালের মাঝে, মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে দেয়ালে লাগানো একটি মার্বেল ফলক। আর্মেনি ও ইংরেজি ভাষায় তাতে লেখা, যার মূল কথা হল, মি. সার্কিস ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছেন এই চমৎকার জাঁকালো মিনার।

১৮৪০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরে লে. কর্নেল ডেভিডসন এসেছিলেন ঢাকায়। আর্মেনিদের ক্রিসমাস উৎসবে তিনি হঠাৎ গিয়েছিলেন আর্মেনি গির্জায়। চৌদ্দ ফুট প্রশস্ত এক বারান্দা দিয়ে ডেভিডসন ঢুকলেন গির্জায়। দালানের ভেতর মেঝে তিন ভাগে বিভক্ত, রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি বেদি, মাঝখানের অংশে আছে দুটি ফোল্ডিং দরজা। তৃতীয় ভাগটি বেষ্টনী দিয়ে আলাদা করা যাতে বসেছিল মহিলা ও শিশুরা। এর উপরে আছে আবার একটি গ্যালারি। দেয়াল থেকে চার ফুট দূরে অর্ধবৃত্তাকার বেদি, মনে হয় তা কাঠের তৈরি এবং দশ ফুটের মতো উঁচু। সিঁড়ি আছে উপরে ওঠার: সিঁড়িতে তিন ফুট করে লম্বা চব্বিশটি মোমবাতি আর চক্‌চকে ধাতুর কিছু ক্রস। রোদালো সকাল, তবু জ্বলছিল সব মোমবাতি।

গির্জার ভেতরে এখনও আছে একটি তৈলচিত্র। এখন তা মলিন। খুব সম্ভব তা আঁকা চার্লস পোট নামে এক অ্যাংলো চিত্রকরের যিনি একসময় ছিলেন পোগজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

১৮৮০-র দিকে আর্মেনি গির্জার বিখ্যাত ঘণ্টাটি (হয়ত) স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আক্ষেপ করে লিখেছিল একটি সংবাদপত্র

...আরমানীটোলা বলিয়া প্রসিদ্ধ, আরমানী ভজনালয়ে সাধারণের সময়জ্ঞাপক একটা অতি বৃহৎ ঘণ্টা বহুকাল হইতে স্থাপিত ছিল। নিতান্ত আক্ষেপের [বিষয়] এই যে, সম্প্রতি উহার কার্য্য রহিত হইয়াছে। শুনা যায়, তদানীন্তন আরমানীগণের দুরবস্থা নিবন্ধন তাঁহারা এতদ্‌সংক্রান্ত ব্যয় সংক্ষেপ করাতেই সাধারণের সুবিধাজনক এই কার্য্য স্থগিত হইয়াছে। এই গীর্জার ঘণ্টার শব্দ নগরের প্রায় সমস্ত স্থানসমূহ হইতেই শ্রুতিগোচর হইত। এমনকি রাত্রি অর্ধেক হইলে চারিক্রোশ দূরবর্তী স্থান হইতেও উহার শব্দ শুনা যাইত।...আরমানীটোলার গীর্জার ঘটিকাশব্দ শুনিয়া অধিকাংশ ঢাকাবাসীই আপন আপন

ঘটিকার সময় ঠিক করিয়া রাখিতেন। ঢাকায় অনেক স্থলে ঘটিকার সময়জ্ঞাপক কাঁসির বাদ্য হয় সত্য, কিন্তু তাহা নিকটবর্ত্তী লোক ভিন্ন অপরের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হয় না। অতএব পূর্ব্বতন আরমানীগণের কীর্ত্তি রক্ষা ও ঢাকাস্থ সর্ব্বসাধারণের সুবিধার দিকে দৃষ্টি না করিয়া অধুনাতন আরমানীগণ সামান্য ব্যয় সংক্ষেপানুরোধে যে গীর্জার ঘণ্টাবাদক ভৃত্যগণকে উঠাইয়া দিতেছেন উহা কতদূর সঙ্গত হইতেছে, আমরা নির্বন্ধসহকারে অনুরোধ করি তাঁহারাই একবার স্থিরচিত্তে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।'

ঢাকার আর্মেনিদের কবর আছে আর্মেনি গির্জার চতুর্দিকের প্রাঙ্গণে। অষ্টাদশ শতকের পুরানো কবরও আছে সেখানে। অধিকাংশ স্মৃতিফলকে উদ্ধৃত হয়েছে ধর্মগ্রন্থের বাণী। এপিটাফগুলি পাথরের আর এগুলির অধিকাংশ কিনে আনা হয়েছিল কলকাতার ওয়েলেসলি স্ট্রিট থেকে। দু-একটি এপিটাফের কথা উল্লেখ করছি এখানে।

ম্যাক. এস. ম্যাকারটিক নামে এক যুবকের কবর আছে সেখানে, যার জন্ম হয়েছিল পারস্যের কারমেনে। চব্বিশ বছরের ম্যাকারটিক পরলোকগমন করেছিলেন চাঁদপুরে। তাঁর ভাবী বধূ তৈরি করে দিয়েছিলেন তাঁর সমাধি ও এপিটাফ। লেখা আছে এপিটাফটিতে তাঁকে ভালবাসতাম বলেই তাঁর অনুপস্থিতি আমার কাছে সত্যই দুঃখের। স্মৃতিতে সে আছে আমার কাছে। অজস্র নীরব অশ্রুর মাঝে তাকে এখনও ভালবাসি, সারাক্ষণ স্মরণ করি, পেতে চাই একান্ত আপন করে।

— প্রিয়তমা, আমার জন্য কোরো না অশ্রুপাত। আমি তো তোমার ছিলাম না, ছিলাম খৃস্টের। তিনিই আমাকে ভালবাসতেন সবচেয়ে বেশি, আর তিনিই আমাকে নিয়ে গেছেন তাঁর ঘরে ডেকে। (ভাবানুবাদ)।

ক্যাটচিক আভেটিক থমাসের সমাধির উপর তাঁর স্ত্রী কলকাতা থেকে কিনে এনে বসিয়েছিলেন সুন্দর এক মূর্তি যা এখনও টিকে আছে। এপিটাফে তিনি তাঁর স্বামীকে উল্লেখ করেছিলেন 'বেস্ট অফ হাজব্যান্ডস' বলে।

এখনও আর্মেনিটোলার গির্জার মতো শান্ত, নিরিবিলি জায়গা ঢাকায় খুব কমই আছে। কিছুদিন আগেও গির্জার রক্ষণাবেক্ষণ ছিল ভালো। সম্প্রতি দেখে মনে হল, ক্রমেই গির্জাটির রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই ঢাকার আরও অনেক পুরানো ঐতিহাসিক অট্টালিকার মতো এটিও ধ্বংস হয়ে যাবে।

তথ্য নির্দেশ

A. L. Clay, Leaves from a Diary in Eastern Bengal, London, *1898. Ara 1893*

Azimusshan Haider, *A City and its Civic Body* A souvenir to mark the centenary of Dacca Municipality, Dacca, 1966.

Henry Walters, 'Census of the City of Dacca', *Asiatic Researches,* 1837.

S M Taifoor, *Glimpses of Old Dacca*, Dacca. 1956
Sharifuddin Ahmed, *Dacca*, London, 1986.
Sirajul Islam, *District Record Dacca*, Dacca, 1981.
W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, vol. v, London, 1875
Walter Firminger, 'Some Old Graves at Dacca', *Bengal Past and Present*, vol. xv, 1917.
জেমস টেলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা* (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), ঢাকা, ১৯৭৮।
ঢাকা প্রকাশ, ১৮৬৬, ১৮৭০, ১৮৮০।
মুনতাসীর মামুন, *কর্ণেল ডেভিডসন যখন ঢাকায়*, ঢাকা, ১৯৯১।

ঢাকার কাগুজে নবাব

বৃটিশ আমলের ঢাকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ঢাকার নবাব আবদুল গনি ও নবাব আহ্‌সানউল্লাহ্‌র নাম। বা অন্যভাবে বলতে পারি, প্রায় একশ বছর ধরে ঢাকার নবাবপরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তি ঢাকায় তো বটেই পূর্ববঙ্গেও ছিল অসীম। ঢাকাতেই তাঁদের জন্ম, ঢাকাতে বসবাস করেছেন তাঁরা আজীবন এবং পরলোকগমনও করেছিলেন ঢাকায়। নবাব আহ্‌সানউল্লাহ্‌র পুত্র নবাব সলিমুল্লাহ্‌ বিশ শতকের গোড়ায় মুসলমান রাজনীতিতে কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ঢাকা শহরে এই নবাবপরিবারের যে-প্রতিপত্তি ও বৈভব ছিল, সলিমুল্লাহ্‌র সময় ঠিক ততটা ছিল না। বরং ইংরেজ সরকার তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন ঋণজাল থেকে।

ঢাকায় নবাবপরিবারের পত্তন করেছিলেন খাজা আলিমউল্লাহ্‌ বা আলি মিয়া। তবে, 'নবাব' উপাধি বৃটিশ সরকার দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র আবদুল গনিকে। এবং সে-সময় বংশানুক্রমিকভাবে সে-উপাধি ব্যবহারেরও অধিকার দেয়া হয়েছিল। ঐ সময় থেকে এই পরিবার পরিচিত ছিল ঢাকার নবাবপরিবার নামে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর এক প্রবন্ধে, ঢাকার এই নবাবদের উল্লেখ করেছেন কাগুজে নবাব হিসেবে। হয়ত, এক সময় ঢাকার খানদানি পরিবারের লোকজন (মুঘল আমলে বসতি স্থাপনকারী অভিজাতরা) তাচ্ছিল্যভরে এই নামই ব্যবহার করতেন। কারণ, ঢাকার আদি বা খানদানি নবাবপরিবার ছিল নিমতলি কুঠির নায়েব-নাজিমরা, যে-বংশের শেষ উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৪৩ সালে। অবশ্য নায়েব-নাজিমদের আগে ঢাকা যখন ছিল বাংলার রাজধানী এবং ঢাকায় বসে যে-মুঘল সুবাদাররা বাংলা শাসন করতেন তাঁদেরও বলা হত নবাব।

এখানে প্রথমে ঢাকার নবাবপরিবারের উৎপত্তি, খাজা আলিমউল্লাহ্‌, নবাব আবদুল গনি, আহ্‌সানউল্লাহ্‌ ও সলিমুল্লাহ্‌ সম্পর্কে ধারাবাহিক এবং সবশেষে আহ্‌সান মঞ্জিল নিয়ে আলোচনা করব।

নবাবপরিবারের পত্তন কে করেছিলেন তা নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত। লোকনাথ ঘোষের মতে, কাশ্মির থেকে খাজা আবদুল হাকিম রাজকর্মচারী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন দিল্লিতে। নাদির শাহ দিল্লি আক্রমণ করলে তিনি চলে এসেছিলেন সিলেটে এবং শুরু করেছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসার বিস্তার ঘটলে তিনি পিতা আবদুল

কাদির ও ভাই আবদুল্লাহ এবং ওয়াহাবকে কাশ্মির থেকে সিলেটে চলে আসতে বলেছিলেন। আবদুল হাকিম মারা গিয়েছিলেন সিলেটে এবং তাঁকে সমাহিতও করা হয়েছিল সেখানে। তারপর আবদুল্লাহ চলে এসেছিলেন ঢাকায়।

ব্রাডলি বার্ট লিখেছেন, আবদুল্লাহ কাশ্মির থেকে দিল্লি এবং তারপর দিল্লি থেকে চলে এসেছিলেন সিলেটে। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন ব্যবসায়ী হিসেবে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা ঢাকার বেগমবাজারে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। আবার অন্য একটি গ্রন্থে আবদুল হাকিমকে তিনি উল্লেখ করেছেন নবাবপরিবারের আদি পুরুষ হিসেবে।

বাকল্যান্ডও নবাবপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন আবদুল হাকিমকে, যিনি সিলেট থেকে ঢাকায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন।

তাইফুরের মতে, এ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবদুল ওয়াহাব। তাঁর দু-ভাই হাফিজউল্লাহ ও আহসানউল্লাহ ঢাকার পুরব দরওয়াজায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন।

সম্প্রতি মুহম্মদ আবদুল্লাহ নবাবপরিবারের ইতিহাস সম্পর্কিত দুটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে নতুন কিছু তথ্য উদ্ধার করেছেন। একটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেছিলেন খাজা আলিমউল্লাহর ভাইপো ও জামাই, ফার্সি ভাষার কবি আবদুর রহিম সাবা (মৃ. ১৮৭১)। তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির নাম *তারিখ-এ-কাশ্মিরিয়ান-এ-ঢাকা*। এ-পাণ্ডুলিপি রচনায় তাঁকে সাহায্য করেছিলেন আলিমউল্লাহ। সাবা লিখেছেন, খাজা হাকিম ছিলেন কাশ্মিরের শাসনকর্তা। কোন এক কারণে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে তিনি দিল্লি রওনা হয়েছিলেন। দিল্লি যাত্রার সময় তাঁর নিকট-আত্মীয় খাজা আবদুল্লাহ ও খাজা আবদুল ওয়াহাবকে তাঁর সফরসঙ্গী হওয়ার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা রাজি হন নি। নতুন শাসনকর্তা এসে তাদের হেনস্তা শুরু করলে (যেহেতু তাঁরা ছিলেন ক্ষমতাচ্যুত শাসনকর্তার আত্মীয়) তাঁরা ঢাকায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। আবদুল ওয়াহাব ব্যবসা করতেন 'সামুদ্রিক কুকুরের চর্মের'। ছোট ভাই আবদুল্লাহ ছিলেন আলেম।

ইতোমধ্যে খাজা হাকিম ঢাকার বেগমবাজারে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। এরপর ওয়াহাব ও আবদুল্লাহর পিতা আবদুল কাদির চলে এসেছিলেন ঢাকায় এবং বিয়ে করেছিলেন আবদুল হাকিমের মেয়ে আশুরি খানমকে।

আবদুল্লাহর পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় ও মেজ ছিলেন আহসানউল্লাহ ও হাফিজউল্লাহ। আহসানউল্লাহর তিন ছেলের মধ্যে কনিষ্ঠ আলিমউল্লাহকেই বলা যায় নবাবপরিবারের আসল প্রতিষ্ঠাতা।

তাওয়ারিখ-এ-খান্দান-এ-কাশ্মিরিয়াহ নামক পাণ্ডুলিপির লেখক ছিলেন নবাব আহসানউল্লাহ। তিনিও প্রায় একই বর্ণনা দিয়েছেন নিজ পরিবার সম্পর্কে।

উল্লিখিত দুজনের বর্ণনা সঠিক হলেও একটি তথ্য বোধ হয় সঠিক নয়। আবদুল হাকিম খুব সম্ভব কাশ্মিরের শাসনকর্তা ছিলেন না। নবাবপরিবারের দুজনই তাঁকে

শাসনকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন আভিজাত্য অর্জনের জন্য। প্রথম দিকে সবাই তাঁদেরকে চামড়া বা গাঁজা ব্যবসায়ী হিসেবেই জানতেন। ধনাঢ্য হলেও সমাজে তাঁরা আভিজাত্য অর্জন করতে পারেন নি। আবদুল হাকিমকে তাই তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন শাসনকর্তা হিসেবে। এ-ছাড়া বলা হয়েছে আবদুল কাদির আবদুল হাকিমের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। খুব সম্ভবত এটি ছিল দ্বিতীয় বিয়ে, যদিও কেউ তা উল্লেখ করেন নি।

এ-সমস্ত তথ্য থেকে বলা যায়, কাশ্মির থেকে আবদুল হাকিম অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশকে সিলেটে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছিলেন। এবং এ-সময় আবদুল্লাহ ও আবদুল ওয়াহাব এই দুই ভাইও সিলেট এসেছিলেন। তাঁরা ছিলেন আবদুল হাকিমের আত্মীয় (সম্পর্ক জানা যায় নি)। কিছুদিন পর আবদুল কাদির চলে এসেছিলেন সিলেটে এবং বিয়ে করেছিলেন হাকিমের মেয়েকে। আহসানউল্লাহর মতে, আবদুল হাকিম সিলেটেই পরলোকগমন করেছিলেন।

আবদুল ওয়াহাবের ছিল এক ছেলে— খলিলুল্লাহ। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে তিনি সম্পত্তি প্রায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ বিয়ে করেছিলেন সিলেটের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, আরেকজন কাশ্মিরি খাজা আবদুল সালাম কাশ্মিরির মেয়েকে। আবদুল্লাহ পরে চলে এসেছিলেন ঢাকায়।

আবদুল্লাহর বড় ছেলে আহসানউল্লাহ ছিলেন ধার্মিক, বিয়ে করেছিলেন আবদুল হাকিমের এক পৌত্রী ফাতেমা খানমকে। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আলিমউল্লাহ প্রতিপালিত হয়েছিলেন চাচা হাফিজউল্লাহর কাছে। আলিমউল্লাহর ছেলে আবদুল গনিই এ-পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যিনি উপাধি পেয়েছিলেন 'নবাব'। এবং তা ঘটেছিল ১৮৭২ খৃস্টাব্দে।

খাজা আলিমউল্লাহ (?— ১৮৫৪)

আহসান মঞ্জিল বা ঢাকার নবাবদের আদি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলি মিয়া বা খাজা আলিমউল্লাহ। এ-পরিবারের মৌলবি আবদুল্লাহর পাঁচ ছেলের মধ্যে মৌলবি আহসানউল্লাহ ছিলেন সুফি ও 'আলিম-ই আলম'। মক্কায় হজ্ব করতে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আলিমউল্লাহকে রেখে গিয়েছিলেন হাফিজউল্লাহর কাছে। আহসানউল্লাহ আর ফিরে আসেন নি। মক্কার পথেই পরলোকগমন করেছিলেন।

হাফিজউল্লাহ ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় শাস্ত্রে ছিলেন পারদর্শী এবং ঢাকায় তিনি পেয়েছিলেন পীরের সম্মান। তায়েশের মতে, 'এ-শহরের অধিকাংশ লোক তাঁর মুরিদ হন।' তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন তাঁর ছেলে আবদুল গফুর।

হাফিজউল্লাহর সময় থেকেই এ-পরিবার কেনা শুরু করেছিল জমিদারি। আলিমউল্লাহ তাঁর কাছে প্রতিপালিত হয়েও আলাদা ব্যবসা শুরু করেছিলেন। মৃত্যুকালে হাফিজউল্লাহ আলিমউল্লাহকে দুটি উপদেশ দিয়েছিলেন। উপদেশটি ছিল ব্যবসা

থেকে সব পুঁজি প্রত্যাহার করে জমিদারিতে বিনিয়োগ। এবং এ-ক্ষেত্রে, এক, জমি যেন চরাঞ্চলে হয়; দুই, কৃষক মুসলমান হলে নায়েব যেন হয় হিন্দু। আলিমউল্লাহ এ-উপদেশ মেনে ১৮২৫ থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জমিদারি কিনেছিলেন। এ-সব জমিদারি ছিল ঢাকা, বাখরগঞ্জ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে, যার বার্ষিক আয় ছিল আট লক্ষ টাকা।

১৮৩৫ সালে ফরাসি কুঠিয়ালদের কাছ থেকে একটি বাড়ি (দ্র. আহসান মঞ্জিল) কিনে নিয়ে আলি মিয়া জাঁকিয়ে বসেছিলেন ঢাকায়। তখন তিনি শুধু ঢাকার নন, পূর্ববঙ্গের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। কিন্তু নব্য ধনী হিসেবে সামাজিক আভিজাত্যে তাঁর স্থান ছিল নিচুতে। এ-ছাড়া সবাই তাঁকে ডাকতেন আলি মিয়া। 'মিয়া' পদবিটি ছিল গ্রামাঞ্চলে সম্মানের প্রতীক। বাখরগঞ্জের প্রজারাই তাঁকে দিয়েছিল এই উপাধি।

আভিজাত্য অর্জনের জন্য আলিমউল্লাহ তখন ঢাকার পরিবারসমূহের কাছ থেকে কেনা শুরু করলেন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। কারণ, সেই সব পরিবার তখন ক্ষয়ের পথে। যেমন, কুতুবউদ্দিন ছিলেন ঢাকা শহরের একজন অভিজাত। তিনি ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে আলিমউল্লাহ তাঁকে অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন অন্তত তাঁকে মুঘল বাদশাহ প্রদত্ত রূপোর ছড়ি আর মুক্তোর মালাটা বিক্রি করে যান। কুতুবউদ্দিন সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ঢাকার আরেক ধনাঢ্য ব্যক্তি গোপাল দাসকে মাত্র দু-হাজার টাকায় তা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। আলিমউল্লাহ পরে গোপাল দাসের কাছ থেকে তা আবার তেইশ হাজার টাকায় কিনে নিয়েছিলেন। আরও কিনেছিলেন জুড়ি গাড়ি, আয়োজন করেছিলেন বাৎসরিক ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার। ভোজ, নাচ ও জলসার আসরের।

পুরানো অলংকার, রত্ন কেনা ছিল তাঁর নেশা। বিশ্বের একটি বিখ্যাত হীরা দরিয়া ই-নূর কিনেছিলেন তিনি। তাইফুর জানিয়েছেন, এটি তিনি কিনেছিলেন নায়েব নাজিম নুসরাত জংয়ের পরিবার থেকে। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নয়, কারণ বিখ্যাত হ্যামিলটন কোম্পানির ক্যাটালগে দেয়া হয়েছে অন্য তথ্য এবং সে-তথ্য তাইফুর প্রদত্ত তথ্য থেকে নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। হ্যামিলটনের ক্যাটালগে উল্লেখ করা হয়েছে

'It is encircled by ten large magnificent table diamonds of the first order and of the utmost brilliency free from all impurities, in a rich gold-enamelled setting in the form of an armlet, and also suited for a head ornament with ten pearls. The Darya-i-Noor is believed to be the largest and most beautiful diamond ever in Bengal. It was formerly for ages in possession of the Maratha princes, and afterwards passed, at a cost of 1,30,000/= rupees to the ancestor of Nawab Soorajoot Moolk, the present Minister of Hyderabad, subsequently it reached the Punjab, and was in possession of the Maharajas Ranjit Sing, Neonchal Sing and Ghere Sing. It was sent to

the great exhibition in 1850 (London) with the Kohinoor possessed by the Queen of England, and it was remarkable for its very large surface at its superior brilliency and purity of colour to the Kohinoor Its wonderful size, perfection and great weight makes it of extraordinary commercial value worthy alike of the refined taste of the prince, noblemen or capitalist This splendid jewel was sold by public sale under the commands of the government of India in 1852 and was purchased by Hon'ble Khajah Ali Mollah

লিখেছেন, ঐ সময়ে ঢাকার স্কুলে মুসলমান ও আর্মেনি ছাত্রের সংখ্যাই ছিল বেশি, হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল কম। এ-তথ্য বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

আবদুল গনিকে খাজাপরিবারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল মাত্র আঠার বছর বয়সে। বাংলা ১২৫৩ সালে খাজাপরিবারের সবাই মিলে, '...শুধু কর্তৃত্ব নহে : তাঁহারা এক ওয়াকফনামা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে চিরদিনের জন্য তাঁহার মতল্লি করেন এবং তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা মতল্লি করিতে পারিবেন, এরূপ ক্ষমতা তাহাকে প্রদান করেন, ঐ এজমালী সম্পত্তির ন্যায্য মোসহারা [মাসোহারা] পাওয়া ভিন্ন অপর বিশেষ কোন দাবী তাঁহারা রাখিয়া ছিলেন না। ঐ রূপ ওয়াকফনামা ১২৫৩ সালে ২৭শে বৈশাখ প্রস্তুত হয়।'

আবদুল গনি ইংরেজ শাসকদের নজরে এসেছিলেন প্রথম ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সময়। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাতাশ। অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন তিনি ইংরেজদের, যে-জন্য বাংলার শাসক হ্যালিডে পর্যন্ত তাঁর রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন গনি মিয়ার নাম। আর একজন ইংরেজ প্রশাসক বাকল্যান্ড লিখেছিলেন, ঐ সময় বলেছিলেন গনি মিয়া—

'এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আমার উপস্থিতি সরকারকে সাহস যোগাবে। আমার অনুপস্থিতি বিস্তার করবে আতঙ্ক যা রোধে আমরা এখন শঙ্কিত।'

তারপর তিনি দুর্ভেদ্য করেছিলেন নিজ অট্টালিকা, পরিবারবর্গকে সজ্জিত করেছিলেন অস্ত্রে, সরকারকে দান করেছিলেন মোটা অঙ্কের অর্থ, সহায়তা করেছিলেন সরকারকে হাতি, ঘোড়া, নৌকা সবকিছু দিয়ে।

তাঁর এই সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে লিখেছিল *ঢাকা প্রকাশ*

'খাজে আবদুল গনি, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টেরও বিশেষ সাহায্যকারী ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় উন্মত্ত সিপাহীগণ আবদুল গনিকে বাঙ্গালায় রাজত্ব প্রদানের প্রলোভন দিয়াছিল, এবং তাহাদের সাহায্য না করিলে ভয়েরও সম্ভাবনা জানাইয়াছিল। কিন্তু আবদুল গনি বাহাদুর তাহাদের প্রলোভনে না ভুলিয়া ও ভয়েও দৃকপাত না করিয়া তাহাদের দুরভিসন্ধি গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, যদি স্থানীয় রাজপুরুষেরা সেই সন্ধানানুসারে অপ্রস্তুত সিপাহীদিগকে অসময়ে আক্রমণপূর্বক পরাস্ত না করিতেন, তাহা হইলে একটু পরেই তাহাদের দ্বারা ইংরাজ রাজত্ব (অন্ততঃ কতকদিনের জন্য) অবসান হইত। আবদুল গনিকে সেই উপকারের যথাযোগ্য প্রত্যুৎপকার করিয়াছেন বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাকে যে অত্যন্ত সম্মান করিতেন, তাহা বলিতে পারি।'

সিপাহিরা অবশ্য আবদুল গনির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। আর পত্রিকা যে লিখেছিল উপকারের যথাযোগ্য 'প্রত্যুৎপকার' ইংরেজরা করে নি তাও বোধ হয় ঠিক নয়।

১৮৬০ সালে ঢাকায় শিয়া-সুন্নিদের এক মারাত্মক দাঙ্গা হয়েছিল। ড. সিরাজুল ইসলাম তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, সরকার পর্যন্ত ঐ দাঙ্গা রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

তখন আবদুল গনি নিজ প্রচেষ্টায় মাত্র তিন দিনের মধ্যে শান্ত করে তুলেছিলেন ঢাকা শহরকে। এবং তখন সরকার তাঁকে সি. এস. আই. (কোম্পানিয়ন অফ দি অর্ডার অফ দি স্টার অফ ইন্ডিয়া) উপাধি দিয়েছিল। ১৮৬৭ সালে ভাইসরয় তাঁকে মনোনীত করেছিলেন আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে। ১৮৭৫ সালে তাঁকে বংশানুক্রমিক নবাব উপাধি দেয়া হয়েছিল। ১৮৮৬ সালে লাভ করেছিলেন কে. সি. এস. আই. (নাইট কমান্ডার অফ দি অর্ডার অফ দি স্টার অফ ইন্ডিয়া) উপাধি। ইংরেজদের এ-অনুগ্রহ পূর্ববঙ্গে প্রবল প্রতাপশালী করে তুলেছিল নবাব গনিকে।

জবরদস্ত জমিদার ছিলেন নবাব গনি। পৈতৃকসূত্রে পেয়েছিলেন তিনি ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে বিস্তৃত জমিদারি। জবরদস্ত বলছি এ-কারণে যে, (একটি উদাহরণ) 'নবাব বাহাদুর কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে বরিশালে জমিদারীতে উপস্থিত হন। তাহাতে প্রজাগণ তাঁহাকে প্রায় সাড়ে ত্রিশ হাজার টাকা নজর দেয়।' প্রজাদের কড়া নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, তাঁর জমিদারিতে, সালিশে উপস্থিত না হয়ে সরাসরি কেউ আদালতে যেতে পারবে না।

ঢাকা শহরে তাঁর আভিজাত্য, বৈভব ও প্রভাবের প্রতীক ছিল আলি মিয়ার কেনা সেই রঙমহল। বাড়িটিকে প্রায় পুনর্নির্মাণ করে নাম দিয়েছিলেন তিনি নিজের ছেলের নামে 'আহসান মঞ্জিল'। তবে ঢাকাবাসীর কাছে তা নবাববাড়ি নামেই ছিল অধিক পরিচিত। এর দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার দিকে বারান্দা ও সিঁড়ি (যা দিয়ে সরাসরি ওঠা যায় দোতলায়) এবং উত্তর দিকের প্রধান ফটক ও নহবতখানা তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে ঘূর্ণিঝড়ে 'আহসান মঞ্জিল' ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা আবার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তখনই নির্মিত হয়েছিল এর গম্বুজ।

তৎকালীন ঢাকা শহরের অনেকাংশের মালিক ছিলেন তিনি। শাহবাগ, বেগুনবাড়িতে ছিল তাঁর বাগান, অট্টালিকা। বেগুনবাড়িতে ত্রিশ বিঘা জমি পরিষ্কার করে তৈরি করেছিলেন চা-বাগান। সেখানে ব্যবহার করেছিলেন 'কাছার বীজ' এবং ১৮৬৭ সালে সেখান থেকে পেয়েছিলেন আড়াই মণ চা।

শাহবাগ তো নবাবের ছিলই, অনুমান করে নিচ্ছি রমনা রেসকোর্সও ছিল নবাবের সম্পত্তির অন্তর্গত। ড. সিরাজুল ইসলাম একবার আমাকে বলেছিলেন, নবাবপরিবারের দলিলপত্র ঘেঁটে তিনি জেনেছেন, সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর, তাঁর সম্পত্তির হিসাব তৈরির সময় রেসকোর্সকেও দেখানো হয়েছিল সম্পত্তির অংশ হিসেবে।

ঢাকায় পেশাদার ঘোড়দৌড়ের প্রচলন করেছিলেন নবাব আবদুল গনি। হতে পারে এক ধরনের নতুন ব্যবসা হিসেবে ঘোড়দৌড় চালু করেছিলেন নবাব গনি এবং তখন রমনা এলাকাও লিজ নিয়েছিলেন।

ঘোড়দৌড় ঢাকার অন্যতম বিনোদনে পরিণত হয়েছিল। অনেক সময় অফিস-আদালত বন্ধ হয়ে যেত ঘোড়দৌড়ের কারণে। ১৮৯১ সালের ডিসেম্বর মাসের সংবাদপত্রের এক খবরে জানা যায়

'এবারে ঢাকাতে অতিশয় আড়ম্বরের সহিত ঘোড়দৌড় হইয়া গিয়াছে। এখানকার

প্রধান খাজে আবদুল গনি এখানকার কয়েকজন কাপ্তান ও বাবু মধুসূদন দাস এবারে দৌড়ের ঘোড়া প্রস্তুত করেন এবং দৌড়ের পূর্ব্বদিন রাত্রে কলিকাতার কাপ্তান ওয়ার্লোর দুইটা দৌড়ের ঘোড়াও এখানে পৌছে। এখানে যে সকল ঘোড়া প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার মধ্যে গনি মিয়ার ঘোড়াগুলি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকে এমত মনে করিত। যদি শেষোক্ত কাপ্তান ওয়ার্লো তাঁহার ঘোড়া এখানে না পাঠাইতেন, তাহা হইলে এখানকার ঘোড়ার দৌড় হইয়াই গনি মিয়ার শ্রেষ্ঠ কি অশ্রেষ্ঠ নিশ্চয় হইত। কিন্তু উক্ত কাপ্তানের ঘোড়া দুইটি এমত উত্তম ছিল যে, এখানকার কোন ঘোড়া কোন বাজিতেই তাহার একটার সঙ্গেও জয়লাভ করিতে পারে নাই। ...৪ দিনে ১৬ বাজি খেলা হয়, তাহাতে সমষ্টিতে প্রায় ৬ হাজার টাকার বাজি হইয়াছিল। ইহার অধিকাংশই কাপ্তান ওয়ার্লো সাহেবের ঘোড়ায় জিতিয়াছে।'

তাইফুর জানিয়েছেন, নবাবপরিবারকে রেস প্রবর্তনে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের জমিদারির ইংরেজ ম্যানেজার জি. এল. গার্থ। রামশ্ ও রবিনসন নামে দুইজন ইংরেজ জকিও ছিল তাঁদের। কলকাতার রেসে ভাইসরয় কাপ দু-বার জিতেছিল নবাবের দুটি ঘোড়া 'দরিয়াবাজ' এবং 'শাহানশাহ'।

ঢাকা শহর শাসন করতেন নবাব গনি অনেকটা জমিদারের মতো। ইংরেজ প্রশাসন তাঁকে সমীহ করত, সমীহ করত হিন্দু, মুসলমান, সাধারণ মানুষ। মুহররম, ঈদে যেমন তিনি যোগ দিতেন, সাহায্য করতেন, তেমনি জন্মাষ্টমী বা কালীপূজায়ও। ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেন ঢাকায় এলে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁকে 'আহসান মঞ্জিলে'। ঢাকা শহরকে বিভক্ত করেছিলেন তিনি বিভিন্ন পঞ্চায়েতে (এ-প্রথা অবশ্য আগেও কিছুটা প্রচলিত ছিল)। প্রতিটি পঞ্চায়েতি মহল্লায় ছিলেন একজন করে সর্দার। তিনি ছিলেন মহল্লার সর্বেসর্বা। তবে, পঞ্চায়েতের কলহ-বিবাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালত ছিল আহসান মঞ্জিল।

নবাব আবদুল গনিকে ঢাকাবাসীরা কী-রকম সমীহ করত তার একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে তখনকার এক ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে। ১৮৭৬ সালে, তিনি একবার কলকাতা থেকে ফিরছিলেন ঢাকায়, স্টিমারে করে। স্টিমার ঘাটে ছিল শ-য়ে-শ-য়ে লোক, অভ্যর্থনার জন্য ছিল ব্যান্ডপার্টি আর নর্তকী। লিখেছিল বেঙ্গল টাইমস

'Early last Monday grand preparations were being made at the palace and the river-side, and all was bustle and confusion, for the reception of Nawab Khajeh Abdool Gunni, C. S. I, on his return from the visit to Calcutta, during H. R. H.'s arrival. All along the river-banks there were flags flying, whilst at the palace hundreds of them could be seen gaily waving; there were imitation canons of sola placed along the banks and raised poles were adorned with flowers. The town hand was also in attendance, and played several lively tunes. Hundreds of spectators, friends and relatives stood anxiously waiting to catch the first glimpse of the steamer, when a

little after midday, the *princess Alice* was sighted of Fahtoolah. As she gradually approached the mills, guns were fired to signal her arrival and several ballons floated in the air. The crowd of matives was simply suffocating besides the noise of the rushing up and down of the *ticaa gharries*. As soon as the steamer reached the ghaut opposite the palace, more guns were fired, and the bandsman who were on board, landed and struck up some grand marches At about 2 o' clock the Nawab accompanied by his [son] Kajeh Ahsun Oollah Khan Bahadoor, the rest of his family and suite, landed and was greeted by numerous *Salams* from the assembled multitude He then proceeded to his palace, accompanied multitude. He then proceeded to his palace, accompanied by some influential Mohamedan gentlemen, the crowd dispersing as he went. I forgot to mention that some nautch girls beautiful dressed and with most valuable jewels on, were present at the landing, and danced sevral dances. Altogether the scene was very grand, and well worth seeing'.

আবদুল গনির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যা জানা গেছে, তা হল - বিয়ে করেছিলেন তিনি দু-বার। পুত্র-কন্যার সংখ্যা ছিল ছ-জন। ব্রাডলি বার্ট লিখেছেন, ভোরে উঠে নবাব গনি খানিকটা বেড়াতেন অথবা যেতেন শিকারে বা অশ্বারোহণে। সকাল সাতটা-আটটায়, আহসান মঞ্জিল সংলগ্ন 'চা-খানা'য় বৈঠক করতেন সমবেত লোকদের নিয়ে। সকাল ন-টায় যেতেন নিজের ঘরে এবং নাস্তা করতেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। তারপর জেনানা মহলে কাটাতেন এগারটা থেকে দুটো পর্যন্ত। এরপর বসতেন জমিদারির কাজ নিয়ে। রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত সময় কাটাতেন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে।

আবদুল গনি ১৮৭৭ সালে খাজাপরিবারের কর্তৃত্বভার অর্পণ করেছিলেন পুত্র আহসানউল্লাহর উপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পত্তি নিয়ে ১৮৮১ সালে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন গৃহবিবাদে। স্যার এসলি ইডেন, জজ র‍্যাম্পিনি ও ঢাকা ব্যাংকের প্রধান ফ্রেজারের চেষ্টায় গৃহবিবাদের আপোষ-মীমাংসা হয়েছিল। আপোষ-মীমাংসা অনুযায়ী ঠিক হয়েছিল পরিবারের সব সদস্য বার্ষিক মোট এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার এগার আনা প্রাপ্ত হবেন এবং ঐ 'টাকা সবার মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার নিমিত্ত একটা পারিবারিক পঞ্চাইত নিয়োজিত হইবেন। ওয়াকফ সম্পত্তির ওয়ারিশানদিগের মধ্য হইতে মতৌল্লি ২ জনকে সংশ্রুত ব্যক্তিরা ২ জনকে পঞ্চাইত মনোনীত করিবেন। এ মনোনীত ৪ জনে আবার আর এক পঞ্চাইত গঠিত হইবেন, সেই পঞ্চাইত উপরিউক্ত ১৩৩০৮৪৷৷ আনা যেরূপে বিভাগ করিয়াছেন তাহাই সকলকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।'

'২০ বৎসর পর্যন্ত উল্লিখিত রূপ বৃত্তিই নির্দিষ্ট থাকিবে। কুড়ি বৎসর পর যদি পঞ্চাইত, সংশ্রুত ব্যক্তিদিগের বৃত্তি বর্ধিত করা উপযুক্ত বোধ করেন, তাহা হইলে মতৌল্লি বৃত্তি বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইবে।'

আবদুল গনিই আবার ১৮৯৪ সালে মামলা করেছিলেন তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে— 'নবাব আবদুল গনি নিজ পরিবার ও জ্ঞাতি গোষ্ঠীগণের ৩৭০ ব্যক্তিকে বিবাদী করিয়া

এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন. ইহাতে কেবল প্রধান পুত্র নবাব আহসানউল্লাহ নহেন. তাঁহার আর দুই পুত্র করিমুল্লা ও নান্না মিয়া. দুইটা বর্ত্তমান স্ত্রী শ্রীমতি মনিজা বিবি ও শ্রীমতি ওমদা খানেম তিনটি বর্ত্তমান কন্যা শ্রীমতী সালেহা খানেম. শ্রীমতী মনিজা খানেম ও শ্রীমতি নূরজাহান এতদ্ভিন্ন তিনটি পুত্রবধূ. পৌত্রগণ. পৌত্রীগণ. পৌত্রবধূগণ. পৌত্রীপতিগণ. জামাতাগণ. দৌহিত্রগণ. দৌহিত্রীগণ, ভ্রাতৃগণ. ভগ্নীগণ ও অন্যান্য জ্ঞাতি কুটুম্বগণের ঐ ৩৭০টি বিবাদী হইয়াছেন।'

মামলার কারণ? আবদুল গনি খাজাপরিবারের এজমালি সম্পত্তি, নিজের সম্পত্তি সবকিছুর মোতওয়াল্লি নিযুক্ত করেছিলেন আহসানউল্লাহকে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল. ইসলামী আইন অনুসারে যে-ওয়াকফনামা তৈরি করেছিলেন তা অসিদ্ধ। মোকদ্দমার ফলাফল অবশ্য জানতে পারি নি। তবে, আপোষ-মীমাংসা নিশ্চয় একটা হয়েছিল।

ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র *ঢাকা নিউজ*-এর ছিলেন তিনি একজন উদ্যোক্তা। ঢাকার প্রাচীন প্রেসগুলির মধ্যে অন্যতম 'ঢাকা নিউজ প্রেসে'র তিনি ছিলেন একজন অংশীদার। এখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিক *ঢাকা নিউজ*। স্বাভাবিকভাবে এ-পত্রিকা ছিল খানিকটা 'নেটিভ' বিদ্বেষী। উনিশ শতকের চল্লিশ দশকে (আনুমানিক) একটি ফ্রি স্কুল স্থাপন করেছিলেন তিনি. কিন্তু কখনও তা ভালো চলে নি। ১৮৬৬ সালে. পুরব দরওয়াজায় স্থাপন করেছিলেন একটি লঙ্গরখানা। এর বৈশিষ্ট্য ছিল, এখানে তাদেরই আশ্রয় ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হত যারা থাকবে স্থায়ীভাবে। লঙ্গরখানায় থাকত ২০ জন পুরুষ, ১৬ জন মহিলা ও ৬টি শিশু। এদের অধিকাংশই ছিল খোঁড়া অথবা পঙ্গু।

আবদুল গনি ঢাকা শহরের জন্য অন্তত একটি কাজ করে গেছেন যে-জন্য ঢাকাবাসী তাঁকে স্মরণে রাখতে পারে। তা হল বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ।

১৮৭৮-এর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকায় খাবার পানির উৎস ছিল বুড়িগঙ্গা এবং পাতকুয়োর নোংরা পানি। এ-কারণে ঢাকা শহরে মহামারী প্রায়ই লেগে থাকত। নবাব গনি সি. এস. আই. উপাধি পেলে এবং প্রিন্স অফ ওয়েলস সুস্থ হয়ে ওঠার আনন্দে সরকারকে দান করেছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। ইচ্ছে ছিল, সে-টাকা দিয়ে ঢাকাবাসীদের জন্য যেন কিছু করা হয়। এ-টাকা খরচ করার জন্য গঠিত হয়েছিল একটি কমিটি এবং ঠিক হয়েছিল ঢাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ব্যয় করা হবে এ-টাকা। নবাব গনি এ-প্রকল্পে দান করেছিলেন মোট দু-লক্ষ টাকা। ১৮৭৪ সালে লর্ড নর্থব্রুক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ওয়াটার ওয়ার্কসের এবং ১৮৭৮ সালে তা উদ্বোধন করেছিলেন ঢাকা বিভাগের কমিশনার পিকক।

ঐতিহাসিকদের অনেকেই আবদুল গনির দান-ধ্যানের প্রশংসা করেছেন। দান-ধ্যান যে তিনি প্রচুর করেছিলেন তা সত্যি কিন্তু তাঁর দানের তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দেশের জন্য যা ব্যয় করেছেন তার থেকে বেশি না হলেও বিদেশী স্বার্থে কম দান করেন নি। আর স্থায়ীভাবে যা ব্যয় করেছেন তা নিজের প্রজা বা শহরবাসীর

কথা ভেবে নয়, বৃটিশ কোন প্রতিনিধির সে-অঞ্চলে পদার্পণকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বা ঔপনিবেশিক সরকারের অনুরোধে। এই তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ঢাকা শহরের জন্য এককালীন দু-লক্ষ টাকা দান ব্যতীত অধিকাংশই খরচ করা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসকের সম্মানার্থে বা ধর্মীয় কাজে।

নবাব গনির দানের একটি তালিকা পাওয়া গেছে *ঢাকা প্রকাশ*-এ। তালিকাটি দীর্ঘ হলেও এখানে উদ্ধৃত করছি এ-কারণে যে তা দুষ্প্রাপ্য।

'জলের কলের জন্য ৩ বারে ২০০০০০, মক্কা 'জবিদা' নামক খাল মেরামতে ৪০০০০, ১৮৬৭ সালের দুর্ভিক্ষে সাহায্য ১০০০০, ১৮৮৫ সালে জলপ্লাবনে সাহায্য ১০০০০, ১৮৬৪ সালে ঝটিকাপীড়িতের সাহায্য ৫০০০, ১৮৬৭ সালের ঝটিকাপীড়িতের সাহায্য ৫০০০, ফরাসী ও জর্ম্মান যুদ্ধে আহত ও পীড়িত সৈন্যদিগের সাহায্যার্থে ৫০০০, ঢাকা মাদ্রাসার ভূমি ক্রয়ে ৫৫০০, লেডী ডফারিন ফন্ড ১০০০০, ঢাকার বাকলন্ড বাঁধ ও ঘাটে ৩৫০০, লেডী ডফারিন হাসপাতাল ১০০০, ঐ বার্ষিক চান্দা ৫০০, ১৮৮৫ সালে বর্ধমানের দুর্ভিক্ষে ১০০০, ১৮৭২ সালে বর্ধমানের দুর্ভিক্ষে ২০০০, ঐ মারফত লুইস সাহেব ২০০০, কলোনিয়াল মেলাতে মুসলমানদিগের পর্দ্দার জন্য ৩০০০, ফ্রান্সে ওলাওঠা রোগীর সাহায্যে ২০০০, রুশ-তুর্ক যুদ্ধে পীড়িত ও আহত সৈন্যের সাহায্য (১৮৮৭) ২০০০০, ১৮৭৯ সালে তুরস্ক দুর্ভিক্ষে ১০০০, ১৮৮৭ সালে বরিশাল হাসপাতালের জন্য ৪০০, ১৮৭৬ সালে বরিশাল ঝড়ে ৫০০০, ১৮৮০ সালে বরিশাল স্কুলে ২০০০, কাশ্মিরের ভূমিকম্পে পীড়িতদিগের ও দরগাহ মেরামতের সাহায্য ১৫০০০, ডিউক অব এডিনবরার আগমনে ১২০০০, কলকাতার পশুশালায় ১১৩০০, কলকাতার পশুশালায় সাপের ঘরে ২০০০, ময়মনসিংহ লাইব্রেরীতে ৫০০, আটিয়ার প্রজাদিগের সাহায্য ১০০০০, ময়মনসিংহ দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদিগের সাহায্য ৫০০, ইটালিতে কলেরা উপলক্ষে ২০০০, মান্ডা প্রণালীতে ভূকম্পে ৩০০০, দিল্লির রাজকীয় ঘোড়দৌড় সমিতিতে [অস্পষ্ট বিধায় সংখ্যা জানা যায় নি, তবে তা ছিল হাজারের কোঠায়], কলিকাতা হাসপাতালে ধাত্রী শিক্ষার সাহায্য [ঐ], ইয়োরসিয়ান পিতৃমাতৃহীনদিগের জন্য ৫০০, মে. মানিকদির মারফত নানা বিষয়ে ৩৮০০০, ইস্টউইক সাহেবকে দেওয়া হয় ৫০০, মুসুরিস্থ সৈনিকদিগের গ্রীষ্মাবাসের জন্য ৫০০, মিশনারী বালিকাদিগের সাহায্য ২৫০, কলিকাতাস্থ দেশীয় হাসপাতালে ৫০০, কলিকাতাস্থ কৃষিমেলায় ৫০০, রিলিফ ফণ্ডের কাপ্তানকে ১০০০, লংশায়েরের দুর্ভিক্ষে ৩০০০, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষক সমিতিতে ৫০০, সার্জন লরেন্স জাহাজডুবির সাহায্য ৫০০, বোম্বের মাদ্রাসায় ২০০, রাজমহেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ৫০, বালেশ্বরের টিউট মুসলমান শিক্ষা ফন্ডে ৪০০, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিট্যাবল সমিতিতে ৩০০০, ত্রিপুরার রাজবংশীয় নবদ্বীপচন্দ্রকে ৫০০, সুসঙ্গের মহারাজকে ৫০০০, মিটফোর্ড হাসপাতালে ৫০০, নর্থব্রুক ইন্ডিয়ান সমিতিতে ২২০০, সেজাগডীন বিভ্রাটে ১০০০, প্রিন্সেস এলিসের স্মরণার্থ ২০০০, অক্সফোর্ড ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ৫০০, কলিকাতার পশুনিবাসে ৫০০, কলিকাতার বৃহদাকারে [ঝরনা নির্মাণে?] ১০০০, কলিকাতার হোস্টেল ফন্ডে ও

মুসলমান সমিতিতে ৬০০, আয়ারল্যান্ডের দুর্ভিক্ষে ডাচেস অফ ম্যারেলবয়ের মারফতে ৩০০০, আয়ারল্যান্ডের দুর্ভিক্ষে ডাব্লিনের মেয়রের হস্তে ৩০৯০, মাদারিপুর মসজিদ মেরামতে ১৫০০, মাদারিপুর মাসিক চান্দা ২৫, রামচন্দ্রপুরের মসজিদ ও ঘাটে ১০০০০, কুমিল্লার শহর আলোকের জন্য ৫০০০, বীরভূম দাতব্য তহবিলে ১০০০, নদীয়ায় দাতব্য তহবিলে ৫০০, মিটফোর্ড হাসপাতালে রুগ্না স্ত্রীগৃহের জন্য ২৫২৪৫, ঢাকা ক্লাবের পাঠগৃহে ৪০০০, আর্মেনিয়ান দুর্ভিক্ষ তহবিলে ৩০০, কুমিল্লা হাসপাতালের স্ত্রী প্রকোষ্ঠে ৩০০০, ইটালির ভূমিকম্প প্রপীড়িতদিগের জন্য ৪১০০, ইটালির কলেরাপীড়িতদিগের জন্য ২০০০, সুরাটের অগ্নিদাহের সাহায্য তহবিলে ৩০০, আলিগড় কলেজে ২০০০, বেনারস কলেজে ২০০০, আলিগড় কলেজের সেন্ট্রাল হলে ৫০০, ভাগলপুর হেদায়েৎ সভায় ২৫০, ফসেট মেমোরিয়েল ফন্ডে ৫০০, স্ট্যানলি বিলিয়ার্ড খেলায় ৫০০, কালাবোবার শিক্ষাগারে ২৫০, আহাম্মদাবাদের দুর্ভিক্ষে সাহায্য ১০০০, পুনার দুর্ভিক্ষে সাহায্য ১০০০, মগবাজারস্থ একটা গৃহের সংস্কারে ৩০০০, লালবাগের মসজিদ মেরামত ৩০০০, শাহ আলি সাহেবের দরগায় ২০০০, শ্রীহট্টের মসজিদ মেরামত ১৩০৭, বালাক্লার্জ[ভ] যুদ্ধ জয়ীদিগকে ১০০০, ১ম বার ৪০ জন মক্কাযাত্রীর সাহায্য ৯০০০, আজমীরের পবিত্র স্থলে ১১৯৯, ঢাকার সেন্ট লুইস চার্চে ৩০০, প্রিন্স আলবার্ট বিক্টরের অভ্যর্থনা কমিটিতে ৫০০০, সাহামল্লিকের দরগাহ মেরামতে ১১০০, বালিয়াটির মহমিবাবুকে ২০০০, কদম রসুলের দরগাহ ১১৯৭, মিটফোর্ড হাসপাতালে ৫০০, ঢাকার টর্নেডো সাহায্য সমিতিতে ১০০০০, ২য় বার ৪০ জন মক্কাযাত্রীর সাহায্য ৯০০০, আজমীরের দরগায় ৫০০, নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে ২০০০, ৩য় বার মক্কাযাত্রী ৪০ জনকে ৯০০০, ডফারিন হাসপাতালে ৩৫০০, ডাক্তার মেডোসের জিম্মায় দান ৪০০, ডাক্তার ক্রম্বির জিম্মায় দান ১৩০০, মি. উইদ্রলের জিম্মায় দান ৫০০, মাদারীপুর মসজিদে আলো ও কার্পেট ১০০০, ৪র্থ বার ৩৫ জন মক্কাযাত্রীকে ৬৮০০, ষাটগম্বুজ মসজিদ

স্মরণার্থে ১০০০. নর্থব্রুক হলে ২০০০. প্রিন্স অফ ওয়েলসকে দেশীয়দিগের অভ্যর্থনায় ৩০০০. দার্জিলিঙ্গে ক্রীড়াভূমিতে ১০০০. দার্জিলিঙ্গে কলেজের জন্য ১০০০. ঢাকার ইমামবাড়ি মেরামতে ২০০০০. দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের নিয়মিত বেতন ও পেনশন প্রভৃতিতে মাসিক অন্যূন ২০০০।'

উত্তরাধিকার সূত্রে এবং নিজে যে-বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন তার ক্ষয় নবাব গনি আবার দেখে গিয়েছিলেন নিজের জীবদ্দশায়ই। আহসানউল্লাহর আমল থেকে শুরু হয়েছিল ধারকর্জ করা। এর কারণ. অত্যধিক বিলাস-ব্যসন. অপচয়. সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ ইত্যাদি। কী পরিমাণ অর্থের অপচয় তাঁরা করতেন তার একটি উদাহরণ দেয়া যাক। লর্ড ডাফরিন ঢাকায় এলে নবাব কলকাতার উইলসন হোটেল থেকে তার জন্য সাত হাজার টাকার খাবার কিনে এনেছিলেন (যদি সংবাদপত্রে ভাষ্য সত্য হয়)। *ঢাকা প্রকাশ* এ-পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছিল 'মোটা পেটে এত ধরেগো।'

সবশেষে নবাব গনি (নবাবপরিবার) ও ঢাকার আদি অধিবাসীদের সম্পর্কে কথা উল্লেখ করতে হয়। এই আদি অধিবাসী বা কুট্টিরা ছিলেন নবাবদের অত্যন্ত অনুগত। ১৯২১-২২ সালে এম. এল. এ. আবুল হুসেন আহসানউল্লাহকে লেখা নবাব গনির একটি চিঠি প্রকাশ করেছিলেন খবরের কাগজে 'নবাবসাহেব তাঁর পুত্রকে লিখেছিলেন যে. তিনি যেন মনে রাখেন যে ঢাকার কুট্টিরা তাদের প্রজা নয় অথচ তাদের প্রজার মত ব্যবহার করতে হবে খানদানের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এসব লোক যদি লেখাপড়া শিখে বাস্তব অবস্থা জানতে পারে তবে খানদানের নেতৃত্বের পরিকল্পনা ছাড়তে হবে। তাদের অন্যভাবে টাকা-পয়সা দিয়ে সময় সময় সাহায্য করা যেতে পারে কিন্তু স্কুলের ব্যবস্থা যেন না করা হয়।'

ঢাকার সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* ১৮৬৪ সালে লিখেছিল ঢাকায় খাজা আবদুল গনির মতো 'ঐশ্বর্য্যশালী লোক আর নাই। ক্ষোভের বিষয় এই যে তিনি দেশহিতকর সৎকার্য্য সাধনে নিতান্ত উদাসীন. তাঁহার কার্য্যের মধ্যে কেবল মৃগয়া. ভোজ এবং ঘোড়দৌড়ই দেখিতে পাওয়া যায়।'

তবে পরবর্তী ত্রিশ বছরে পরিবর্তন হয়েছিল আবদুল গনির। তাঁর দানের তালিকা এর প্রমাণ। ১৮৯৬ সালে যেদিন তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন সেদিন ঢাকায় নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। স্কুল. কলেজ. অফিস-আদালত সব ছিল বন্ধ। প্রায় 'পঞ্চাশ হাজার লোক যেন নদীপ্রবাহের ন্যায়' শবানুগমন করেছিল।

নবাব আহসানউল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১)

নবাব আবদুল গনির মতো তাঁর পুত্র নবাব আহসানউল্লাহও ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত।

পুরানো একটি চরিতাভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে 'ইনি পৈতৃক ভূ-সম্পত্তির ন্যায় পিতার গুণাবলীরও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। পিতা যেমন দান-বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন. পুত্র বদান্যতার জন্য তদনুরূপ যশ অর্জন করিয়াছিলেন।'

আহসানউল্লাহর জন্ম ১৮৪৬ সালের ২২ আগস্ট। পিতা আবদুল গনি ছেলের জন্য বাসায়ই শিক্ষক রেখে বন্দোবস্ত করেছিলেন শিক্ষার। উর্দু ছিল তাঁর মাতৃভাষা, ফারসি শিখেছিলেন খাজা আবদুর রহিমের কাছে। ইংরেজি শিক্ষার জন্য মাসিক এক হাজার টাকা বেতন দিয়ে তাঁর জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল।

আহসানউল্লাহকে নবাবপরিবারের মোতওয়াল্লি নিযুক্ত করা হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। সেই থেকে ১৯০১ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন সেই দায়িত্ব। তবে শেষের দিকে নবাবপরিবারের সেই জৌলুস আর ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদে টাকা ওড়াতে তিনি কার্পণ্য করতেন না। শাহবাগে ছিল তাঁর শখের উদ্যান আর চিড়িয়াখানা, বেগুনবাড়িতে ছিল বাগানবাড়ি। এ-ছাড়া মেষের লড়াই, বেলুন ওড়ানো ইত্যাদিতেও ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ।

সোম প্রকাশ ১৮৭৮ সালে লিখেছিল '১লা জানুয়ারীতে নবাব আসানুল্লাহ খাঁ ঢাকায় মেষের লড়াই দেখাইবার উদ্যোগ করেন। এই প্রকার অনেক পশুর যুদ্ধ দেখাইবার কথা হয়। কলিকাতায় পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণ সভার সভ্যরা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া একজন ইউরোপীয় এজেণ্ট প্রেরণ করেন এবং যাহাতে পশুদিগকে কোন প্রকারে কষ্ট দেওয়া না হয়, তদ্বিষয়ক এক আজ্ঞা প্রচার করেন। ইউরোপীয়ের হাবভাব দেখিয়া নবাব বাহাদুর সকল প্রকার পশুর লড়াই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। উত্তম কাজ হইয়াছে।'

ঢাকা শহরে বিস্তৃত বাগান ছিল তাঁর তিনটি দিলকুশা, শাহবাগ ও বেগুনবাড়িতে।

শাহবাগের বাগান এবং বাগানবাড়ির ধ্বংসাবশেষের কিছু ছিটেফোঁটা এখনও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছড়িয়ে আছে। যেমন, মধুর ক্যান্টিন, জনশ্রুতি অনুযায়ী, ছিল বাগানবাড়ির নাচঘর। এই তিন জায়গায়ই ছিল তাঁর শখের চিড়িয়াখানা। ১৮৯৫ সালে *ঢাকা প্রকাশে* প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে জানা যায়

'ঢাকার সর্ব্বসাধারণে ভালরূপ অবগত আছেন যে অনেকদিন যাবৎ আমি বাইগুনবাড়ির রক্ষিত বন ও ঢাকার দেলকোশা ও শাহবাগ বাগানে মশ্বর [?] ও অন্য জাতীয় হরিণ, ময়ূর, বনকুক্কুট, তিতির ইত্যাদি শিকারের পশুপক্ষী পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে অনেক দুর্লভ ও মূল্যবান বিদেশী পশুপক্ষী সকল সময় তাহাদের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে চলিয়া যায় ও লোকে ক্রীড়াচ্ছলে ঐ পশুপক্ষী সকলকে অন্যায়রূপে গুলি করিয়া মারে। যদিও তাহারা প্রকাশ করে যে উহাদের মালিক কে জানে না কিন্তু বাস্তবিক ঐ সকল যে আমার ইহা বিশেষরূপে অবগত আছে এবং যেহেতুক আমার ইচ্ছা ঐরূপ ঘটনা পুনরায় ভবিষ্যতে আর না হইতে পারে এইজন্য এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণ ও শিকার অপহরণকারিগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কেহ ভবিষ্যতে আমার কোন পশুপক্ষীকে তাহাদের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে গেলে হত কিংবা নষ্ট না করে। করিলে তাহারা হানি, চুরি অথবা দণ্ডবিধি আইনের অন্য কোন ধারা অনুসারে ফৌজদারী সৌপর্দ হওয়ার যোগ্য হইবে ও ক্ষতিপূরণেরও দায়ী হইবে। শ্রী নবাব আহসানউল্লাহ।'

১৮৯২ সালের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন সিলেটের এক ছোটখাট জমিদার মরমী কবি হাছন রাজার ছেলে দেওয়ান গনিউর রাজা। মন খারাপ হলে, ফুর্তি করার জন্য গনিউর রাজা আসতেন ঢাকায়। এমনি এক সফরে একদিন ঢাকায় এসে দেখেন হৈহৈ কাণ্ড। কী ব্যাপার? আহসানউল্লাহ ইংল্যান্ড থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করে একজন 'ইউরোপীয়ান লেডী' এনেছেন। তিনি বেলুনে চড়ে, লোকদিগকে 'আশ্চর্য তামাসা' দেখাবেন। শহরে দু-তিন দিন ঢোল পিটিয়ে এই কথা প্রচার করা হয়েছিল।

ঘটনার দিন নবাব বলেছিলেন, লেডিকে নদীর ওপার থেকে উড়ে এসে আহসান মঞ্জিলের ছাদে নামতে হবে যাতে তার বাড়ির মেয়েরা 'তামাসাটা' উপভোগ করতে পারে। মেয়েটির ভাই ও মা তাতে রাজি হচ্ছিলেন না, কারণ দক্ষিণ দিক থেকে প্রবল বাতাস বইছিল। নবাব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তখন মেয়েটি বলেছিল, আরও পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিলে সে নদীর ওপার থেকে বেলুনে উঠবে। নবাব রাজি হয়েছিলেন। শুরু হয়েছিল তামাসা।

কিন্তু বিধি বাম। প্রবল বাতাস বেলুনটিকে আহসান মঞ্জিল হতে প্রায় আড়াই-তিন মাইল উত্তরে নবাবেরই রমনার বাগিচায় উড়িয়ে নিয়েছিল এবং সেখানে এক ঝাউগাছে আটকে গিয়েছিল। তারপর আরেক কাণ্ড। গনিউর রাজার ভাষায়- - 'তখন রাত্রি হইয়াছে। আকাশে মেঘ থাকায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তখন অনুমান ৭টা বাজিয়াছিল। পুলিশের সাহেব তাহার সহচর কনষ্টেবল ইত্যাদিকে বলিল, 'জলদি বাম্বু লাও।' তখন তাহারা বাঁশ আনিয়া ঐ গাছে লাগাইয়া দিল এবং সাহেব ঐ উড়নেওয়ালী মিসকে বলিতে লাগিল, 'মেম সাহেব, ঐ বাম্বু অবলম্বন করিয়া গাছ হইতে নামিয়া পড়।' কিন্তু মিস বলিল, 'আমার মা ও ভাইকে আনাও, রশি ও লেন্টন আনাও, নতুবা আমি নামিতে পারিব না।' কিন্তু পুলিশ সাহেব তাহাকে ধমকাইয়া জোর গলায় বলিতে লাগিল, 'বাম্বু মজবুত হেয়, কুচ পরওয়া নেই, উতার যাও, হাম লোক নিচে হেয়।' তখন ঐ উড়নেওয়ালী মিস বাঁশ অবলম্বন করিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। অর্ধেক বাম্বু নামিলে পর বাম্বু ভাঙ্গিয়া গেল ও মিস পাক্কা ভূমিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।'

নবাবকে অবশ্য আরও কিছু অর্থ খরচ করে এই ঝামেলা মেটাতে হয়েছিল। গনিউর রাজার এক বন্ধু আক্ষেপ করে বলেছিল, 'এই ইউরোপীয়ান লেডীকে প্রাপ্ত হইলে ১০,০০০ হাজার টাকা কোন ছার নবাব সাহেব যদি তাহার ভোগ-বিলাসের জন্য ২০,০০০ টাকা দিয়াও ঐ ইংলিশ লেডীকে রাখিয়া ফেলিতেন তাহা হইলে তাহার নাম অনেক দূর পর্যন্ত যাইত ও ঐ লেডীর জীবনবিনাশ না হইয়া বাঁচিয়া থাকিত।'

সমসাময়িক অনেক জমিদারের মতো আহসানউল্লাহ গান-বাজনাও ভালবাসতেন। পিয়ানো, বেহালা ও সেতার বাজাতে পারতেন। নবাব 'শাহীন' ছদ্মনামে লিখতেন কবিতা। *কুল্লিয়াত-এ-শাহীন* নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর। এতে

ছিল চারটি ফার্সি ও ত্রিশটি উর্দু গজল, পাঁচটি উর্দু রেখতা এবং পঁচিশটি হিন্দি গীত। তিনি কিছু ঠুমরিও রচনা করেছিলেন। *তাওয়ারিখ-এ-খান্দান-এ-কাশ্মিরিয়াহ* নামে তিনি একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। পাণ্ডুলিপিটি ছিল খাজা বংশের ইতিহাস সম্পর্কিত। ১৮৮৪ সালে তাঁর সহায়তায় প্রকাশিত হয়েছিল *আহসানউদ ক্যাসাস* নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিক। ঐ পত্রিকায় উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ মুদ্রিত হয়েছিল।

তাঁর বিলাস-ব্যসনের বিপরীতে দান-ধ্যানও ছিল। তাঁর দানের ছোট একটি তালিকা উদ্ধৃত হল—

ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ প্রদান ৪০০০০০, শহরবাসীর স্বাস্থ্যোন্নয়নকল্পে ১০০০০০, ঢাকার ইমামবাড়ি সংস্কার বাবদ ১০০০০০, ডাফরিন তহবিল ৫০০০০, ঢাকায় ভিক্টোরিয়া পার্ক প্রতিষ্ঠা ১২০০০, ঢাকার নিকটবর্তী নদীসমূহ সংস্কার ১৫০০০, ভিক্টোরিয়া স্ত্রী বিদ্যালয় ১০০০০, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও ত্রিপুরা জেলার জমিদারিতে কুয়ো ও পুষ্করিণী খনন বাবদ ৪০০০০, চাঁদপুরে মসজিদ নির্মাণ ৫০০০, বেগুনবাড়ির সন্নিহিত খাল সংস্কার ৮০০০, রিপন বৃত্তি ৮০০০, বরিশালে সাহেবদের বিশ্রামগৃহ ৩৯০০, দুর্ভিক্ষে দান ১০০০০, ঢাকা নর্থব্রুক হল ২০০০, মিটফোর্ড হাসপাতাল সংস্কার ২০০০, লর্ড এলগিনের আগমন স্মরণে চাঁদপুরে টাউন হল নির্মাণ ৫০০০, ঢাকার ঘোড়দৌড়ের মাঠ উন্নয়ন ১৬০০০, পটুয়াখালী বেগম হাসপাতাল ৮০০০, কলিকাতা ইলিয়ট মাদ্রাসা ১০০০, এলগিন টাউন হল ৫০০০, ঢাকা ইডেন ফিমেল স্কুল ১০০০, সাময়িক দান ১৭৫৬৫, আলিগড় কলেজ ২০০০, আলিগড় কার্জন হাসপাতাল ১০০০, লালবাগ মসজিদের মেরামত ৩০০০, চট্টগ্রামে ঝড়ের জন্য ১০০০, খাজা আবদুল হামিদের মসজিদ ৪০০০।

এ ছাড়া মক্কায় যাঁরা হজ্ব করতে যেতে চেয়েছেন তাঁদের জন্য ব্যয় করেছেন প্রায় আশি হাজার টাকা। ঢাকার গরিবদের সাহায্য করার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটি তালুক কিনে দিয়েছিলেন। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের সংখ্যাই নাই। সর্ব্বসমেত দানের পরিমাণ এগার লক্ষেরও অধিক?'

তবে, আহসানউল্লাহর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সার্ভে স্কুল স্থাপন যা কালে পরিণত হয়েছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবং ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ প্রদান। ১৮৭৬ সালে স্থাপিত হয়েছিল সার্ভে স্কুল। এ-স্কুলে আহসানউল্লাহ দান করেছিলেন এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। প্রথমে সার্ভে স্কুলে দু-বছরের কোর্স প্রদান করা হত। ১৯০২ সাল থেকে ওভারসিয়ারের তিন বছরের কোর্স চালু করা হয়েছিল। ১৯০৫ সালে চালু করা হয়েছিল চার বছরের কোর্স এবং সার্ভে স্কুল উন্নতি করা হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে। ১৮৯৬ সালে স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪০০। ১৯০৮-এ ৩৭৫ জন। প্রথমে সার্ভে স্কুল চালু করা হয়েছিল ভাড়া বাড়িতে। পরে তা স্থানান্তরিত করা হয়েছিল পাকিস্তান আমলের পি. এ. এফ. রিক্রুটিং সেন্টার অফিসের জায়গায়। ১৮৮৬ সালে নবাব আবদুল গনিকে কে. সি. এস. আই. উপাধি প্রদান করা হলে আহসানউল্লাহ খুশিতে

ঢাকা শহরের রাস্তায় গ্যাস বাতি প্রদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কলকাতার ইংলিশম্যান পত্রিকায় এক বিবৃতি প্রদান করে বলেছিলেন

'The enthusiasm displayed by our fellow townsmen on the occasion of my father's investiure with the insignia of a Knight Commander of the Star of India, has so touched and gratified me that as a token of appreciation of the good feeling shown to day by both Mohamedans and Hindus of Dacca, I propose to light such main roads and streets of the city as are now lighted with oil lamps, with gas, entirely at my own cost and to maintain the works free of all costs, on the sole condition that the Municipality will, on their part, undertake to expand on improved sanitation and the purchase and maintenance of fire engines, the sum that now expend on lighting the town.'

বেঙ্গল টাইমস লিখেছিল -

'When Nawab Sir Abdul Ghanie was about to be Knighted, his son Nawab Ahsanullah promised a reward to every person who should illuminate his dwelling in honour of that event. If you maintain my Father's *Izzat* he promised by himself and through others 'I will make you *khooshie*'. খুশির অর্থ ছিল গ্যাস বাতি প্রদান।

তবে তাঁর প্রতিজ্ঞার এক যুগ পর ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর তাঁরই অর্থ সাহায্যে ঢাকার প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে বিজলি বাতি দেয়া সম্ভব হয়েছিল। *ঢাকা প্রকাশ* লিখেছিল, 'গতকল্য সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে, শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুরের অনুকম্পায় ঢাকা নগরীর প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি চপলা চমকে অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিয়াছে। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটির, দীনা, ক্ষীণা দীপকলিকা, কৌতূহলাক্রান্ত, অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূর ন্যায় এখানে ওখানে অলক্ষ্যে উঁকিঝুঁকি মারিয়া পথিকের মনে ঘৃণার সঞ্চার করিয়া দিত, আজ সেখানে দামিনীপ্রভা বিমল চন্দ্রিকাপাতে জনসাধারণের নয়নমন পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। ঢাকার ন্যায় শহরে এরূপ দৃশ্য লোকনয়নে নিপতিত হইবে দশ বৎসর পূর্বে বোধ হয় তাহার স্বপ্নের অগোচার ছিল কিন্তু নবাব বাহাদুরের অপার অনুগ্রহে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে।'

আহসানউল্লাহ দীর্ঘকাল ছিলেন ঢাকার অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। ইংরেজ সমর্থক আহসানউল্লাহ যে-সব উপাধি পেয়েছিলেন সেগুলো হল, খান বাহাদুর (১৮৭১), নবাব (১৮৭৯), সি. আই. ই. (১৮৯১), নওয়াব বাহাদুর (১৮৯২) ও কে. সি. এস. আই. (১৮৯৭)। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত তিনি ছিলেন গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্য। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের প্রবক্তা হিসেবেও ছিলেন প্রভাবশালী।

১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে পরলোকগমন করেছিলেন আহসানউল্লাহ। মৃত্যুকালে রেখে গিয়েছিলেন এক স্ত্রী (এর আগে তিন স্ত্রী পরলোকগমন করেছিলেন),

দু-ছেলে ও ছয় মেয়ে। ছেলে দুজন হলেন সলিমুল্লাহ ও আতিকুল্লাহ এবং মেয়েরা হলেন বিলকিস বানু, বাদশা বানু, আমিনা বানু, পরী বানু, মেহার বানু ও আক্তার বানু।

ঢাকা প্রকাশ নবাবের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে লিখেছিল, সমসাময়িক ধনীদের মতন নবাব রমণীদের পিছে অর্থ খরচ করেন নি। স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কখনও মদ স্পর্শ করেন নি। '....নবাব বাহাদুরের অপার অনুকম্পায় যে ঢাকাবাসী নিত্য কত সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে, রোগে-শোকে, আপদে-বিপদে যাঁহার সুমধুর আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া দীনদরিদ্র পূর্ববঙ্গবাসী জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিতে সক্ষম হইয়াছে তাঁহার নিয়োগবার্তা শ্রবণে পূর্ববঙ্গবাসী আজ আপনাদিগকে কিরূপ বিপন্ন মতে করিতেছে, কেমন করিয়া তাহা বর্ণনা করিব। হায়, কোথায় আজ আমাদের সেই দেবোপম নবাব বাহাদুর, স্বদেশের কল্যাণ সাধনকল্পে যাঁহার করকমল নিয়ত নিযুক্ত ছিল। কোথায় সেই দারিদ্র্যের জীবন। নিরন্নের সংস্থাপনকল্পে যাহার ভাণ্ডারদ্বার নিয়ত উন্মুক্ত ছিল। কোথায় সেই বিপন্নের বন্ধু, হৃতসর্বস্ব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ একমাত্র যাঁহার কৃপায় জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইত। বিধাতার বক্রদৃষ্টিবশে সকলেই আজ বঞ্চিত হইয়া হাহাকার করিতেছে।'

নবাব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

নবাব আহসানউল্লাহর পুত্র সলিমুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭১ সালে। আহসানউল্লাহর প্রথম স্ত্রীর ছয় জন পুত্র-কন্যার মধ্যে সলিমুল্লাহর স্থান ছিল পঞ্চম। বিদেশী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাসাতেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৩ সালে তাঁর বিয়ে নিয়ে পিতার সঙ্গে মতান্তর হয়। এ-প্রসঙ্গে *ঢাকা প্রকাশ*-এর একটি সংবাদে বিস্তারিত জানা যায়। এতে নবাবপরিবারের অন্তর্বিরোধ ছাড়াও স্থানীয় ইংরেজ শাসকরা নবাবদের কীভাবে দেখতেন তাও জানা যাবে

'নবাব আসানুল্লা সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত সলিমুল্লা সাহেব ময়মনসিংহের ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া গিয়াছেন। সুলিমুল্লা সাহেব গত শ্রাবণ মাস হইতে পিতৃসকাশ হইতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবার নবাব সাহেব অনেকের অনুরোধক্রমে তাঁহাকে মাসিক তিনশত টাকা বৃত্তি এবং সলিমুল্লা সাহেবের মৃত মাতার অলঙ্কারপত্র ও কাবিনের এক লক্ষ টাকা তিন ভগ্নীসহ অংশমতে যাহা প্রাপ্য হয়, তাহাও নাকি দিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন অবধি যিনি সর্ব্বদা বিষণ্ন থাকিতেন, পুত্রসহ দেখা হইবে বলিয়া সাহেবদিগের সভাসমিতিতেও যাইতেন না। এতদৃষ্টে কমিশনার প্রমুখ সাহেবগণ তাঁহাকে পুত্রের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন, সলিমুল্লা সাহেবও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু নবাব সাহেব সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। নবাব সাহেবের এই ভাব ঢাকাস্থ সাহেবদিগের ভয়ানক ক্ষতি, কেননা তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদাদি সমস্ত সাহেবের অনুগ্রহাধীন। সলিমুল্লা সাহেব স্থানান্তরিত হইলে তিনি পুনরায় তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদে যোগ দিবেন এই অভিপ্রায়ে সলিমুল্লা সাহেবকে ডিপুটিগিরি পদ দিয়া স্থানান্তরিত করিতেই তাঁহারা ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের প্রস্তাবে সলিমুল্লা সাহেব

সম্মত হন, কিন্তু সম্প্রতি দুইশত টাকা বেতনে কাজ করিতে হইবে এবং কাজ গ্রহণ করিলে নবাব সম্ভবতঃ বৃত্তি তিনশত টাকা বন্ধ করিলে তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইবে, তিনি এই কথা বলায় অবিলম্বে তাঁহাকে উচ্চ গ্রেডের বেতন প্রাপ্তির আশা দিয়া ডিপুটি পদ গ্রহণে সম্মত করান হয়, ওদিকে ছোটলাটের নিকট হইতে তাঁহার নিয়োগপত্র আনা হয়। কাজেই সলিমুল্লা সাহেব ময়মনসিংহের ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।'

যা হোক, ময়মনসিংহের পর তিনি মুজফফরপুর এবং ত্রিপুরায় বদলি হন। ১৯৮৫ সালে ইস্তফা দেন পদ থেকে। ১৯০১ সালে পিতার মৃত্যু হলে তিনি নিযুক্ত হন পরিবারপ্রধান হিসেবে।

নবাবপরিবারের সদস্যদের মধ্যে সলিমুল্লাহই সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এর সূত্রপাত। সলিমুল্লাহর সময় নবাবপরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল খারাপ। বৃটিশ সরকার সলিমুল্লাহকে ঋণভার থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। বিনিময়ে সলিমুল্লাহ সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন বঙ্গভঙ্গকে। অবশ্য, শুধু বৃটিশ সরকারের চাপ-ই নয়, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদেরও নীরব চাপ ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমর্থন করে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে (বিশেষ করে মুসলমানদের) তিনি নিজের কর্তৃত্ব সংহত করেন। এ-ছাড়া ঢাকার পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবেও নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি ঢাকা শহর।

১৯০৫ সালে তাঁর উদ্যোগে ঢাকার নর্থব্রুক হলে গঠিত হয় 'মোহামেডান প্রভিনসিয়াল ইউনিয়ন।' ১৯০৬ সালে, শাহবাগে তাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় 'অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স।' প্রায় দু-হাজার লোক এতে যোগ দেন এবং এর যাবতীয় খরচ বহন করেন সলিমুল্লা। এ সম্মেলনে তিনি সর্বভারতীয় একটি দল গঠনের নিমিত্ত একটি খসড়া প্রস্তাব বিতরণ করেন, দলের নামকরণ করেছিলেন 'মুসলিম অল ইন্ডিয়া কনফেডারেন্সি।' আলোচনার পর এর নামকরণ করা হয় 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ।' ১৯০৭ সালে 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগ' গঠিত হলে সলিমুল্লাহ হন এর সভাপতি।

নবাব সলিমুল্লাহ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদ (১৯০৬-১৯০৭), ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ (১৯১৩-১৫)-এর সদস্য ছিলেন। ১৯০৭ সালে সরকার তাঁকে সি.এস.আই. ও ১৯০৩ সালে 'নবাব বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন।

সলিমুল্লাহ বিয়ে করেছিলেন চার বার এবং ১৯১৫ সালে কলকাতায় পরলোকগমন করার সময় পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা ও চার স্ত্রী রেখে যান। তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল নবাবদের পারিবারিক গোরস্থান পুরব দরওয়াজায়।

আহসান মঞ্জিল

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এ-শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ঢাকায় তো বটেই, পূর্ববঙ্গেও প্রভাব বিস্তার করেছিল আহসান মঞ্জিল। ঢাকা শহরে, পূর্ববঙ্গের প্রধান জমিদার ও ইংরেজসৃষ্ট এই নবাবপরিবারের আভিজাত্য, বৈভব ও প্রভাবের প্রতীক ছিল এই অট্টালিকা। নতুন নবাবদের আদি পুরুষ ঢাকার জমিদার আলি মিয়া বা খাজা আলিমউল্লাহ ১৮৩৫ সালে ফরাসি কুঠিয়ালদের কাছ থেকে বুড়িগঙ্গার তীরে তাদের কয়েকটি কুঠিবাড়ি কিনেছিলেন (দানীর মতে ১৮৩৮ সালে)। বাড়িগুলি ছিল ফরিদপুরের জালালদির জমিদার শেখ এনায়েতুল্লাহর। এগুলির একটি হয়ত পরিচিত ছিল রঙমহল নামে। এনায়েতুল্লাহর ছেলে শেখ মুতিউল্লাহ এই রঙমহল বিক্রি করে দিয়েছিলেন ফরাসিদের কাছে। ফরাসিদের কাছ থেকে কিনে রঙমহলটি সংস্কার করে আলিমউল্লাহ বসবাস শুরু করেছিলেন। ঐ সময় বাড়িটিতে বোধ হয় তিনি একটি ঘড়িও বসিয়েছিলেন যা কখনও ঠিক সময় দিত না। ঐ সময় প্রচলিত একটি ছড়া এর প্রমাণ–

আলি মিয়ার বাড়ি
নীলাম্বর সেনের বড়ি
গোকুল মুন্সীর গোঁফে তাও
গল্প যদি শুনতে চাও
তবে মৃত্যুঞ্জয় মুন্সীর কাছে যাও।

নীলাম্বর সেন ছিলেন কবিরাজ যাঁর ওষুধে কোন কাজ হত না। সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেনের নানা গোকুল মুন্সীর গোঁফ ছিল দর্শনীয় বস্তু। আর মৃত্যুঞ্জয় মুন্সী ছিলেন আজগুবি গল্প বলিয়ে।

১৮৭২ সালে নবাব আবদুল গনি বাড়িটিকে প্রায় পুনর্নির্মাণ করে নাম দিয়েছিলেন আহসান মঞ্জিল, নিজের ছেলের নামে। ঢাকাবাসীরা অবশ্য সব সময় এটিকে নবাববাড়ি হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। এর দক্ষিণে, বুড়িগঙ্গার দিকে বারান্দা ও সিঁড়ি। এ-সিঁড়ি দিয়ে সরাসরি দোতলায় ওঠা যায়। উত্তর দিকে আছে ফটক ও নহবতখানা যা আবদুল গনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, সে-সময় বাড়িটিতে কোন গম্বুজ ছিল না।

১৮৮৮ সালে ঢাকার প্রবল টর্নেডোতে বাড়িটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। স্থানীয় একটি পত্রিকার ভাষায়—

'নবাববাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক স্তম্ভ বা হাতিশুঁড় নামিতে দেখে। দেখিতে দেখিতে ঐ জলস্তম্ভটি দ্বিখণ্ড হইয়া একভাগ পশ্চিম দিকে ও একভাগ নবাববাড়ির দিকে প্রধাবিত হয়। উহা দ্বিখণ্ড হওয়ার সময়ই উহা হইতে সহস্র অগ্নিময় গোলা উড্ডীন হইতে লোকে দেখিয়াছিল। যখন উহা নবাববাড়ির ধ্বংসসাধনে নিরত হয়, তখন দূরবর্তী লোকে নবাববাড়িটাকে যেন প্রজ্বলিত অগ্নিময় দেখিয়াছিল।

'বাতাবর্তের শব্দ শুনিয়া নবাব সাহেবগণ আপনাপন প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া উত্তর দিকের বারান্দায় আসিয়াছিলেন, যেই তাঁহাদের আসা অমনি পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠগুলি চুরমার হইয়াছিল।...'

নবাবপরিবার এরপর আশ্রয় নিয়েছিলেন ঢাকায় তাদের আরেকটি অট্টালিকায়। ঝড়ের পর আহসান মঞ্জিল আবার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তখনই নির্মিত হয়েছিল নবাববাড়ির গম্বুজটি।

'আহসান মঞ্জিল'-এর উপর তলার পূর্ব দিকে ছিল বৈঠকখানা, লাইব্রেরি ও অতিথিদের জন্য তিনটি ঘর। পশ্চিম দিকে ছিল বলনাচের ঘর, নবাবদের শোয়ার ঘর। নিচের তলায় ছিল সমপরিমাণ ঘর, পূর্ব দিকে ছিল খাবার ঘর আর পশ্চিম দিকে বিখ্যাত দরবার হল।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে নবাববাড়ির অভ্যন্তরের সুন্দর বর্ণনা পাই শিল্পী পরিতোষ সেনের আত্মজৈবনিক লেখায়

'সেখানে পৌঁছতেই দেখি চারদিকে চাকর-বাকর, বন্দুকধারী সেপাই-সামন্ত, ঘোড়ার আস্তাবল, ত্রেপলের হুড দেয়া ফোর্ড গাড়ি, আরও কত লোকজন। মস্ত মস্ত খিলান থামওয়ালা ঘর। নানারকম ফুল-লতাপাতার নকসায় ঘেরা। দরজার ওপর রেশমী পাড় দেয়া খুব সরু চিকের পর্দা।...

'রুহিতনের আকারের রঙবেরঙের কাচ বসানো দরজা আর জানালা। তার ভেতর দিয়ে রামধনুর মোলায়েম আলোয় সমস্ত ঘরটি উদ্ভাসিত। সেই রঙে রঞ্জিত মস্ত ঝাড় লণ্ঠনটির স্ফটিকগুলো নানা বর্ণের তারার মত ঝিকমিক করে। পায়ের তলায় জটিল নকসা কাটা, মখমলের মত নরম গালিচা। দুধের রঙের দেয়াল, উঁচু-নিচু সোনার লতাপাতায় অলঙ্কৃত। গিলটি করা মস্ত খাট, যেন চারটি ফুলদানীর ওপর ভর করে আছে। খাটের ওপর হাল্কা গোলাপী রঙের মসলিনের মত ফিনফিনে, ভাঁজ করা মশারি, একটি চাঁদোয়ার মত ঝুলছে। ডানদিকে মোষকালো, গোল মার্বেলের টেবিল। তার ওপর সূক্ষ্ম খোদাই করা রূপোর গড়গড়া। তারই পাশে আরেকটি টেবিলে পানদান, রূপোর গ্লাস, আতরদান আর চমৎকার একটি তামা এবং পেতলের হাতলওয়ালা গাড়ু। তার গায়ে কী উৎকৃষ্ট মানের কারিগরি। গাড়ুর সংলগ্ন একটি শ্বেত পাথরের বাটি। তাতে কয়েকটি গোলাপের পাপড়ি ভাসছে। সাদার ওপর সাদার কী বাহার।'

সম্প্রতি 'আহসান মঞ্জিল' সংস্কার করে জাদুঘর হিসেবে দর্শকদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।

তথ্য নির্দেশ

A. H. Dani, *Dacca*, Dacca, 1957.

A. L. Clay, *Principal Heads of the History and Statistics of Dacca Division*, Calcutta, 1868.

Azimusshan Haider, *A City and its Civic Body* A souvenir to mark the centenary of Dacca Municipality, Dacca, 1966.

Bengal Times, 1976, 1889.

Bradely Birt, *Romance of an Eastern Capital*, London, 1906.

Bradley Birt, *Twelve Men in Bengal*

C. E. Buckland, *Bengal Under the Lieutenant Governors*, New Delhi, (reprint), vol i, 1976.

C. T Buckland, *Sketches of Social Life in India*, London, 1884

Hamilton Catalogue.

Loknath Ghose, *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas and Zamindars of India*, vol i and vol ii, Calcutta, 1879, 1881.

S. M. Ali, 'Education and Culture in Dacca during the last Hundred years'. Muhammad Enamul Huq (ed), *Muhammad Shahidullah Felicitation volume*, Dacca, 1966

S. M. Taifoor, *Glimpses of old Dacca*, Dacca, 1956

আদিনাথ সেন, *স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ*, কলকাতা, ১৯৪৮।

উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *চরিতাভিধান*, কলকাতা, ১৯১২।

কাজী মোতাহার হোসেন, *নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ*, ঢাকা, ১৯৮০।

কামরুদ্দিন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ঢাকা, ১৩৮২।

ঢাকা প্রকাশ, ১৮৬৪ ১৮৮১, ১৮৮৭, ১৮৮৮, ১৮৯৫, ১৮৯৬, ১৮৯৯, ১৯০১।

পরিতোষ সেন, *জিন্দাবাহার*, কলকাতা, ১৩৮৬।

মুনতাসীর মামুন, 'গনিউর রাজার ঢাকা ভ্রমণ', *স্মৃতিময় ঢাকা*, ঢাকা, ১৯৮৯।

মুনশী রহমান আলি তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা* (অনুবাদ : আ. ম. ম.শরফুদ্দীন আহমদ) ঢাকা, ১৯৮৫।

মুহম্মদ আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, ঢাকা, ১৯৮৬।

মুহম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৮২।

সিরাজুল ইসলাম, *ঢাকার নবাব*, বিচিত্রা।

সোম প্রকাশ, ১৮৭৮।

হৃদয়নাথের ঢাকা শহর

হৃদয়নাথ মজুমদার বিখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় কোন ব্যক্তিত্ব নন। বা কেউ যদি মনে করে থাকেন এক সময় তিনি অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন, তারপর নানা কারণে বিলুপ্তির গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছেন এবং এখন আবার তাঁর পূর্বখ্যাতি সম্পর্কে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে তাহলেও ভুল করবেন। হৃদয়নাথ মজুমদার ছিলেন উনিশ শতকের ঢাকা শহরের মধ্যশ্রেণীর একজন হিন্দু ভদ্রলোক। ঐ আমলের অনেকের মতোই জীবনে বোধ হয় তাঁর একটি উচ্চাশাই ছিল, তা হল উকিল হওয়া এবং তাঁর সেই উচ্চাশা পূরণ হয়েছিল। তবু কেন তাঁকে নিয়ে এই লেখা? তাঁর কারণ মাত্র একটি, পরিণত বয়সে তিনি ইংরেজিতে একটি গ্রন্থ লিখে গিয়েছিলেন। ঐ গ্রন্থে তিনি উনিশ শতকের ঢাকার কিছু চিত্র তুলে ধরেছেন যা আজকের পাঠক বা গবেষকদের জন্য হয়ত কৌতূহলোদ্দীপক। এ-কথা মনে রেখেই হৃদয়নাথের লেখা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটির উপর ভিত্তি করে রচিত হল এ-লেখা।

হৃদয়নাথ মজুমদারের বইটির নাম রেমিনিসেন্সেস অফ ঢাকা বা 'ঢাকার স্মৃতি'। ক্রাউন আকারের আটানব্বই পৃষ্ঠার এই বইটি কলকাতা থেকে লেখক নিজেই প্রকাশ করেছিলেন ১৯২৬ সালে। কলকাতা হাইকোর্টের উকিল রমণীমোহন চ্যাটার্জি বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন ১৯২৪ সালে। বইটি বিভক্ত এগারটি অধ্যায়ে।

হৃদয়নাথ তাঁর জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত কোন বিবরণ রেখে যান নি বইটিতে। সামান্য যা তথ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বইটিতে তাঁর সম্পর্কে, এখানে তার বিবরণ দিচ্ছি।

১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে মানিকগঞ্জের 'তরা' নামে এক গরিব গ্রামে জন্মেছিলেন হৃদয়নাথ। তাঁর বাবার ছিল কিছু জমিজমা এবং একটি খামার। ঐ জমিজমা এবং খামারের আয় দিয়েই চলত তাঁদের সংসার।

আট বছর বয়সে হৃদয়নাথকে পড়াশোনার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল ঢাকায়। ঢাকার শাঁখারিবাজারে এক বাসায় উঠেছিলেন তিনি। তখন তাঁর দেখাশোনা করতেন তাঁদের মোক্তার শিবনাথ ভৌমিক ও তাঁর বাবার বন্ধু রাজকুমার রায়। কিছুদিন পর, তাঁকে 'স্থানান্তরিত' করা হয়েছিল একটি মেসে। ১৮৬৪ সালে ঢাকার আর্মেনিটোলায় পোগজ স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে, বাবা-কাকার সঙ্গে হৃদয়নাথ অবশ্য এসেছিলেন ঢাকায়, কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার পর আবার ফিরে গিয়েছিলেন গ্রামে।

পোগজ স্কুলে পড়েছিলেন হৃদয়নাথ ১৮৭০ পর্যন্ত, তারপর ভর্তি হয়েছিলেন কলেজিয়েট স্কুলে। কিন্তু কলেজিয়েট স্কুলে চার বছর পড়ার পর আবার ভর্তি হয়েছিলেন জগন্নাথ স্কুলে এবং সেখান থেকেই মাসিক পনের টাকা বৃত্তি পেয়ে পাশ করেছিলেন এন্ট্রান্স।

জগন্নাথ স্কুলের একটি ঘটনা হৃদয়নাথের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে ছিল। ১৮৭৪ সালে লর্ড নর্থব্রুক এসেছিলেন ঢাকায়। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি পরিদর্শন করেছিলেন জগন্নাথ স্কুল। ঐ সময় স্কুল থেকে তাঁকে যে-অভিনন্দনপত্রটি দেয়া হয়েছিল তা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন হৃদয়নাথ। ভাইসরয় খুশি হয়ে তাঁকে পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, তিনি যদি এন্ট্রাস পাশ করেন তবে তাঁকে তিনি একটি ঘড়ি উপহার দেবেন। হৃদয়নাথ এন্ট্রাস পাশ করার পর, ভাইসরয়ের সচিব যথাসময়ে তাঁকে প্রতিশ্রুত ঘড়িটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এন্ট্রাস পাশ করার পর ১৮৭৫ সালে হৃদয়নাথ ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকা কলেজে। সেখান থেকে ১৮৭৭ সালে বিশ টাকা মাসিক বৃত্তি পেয়ে পাশ করেছিলেন 'ফার্স্ট একজামিনেশন' (এখনকার হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট)। ১৮৭৯ সালে একই কলেজ থেকে পাশ করেছিলেন বি. এ.। তখন তাঁকে কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং সানন্দে তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষকতা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আইনের ক্লাস করতে থাকেন এবং বি. এল. পাশ করে ১৮৮৪ সালে যোগ দিয়েছিলেন ডিস্ট্রিকট বারে।

এর চেয়ে বেশি কিছু আর জানা যায় নি তাঁর জীবন সম্পর্কে, এমনকি তিনি কখন পরলোকগমন করেছিলেন তাও নয়।

উনিশ শতকের শেষার্ধের ঢাকা

মানিকগঞ্জের তরা গ্রাম থেকে হৃদয়নাথ ঢাকা এসেছিলেন ১৮৬৪ সালে। সেই থেকে বিশ শতক পর্যন্ত তিনি জীবন যাপন করেছিলেন এই শহরেই। বলতে গেলে ঢাকা শহরকে গড়ে উঠতে দেখেছিলেন তিনি তাঁর চোখের সামনেই। ১৮৬৪ সালে হৃদয়নাথ ঢাকা শহরকে দেখেছিলেন এভাবে—

বাবুবাজার খাল ঢাকা শহরকে ভাগ করেছিল দু-ভাগে। খালের উত্তর এবং পশ্চিমে ছিল শহরের পুরানো অংশ। রায়েরবাজার থেকে শুরু করে ঢাকার উত্তরে এবং পুবে পুরানা পল্টন ও রমনার মাঠ ছিল শহরের অন্তর্গত। বিলের দক্ষিণ অংশ, বংশালের দক্ষিণ এবং তাঁতিবাজার ও কামার নগরের উত্তরাংশ মনে হয় গড়ে উঠেছিল পরবর্তী সময়ে। অনেকের ধারণা, শহরের মাঝখানে ঐ বিল ছিল একসময় বুড়িগঙ্গা নদী। পরে নদী দক্ষিণে সরে গেলে চর পড়েছিল এই জায়গায় এবং তা অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল শহরের।

লিখেছেন হৃদয়নাথ— '১৮৬৪ সালে যখন আমি প্রথম বুড়িগঙ্গা দেখেছিলাম তখন তা বয়ে যেত লালবাগ কেল্লা, চৌধুরীবাজার, রায়েরবাজার এবং পিলখানা ঘাটের ধার ঘেঁষে। ১৭৮২ সালে রেনেলের মানচিত্রে বুড়িগঙ্গার গতিপথ যেভাবে দেখানো হয়েছিল

ঐ সময়ও [১৮৬৪] তার কোন পরিবর্তন হয়নি। মানিকগঞ্জ থেকে যে-সব নৌকা আসত সেগুলি ভিড়ত লালবাগ ঘাটে। নওয়াবগঞ্জ চরের কোন অস্তিত্বই ছিল না।'

অনেক গ্রাম ভেঙে বুড়িগঙ্গা ক্রমে সরে গিয়েছিল দক্ষিণে, উত্তরে জমেছিল পলি, সেই পলিভরা খাত ক্রমান্বয়ে পরিণত হয়েছিল নওয়াবগঞ্জের চরে। বার্থচিলা থেকে একটি খাল বা নালা ছিল পিলখানা ঘাট পর্যন্ত যা নদীর পুরানো খাত। বর্ষার সময় পথ সংক্ষেপ করার জন্য মাঝিরা এই নালা ব্যবহার করত। নওয়াবগঞ্জ চরে বসতি বেঁধেছিল প্রধানত মুসলমানরা, গড়ে উঠেছিল সেখানে অনেক পাটকল ও গুদাম। হৃদয়নাথ লিখেছিলেন, 'কে জানে, ভবিষ্যতে হয়ত এ-চর শহরেরই অংশ হয়ে যাবে।'

বুড়িগঙ্গার যে-চরের কথা লিখেছেন হৃদয়নাথ, সেই চর কালক্রমে পরিণত হয়েছিল শহরের একটি অংশে। আশা প্রকাশ করে লিখেছিলেন তিনি, 'বুড়িগঙ্গা নদীর পুরানো খাত যা এখন রয়ে গেছে বিল আকারে, পরবর্তী কালে ভরাট হয়ে হয়ত তা মিলিয়ে দেবে শহরের দু-অংশকে।' হৃদয়নাথের মতে, তাঁতিবাজার, গোয়ালনগর, কলতাবাজার, শাঁখারিবাজার, একরামপুর এবং সুত্রাপুর পুরানো কিন্তু আর্মেনিটোলা, বংশাল, নবাবপুর, সোয়ারীঘাট, নলগোলা, চকবাজার, বেগমবাজার, চান্নিঘাট, উর্দুবাজার, লালবাগ, আমলিগোলা, চৌধুরীবাজার এবং রায়েববাজার আরও পুরানো।

ঢাকা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে একটি দুর্গ, লালবাগ দুর্গ। হৃদয়নাথের সময়, এর সীমানার প্রাচীর ও বিশাল ফটকটি অটুট ছিল যা বহন করছিল প্রাচীন বৈভব। সিপাহিরা থাকত দুর্গে, কেল্লার ভেতরে দক্ষিণে ছিল তাদের ব্যারাক, অস্ত্রাগারটি ছিল ঠিক মাঝখানে। এক ইংরেজ কাপ্তানের অধীনে দেশী সিপাহিরা থাকতেন সেখানে। সিপাহিরা সপ্তাহে নির্দিষ্ট কয়েক দিন মার্চ করে যেতেন পুরানা পল্টনে। লিখেছেন হৃদয়নাথ, 'স্কুল থেকে আমরা মাঝে মাঝে যেতাম পুরানা পল্টনে তাদের চাঁদমারি আর প্যারেড দেখতে। এখনও [বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক?] পল্টনে সিকি মাইল লম্বা, কুড়ি কিউবিক উচ্চতার মাটির ঢিপিটি আছে যেখানে সিপাহিরা টার্গেট প্র্যাকটিস করতেন।'

ছেলেবেলায় হৃদয়নাথ ও বন্ধুরা প্রায়ই লোহার পুল দেখতে যেতেন। তাদের কাছে শহরের আশ্চর্যজনক জিনিসগুলির মধ্যে এটি ছিল একটি। লোহার পুলের উপর দিয়ে দোলাই খাল পার হওয়া ছিল তাদের জন্য এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

লোহার পুলের পুবে ফরিদাবাদও বেশ পুরানো আঞ্চল। ফরিদাবাদের পশ্চিমে ছিল কিছু অট্টালিকা যা পরিচিত মিলব্যারাক নামে। হৃদয়নাথ লিখেছেন, তিনি কখনও সেখানে কারখানা দেখেন নি। 'হয়ত আমি আসার আগে তা চালু ছিল। ছেলেবেলায় দেখেছি দেশী সিপাহিরা থাকতেন সেখানে। লালবাগ থেকে সিপাহিদের সরিয়ে নেয়া হয়েছিল মিলব্যারাকে আর লালবাগকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল রিজার্ভ পুলিশের আস্তানা ও থানায়।'

ফরাশগঞ্জ আদিতে ছিল ফরাসি উপনিবেশ। মোহিনীবাবুর বাড়ি (বর্তমানে 'মুক্তধারা'র কার্যালয়) থেকে বড় রাস্তার দক্ষিণের পুরোটা ছিল ফরাসিদের। ফরাসি বিপ্লবের পর ভারতে যখন তারা তাদের উপনিবেশগুলি হারাতে থাকে, তখন এ-

অঞ্চল পৌরসভায় অধীন হয়ে গিয়েছিল এবং খাজনা জমা দেয়া হত তখন কালেকটরেটে। চন্দননগরের যুদ্ধের পর তাও গিয়েছিল বন্ধ হয়ে। অনেকে অভিযোগ করে বলেছেন, সুত্রাপুরের রায়েরা নাকি চন্দননগরের গভর্নরের কাছ থেকে ফরাশগঞ্জ লিজ নিয়ে, লাখেরাজ সম্পত্তি হিসেবে তা ভোগ করেছিলেন।

যা হোক, ফরাশগঞ্জ অনেকদিন থেকে শাল ও সেগুন কাঠের ডিপো হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রেবতীমোহন, দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীর আলাদা আলাদা গুদাম ছিল ফরাশগঞ্জে। নওয়াবগঞ্জের চরেও ছিল এ-ধরনের কাঠের ডিপো।

হৃদয়নাথ লিখেছেন, লালবাগ দুর্গকে সাধারণত বলা হত বড় কাটরা (এ-রকম উল্লেখ আর কোথাও পাই নি)। সোয়ারীঘাটের পুরানো ব্যারাকের মতো বিল্ডিংকে বলা হয় ছোট কাটরা। নওয়াবি আমলে দুই জায়গায়ই থাকত সৈন্যসামন্ত। হৃদয়নাথের আমলে, ইংরেজ সরকার দুটি অট্টালিকাই বাজেয়াফত করে নিয়েছিল।

ছোট কাটরায় আগে ছিল নর্মাল স্কুল। পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্তী ও দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর ছাত্র। মাহুতটুলিতে নর্মাল স্কুল সরিয়ে নেয়া হয়েছিল ১৮৮০ সালে।

একসময় ঢাকায় যখন-তখন শোনা যেত হাতির গর্জন। এর কারণ, ঢাকার হাতি খেদা ছিল বিখ্যাত এবং নবাবি আমল থেকেই হাতির ব্যবসা ছিল লাভজনক। ইংরেজরা যখন নবাবের হাত থেকে গ্রহণ করেছিল শাসনভার তখন হাতির খেদা ছিল পিলখানায়। হৃদয়নাথ লিখেছেন এ-সম্পর্কে '১৮৬৪ সালে যখন আমি ঢাকায় আসি তখন খেদার কাজ চলছিল পুরোদমে। আসাম থেকে প্রতি বছর হাতি ধরে নিয়ে আসা হত এখানে এবং যতদিন না তারা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে উঠছে ততদিন তাদের রাখা হত সেখানে। জমিদাররাও সামান্য অর্থের বিনিময়ে সরকারি খেদাতে হাতি রাখতে পারতেন। প্রথম যখন আমি পিলখানা দেখতে গিয়েছিলাম তখন সেখানে ছিল দেড়শটি হাতি। পিলখানা সরাসরি ছিল ভারত সরকারের অধীন। আঞ্চলিক কোন সংস্থা পিলখানার কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারত না। ঢাকেশ্বরীর জঙ্গল ব্যবহৃত হত হাতিদের চরে বেড়াবার জন্য।'

এ তো গেল উনিশ শতকের কথা। বিশ শতকের শুরুতে কী হয়েছিল পিলখানার অবস্থা? লিখেছেন হৃদয়নাথ 'পিলখানা, অবশ্য এখন আর নেই। ১৮৮৫ সালে তা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বার্মায়। কয়েকটি দেশী স্কুল এখন গড়ে উঠেছে ঐ জায়গায় আর পুরো কম্পাউন্ডটা ঢাকা পড়ে গেছে জঙ্গলে।'

হৃদয়নাথের মতে, ১৮৬৪ সালের পর থেকে ঢাকা শহরের ক্রমোন্নয়ন শুরু হয়েছিল (অর্থাৎ পৌরসভা স্থাপনের পর)। ঐ সময় ইসলামপুর, তাঁতিবাজার, গোয়ালনগর এবং রায়সাহেব বাজারের উত্তরাংশ ছিল নিচু জলাজমি। বোধ হয় কোন এক সময় এটি ছিল বিল এলাকা। পরে পৌরসভা ভরাট করেছিল এর কিছু অংশ। এই জমি ব্যবহৃত হয়েছিল ঢাকা কলেজের উত্তর, সদরঘাট-নবাবপুর রাস্তার পশ্চিমাংশে কোর্ট বিল্ডিং এবং রায়সাহেব বাজারের জন্য। পৌরসভা, বিলের দক্ষিণাংশ দিয়ে বাঁধের মতো একটি রাস্তা করেছিল,

যা বিস্তৃত ছিল বাবুবাজার থেকে মালিটোলা হয়ে কামারনগর পর্যন্ত। '১৮৭০-এ ছিল এই রাস্তা এবং আমরা পোগজ স্কুল থেকে ফেরার সময় এটি পেরিয়ে আসতাম। বর্তমানে [খুব সম্ভবত বিশ শতকের গোড়ার দিকে], বিলের পশ্চিমাংশ ভরাট করে পৌরসভা স্থাপন করেছে একটি বাজার'— লিখেছেন হৃদয়নাথ।

উনিশ শতকের শেষের দিকে শহরের অভিজাত এলাকা ছিল উয়ারি। ১৮৮০-র দিকে উয়ারির জমি (সব খাস জমি) বিঘা প্রতি বাৎসরিক ছয় টাকা দেয় করে দেয়া হয়েছিল সরকারি কর্মচারীদের। শর্ত ছিল পাকা দালান তুলতে হবে তিন বছরের মধ্যে। খুব শিগগিরই দখল নেয়া হয়েছিল জমিগুলির এবং পাঁচ বছরের মধ্যে দেখা গিয়েছিল উয়ারি পরিণত হয়েছে সরকারি কর্মচারীদের আবাসিক অঞ্চল হিসেবে। হৃদয়নাথের মতে, 'উয়ারি এখন ঢাকার স্যানিটোরিয়াম হিসেবে পরিগণিত।'

রজনীকান্ত চৌধুরী ও দীননাথ সেন, প্রথম গেন্ডারিয়ায় জমি কিনেছিলেন বাগানবাড়ি করার জন্য। তাদের দেখাদেখি পরে আরও অনেকে গেন্ডারিয়ায় জমি কিনে বাড়ি তৈরি শুরু করেছিলেন এবং অচিরেই গেন্ডারিয়া রূপান্তরিত হয়েছিল 'ভদ্রলোকদের কলোনি'তে।

উয়ারির উত্তরে এবং নারিন্দার পুবে টিকাটুলি ও স্বামীবাগ উন্নত করে তোলা হয়েছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে। ঐ অঞ্চলে প্রধানত বসবাস শুরু করেছিলেন মফস্বলের জমিদার ও উকিলরা। মথুরামোহন চক্রবর্তী সেখানে স্থাপন করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'শক্তি ঔষধালয়।'

শহরের দক্ষিণে ও পশ্চিমে হল রমনা। ঢাকার নবাবের পুরানো বাসস্থান (নায়েব-নাজিমদের নিমতলি কুঠি) ছিল সেখানে। 'এখন সেখানে [নব্বই দশকে] ভিড় জমিয়েছে ব্রাহ্মরা', লিখেছেন হৃদয়নাথ। কালেকটরেটের সেরেস্তাদার গোপীকেষ্ট নিজের প্রভাব খাটিয়ে ব্রাহ্মদের জন্য এখানে একটি কলোনি নির্মাণে সহায়তা করেছিলেন। কলোনিটি পরিচিত ছিল 'বিধান পল্লী' নামে।

ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলওয়ের কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে (১৮৮০) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ঢাকায়। হৃদয়নাথ লিখেছেন, 'প্রথমদিকে ঢাকায় পানির ট্যাংকের সংখ্যা ছিল চারটি। আর প্রধান রাস্তাগুলিতে ছিল হাইড্রান্ট। নবাব আবদুল গনির দানে মিউনিসিপালিটি ব্যবস্থা করেছিল পানি সরবরাহের। এরপর মাসে চার টাকা ট্যাক্সে ব্যক্তিগত বাসগৃহে ব্যবস্থা করা হয়েছিল পানি সরবরাহের।'

১৮৮০-র দিকে রাস্তা আলোকিত করা হত কেরোসিন বাতি দিয়ে। হৃদয়নাথের আমলেই (১৯০১) আবার ঢাকায় ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিজলি বাতির। এ-জন্য পৌরসভাকে টাকা দিয়েছিলেন নবাব আহসানউল্লাহ। হৃদয়নাথ এ-সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু লেখেন নি। কিন্তু ঐ আমলের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ*-এর সম্পাদক নতুন যুগের আগমন দেখে আবেগ চেপে না রাখতে পেরে লিখেছিলেন—

'শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুরের অনুকম্পায়, ঢাকা নগরীর প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি চপলা চমকে অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিয়াছে। যেখানে মিউনিসিপালিটির ক্ষীণা দীপকলিকা, কৌতূহলাক্রান্ত, অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূর ন্যায় এখানে ওখানে অলক্ষ্যে উঁকিঝুঁকি মারিয়া

পথিকের মনে ঘৃণার সঞ্চার করিয়া দিত, আজ সেখানে দামিনীপ্রভা বিমল চন্দ্রিকাপাতে জনসাধারণের নয়নমন পুলকিত করিয়া তুলিযাছে। ঢাকার ন্যায় শহরে এরূপ দৃশ্য লোকনয়নে নিপতিত হইবে দশ বৎসর পূর্বে বোধ হয় তাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল। কিন্তু নবাব বাহাদুরেব অপার অনুগ্রহে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে।'

ঢাকার কমিশনার সি. টি. বাকল্যান্ডের আমলে নির্মিত হয়েছিল বাকল্যান্ড বাঁধ। ১৮৭৫/৭৬ সালে ঠিক হয়েছিল, নদীর তীরে যে-বাড়িগুলি আছে তাদের সামনের দিকটুকু বাঁধিয়ে দেয়া হবে যাতে তা 'স্ট্রান্ডে'র মত দেখা যায়। তা ছাড়া নদীব পাড় বাঁধিয়ে দিলে শহরের লেভেল নদী থেকে উঁচু থাকবে। প্রথম বছর বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল নর্থব্রুক হল ঘাট থেকে ওয়াইজঘাট পর্যন্ত। হৃদয়নাথ লিখেছেন, 'আমরা শুনেছি, বাঁধের পুবের অংশটুকু তৈরি করেছিলেন রূপলাল ও রঘুনাথ সাহা, পশ্চিমের অংশটুকু নবাব আবদুল গনি আর মাঝখানেরটুকু সরকার। কিন্তু বাবু বা নবাব কেউই তাঁদের অংশ হস্তান্তর করে নি পৌরসভার কাছে। কিন্তু এর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বহন করে পৌরসভা। প্রস্তাব করা হয়েছিল শহরের যে যে-ধার ঘেঁষে নদী গেছে তার পুরোটাই বাঁধিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু পৌরসভার পর্যাপ্ত ফান্ড না থাকায় তা হয় নি। সদরঘাটে আছে ছোট একটা পার্ক যেখানে আছে একটা মঞ্চ। প্রতি শনিবার সেনাবাহিনীর বাদকদল এই মঞ্চে ব্যান্ড বাজাত। এখন সেনাবাহিনীও নেই, বাজনাও নেই। এখন মঞ্চটি ব্যবহৃত হয় গভর্নর এলে ঘাট হিসেবে।'

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় ঢাকা আবার প্রাদেশিক রাজধানী হলে শহরের ক্রমোন্নয়নের দিকে নজর দেয়া হয়েছিল। ১৯০৬ সালের ঢাকা সম্পর্কে লিখেছেন হৃদয়নাথ, 'বন্যজন্তুর আবাসস্থল ঢাকেশ্বরী মন্দিরের আশেপাশের জলা-জঙ্গল কেটে সাফ করা হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে অট্টালিকা, শহর বাড়ছে উত্তরে, তৈরি হচ্ছে সেখানে গভর্নমেণ্ট হাউস, সেক্রেটারিয়েট আর ইউনিভারসিটি। রমনার বনভূমিতে বড়লোকেরা যত পারছে জমি কিনছে, বাড়ি বানাচ্ছে।'

বঙ্গভঙ্গ রদের পর ঐ ঝোঁক কমে গিয়েছিল। হৃদয়নাথ ভবিষ্যদ্বাণী করে ঐ সময় লিখেছিলেন 'কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন রমনাই হয়ে উঠবে ঢাকা শহরের সমস্ত অফিস-আদালতের কেন্দ্র। তখন চকবাজার, নলগোলা, বাবুবাজার, ইসলামপুর এবং বাংলাবাজারের মতো পুরানো অঞ্চলগুলি জৌলুস হারিয়ে ফেলবে। আর উত্তরে গড়ে উঠবে ঢাকা ক্যান্টনমেণ্ট।'

ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে হৃদয়নাথ তাঁর গ্রন্থে মোটামুটি বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন। তিনি যখন ঢাকায় এসেছিলেন অর্থাৎ ষাটের শুরুতে, তখন ঢাকায় স্কুল ছিল তিনটি। পোগজ স্কুল যা সাধারণেব কাছে পরিচিত ছিল 'নিকি সাহেবের স্কুল' নামে, ঢাকা কলেজ সংলগ্ন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং খাজা আবদুল গনির ফ্রি স্কুল।

পোগজ স্কুল স্থাপন করেছিলেন ঢাকার একজন নামজাদা আর্মেনিয়ান নাগরিক এবং জমিদার নিকি পোগজ। প্রথম দিকে তাঁর বিশাল অট্টালিকার নিচের তলায় বসত স্কুল, উপর তলায় থাকতেন তিনি নিজে। সম্পূর্ণ নিজের খরচে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ-স্কুল স্থাপন করেছিলেন নিকি পোগজ।

কিছুদিন পোগজ সাহেবের বাসায় স্কুল চলার পর তা স্থানান্তরিত করা হয়েছিল সদরঘাট ক্রসিংয়ের কাছে এক দোতলায়। তারপর আবার স্কুলের স্থান পরিবর্তিত হয়েছিল কলেজ বিল্ডিংয়ের পশ্চিমে (বর্তমান স্থানে)। বেশি দিন পোগজ স্কুল নিকি সাহেবের হাতে থাকে নি। জমিদারি বিক্রি করে তিনি ইংল্যান্ডের চলে গেলে সবজিমহলের জমিদার রমণীমোহন দাস পোগজ সাহেবের জমিদারির সঙ্গে লাভ করেছিলেন স্কুলের মালিকানাও। পোগজ স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন মাজিপাড়ার কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়। তারপর সে-ভার গ্রহণ করেছিলেন গোপীমোহন বসাক।

জগন্নাথ স্কুলের মালিক ছিলেন বাবু কিশোরীলাল রায়চৌধুরী। কলেজিয়েট এবং পোগজ স্কুলের অনেক পরে স্থাপিত হয়েছিল জগন্নাথ স্কুল। এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রচুর এবং খরচা বাদ দিয়ে মাসে এ-স্কুলের প্রায় এক হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকত।

গোপীমোহন বসাক ছিলেন জগন্নাথ স্কুলের হেডমাস্টার (পোগজ ছেড়ে এসেছিলেন তিনি)। তাঁর আমলে পাঁচ-ছ বছর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল জগন্নাথ স্কুল। ঢাকা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়েছিল গোপীমোহনের। কলেজিয়েট এবং পোগজ স্কুলও এই খ্যাতির নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছিল।

গোপীমোহন মাসে বেতন পেতেন দু-শ টাকা। স্কুলের আয় দেখে স্বাভাবিকভাবেই মালিকের কাছে তিনি ইনক্রিমেন্ট দাবি করেছিলেন। হৃদয়নাথের মতে, 'কিশোরীবাবু একাই ঐ লাভ নিতেন বলে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। কিশোরীবাবুর উপদেষ্টারা আবার গোপীবাবুকে মনে করত অটোক্র্যাট। ফলে, একদিন এক সুন্দর সকালে কর্মচ্যুত করা হয়েছিল গোপীবাবুকে। এবং ঐ দিনই মালিক জগন্নাথ স্কুল বন্ধ ঘোষণা করেছিলেন। পরে স্কুলের নাম বদলে রাখা হয়েছিল 'কিশোরীলাল জুবিলী স্কুল।' গোপীমোহন ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় স্কুলের নাম বদলে রাখা হয়েছিল।

ঐ সময় স্কুলের অন্য শিক্ষকদের কর্মচ্যুত করা হয় নি। পরে এই স্কুলের আয় দিয়ে খোলা হয়েছিল একটি কলেজ। কলেজের জন্য জুবিলী স্কুলের পুবে তৈরি করা হয়েছিল করোগেটের বিরাট এক শেড। পরে সরকার জুবিলী স্কুলের পুবে যে-সব জমিজমা দরকার তা কিনে তৈরি করেছিলেন জগন্নাথ কলেজের অট্টালিকাসমূহ।

হৃদয়নাথ কিশোরীলাল জুবিলী স্কুল সম্পর্কে নানা ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু স্কুলের আদি ইতিহাস সম্পর্কে কিছু লেখেন নি। সে-সম্পর্কে সংক্ষেপে এখানে কিছু বলা যেতে পারে।

স্কুল ইনসপেকটর, তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের একজন কর্মীপুরুষ ও ঢাকার প্রভাবশালী নাগরিক দীননাথ সেন ১৮৬৩ সালে তাঁর নিজের বাড়িতে খুলেছিলেন ছোট এক স্কুল 'ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুল'। ঐ সময় ঢাকার তরুণ, যারা ব্রাহ্ম মতে আকৃষ্ট হতেন,

স্বাভাবিকভাবেই রক্ষণশীল পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন দ্বারা লাঞ্ছিত হতেন। দীননাথ এইসব তরুণকে নিয়মিত ধর্মশিক্ষা দেয়ার জন্য স্থাপন করেছিলেন স্কুলটি। প্রায় বার বছর চলার পর কর্তৃপক্ষ অর্থাভাবের দরুন স্কুলটি তুলে দিয়েছিলেন কিশোরীলাল রায়চৌধুরীর হাতে। তিনি তাঁর পিতার নামে স্কুলের নাম রেখেছিলেন জগন্নাথ স্কুল। জুবিলী স্কুলের আদি ইতিহাস হল এই।

ঐ সময় স্থাপিত হয়েছিল আরও কিছু স্কুল। রূপলাল দাস ডালবাজারে স্থাপন করেছিলেন রূপলাল রঘুনাথ স্কুল। এ-স্কুল পাঁচ বছর থেকে পথ করে দিয়েছিল ইস্টার্ন বেঙ্গল একাডেমির জন্য, যার হেডমাস্টার ছিলেন দীনবন্ধু সেন। বিক্রমপুরের অম্বিকাচরণ উকিল খুলেছিলেন একটি স্কুল, উকিল ইনসটিটিউশন। দশ বছর চলার পর অর্থাভাবে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

খাজা আবদুল গনির ফ্রি স্কুল ছিল অনেক আগে থেকেই। পোগজ স্কুলের আগে স্থাপিত হয়েছিল এই স্কুল। আহসান মঞ্জিলের কাছে নবাব এই স্কুল স্থাপন করেছিলেন। তবে খাজা সাহেবের স্কুল কখনও ভালো চলে নি। স্কুলটি প্রধানত খোলা হয়েছিল মুসলমানদের শিক্ষার জন্য। পরে ছাত্রের অভাবে এটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে। হৃদয়নাথ লিখেছেন, 'কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অনুকরণে খোলা হয়েছিল নর্মাল স্কুল। এখানে সংস্কৃত সাহিত্য, কাব্য অলংকার এবং ব্যাকরণ শিক্ষা দেয়া হত। আমরা যখন পোগজ স্কুলের ছাত্র তখন ছোট কাটরায় স্থাপিত নর্মাল স্কুল চলছিল চমৎকারভাবে। স্যামুয়েল আরাথুন নামে এক আর্মেনিয়ান ছিলেন এর হেডমাস্টার।' হৃদয়নাথ পরে আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'নর্মাল স্কুলের আগের অবস্থা আর নেই। এখন এখান থেকে শুধু মাইনর স্কুলের জন্য হেড পণ্ডিত তৈরি হয়।' বর্তমান টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ভিত্তি ছিল এই নর্মাল স্কুল।

বাংলার লেফটেনান্টস গভর্নর স্যার এসলি ইডেনের নামানুসারে ১৮৮০ সালে মেয়েদের জন্য স্থাপিত হয়েছিল ইডেন ফিমেল স্কুল। প্রথমে স্কুলটি বসত লক্ষ্মীবাজারে। ১৮৯৭-এর ভূমিকম্পে লক্ষ্মীবাজারের বিল্ডিংটি ধসে পড়লে স্কুল স্থানান্তরিত করা হয়েছিল উকিল ঈশ্বরচন্দ্রের বাসায়। বিশ শতকের ইডেন সম্পর্কে লিখেছিলেন হৃদয়নাথ, 'এখন এটি একটি কলেজ এবং সদরঘাটের পুবে একটি বড়সড় বাড়িতে কলেজটি স্থানান্তরিত করা হয়েছে।'

ঢাকা কলেজ ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান কলেজ। হৃদয়নাথ লিখেছেন, 'আমরা শুনেছি ১৮৫০ সালে স্থাপিত হয়েছিল ঢাকা কলেজ। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চাঁদা ও প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল এই কলেজ।' ঢাকা কলেজের প্রথম বি. এ. ছিলেন বাবু রোহিনীকুমার বসাক।

ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশের পর ছাত্রদের বলা হত জুনিয়র স্কলার। দু-বছর পর আরেকটি পরীক্ষা পাশ করলে বলা হত তাদের সিনিয়র স্কলার। সিনিয়র স্কলারশিপ একজামিনেশন পাশ করার জন্য সময় লাগত চার বছর। এরপর ছিল লাইব্রেরি একজামিনেশন নামে একটি ফাইনাল পরীক্ষা বা বর্তমানের এম.এ.-র সমান। ঢাকা কলেজের প্রথম এম. এ. ছিলেন নবাবপুরের রসময় বসাক।

১৮৭৩ পর্যন্ত ঢাকা কলেজ ও ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ছিল একই ভবনে। পরে বিজ্ঞান গবেষণাগারের জন্য জায়গার প্রয়োজন হলে করোনেশন পার্কের পূর্ব দিকে এক বৃহৎ অট্টালিকায় স্কুলটি স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। রমনার দেওয়ানবাজারে কলেজ স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা ঐ পুরানো বিল্ডিংয়েই ছিল। ফিজিক্যাল সায়েন্সের জন্য গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছিল ১৮৭৯ সালে কলেজ কম্পাউন্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। সায়েন্স লেকচার যাতে ছাত্ররা ভালোভাবে শুনতে পায় সে-জন্য নির্মিত হয়েছিল গ্যালারি। নির্মাণের সময় এটি তত্ত্বাবধান করেছিলেন সুপারভাইজার হরিপ্রসাদ ঘোষাল। ল্যাবরেটরির নির্মাণকার্য সাফল্যজনকভাবে শেষ করার পুরস্কারস্বরূপ লে. গভর্নর তাঁকে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার পদে প্রমোশন দিয়েছিলেন।

একসময় ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ব্রেনান্ড। নামকরা অঙ্কবিদ্ ছিলেন তিনি। লিফিভর ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার (হৃদয়নাথের সময়)। কৈলাশচরণ ঘোষ ও উমাচরণ দাস ছিলেন যথাক্রমে সেকেন্ড ও থার্ড মাস্টার। হৃদয়নাথ লিখেছেন 'এন্ট্রান্স পাশ করার পর আমি যখন কলেজে ঢুকলাম তখন ক্যামব্রিজের র‍্যাংলার ইউবাংক এলেন প্রিন্সিপাল হয়ে। সে-সময় রোয়ে ও ওয়েব ছাড়া অঙ্কের প্রভাষক ছিলেন মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় ও কেমেস্ট্রির প্রিয়নাথ ঘোষ। ১৮৭৯ সালে ইউবাংক পাটনায় বদলি হয়ে গেলে পোপ এসেছিলেন প্রিন্সিপাল হয়ে। পোপের পর প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন বুথ। বুথের পর এডোয়ার্ডস। তাঁর আমলেই কলেজ সংশ্লিষ্ট হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে।'

হৃদয়নাথ অবশ্য সামগ্রিকভাবে ঢাকা শিক্ষাব্যবস্থার উপর আলোকপাত করেন নি। এ-সম্পর্কে, বিশেষ করে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারি, ঢাকা নর্মাল স্কুলের হেডমাস্টার থাকার সময় দীননাথ শিক্ষাব্যবস্থার উপর সরকারি যে-রিপোর্ট লিখেছিলেন (১৮৭১-৭২) তা থেকে।

দীননাথ অবাক হয়ে বলেছেন, ঢাকা শহরে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি কিন্তু নর্মাল স্কুলে অন্য ছাত্রের তুলনায় মুসলমান ছাত্রসংখ্যা কম। হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান সমাজে জাতিভেদ নেই। সমাজে তাদের দুটি প্রধান স্তর, অভিজাত ও অনভিজাত। ধর্মীয় কারণে যা প্রয়োজন এর বাইরে অভিজাতরা কোন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চান না। বাকি থাকে অনভিজাতরা। কিন্তু তারাও নানা রকম ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত। সুতরাং শিক্ষা বিভাগ প্রদত্ত শিক্ষাসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাও তারা গ্রহণ করে না।

শহরের এই দুই শ্রেণী ছাড়া শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত আরেকটি মুসলিম যুবক শ্রেণী আছে যারা তায়েব এলম নামে পরিচিত। বাংলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য তারা ঢাকা শহরে এসে ভিড় জমায়। তাদের গড় বয়স সতের থেকে আঠার।

গরিব কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশে এদের জন্ম। গ্রামের মুনশির কাছে এরা ছোট বেলায় হয় আরবি নয়ত ফারসি শেখে। এবং তারপর নিজেরাই মুনশি বা মৌলবি হওয়ার জন্য ছুটে আসে ঢাকার দিকে।

খুব দুস্থ অবস্থায় এরা গ্রাম থেকে শহরে আসে এবং ধনী মুসলমানদের দয়ার উপর নির্ভর করে। শহরে মক্তব অথবা নামকরা মুনশির কাছে এরা ফারসি এবং আরবি শিখতে যায়।

যদিও প্রাচীন ধারায়, এরা শিক্ষিত হচ্ছে কিন্তু এদের জ্ঞানস্পৃহা প্রশংসা করার মতো। ঢাকায় প্রায়ই দেখা যায়, দল বেঁধে, কোন দিকে দৃকপাত না করে তারা পড়া মুখস্থ করছে বা আলোচনা করতে করতে মৌলবির কাছে যাচ্ছে বা তাদের আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে। নিঃসঙ্গ শহরে, দুস্থ অবস্থায়, একাগ্র মনে পড়াশোনা করে যাওয়া যে কী কঠিন ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়। দীননাথ এক কথায় এদের প্রশংসা করেছেন।

হৃদয়নাথ তৎকালীন ঢাকা শহরের একটি অন্য ধরনের স্কুলের বর্ণনা দেন নি। তা হল সঙ্গীত বিদ্যালয়। ঢাকা শহরের এটাই ছিল বোধ হয় প্রথম সঙ্গীত বিদ্যালয়। এ-প্রসঙ্গে ১২২৯ সালের (১৮৮৬ খৃস্টাব্দ) ১ ভাদ্রের ঢাকা গেজেট থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি

'ঢাকাবাসী সঙ্গীত বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমাদের বন্ধু সঙ্গীতানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের প্রযত্নে ঢাকা জগন্নাথ কলেজগৃহে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ঢাকা নগরীর একটি বিশেষ অভাব দূরীকৃত হইবার সম্ভাবনা। সঙ্গীত বিদ্যাভ্যাসাকাঙ্ক্ষীদের শিক্ষাকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

'ভরসা করি সঙ্গীতপ্রিয় মহোদয়গণ চন্দ্রনাথ বাবুর এই সদুদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য যথোচিত সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিবেন।

'বিদ্যালয় সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম নিম্নে প্রকাশ করা গেল :

'বিদ্যালয়ে চারিটি বিভাগ অথবা শ্রেণী থাকিবে।

(ক) হারমোনিয়াম শ্রেণী

(খ) সঙ্গীত শ্রেণী

(গ) তবলার শ্রেণী

(ঘ) সেতারের শ্রেণী।

প্রতি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীগণ হইতে এক টাকা হারে মাসিক বেতন গ্রহণ করা হইবে। যদি কেহ দুই শ্রেণীতে শিক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তবে তাহাকে উভয় শ্রেণীর জন্য মাসে ১॥ টাকা বেতন দিতে হইবে। এই প্রকার তিন শ্রেণীর জন্য ২॥ টাকা এবং চারি শ্রেণীর জন্য ৩ টাকা বেতন গৃহীত হইবে। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সেই মাসের বেতন দিতে হইবে। সন্ধ্যা ৭টা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিবে। প্রতি সোম, বুধ, শুক্রবারে হারমোনিয়াম ও সেতারের এবং প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিবারে সঙ্গীত ও তবলা শ্রেণীর শিক্ষাকার্য্য চলিবে। অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন স্কুলের ছাত্রকে শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করা যাইবে না। কিন্তু কলেজের ছাত্র গৃহীত হইবে। অজ্ঞাতকুলশীল কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করা যাইবে না। বিদ্যালয়ের উন্নতি এবং শিক্ষার্থীগণের

উৎসাহানুসারে ফ্লুট, ক্লারিওনেট, এস্রাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইবে।'

হৃদয়নাথ তৎকালীন ঢাকার ছাত্রদের জীবন-যাপন সম্পর্কে কিছুই লেখেন নি। এই সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় আদিনাথ সেন লিখিত *দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ* নামক গ্রন্থে। তখনকার দিনে কলেজের ছাত্ররা পর্যন্ত শ্লেট ব্যবহার করত। ছেলেদের জন্য কোন ছাত্রাবাস ছিল না। কয়েকজন ছাত্র মিলে একসঙ্গে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকত। এবং অনেক সময় রান্নার ঠাকুরের সঙ্গে মাসে চার-পাঁচ টাকায় খাবারের বন্দোবস্ত করা হত। অনেকে আবার কোন কোন আখড়ার সঙ্গে এক থেকে দেড় টাকার মধ্যে খাবারের বন্দোবস্ত করে নিত। সকালের নাস্তা ছিল এক-আধ পয়সার ফুলুরি, বেগুনি, মুড়ি-মুড়কি, ছোলাভাজা বা চিনেবাদাম অথবা এক পয়সার তিনখানা বিস্কুট। চায়ের চল তখন একদম ছিল না, ছাত্ররা দু-আনা করে ছয়টি কেরোসিনের বাক্স কিনে খাটের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয়েছিল হৃদয়নাথ তখন বৃদ্ধ। বোঝা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকে তিনি সহজভাবে নিতে পারেন নি। হয়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তৎকালীন অপপ্রচার (যেমন, বঙ্গভঙ্গ রদের সান্ত্বনা হিসেবে মুসলমানদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন) তাঁকে স্পর্শ করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে, কটাক্ষ করে তিনি লিখেছিলেন

'ঢাকার ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতখানি সফল হয়েছে তা সমালোচনা করা আমার এখতিয়ারভুক্ত নয়। এখন এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন উচ্চ বেতনের শিক্ষকরা। তাঁদের কার্যক্ষমতার বিরুদ্ধে কিছু বলা আমার উচিত নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে সার্বজনীন মতামত জরিপ করলেই যথেষ্ট হবে।'

ঢাকায় সিপাহি বিদ্রোহ

'১৮৬৪ সালে যখন আমি ঢাকা আসি তখন থেকেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে শুনেছি। জনমনে তখনও ঐ স্মৃতি তাজা ছিল' লিখেছেন হৃদয়নাথ। তিনি যাঁদের কাছ থেকে এ-সম্পর্কে শুনেছিলেন তাঁরা ছিলেন কালেকটরেটের তৎকালীন তওজিমোহরের রাজকুমার রায়, কালেকটরেটের নাজির জগবন্ধু নাজির (সক্রিয়ভাবে যিনি ১৮৫৭ সালে সাহায্য করেছিলেন ঢাকার ইংরেজদের), মোক্তার শিবনাথ ভৌমিক এবং আরও কিছু হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোক যাঁরা থাকতেন শাঁখারিবাজার ও লালবাগে।

হৃদয়নাথ ১৮৫৭ সালের এই বিদ্রোহ সম্পর্কে যা শুনেছেন তাই সাজিয়ে গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন।

লালবাগে তখন থাকত দেশী সিপাহিরা যারা সাধারণত পরিচিত ছিল কালা সিপাহি নামে, ইংরেজ সিপাহিদের বলা হত গোরা সিপাহি। কালা সিপাহিরা ছিল শক্ত-সমর্থ, অমায়িক এবং এইজন্য শহরের মুসলমানদের মধ্যে তারা খুব জনপ্রিয়

ছিল। লালবাগ দুর্গে এক ইংরেজ কাপ্তানের অধীনে আধা ব্যাটালিয়ান সৈন্য ছিল।

বলা হয়ে থাকে লালবাগের দেশী সিপাহিদের সাথে পাঞ্জাব এবং অযোধ্যার বিদ্রোহী সিপাহিদের যোগাযোগ ছিল। এই জনশ্রুতি ঠিক ছিল এমন বলা যায় না। বাংলার তিন জায়গায় তখন দেশী সিপাহিরা থাকত মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং চট্টগ্রামে। তারা ছিল দক্ষ এবং বিশ্বাসী।

ঢাকার দলকে প্রতিদিন ট্রেজারি, ব্যাংক অফ বেঙ্গল এবং ইংরেজ পাড়ায় পাহারা দিতে হত। মাঝে মাঝে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তারা নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করত। 'এক বৃদ্ধের কাছে শুনেছিলাম, একবার আন্টাঘর ময়দানে [বর্তমান বাহাদুরশাহ পার্ক] ঢাকা খেদার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতির সঙ্গে এই রেজিমেন্টের এক শক্তিশালী সৈনিকের শক্তি পরীক্ষা হয়। হাতি তার শুঁড় দিয়ে লোকটার এক হাত জড়িয়ে ধরে টানতে থাকে। কিন্তু ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সিপাহিটিকে হাতিটি এক ইঞ্চিও নড়াতে পারে নি।'

এই রকম শক্তিশালী সমর্থ একদল সিপাহি ছিল তখন ঢাকায়। ঢাকার ইংরেজরা তাদের ভয় পেত। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কখনও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিপাহিদের সঙ্গে তাদের গোপন আঁতাতের কোন তথ্য আবিষ্কার করা যায় নি।

কানপুরের হত্যাকাণ্ডের খবর ঢাকায় পৌঁছুলে প্রায় ১২৫ জন ইংরেজ সৈন্য প্রয়োজনমতো বিদ্রোহের মোকাবেলা করার জন্য ঢাকায় আসে। ঢাকার ইংরেজদের তখন প্রতিরক্ষাব্যবস্থা শিক্ষা দেয়া হয়। রেভিনিউ কমিশনারের বাড়ি ছিল তাদের ঘাঁটি। এ-ছাড়া কলেজপ্রাঙ্গণেও ইংরেজ সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়ে বসে।

এভাবে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে ব্যাটালিয়নের কাপ্তান একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সুবাদারকে ডেকে জিজ্ঞাস করল, পেনসন দিয়ে তাদের যদি চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা চলে যাবে কি না। সুবাদার তার সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করার জন্য সময় নিল।

এদিকে রাত্রিবেলা কলকাতা থেকে আদেশ পাওয়ার পর ১২৫ জন ইংরেজ সৈন্য এবং প্রায় ১০০ জন ইংরেজ নাগরিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কমিশনারের বাড়ি থেকে কেল্লার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এবং যথাসময়ে কেল্লাটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে কাপ্তানের আদেশে তারা শুরু করেছিল গুলিবর্ষণ।

সিপাহিরা এ-ধরনের কোন কিছু আশঙ্কা করে নি। তাই নিরুদ্বেগে তারা ঘুমিয়ে ছিল। গুলিবর্ষণের শব্দে তারা প্রথমে বিমূঢ় হয়ে পড়লেও পরে বিপদ দেখে নিজেদের তৈরি করে নিয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের কাছে ছিল দশ রাউন্ড গুলি এবং তা দিয়ে তারা আক্রমণকারীদের প্রত্যুত্তর দিয়েছিল।

অস্ত্রাগারের চাবি ছিল সুবাদারের কাছে। সিপাহিরা তাকে অস্ত্রাগার খুলে দিতে বললে সুবাদার অস্বীকৃতি জানায়। সুবাদারের স্ত্রীও অনুরোধ জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়। সিপাহিরা সুবাদারকে হত্যা করে চাবি দখল করে নিতে চাইল। কিন্তু ইংরেজরা তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। কিছু সিপাহি নিহত হল, কিছু আহত এবং বাকিরা গোলাবারুদ না

থাকায় বন্দি হিসেবে আত্মসমর্পণ করল। কাপ্তান প্রথমে তাদের নিরস্ত্র করে অস্ত্রাগারের চাবি নিয়ে, তারপর পরিবার-পরিজনসহ সিপাহিদের বন্দি করে কেল্লার দখল নিল।

ইংরেজদের এই জয়ের খবর দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। পুরো শহর বিপদের আশঙ্কা করতে লাগল। আগেই অনেক ভদ্রলোক তাদের পরিবার-পরিজনদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গ্রাম বা নিরাপদ আশ্রয়ে, অনেকে শহর ছেড়ে গিয়েছিল পালিয়ে। বাকি যারা ছিল তারা উল্লাসের সঙ্গে সংবাদটি গ্রহণ করল। দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের অনেক হিন্দু কর্মচারী ইংরেজ এবং ইংরেজ সৈনিকদের সঙ্গে যোগ দিল। তাদের অনেককে অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হল। যা হোক সুবাদার চাবি না দেওয়ায় শুধু শুধু সিপাহিরা গুলি খেয়ে মরল। অনেকের মতে সিপাহিদের গুলি এবং বেয়নেটের আঘাতে ৫০ জন ইংরেজ এবং দেশী নাগরিক আহত হয়েছিল।

পরের দিন তাড়াতাড়ি করে ধৃত সিপাহিদের কোর্ট মার্শাল করা হল। কারণ ইতোমধ্যে রটে গিয়েছিল চট্টগ্রামের সিপাহিরা ঢাকার সিপাহিদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য ঢাকা অভিমুখে রওনা হয়েছে। সুতরাং সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হল। দেরি না করে পরের দিন আন্টাঘর ময়দানে গির্জার কাছে তাদের ফাঁসি দেয়া হল। অপরাধীদের সাধারণত জেলে ফাঁসি দেয়া হয়। কিন্তু ঢাকাবাসীর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য শহরের মাঝখানে খোলা জায়গায় ফাঁসি দেয়া হয়েছিল।

এরপর সুবাদারের বিচার করা হল। সুবাদার ও তার স্ত্রীকে সাময়িক আদালতের সামনে হাজির করা হলে সুবাদার জানাল যে, সে নির্দোষ, কারণ অস্ত্রাগারের চাবি সে দেয় নি এবং এ-জন্যই ঢাকা শহর রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু আদালত জানাল যেহেতু আগের দিন বিকেলে সে আত্মসমর্পণ করে নি সেহেতু তাকেও ফাঁসি দেয়া হল। সুবাদারের স্ত্রীকেও ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হল। কারণ সুবাদার যখন চাবি দিতে অস্বীকার করেছিল তখন সে নাকি দুর্গের ভেতর থেকে দুটি গুলিভরা বন্দুক ব্যবহার করেছিল। সুতরাং সবাইকে ফাঁসি দেয়া হল এবং এই ভাবেই ঢাকা বিদ্রোহের ইতি হল। ঢাকাবাসীরা এরপর থেকে আন্টাঘর ময়দানের আশপাশ দিয়ে হাঁটতে ভয় পেত। কারণ এই ময়দান নিয়ে অনেক ভৌতিক কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাবাজার, শাঁখারিবাজার এবং কলতাবাজারের লোকজন তো সন্ধ্যার পর ময়দানের ধারে-কাছেও ঘেঁষত না।

ঢাকার অধিবাসীরা

তৎকালীন ঢাকাবাসীদের সম্পর্কেও সামান্য কিছু বিবরণ রেখে গেছেন হৃদয়নাথ। তবে তাঁর সেই বিবরণ মনে হয় খানিকটা পক্ষপাতদুষ্ট। ঢাকাবাসীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি ঢাকাবাসী মুসলমানদের কথাই উল্লেখ করেছেন এবং তার সবটুকুই প্রশংসা নয়।

হৃদয়নাথের মতে, ঢাকার মুসলমানরা ছিলেন উদ্ধত। মুসলমান 'গুণ্ডা'দের আখড়া ছিল রোকনপুর, বংশাল এবং উর্দুবাজারে। সেখানে তাদের কুস্তি শিক্ষা দেয়া হত। 'গুণ্ডামি'

ছিল তাদের নিত্যদিনের ব্যাপার এবং মফস্বল ও শহরের হিন্দুরা ছিলেন এর শিকার। 'স্কুলে থাকতে দেখেছি', লিখেছেন হৃদয়নাথ, 'বিভিন্ন আখড়ার পালোয়ানদের নিয়ে আয়োজন করা হতে কুস্তি প্রতিযোগিতার এবং শেষমেশ তা পরিণত হত পরস্পরের মাথা ফাটাফাটিতে। পরে এই ধরনের প্রতিযোগিতা হলে পুলিশের বন্দোবস্ত করা হত সেখানে।'

ব্যক্তিগতভাবে হৃদয়নাথ ও তাঁর বন্ধুরা যে-সব পালোয়ানকে চিনতেন তাঁরা ছিলেন বংশালের ডনগির ফান্নু, রাজাবাবুর আখড়ার অধরচন্দ্র ঘোষ, রোকনপুর-কলতাবাজারের আজিমউদ্দিন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হাফিজ ও সাল্লু নামে দুই ভাই।

অধর ঘোষ ছিলেন ছাত্রদের প্রিয়। এর কাছে ডন কুস্তি শিখেছিলেন জগন্নাথ কলেজের দুই ছাত্র শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশনাথ ঘোষ। শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথ পরে খুলেছিলেন নিজেদেব আখড়া যেখানে স্কুলের ছাত্ররা ভিড় জমাত। ঢাকা কলেজে ছিল একটি জিমনেসিয়াম যার দায়িত্বে ছিলেন হরিমোহন বসাক নামে একজন শিক্ষক। সেখানেও এরা দুজন জিমন্যাস্টিক শেখাতেন। তখন সব স্কুলে খোলা হয়েছিল জিমনেসিয়াম কিন্তু জিমন্যাস্টিকে ঢাকা কলেজই ছিল শ্রেষ্ঠ।'

হৃদয়নাথ লিখেছেন, ১৮৬৫/৬৬-র দিকে ঢাকার ছাত্ররা ডনগিরদের জ্বালায় অস্থির থাকত। চকবাজারে গিয়ে যে কোন ভদ্রলোক কেনাকাটা করবেন তারও উপায় ছিল না।

এদের রুখবার জন্য কিছু হিন্দু ভদ্রলোকও আখড়া গড়ে তুলতে থাকেন, শুরু করেন কুস্তি শেখানো এবং উনিশ শতকের শেষের দিকে শ্যামাকান্ত-পরেশনাথের আখড়া বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। এই আখড়ার শিষ্যরা এদের শায়েস্তা করা শুরু করে এবং হৃদয়নাথের মতে, এই আখড়াব শিষ্যদের জন্য তথাকথিত গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য কমে গিয়েছিল।

মুসলমান তরুণদের দৌরাত্ম্য নাকি আবার বেড়ে গিয়েছিল বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময়। হৃদয়নাথ লিখেছেন, 'বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় তরুণ মুসলমান যুবকদের নিগ্রহের পাত্র হতেন হিন্দু ভদ্রলোকেরা এবং আবার দরকার হয়ে পড়েছিল পুরানো উদ্যোগ গ্রহণ করা। লাঠি খেলা শেখার উদ্যাগ নেয়া হয়েছিল এবং এ-প্রেক্ষিতে জুবিলী স্কুলের শিক্ষক পুলিনবিহারী দাস ছাত্রদের লাঠি খেলা শিক্ষা দেয়া শুরু করেছিলেন। চার-পাঁচ মাসের মধ্যে জমজমাট হয়ে উঠেছিল তাঁর আখড়া। এবং ফলে মুসলমান যুবকদের দৌরাত্ম্যও কমে গিয়েছিল।'

শ্যামাকান্ত যোগ দিয়েছিলেন সার্কাসে; সেখানে তিনি দেখাতেন বাঘের খেলা। এ-ব্যাপারে তিনি এতই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন যে ইউরোপীয় সার্কাস দলগুলি তাঁকে দলে টানতে চাইত। শ্যামাকান্ত পরে নিজেই একটি সার্কাস খুলেছিলেন যেখানে ছিল দুটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার যাদের নিয়ে তিনি খেলা দেখাতেন। এভাবে সংসারের জন্য বেশ কিছু উপার্জন করে সাধু হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন জয়ানন্দ স্বামীর। চলে গিয়েছিলেন হৃষীকেশ, তবে বছরে একবার তিনি ঢাকায় আসতেন। আর পরেশনাথ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষকতা করে গিয়েছিলেন জুবিলী স্কুলে।

ঢাকার পূজা-পার্বণ ও উৎসব

মুসলমান আমলে ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের সদর দফতর। মুসলমানদের আগে, সেনরাজাদের সময়, গৌড় ছিল প্রধান নগর, ঢাকা ছিল দ্বিতীয়। ঢাকেশ্বরী মন্দির হিন্দু আমলের নিদর্শন।

হৃদয়নাথ যখন ঢাকেশ্বরী মন্দির দেখেছিলেন তখন তা ছিল ঘন জঙ্গলে আবৃত। হৃদয়নাথ অবশ্য সময় উল্লেখ করেন নি। তবে আমরা ধরে নিতে পারি খুব সম্ভব তা ছিল উনিশ শতকের সত্তর দশক। ঢাকেশ্বরীর দক্ষিণে ছিল উর্দু রোড যা পশ্চিমে পিলখানার দিকে চলে গিয়েছিল; উত্তর-পশ্চিমে ছিল মিরপুরে যাবার রাস্তা; উত্তরে ছিল জঙ্গল আর পুবে উর্দুবাজার।

ঢাকেশ্বরী মন্দির সম্পর্কে যে-কিংবদন্তী চালু ছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন হৃদয়নাথ এভাবে

একবার বল্লাল সেনের মা গিয়েছিলেন লাঙ্গলবন্ধে, স্নানে। ফেরার সময় জন্মেছিল তাঁর একটি পুত্রসন্তান। যিনি ইতিহাসে বল্লাল সেন নামে পরিচিত। বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণের পর নিজের জন্মস্থানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নির্মাণ করেছিলেন এই মন্দির। মন্দিরটি পঞ্চরত্ন, সামনে নাট মন্দির, নাট মন্দিরকে ঘিরে আছে এক সারি ঘর। আর আছে একটি বড় পুকুর, নহবতওয়ালা ফটক আগে যার ভেতর দিয়ে হাতি যেত। পুবে কিছু সাধুর সমাধি যারা একসময় মন্দিরে পূজা বা ধ্যান করতেন। মন্দিরের বাইরে আছে পাঁচটি মঠ, প্রতিটিতে একটি শিবলিঙ্গ। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত প্রতিদিন এর পূজা করেন। দেবী হলেন দশভুজা, কথিত তা নাকি সোনার তৈরি। দেবীর ডান-বাঁ দিকে আছে আরও কিছু মূর্তি। পুরানো আমলের আরও অনেক হিন্দু মন্দিরের মতো এর ভেতরটাও অন্ধকার, দেবী দর্শনের জন্য দিনের বেলাও জ্বালতে হয় আলো। মন্দিরের মালিক অনেক। এর কারণ, নতুন অনেক সেবায়েত পুরানো সেবায়েতদের কাছ থেকে মালিকানা কিনেছিলেন।

ঢাকেশ্বরীর পর স্থান হল রমনার কালীবাড়ির। রেসকোর্সের মাঝে অবস্থিত কালীবাড়ি, সামনে আছে এর বিরাট এক পুকুর। মনে হয়, রেসকোর্সের যে-চক্করটি আছে সেটি ছিল কালীবাড়ির সীমানা। মন্দিরের উত্তরে আছে একটি বাগান যা ভগ্ন জীর্ণ দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেবী মাটির তৈরি, প্রতি বছর এর সংস্কার করা হয়। কালীবাড়ির মঠটি বেশ বড়, অনেকগুলি ঘর মাটিতে দেবে গেছে। হয়ত এই ভূগর্ভস্থ ঘরগুলিতে পূজারী গিরি-পরিবার বাস করতেন। মাঠের পুবে ভোগ মন্দির চারদিক ঘেরা উঁচু দেয়ালে। বর্তমান গিরি এখানে বাস করেন। মঠের সামনে এক বিরাট নাট মন্দির, সংস্কারের অভাবে তা ভেঙে পড়ছিল। ১৮৯৬ সালে ভূমিকম্পের পর যখন মন্দির সংস্কারের প্রয়োজন পড়েছিল তখন শহুরে ভদ্রলোকদের চাঁদায় আবার নির্মিত হয়েছিল নাট মন্দিরটি। চাঁদার বেশির ভাগ জুগিয়েছিলেন ধানকোড়ার দিনেশচন্দ্র রায়চৌধুরী।

কিংবদন্তী অনুযায়ী, হিমালয়ে কালীর তপস্যা করতেন ব্রহ্মানন্দ গিরি। হঠাৎ একদিন তিনি দৈববাণী শুনলেন যে, এখনও ভারী পাথর নিয়ে যদি তিনি বার বছর

দেবীর নির্দেশে ঘুরে বেড়াতে পারেন তাহলে দেবী তাঁকে দর্শন দেবেন। ব্রহ্মানন্দ মাথায় ভারী পাথর নিয়ে হিমালয় ছেড়ে সমতলে মেনে এলেন এবং বার বছর পর দেবীর নির্দেশে পাথরটি এখানে (অর্থাৎ রমনায়) ফেলেছিলেন। পাথরটি ফেলামাত্র দেবী তাকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, এখানে যদি একটি কালীমন্দির নির্মাণ করা হয় তাহলে ব্রহ্মানন্দ যখন চাইবেন দেবী তখনই তাঁকে দর্শন দেবেন। ব্রহ্মানন্দ গিরি তখন কুচবিহারের রাজার সাহায্যে বর্তমান মঠ ও মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মহারাজ মন্দিরের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য বেশ কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়েছিলেন যা বর্তমান গিরিরা ভোগ করছেন। রমনার কালীবাড়ির গিরি প্রতিবছর দুর্গাপূজার সময় ঢাকেশ্বরী মন্দিরের একদিনের রোজগার (বা প্রণামী) পান। সেই প্রস্তরখণ্ডটি এখনও আছে মন্দিরের সামনে যা গিরিরা তীর্থযাত্রীদের দেখান।

এরপর বলতে হয় রেসকোর্সের উত্তর-পুবে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের কথা। বর্তমান গভর্নমেন্ট হাউস (পুরানো হাইকোর্ট ভবন) থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত এ-মন্দির। হৃদয়নাথ মন্দিরটি প্রথম যখন দেখেছিলেন তখন তা ছিল জঙ্গলে ঢাকা। তারা সেখানে যেতে ভয় পেতেন। সিদ্ধেশ্বরীর জঙ্গলে বাস করত কিছু কাঠুরে, অদূরে ছিল একটি গ্রাম। মন্দিরে আছে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মূর্তি। মন্দির সব সময় তালা দেয়া থাকে। শুধু সকাল এগারটায় পূজারী যখন পূজা করতে আসেন তখন তা খোলা হয়। তখন সরকার জঙ্গল সাফ করছেন এবং পুরানো ঢাকা ত্যাগ করে কিছু ইংরেজ বাড়ি তৈরি করেছেন সেখানে।

রেসকোর্সের পশ্চিমে, নবাব আবদুল গনির শাহবাগের দেয়াল ঘেঁষে আছে শিখদের মন্দির নানকপন্থী আখড়া। মন্দিরটি জীর্ণ, এর ভেতরে আছে বেশ বড়সড় একটি কুয়ো যার পানি সুস্বাদু। দু-তিনজন সাধু নীরবে বসবাস করেন সেখানে। 'গ্রন্থজী' নামে প্রাচীন একটি বই ছাড়া সেখানে দেখার আর কিছুই নেই।

পোলো গ্রাউন্ডের পশ্চিমে (রেসকোর্স) পুরানো লাইনে আছে একটি মসজিদ যা কয়েক-শ বছরের পুরানো। কয়েকজন ফকির বসবাস করেন সেখানে, উপাসনা করেন। প্রধান ফকির যিনি উপাসনা (নামাজ) পরিচালনা করেন তাঁকে বলা হয় শাহ্-সাহেব।

ঠাটারিবাজারের রামসীতার আখড়া বেশ পুরানো। সুসংয়ের মহারাজ তৈরি করিতেছিলেন এ-মন্দির। এর কাছেই আছে একটি পাকা বাড়ি। পুরানো আমলে, নবাবের সঙ্গে দেখা করতে এলে নাকি মহারাজ সেখানে উঠতেন। হাতি বিক্রি মহারাজের একটি ভালো ব্যবসা ছিল।

এরপরেই স্থান রাজাবাবুর লক্ষ্মীনারায়ণজির। পাতলা খান গলির উত্তরে আছে ভিখন ঠাকুরের বাজার। ভিখন ঠাকুর এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে। রাজাবাবু তাঁর ছেলে এবং মন্দিরের আসল সেবায়েত। ভিখন ঠাকুর দেবীকে পেয়েছিলেন স্বপ্নদিষ্ট হয়ে এবং দেবী উদ্ধারের পর তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের বাসায়। এরপরই ভিখন ঠাকুরের ব্যবসা-বাণিজ্য ফুলে-ফেঁপে ওঠে এবং প্রচুর সম্পত্তির মালিক হন তিনি। ভিখন ঠাকুর কিন্তু মৃত্যুর আগে সব উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন দেবীকে এবং তার

উত্তরাধিকারীদের করে গিয়েছিলেন সেবায়েত। তাঁর ছেলেই ঢাকার বিখ্যাত রাজাবাবু যিনি ছিলেন ঐ আমলে ঢাকার গানবাজনার 'রাজা'। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত তবলচি আতা হুসেনের পিতা হুসেন বক্সের শিষ্য ছিলেন রাজাবাবু।

নবাবপুরের লক্ষ্মীনারায়ণজি বোধ হয় ভিখন ঠাকুরের লক্ষ্মীনারায়ণজি থেকেও পুরানো। নবাব নওয়াজিশ মোহম্মদের আমল থেকেই তা আছে। কে কখন এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জানা যায় নি। তবে বলা হয়ে থাকে, নবাবপুরের ধরণীনাথ ও প্রিয়নাথ বসাকের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ধনাঢ্য, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ফরাসিদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল তাঁদের। তাঁরাই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেবোত্তর এই মন্দিরটি এখন জনগণের সম্পত্তি। একটি পঞ্চায়েত এর দেখাশোনা করে। মন্দিরের ব্যয় প্রধানত বহন করেন প্রিয়নাথ এবং ধরণীনাথ, তবে, সাধারণ মানুষও চাঁদা দেন। নবাবপুরের বিখ্যাত জন্মাষ্টমীর মিছিল শুরু হয় মন্দির থেকে।

চৌধুরীবাজারের রামবাগে আছে একটি মঠ ও একটি দরগাহ। দুটিই প্রাচীন প্রতিষ্ঠান কিন্তু এখন ক্ষয়ের পথে।

ঢাকেশ্বরীর উত্তর-পুবে নতুন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের কাছে অবস্থিত বুড়াশিবও পুরানো। কথিত আছে, ঢাকেশ্বরী ও কালীবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত এক সাধু এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হৃদযনাথ লিখেছেন, 'বর্তমানে [বিশ শতকের গোড়ার দিকে হয়ত] উকিল আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী [রায়?] শিবমন্দিরের পুবে জমি কিনে একটি শিবলিঙ্গ ও আনন্দময়ী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুর্গাপূজার সময় এটি শহরের একটি প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। শিবরাত্রির সময় বুড়াশিবকে ঘিরে মেলা বসে এবং সেখানে শহর থেকে তো বটেই আশেপাশের গ্রাম থেকেও লোক আসে।'

হৃদয়নাথ এরপর ঢাকার দুটি প্রধান উৎসব মহররম এবং জন্মাষ্টমীর মিছিল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এগুলি সম্পর্কে অন্যান্য অনেক জায়গায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে এবং হৃদয়নাথের বর্ণনার সঙ্গে সেগুলির অমিল নেই, তাই এখানে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না। বরং তিনি ঢাকার তৎকালীন আরও কয়েকটি হিন্দু উৎসবের আলোচনা করেছেন সেগুলি এখানে বর্ণিত হল।

এ-সব উৎসবের মধ্যে একটি ছিল হোলি যাতে হিন্দু-মুসলমান সমবেতভাবে সমান উৎসাহে যোগ দিতেন। প্রতি বছর দোলযাত্রার সময় রচিত হত হোলির গান, তবে বাংলায় নয়, উর্দুতে। এক বছর ভিখন ঠাকুরের বাজারে হোলির আসর বসলে, পরের বছর তা বসত উর্দুবাজারে লালাবাবুর বাড়ির সামনের ময়দানে। আসরটি হত অনেকটা কবিগানের মত, দল থাকত দুটি একটি রাজাবাবুর অপরটি উর্দুবাজারের বাবুর। আসরের মহড়া শুরু হত হোলির দু-সপ্তাহ আগে হোক। আসরের প্রশ্ন-উত্তর সবই হত উর্দুতে আসলে ঢাকার হাটে-বাজারের ভাষা ছিল তখন ভাঙা উর্দু ও বাংলার মিশ্রণ।

এ-ছাড়া আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হত ঝুলন ও বনবিহার। ঝুলনের সময়, শহরের ঠাকুরবাড়িগুলিতে তিনদিন ধরে চলত নাচ, গান, যাত্রা, কীর্তন ও সেতারের আসর।

তাঁতিবাজারের বাবু, রাজাবাবু, লালমোহন সাহা ও একরামপুরের ঠাকুরবাড়িগুলিতে এগুলির সঙ্গে থাকত বাঈ, খেমটা, ধোব এবং যাত্রা। শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার উৎসব জমত লালমোহন সাহার বাড়ির কাছে মৈশুণ্ডিতে।

ঢাকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উৎসবের বর্ণনার সঙ্গে, হৃদয়নাথ তৎকালীন ঢাকার নাগরিকদের বিনোদন সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য রেখে গেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ঢাকায় ঘুড়ি ওড়ানো ছিল খুব জনপ্রিয়। পৌষ সংক্রান্তি ও শ্রীপঞ্চমীতে দেখা যেত প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ির ছাদে বা ময়দানে ছেলে-বুড়ো মিলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

নবাব নওয়াজিশ মোহাম্মদের আমল থেকে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রচলন। আগে ধনীলোকেরা পরস্পরকে এ-ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ দিয়ে, পৌষের যে-কোন এক নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হতেন। দু-দলেই থাকত ডজন খানেক 'খলিফা'। 'খলিফা' হল যে ঘুড়ি তৈরি করে ও ওড়ানোর সময় খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য রাখে। চ্যালেঞ্জের খেলার সময় থাকতেন নিরপেক্ষ বিচারক। তবে, হৃদয়নাথ লিখেছেন, 'যখন প্রথম ঢাকায় আসি তখন এটা ছিল দারুণ জনপ্রিয়। এখন উচ্চশিক্ষার জন্য এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে।'

জনপ্রিয় ছিল ষাঁড়, বুলবুলি বা মোড়গ লড়াইও। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে এ-ধরনের বিনোদন বিলুপ্ত হয়েছিল।

ঢাকার আরেকটি প্রধান নাগরিক বিনোদন ঘোড়দৌড়ের কথা কিন্তু হৃদয়নাথ উল্লেখ করেন নি।

ঘোড়দৌড়েরও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নবাবপরিবার। নবাবপরিবারের ঘোড়ার সঙ্গে বাজি রেখে দৌড়াবার জন্য কলকাতা থেকে ঘোড়া আনা হত। এবং ঢাকাবাসীরা বিলক্ষণ এই দৌড় উপভোগ করতেন। এই প্রসঙ্গে '*ঢাকা প্রকাশ*'-এর একটি সংবাদ উদ্ধৃত করছি 'ঘোড়াদৌড় উপলক্ষে এবারও ঢাকার সমস্ত অফিস-আদালত বন্ধ হইয়াছিল। শনিবার একেবারেই বন্ধ, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার নামমাত্র কিছুকালের জন্য খোলা ছিল, কোন কার্য্য হয় নাই। মোকদ্দমা উপলক্ষে মফস্বলবাসীরা বহু অর্থ ব্যয়ে বহুদূর স্থান হইতে আসিয়া সহসা কাছারী বন্ধ দেখিয়া মনস্তাপে গভর্নমেন্টকে গালি দিতে দিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এরূপ অনিশ্চিতভাবে কাছারী বন্ধ না দিয়া যদি, 'হর্সরেস হলিডে' নামে একটা কাছারী বন্ধের ঘোষণা গভর্নমেন্ট প্রচার করেন, তবে লোকের বহু ক্ষতি নিবারণ হইতে পারে।'

ঢাকার গীতবাদ্য ও অভিনয়

ঢাকা শহর যে একসময় গীতবাদ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল তা আমরা অনেকেই হয়ত জানি না। হৃদয়নাথ তাঁর বইয়ে এ-সম্পর্কে কিছু তথ্য রেখে গেছেন।

লখনৌ শহর বিখ্যাত ছিল কণ্ঠসঙ্গীতের জন্য। আর তবলা ও সেতার বাদনের জন্য ঢাকা ছিল বিখ্যাত। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ঢাকার সেতার-বাদকরা এক নিজস্ব ঘরানার সৃষ্টি করেছিলেন। গর্বভরে লিখেছেন হৃদয়নাথ, ঢাকার তবলা ও সেতার বাদনের

অদ্ভুত স্টাইল ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না।

মুসলমান আমলে, নবাবদের দরবারে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে ওস্তাদরা আসতেন। ইংরেজরা বাংলায় আসার পর একশ বছর ধরে এই ধারা অব্যাহত ছিল। পৃষ্ঠপোষকতার আশায় ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে-সব ওস্তাদ আসতেন তাদের সহায়তা করতেন নবাবপরিবারের বংশধররা, মৌলবিবাজারের মোগল বংশোদ্ভূত জমিদার, নওয়াবপুরের ধনী বসাক পরিবার, বিশেষ করে রামকুমার বসাক এবং জমিদার রাজাবাবু। এ-ছাড়া আরও যাঁরা সাহায্য করতেন তাঁরা হলেন, ভাওয়ালের রাজপরিবার, কাশিমপুর বালিয়া ও পুবাইলের জমিদার। 'আমি যখন ঢাকায় আসি, তখন প্রায় প্রতিদিনই শুনতাম এখানে-সেখানে মহফিল হচ্ছে', লিখেছেন হৃদয়নাথ। ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ ভালো ধ্রুপদ খেয়াল ও লখনৌর গজল জানতেন। তাঁর গলা ছিল ভালো এবং কলকাতা থেকে কবিয়াল এলে তাদের সঙ্গে গাইতেন। তাঁর ছেলে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন প্রথম শ্রেণীর তবলাবাদক। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত তবলাবাদক আতা হুসেন, ঢাকার আমলিগোলার সুপ্পান খান এবং রাজাবাবু সবাই ছিলেন আতা হুসেনের পিতা হুসেন বক্সের শিষ্য। বসাকবাবুরা দক্ষ ছিলেন তবলা ও পাখোয়াজ বাজানোয়। এখানে বিশেষভাবে বলতে হয় রাজকুমার বসাক, কিশোরীমোহন বসাক ও আনন্দমোহন বসাকের কথা। এ-পরিবারের প্রসন্নকুমার বসাক, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের অতিথি হিসেবে থাকতেন আগরতলায়। মহারাজ নিজেও ছিলেন ধ্রুপদ ও খেয়ালে দক্ষ।

১৮৮০ সালে হৃদয়নাথ যখন কলেজ পাশ করে বেরিয়েছিলেন তখন বিখ্যাত ছিল হরিবাবু ও তাঁর ভাইপো রাধিকাবাবুর গান। টপ্পায় ছিলেন তাঁরা ওস্তাদ।

পেশাদার কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হুসেন খান, আলি আমজাদ খান, কাসিম আলি খান, কৃষ্টদাস সূত্রধর এবং হরিনাথ কর্মকার। 'হরিনাথের শিষ্য ইমদাদ খান এখনও জীবিত', লিখেছেন হৃদয়নাথ (বিশ শতকে), 'এবং ঢাকার ধ্রুপদ ও খেয়ালের রাজা হলেন তিনি।'

সেতারে বিখ্যাত ছিলেন ভগবান দাস বৈরাগী ও তাঁর ছোটভাই লক্ষ্মণ দাস বৈরাগী। কলকাতা, বেনারস ও বৃন্দাবনেও বিখ্যাত ছিলেন ভগবানচন্দ্র। এবং বছরে একবার বাড়তি রোজগারের আশায় তিনি যেতেন ঐ তিন শহরে। তাঁর অনুপস্থিতির সময়, ঢাকায় তাঁর শিষ্যদের দেখাশোনা করতেন লক্ষ্মণ দাস।

যাত্রার জন্যও বিখ্যাত ছিল ঢাকা। নবাবপুর, একরামপুর এবং সুত্রাপুরের সচ্ছল লোকেরা ছিলেন কীর্তনের ভক্ত। নবাবপুরের যাত্রা অনেকদিন থেকেই ছিল বিখ্যাত।

'সীতার বনবাস' ছিল ঢাকার প্রথম যাত্রা। এরপর একরামপুর থেকে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল 'স্বপ্নবিলাস' যা পুরো ঢাকা জেলা মাতিয়ে দিয়েছিল। 'স্বপ্নবিলাস' লিখেছিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। যদিও তিনি ছিলেন শান্তিপুরের কিন্তু আজীবন ছিলের ঢাকায়। মুড়াপাড়ার বাবুদের অর্থসাহায্যে 'স্বপ্নবিলাস' মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়েছিল। কৃষ্ণকমল এরপর লিখেছিলেন 'রাই উন্মাদিনী'ও 'বিচিত্র বিলাস'। দুটিই জনপ্রিয় হয়েছিল। এ-

যাত্রাগুলি এতই লোকপ্রিয় হয়েছিল যে, কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অভিনেতারা জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে এগুলি মঞ্চস্থ করেছিলেন।

নবাবপুরের বাবুদের সঙ্গে রেষারেষি ছিল সুত্রাপুর ও একরামপুরের বাবুদের। তাই একরামপুর ও সুত্রাপুরের বাবুরা মঞ্চস্থ করেছিলেন 'নারদ সম্বাদ' বা 'প্রভাস লীলা'। এটি লিখেছিলেন মৈশুণ্ডির গোবিন্দ চক্রবর্তী। রামকুমার বসাক এরপর মঞ্চস্থ করেছিলেন 'ধন কুণ্ড' ও 'নৌকা কুণ্ড' এবং 'ব্রহ্মার গীতা'। কিন্তু এগুলি জনপ্রিয় হয় নি। গোবিন্দ চক্রবর্তী তারপর কৃষ্ণকমল গোস্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে লিখেছিলেন 'কুণ্ডেশ্বরী মিলন'। কিন্তু আগেরগুলির মতো এটাও জনপ্রিয় হয় নি।

ঢাকার শেষ এ্যামেচার যাত্রা ছিল 'কোকিল সংবাদ'। শুভড্যার কয়েকজন ভদ্রলোক মিলে করেছিলেন এটি। গ্রামে ও শহরে একবছর ধরে চলেছিল 'কোকিল সংবাদ'। তবু বলতে হয় কৃষ্ণকমলের যাত্রার মতো ঢাকায় আর কোন যাত্রা জনপ্রিয় হয় নি।

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে হৃদয়নাথ ঢাকার থিয়েটার সম্পর্কে কিছু লেখেন নি। উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকায় থিয়েটার ছিল নাগরিকদের একটি প্রধান বিনোদন। শুধু তাই নয় পেশাদার থিয়েটারও চালু ছিল ঢাকায়। আর টিকেট কিনে থিয়েটার দেখা ছিল সাধারণ ব্যাপার। এ-সম্পর্কে ১৮৯১ সালের *ঢাকা প্রকাশ* থেকে একটি সংবাদের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে

'ঢাকায় স্থায়ীভাবে আমোদ-আহলাদের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। কিন্তু কতদিন হইতে নবাবপুরে অত্রত্য জজকোর্টের পেস্কার বাবু কৃষ্ণকিশোর বসাকের ঐকান্তিক যত্নে একটি নাট্যসমাজ গঠিত হইয়া সাধারণ্যে নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্বে ইহারা বিনামূল্যে ভদ্রলোকদিগকে অভিনয় দেখাইতেন, কিন্তু তাহাতে সাধারণের ইচ্ছানুসারে দেখা যাইত না। এখন রীতিমত টিকিটের মূল্য গ্রহণ করাতে যার যেদিন সুবিধা সেদিনই সে দেখিতে পারিতেছে...

সঙ্গীতের পুরানো পীঠস্থান হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকায় ছিলেন বেশ কিছু বাঈজি যারা কলকাতার বাঈজিদের থেকেও ছিলেন দক্ষ। কণ্ঠসঙ্গীতের ওস্তাদ হুসেন মিয়া অনেক বাঈজিকে তালিম দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে ঢাকার বাঈজিদের নিয়ে যাওয়া হত। ঢাকার বিখ্যাত বাঈজিদের মধ্যে ছিলেন আমীরজান, অটল, গুন্নু, রাজলক্ষ্মী, ইমামী প্রমুখ। কালী বাঈজি ছিলেন ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারিণীশংকর রায়চৌধুরীর শিষ্যা। বলতে গেলে তারিণীবাবুই কালীকে বিখ্যাত হতে সাহায্য করেছিলেন। জিন্দাবাহারের রাজলক্ষ্মীর বাড়ি ছিল পাঁচ-ছটি। সঙ্গীতশিল্পীর চাইতেও সাধু স্বভাবের জন্য তিনি ছিলেন বিশেষভাবে পরিচিত। ১৮৮৬ সালে ভূমিকম্পের পর জিন্দাবাহারের কালীবাড়ি ভেঙে গেলে তিনি তা তৈরি করে দিয়েছিলেন। রমনার কালীবাড়ি সংস্কারের জন্যও তিনি চাঁদা দিয়েছিলেন মোটা রকমের।

বাঈজিদের অনেকে হেয় চোখে দেখলেও মানবিক গুণের ঘাটতি ছিল না তাঁদের। এখানে এ-প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। অবশ্য হৃদয়নাথ এটি উল্লেখ করেন নি।

সত্তর দশকের আগে ঢাকায় নদী ও পাতকুয়োর পানিই ছিল খাবার পানির উৎস। এই দূষিত পানি শহরে অহরহ মহামারীর সৃষ্টি করত। ১৮৭৪ সালে নবাব আবদুল গনি ঢাকায় কীভাবে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা যেতে পারে সে-নিয়ে আলোচনার জন্য একটি বৈঠক ডেকেছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ, জমিদার রাজাবাবু, কাশিমপুর, পানিয়া ও পুবাইলের জমিদার, রাজকুমার বসাক ও রূপলাল দাস এবং দু-জন বাঈজি রাজলক্ষ্মী ও আমীরজান। নবাব বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য সবাইকে কিছু দান করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ-আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন মাত্র দু-জন আমীরজান ও রাজলক্ষ্মী। তাঁরা পাঁচশ টাকা করে দান করতে রাজি হয়েছিলেন। নবাব অবশ্য পরে কারও কাছ থেকে টাকা না নিয়ে নিজেই দান করেছিলেন এক লক্ষ টাকা।

ঢাকার ধর্মীয় জীবন

ঢাকা শহরের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কেও বিবরণ রেখে গেছেন হৃদয়নাথ। অবশ্য এ-বিবরণ সীমিত হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যে।

'ঢাকা মূলত একটি বৈষ্ণব শহর', হিন্দু ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই লিখেছিলেন হৃদয়নাথ এ-কথা। শহরের হিন্দু মহল্লার প্রায় প্রতিটি সচ্ছল ঘরে ছিল রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। পুবে নবাবপুর, ঠাটারিবাজার, কলতাবাজার, লক্ষ্মীবাজার, বনগাঁ, মৈশুণ্ডি, নারিন্দা, একরামপুর, সুত্রাপুর, ফরাশগঞ্জ, সবজিমহল, বৈরাগীটোলা, বাংলাবাজার, ভিখন ঠাকুরের বাজার, শাঁখারিবাজার, তাঁতিবাজার, গোয়ালনগর এবং পশ্চিমে আমলিগোলা, চান্নিঘাট, উর্দুবাজার, চৌধুরীবাজার, রায়েরবাজার, কাঁসারহাট থেকে প্রতিদিন সকাল-বিকাল আধঘণ্টা ধরে শোনা যেতে শাঁখ আর ঘণ্টার শব্দ। এ-সব মহল্লায় বসবাস করত হিন্দুরা এবং তারা ছিল শহরের পুরানো বাসিন্দা। তবে, হৃদয়নাথের মতে, শহরের আদি বাসিন্দা হল শাঁখারি এবং বসাকরা। তারা মনেপ্রাণে একেবারে বৈষ্ণব, বিশেষ করে শাঁখারিবাজার বিকেল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত মুখরিত থাকত খোল-করতালের শব্দে। নবাবপুরের অবস্থাও ছিল একই রকম। তবে শহরের আদি বাসিন্দারা বৈষ্ণব হলেও কালী ও দুর্গারও ভক্ত ছিল তারা। এ-অদ্ভুত অবস্থা বোধ হয় বিদ্যমান ছিল শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই।

গ্রাম ও অন্যান্য জেলার শিক্ষিতরাই তৈরি করেছিল শহরের এলিট শ্রেণী। এদের মধ্যে 'সেন্টিমেন্টাল' অংশটি ছিল ব্রাহ্মরা, লিখেছেন হৃদয়নাথ। ষাটের দশকে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর শিষ্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় পদার্পণ করলে হিন্দু ছাত্ররা ব্রাহ্ম হতে থাকে। কেশববাবুর বক্তৃতা, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় তাঁর দখল ছাত্রদের আকৃষ্ট করে তুলেছিল ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি। বিজয়কৃষ্ণ ছাত্রদের ব্রাহ্ম মতে প্রভাবিত করার জন্য নিয়মিত যেতেন তাদের মেসে। ঐ সময় বেশ কিছুদিন শুধু অবুঝ ছাত্রই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নরাও পিতামাতাকে ত্যাগ করে গ্রহণ করেছিল ব্রাহ্ম ধর্ম। কলকাতার

মতো ঢাকায়ও ছিল আশ্রম যেখানে হিন্দু বিধবাদের 'ছিনিয়ে' আনা হত তাদের ভিটেমাটি থেকে ব্রাহ্ম যুবকদের বিয়ে করার জন্য। হৃদয়নাথের উল্লিখিত মন্তব্য অবশ্য সত্য নয়।

হৃদয়নাথের বন্ধু ছিলেন তৎকালীন ঢাকার এক বিশিষ্ট নাগরিক কুঞ্জলাল নাগ। হৃদয়নাথ স্মৃতিকাহিনীতে তাঁর জন্য বেশ কয়েক পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন।

কুঞ্জলাল ছিলেন ঢাকারই ছেলে। কলকাতা থেকে এম. এ. পাশ করার পর ঢাকায় এসেছিলেন জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে। তিনি ছিলেন ঢাকার একজন প্রগতিশীল ব্রাহ্ম। হিন্দু রক্ষণশীলরা ঐ সময় ব্রাহ্ম মতবাদকে রোধ করার জন্য কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত কালিবর বেদান্তবাগীশ প্রমুখকে বক্তৃতা করানোর জন্য। একদিন জগন্নাথ হলে কুঞ্জলাল হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দানকালে ব্রাহ্মরা কুঞ্জলালকে ঠিক করে রেখেছিলেন এঁদের বিপরীতে বক্তৃতা দেয়ার জন্য। একদিন জগন্নাথ কলেজে কুঞ্জলাল হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দানকালে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠেছিলেন, হিন্দু ধর্ম ও পৌত্তলিকতাকে এভাবে গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে, বলে মঞ্চে পা ঠুকে কায়দাটি দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ঐ সময় মঞ্চের কাঠের পাটাতন হঠাৎ সরে গিয়েছিল এবং কুঞ্জলাল বিশ্রীভাবে পড়ে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। কয়েক মাস শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল তাঁকে। অনেকে কুঞ্জলালকে বলেছিলেন এটি দৈব ঘটনা। কুঞ্জলালও এটি বিশ্বাস করে ক্রমে পরিণত হয়েছিলেন আবার রক্ষণশীল হিন্দুতে। কিন্তু হৃদয়নাথ কুঞ্জলাল সম্পর্কে একটি তথ্য উল্লেখ করতে বোধ হয় ভুলে গেছেন। তা হল উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকা থিয়েটারের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন কুঞ্জলাল। ঢাকার বিখ্যাত গ্রুপ থিয়েটার 'ইলিশিয়াম থিয়েটারে'র তিনি ছিলেন একজন পরিচালক, নাট্যকারও।

বিজয়কৃষ্ণও পরে হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন। ঢাকার হিন্দু ভদ্রলোকেরা চাঁদা তুলে তাঁকে একটি আশ্রম করে দিয়েছিলেন গেন্ডারিয়ায়। সেখানে কিছুদিন বসবাস করার পর তিনি চলে গিয়েছিলেন পুরী এবং পরলোকগমন করেছিলেন সেখানে।

হৃদয়নাথ লিখেছিলেন, উনিশ শতকের শেষার্ধের কথা স্মরণ করে, 'কুঞ্জলাল ও বিজয়কৃষ্ণ হিন্দু হয়ে গেলে ব্রাহ্মরা হয়ে পড়েছিল নির্জীব। এখন তারা শান্ত ভেড়ার মতো।'

ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেলে তীব্র হয়ে উঠেছিল হিন্দু পুনর্জাগরণ। এর একজন প্রবক্তা ছিলেন নারায়ণগঞ্জের কাছে বারদির প্রভু লোকনাথ ব্রহ্মচারী। ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রায়ই যেতেন তাঁর আশ্রমে, বিশেষ করে শনি ও রোববার। শক্তি ঔষধালয়ের মথুরামোহন চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য এবং কথিত আছে, মথুরামোহনকে নাকি তিনিই উপদেশ দিয়েছিলেন আয়ুর্বেদীয় ঔষধের ব্যবসা করতে।

'এরপর নাম করতে হয়', লিখেছেন হৃদয়নাথ, 'স্বামীবাগের স্বামীজি ত্রিপুরালিঙ্গ স্বামীর।' স্বামীজিটি একসময় বাবুবাজার পুলের কাছে একটি ডালের দোকানের সামনে বসে থাকতেন। দু-তিন বছর ছিলেন তিনি সেখানে। সরকারি উকিল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বুঝেছিলেন যে, তিনি যে-সে লোক নন। তাই ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে প্রথমে আর্মেনিটোলা

পরে আশেক লেনে একটি ভাড়া বাড়িতে রেখেছিলেন। তারপর স্বামীজিকে আশ্রয় দেয়া হয়েছিল বুড়াশিবের মন্দিরে। সবশেষে, স্বামীবাগে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজিকে রাখা হয়েছিল সেখানে সেবায়েত করে।

ঢাকার পণ্য

'রোম যখন গথ, হুন ও ইউরোপের অন্য বর্বরদের পদানত করছে', লিখেছেন হৃদয়নাথ, 'তখনও কিন্তু তারা জানত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বস্ত্র কোথায় উৎপাদিত হয়।' হৃদয়নাথ এখানে ঢাকার মসলিনের ইঙ্গিত করেছেন। অবশ্য তাঁর উক্তিটি আবেগজাত কারণে অতিরঞ্জিত। তবে ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি যে ছিল পৃথিবীজোড়া এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হৃদয়নাথ যখন এসেছিলেন ঢাকায় তখন প্রায় অবসান ঘটেছে মসলিনের গৌরবময় যুগের। এখানে-সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে হয়ত কিছু কারিগর তখনও মসলিন বুনতেন। ঐ সময়ের মসলিনের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন হৃদয়নাথ, আফগানিস্তান, ইরান, গ্রিস ও তুরস্কের ধনীদের সঙ্গে ঢাকার কারিগরদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। ইউরোপের মুসলমানদের পাগড়ির জন্য কাসিদা তখনও রপ্তানি হত ঢাকা থেকে। এবং তখনও নবাবপুরের ধরণীনাথ বসাক ও তাঁর ভাইয়ের বেশ ভালো মসলিনের ব্যবসা ছিল। মসলিনের কারিগররা বাস করতেন নবাবপুর, তাঁতিবাজার, কলতাবাজার, ডেমরা, ধামরাই এবং বালিয়াটিতে। আর এঁদের তৈরি মসলিন বিশেষভাবে শুধু ধুতে পারতেন নারিন্দার ধোপারা।

শাঁখারিবাজারের শাঁখারিরা বাংলার হিন্দুদের সরবরাহ করতেন শাঁখা। ধনাঢ্য শাঁখারিরা শঙ্খ কিনে আনতেন সিংহল থেকে। এ-ছাড়া সমুদ্রের যে-সব অংশে শঙ্খ পাওয়া যেত সরকার সেগুলি লিজ দিতেন। যারা লিজ নিতেন তারা জেলেদের সাহায্যে শঙ্খ উঠিয়ে বিক্রি করতেন মহাজনদের কাছে। মহাজনরা আবার শঙ্খ সরবরাহ করতেন ঢাকার শাঁখারিদের কাছে।

ঢাকার স্বর্ণকাররাও বিখ্যাত অনেকদিন থেকে। আস্তানা ছিল তাদের কামারনগরে। রূপোর জিনিস যারা তৈরি করতেন, বাস করতেন তারা ঠাটারিবাজার এবং বনগাঁও। ঠাটারিবাজারের কারিগরদের তৈরি রূপোর প্লেট এবং কাপ ছিল বিখ্যাত। এ-ছাড়া ঢাকার আতরদান ও গোলাপপাশ বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল।

চামড়ার ব্যবসাও বেশ প্রসার লাভ করেছিল ঢাকায়। নবাব আবদুল গনির বাবা আলি মিয়ার ছিল চামড়ার ঢালাও ব্যবসা। বলা যেতে পারে এই চামড়ার ব্যবসার ফলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল জমিদারি কেনা। আবদুল গনিও কিছুদিন চামড়ার ব্যবসা করে তা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর ঐ ব্যবসা চালিয়ে যান বাটু হাজি নামে জনৈক ভদ্রলোক।

মোষের শিংয়ের চিরুনি ও বোতাম তৈরির ব্যাপারে বেশ নামডাক আছে আমলিগোলার মুসলমানদের। প্রতিদিন এইসব জিনিসপত্র আমলিগোলা থেকে এনে

বিক্রি করা হত চকবাজারে।

আগেই উল্লেখ করেছি ঢাকা বিখ্যাত ছিল সেতারের জন্য। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বিশ শতকের গোড়ার দিকেও ঢাকায় দশ-বারটি দোকান ছিল সেতার, এসরাজ ও বেহালার। সবচেয়ে নামকরা সেতার ও এসরাজ প্রস্তুতকারক ছিলেন শুকলাল মিস্ত্রি। তিনি অবশ্য ঢাকার লোক ছিলেন না; এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে কিন্তু পরে স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছিলেন ঢাকায়। শুকলাল মারা যাবার পর তার তৈরি করা সেতার বিক্রি হত চড়া দামে। শুকলালের ছেলে পুরুষোত্তমও নাম করেছিলেন এ-সময়। বিশ শতকে যখন হৃদয়নাথ স্মৃতিকথা লিখছেন তখন পুরুষোত্তমের ছেলে রামলাল বেঁচে ছিলেন। শুকলালের যারা সহকারী ছিলেন তারা প্রায় সবাই দোকান খুলেছিলেন। এদের মধ্যে বাবুরাম ও বদ্রিনাথের দোকান ছিল চকবাজারে আর বদন মিস্ত্রির দোকান ছিল কোতোয়ালির পাশে।

ঢাকার আইন আদালত

হৃদয়নাথ ছিলেন আইনজীবী। তাই তাঁর স্মৃতিকথায় ঢাকার বিভিন্ন আদালত সম্পর্কে ন্যাতিদীর্ঘ বিবরণ আছে যা ঢাকার উপর আর কোন আত্মজীবনীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। লিখেছেন তিনি, 'আমার স্মৃতিচারণা শেষ করব ঢাকার বিভিন্ন আদালতের বর্ণনা দিয়ে। কারণ এ-সব আদালতের সঙ্গেই কেটেছে আমার চল্লিশটি বছর।'

হৃদয়নাথ যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন সার্কিট জজ এবং আলা সদর আমিনের (পরবর্তী কালের সাবঅর্ডিনেট জজের সমতুল্য) আদালত ছিল ওয়াইজঘাট স্ট্রিটের একটি বড় অট্টালিকায়। 'ছেলেবেলায় আমি প্রায়ই ঢাকার সেশন জজের আদালতে যেতাম বিচার দেখতে যা ছিল বেশ ভালো তামাসা', লিখেছেন হৃদয়নাথ।

ফৌজদারি আদালত ছিল করোনেশন পার্কের পুবে একটি দোতলায়, আশির দশকে যেখানে বসত ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। ব্যাংক অব বেঙ্গলের পুবে যেখানে ছিল ইউরোপিয়ান ক্লাব এবং র‍্যাকেট কোর্ট, সেখানে বসত কমিশনারের আদালত।

ঢাকা কলেজের উত্তরে রায়সাহেবের বাজার পর্যন্ত ছিল নিচু জলাভূমি। এ জলাভূমি ভরাট করে তৈরি করা হয়েছিল জজ ও কালেকটরেট আদালত।

ঢাকার পুরানো জজদের মধ্যে সবাই ভয় করত ইনসপ্লাটকে। আদালতের সামনে দিয়ে বিয়ের বাজনা বাজিয়ে যাওয়া যাবে না— এ-নিয়ম তিনিই করেছিলেন।

ঢাকার পুরানো দিনের উকিলরা সওয়াল-জবাব করতেন হিন্দি উর্দু মিশিয়ে। বরদাশংকর রায়, চন্দ্রকুমার ঘোষ, চন্দ্রকুমার সেন প্রমুখ ছিলেন নামকরা পুরানো উকিল। এঁরা সবসময় উর্দুতেই সওয়াল-জবাব করতেন। কিন্তু আশির দশক থেকে হৃদয়নাথের মত বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা নতুন যুবকরা আদালতে এসে চালু করেছিলেন ইংরেজি। তাদের যুক্তি-তর্ক জজরা ভালোভাবে বুঝতে পারতেন। ফলে নতুনদের পসার ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এ-ছাড়াও, পুরানোদের পসার হারিয়ে ফেলার আরেকটি কারণ ছিল তারা কখনও রেকর্ডপত্র, আইনের বই বা রিপোর্ট দেখতেন না। প্রতিপক্ষকে নানারকম কথা বলে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করতেন শুধু। নতুনদের ভিত্তি ছিল আইনের বই, রিপোর্ট প্রভৃতি। ফলে খুব শিগগিরই জায়গা করে নিয়েছিলেন নতুনরা এবং এদের পসার-প্রতিপত্তি কম ছিল না। এ-ধরনের কয়েকজন বিখ্যাত উকিল ছিলেন— আনন্দচন্দ্র রায়, রমাকান্ত নন্দী, উপেন্দ্রলাল মিত্র, রোহিণীকুমার বসাক এবং রজনীকান্ত চৌধুরী।

বার লাইব্রেরি আগে ছিল ডিস্ট্রিকট জজের আদালতে। হৃদয়নাথ যখন ১৮৮৪ সালে আদালতে মাত্র পা দিয়েছেন উকিল হিসেবে, তখন বারে উকিলের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ। বই ও উকিলদের জায়গা হত না বার লাইব্রেরিতে। সেখান থেকে বাধ্য হয়ে লাইব্রেরি সরিয়ে নেয়া হয়েছিল নাজিরের বসার জায়গায়। এরপর জজ কোর্টের পশ্চিমে একটি বাড়ি ভাড়া করে গড়ে তোলা হয়েছিল স্বাধীন বার লাইব্রেরি। বিক্রমপুরের পাইকপাড়ার বাবুরা ছিলেন এর মালিক। তাদের কাছ থেকে এটি কিনে নিয়ে, আনন্দচন্দ্র রায়ের সাহায্যে এখানে গড়ে তোলা হয়েছিল প্রশস্ত একটি বার লাইব্রেরি।

কমিশনারের বাড়ি ছিল তখন সদরঘাটের পশ্চিমে। এর আগে এটি ব্যবহৃত হত সরকারি টেলিগ্রাম অফিস হিসেবে।

হৃদয়নাথ ঢাকা শহরে ১৮৮৫ সালের টর্নেডো ও ১৮৯৮ সালের ভূমিকম্পের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাহুল্য ভেবে এখানে তা উল্লেখ করা হল না।

সংক্ষেপে এই ছিল হৃদয়নাথের ঢাকা শহর। মধ্যশ্রেণীর একজন সদস্য হিসেবে তিনি যা দেখেছেন, যা তাঁর কাছে কৌতূহলজনক ঠেকেছে তাই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। গ্রন্থের অনেক জায়গায় তিনি খেই হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু বইটির প্রধান গুণ, যা সচরাচর অন্যান্য স্মৃতিকথায় অনুপস্থিত, তা হল, হৃদয়নাথ খুব কম জায়গায়ই নিজের কথা উল্লেখ করেছেন। নিজেকে আড়াল করে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন তৎকালীন ঢাকা শহর, সমাজ সম্পর্কে এবং এর কিছু কিছু তথ্যের জন্য পাঠক ও গবেষকদের নিশ্চয় এ-গ্রন্থ কৌতূহলী করবে।

তথ্য নির্দেশ

Majumdar, Hridaynath, *Reminiscences of Dacca*, Calcutta, 1926.

আদিনাথ সেন, *স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ*, কলকাতা, ১৯৪৮।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ : ঢাকায়

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ, ব্যারাকপুরে মঙ্গল পান্ডে নামে এক ভারতীয় সৈনিক কর্তৃক জনৈক ইংরেজ অফিসারকে হত্যার মাধ্যমে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সূত্রপাত। কিন্তু প্রবল ও ব্যাপক আকারে প্রথম তা ছড়িয়ে পড়েছিল মিরাটে ১০ মে এবং এরপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে। পূর্ববঙ্গ ছিল বিদ্রোহের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে কিন্তু এখানেও এর রেশ এসে পৌঁছেছিল। এখন আলোচনা করব তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকায় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ কীভাবে হয়েছিল এবং কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।

১৮৫৭ সালের মার্চ মাস থেকেই সাধারণ মানুষ আশঙ্কা করেছিল বিদ্রোহের। ঢাকায় দেশী সিপাহিদের সংখ্যা ছিল প্রায় দু-শ এবং নেতৃত্বহীন দু-শ লোক পুরো শহরবাসীর বিরুদ্ধে কী করতে পারে— এ-ধরনের প্রশ্ন তুলে অনেকেই বলেছিলেন, শহরের বাসিন্দা এবং সিপাহিরা দু-পক্ষই পরস্পরকে ভয় করছেন। কারণ, সিপাহিদের সঙ্গে নাকি শহরবাসীর সম্পর্ক ভালো ছিলো না। অন্য আরেকটি ভাষ্যে জানা যায়, দেশী সিপাহিরা থাকতেন তখন লালবাগে এবং তারা পরিচিত ছিলেন 'কালা সিপাহি' নামে। ইংরেজ সিপাহিদের বলা হত 'গোরা সিপাহি'। কালা সিপাহিরা ছিলেন শক্ত সমর্থ, অমায়িক এবং এ-জন্য শহরের মুসলমানদের মধ্যে তারা খুব জনপ্রিয় ছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, তারা কি তাহলে হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন না? এখানে মনে রাখা দরকার উক্তিটি হৃদয়নাথ মজুমদার নামে এক হিন্দু ভদ্রলোকের যিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মন্তব্যটি করেছিলেন যা ছিল কিনা কিছুটা সাম্প্রদায়িক। অবশ্য তিনি এ-কথা লেখেন নি যে, মুসলমান অধিবাসী ছাড়া তারা অন্যদের কাছে ছিলেন অপ্রিয়।

মনে হয়, ১৮৫৭ সালের গোড়া থেকেই বিভিন্ন ছোটখাট কারণে শহরের বাসিন্দাদের সঙ্গে সিপাহিদের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়েছিল এবং এ-সব ঘটনা ইন্ধন জোগাচ্ছিল উত্তেজনায়। যেমন, মার্চ মাসের শেষের দিকে এক ব্রাহ্মণ রুটিওয়ালাকে পেটানোর দায়ে জনৈক সিপাহিকে একশ রুপি জরিমানা করা হয়েছিল এবং অনাদায়ে দু-মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। আরেকটি খবরে জানা যায় তোপখানার প্রহরীদের প্ররোচিত করার প্রচেষ্টার দায়ে 'চৌত্রিশ নেটিভ ইনফ্যানট্রির'

দুজন সিপাহিকে দেয়া হয়েছিল চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

মে মাসে মিরাটের বিদ্রোহের সংবাদ এসে পৌঁছেছিল ঢাকায়। এ-সময় বাজারে ধর্মপ্রচারকালে সিপাহিদের পক্ষ থেকে মিশনারিদের কিছুটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 'বাংলাবাজার ফিমেল স্কুল'ও এ-সময় প্রায় ছাত্রীশূন্য হয়ে গিয়েছিল, কারণ গুজব রটেছিল যে সিপাহিরা স্ত্রীশিক্ষা পছন্দ করেন না। মে মাসের শেষে এবং জুন মাসের শুরুতে ৭৩-এর দুটি কোম্পানি জলপাইগুড়ি থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছিল বদলি হিসেবে। ১০ জুন ইউরোপীয় বাহিনী ঢাকায় আসতে পারে শুনে সিপাহিরা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। মে-জুন মাসের যে-দুটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হল, তা ঘটলেও, এখানে যে প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটেছে তা খানিকটা অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়। কারণ, ঘটনা দুটির যাঁরা উল্লেখ করেছেন তাঁরা ছিলেন ইংরেজ সমর্থক। তবে এটুকু বলা হয়, মে-জুন, এ-দুটি মাস ঢাকায় বিভিন্ন ধরনের গুজব ভদ্রলোকদের ভেসে বেড়াচ্ছিল যা ইংরেজদের আতঙ্কিত ও শহরের উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল।

১২ জুন, এ-ধরনের একটি গুজব ইংরেজদের কীভাবে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল নিচে তা উল্লেখ করছি।

ঐ দিন, দুপুর সাড়ে বারটায়, মিলব্যারাক থেকে এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিলেন। উত্তেজিতভাবে শহরের রাস্তায় ইংরেজ যাদের পেয়েছিলেন তাদের জানিয়েছিলেন, মে মাসের শুরুতে ৭৩-এর যে-দুটি কোম্পানি জলপাইগুড়ির পথে রওনা হয়েছিল, মাঝপথে তারা ব্যারাকপুরের ছাঁটাই-করা কিছু সিপাহির সঙ্গে একত্র হয়ে বিদ্রোহ করেছে এবং ঢাকায় ফিরে এসে লালবাগ দুর্গে অবস্থানরত দেশী সিপাহিদের সঙ্গে একত্র হয়ে বাজার লুট করেছে, মুক্তি দিয়েছে জেলবন্দিদের।

গুজব শুনে বেশ কিছুসংখ্যক ইউরোপিয়ান মিলিত হয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট কিনসের

ব্যাংকের চৌহদ্দি)। আর বুড়িগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে 'নেটিভ' শহরবাসী জমায়েত হয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করছিল পুরো ব্যাপারটা।

শহরের অবস্থাপন্ন বাসিন্দারা বসেছিলেন ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে। তবে বেশির ভাগ মানুষই ছুটাছুটি করছিলেন অকল্পনীয়ভাবে। এক গলি দিয়ে বেরিয়ে তারা ঢুকছিলেন আরেক গলিতে। মাটি খুঁড়ে অনেকে পুঁতে রাখছিলেন ধনসম্পদ। কিন্তু আশ্চর্য। দুষ্কৃতকারী বলে শহরে যারা খ্যাত ঐ সময়ে তারা কোন উৎপাত করে নি। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই হু হু করে বেড়ে গিয়েছিল জিনিসপত্রের দাম এবং সবাই মিলে কিনে নিয়েছিলেন খাদ্যদ্রব্যের শেষটুকু।

অবশ্য, পরে দেখা গিয়েছিল পুরো ব্যাপারটাই ভিত্তিহীন। কিন্তু পরদিনই ইউরোপীয় বাসিন্দারা একটি কমিটি অফ সেফটি গঠন করে কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছিলেন, শহরবাসী ভদ্রলোকেরা যেন গুজবে কান না দেন এবং কোন গুজব শুনলে যেন ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিটির সদস্যদের জানান। তারা তখন এর সত্যতা যাচাই করবেন। বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে ঢাকার খৃস্টানদের বলা হয়েছিল, বিপদে যেন তারা পরস্পরকে রক্ষা করেন। এবং এ-জন্য তাদের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত, শহরের একটি বাড়ি ঠিক করা যেখানে বিপদের সময় সবাই মিলে আশ্রয় নেয়া যাবে। প্রস্তাব করা হয়েছিল এই বলে যে, কমিশনারের বাড়িই এ-জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

১৮৫৭ সালের আগস্ট মাসে লেফটেনান্ট লুইসের অধীনে একশ নৌসেনা দুটি চৌদ্দ ইঞ্চি কামান নিয়ে, 'ক্যালকাটা'য় করে পৌঁছেছিলেন ঢাকায়। রতনলাল চক্রবর্তী সরকারি নথি উদ্ধৃত করে অবশ্য বলেছেন, লুইসের অধীনে ছিলেন দেড়শ নৌসেনা আর তারা ঢাকা এসে পৌঁছেছিলেন 'জেনোবিয়া' ও 'পাঞ্জাবে'। সেনা কমবেশি হতে পারে, জাহাজের নামের গরমিল থাকতে পারে, তবে মূল কথা হল ঢাকায় ইউরোপীয়দের রক্ষার্থে (বা ঢাকা রক্ষার্থে) পাঠানো হয়েছিল লুইসকে। লুইস সৈন্যদের নিয়ে আস্তানা গেড়েছিলেন, ব্যাপটিস্ট চার্চের উল্টোদিকে এক বাড়িতে। কুমারটুলির এলিসের বাড়িটি মাসিক আশি রুপিতে ভাড়া নেয়া হয়েছিল সেনা হাসপাতাল করার জন্য।

তবে যে-দিন নৌসেনাদের জাহাজ ভিড়েছিল সদরঘাটে সে-দিন বেশ কয়েকজন যুবক নদীর অপর তীরে সিপাহিদের পোশাক পরে কিছু লোককে পিটিয়েছিল। কেন? তার কারণ অবশ্য জানা যায় নি। ফলে সে-দিনও ফের দেখা দিয়েছিল উত্তেজনা। নিরাপদ আশ্রয় ভেবে অনেকে মূল্যবান জিনিসপত্র ফেলে দিয়েছিলেন কুয়োতে। নাজির ঐ যুবকদের গ্রেফতার করে তিন মাসের জন্য (মনে হয়) শ্রীঘরে পাঠিয়েছিলেন।

২৮ জুন, দুজন দলত্যাগীকে পুলিশ ধরেছিল শহরতলি থেকে। কিন্তু সিপাহিরা নাকি পুলিশের হাত থেকে তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। পরে দুটি কোম্পানিকেই প্যারেড করানো হয়েছিল। কিন্তু বরকন্দাজরা দোষীকে চিহ্নিত করতে পারে নি বা ভয়েই করে নি। অন্যদিকে, সিপাহিরা অভিযোগ জানিয়ে বলেছিলেন, পুলিশের জন্য

তারা শহরে আসতে পারছেন না।

এদিকে লে. লুইস প্রতিদিন তাঁর সেনাদল নিয়ে র‍্যাকেট কোর্ট আর ঢাকা কলেজের সামনে মহড়া দিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে কালেকটরিতেও চলছিল এই মহড়া। পাহারাদার সিপাহিরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এতে এবং মন্তব্য করেছিলেন– 'ইয়ে কেয়া ডর দেখলাতা?' বোঝা যাচ্ছে নৌসেনাদের উপস্থিতি পছন্দ করেন নি তারা। জুলাইর দু-তারিখে, ঢাকা সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ডওয়েল লালবাগে কামান বাসানোর জন্য স্ক্রুর খোঁজে পাঠিয়েছিলেন। সিপাহিরা এতে ধারণা করেছিলেন যে, তাদের বোধ হয় নিরস্ত্র করা হবে।

৩০ জুলাই, ঢাকায় বসবাসরত অধিকাংশ ইউরোপীয়কে (প্রায় ষাট জন) নিয়ে একটি সভা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা। সভায় ঠিক হয়েছিল, দু-ধরনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হবে— পদাতিক এবং ঘোড়সওয়ার। মেজর স্মিথ এবং মি. হিচিন্স যথাক্রমে অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন পদাতিক এবং ঘোড়সওয়ার বাহিনীর।

বকরি ঈদের তিন দিন (আগস্ট ১-৩) সারারাত স্বেচ্ছাসেবকরা টহল দিয়ে বেড়িয়েছিল শহরে, কারণ তারা ভেবেছিল ঈদ উপলক্ষে হয়ত ঝামেলা হতে পারে। শুধু তাই নয়, ইউরোপীয়রা এত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, আগস্টের দু-তারিখে গির্জায় যারা উপাসনা করতে গিয়েছিলেন, কাল্পনিক হামলা থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

পরের সপ্তাহে, অনেক আর্মেনিয়ান শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়। ইউরোপীয়রা চিন্তা করছিলেন ফলির মিল দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য করার। সেচ্ছাসেবকরা তখনও নিয়মিত ড্রিল করছিল উদ্দীপ্ত হয়ে। 'নেটিভ'রা কিন্তু বুঝতে পারছিল না, 'সাহেব'রা কেন এত উত্তেজিত বা স্বেচ্ছাসেবকরাও এত কষ্ট করে কেন রাতে টহল দিচ্ছে।

আগস্টের বার তারিখে, ঢাকার খৃস্টান অর্থাৎ ইংরেজদের তরফ থেকে আলেকজান্ডার ফর্বেস (যিনি ছিলেন আবার *ঢাকা নিউজের*ও সম্পাদক) কমিশনারের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, বিপদ হলে খৃস্টানরা যাতে ফলির মিলে আশ্রয় নিতে পারেন সে-জন্য মিলটিকে সজ্জিত করা প্রয়োজন এবং এ-জন্য দরকার আর্থিক সাহায্য। ফর্বেস হুমকির সুরে জানিয়েছিলেন, ঝামেলা হলে খৃস্টানরা যদি শহর ত্যাগ করে তবে রাজস্বের অনেক ক্ষতি হবে। উত্তরে কমিশনার ডেভিডসন জানিয়েছিলেন, এ-রকম কাজে অর্থ বরাদ্দ করার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই।

শহরবাসী ইংরেজরা অবশ্য এতে দমে যান নি। নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে তারা ফলির মিল সংরক্ষিত করার কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। দু-শ লোককে নিয়োজিত করা হয়েছিল এ-জন্য। তারা আশা করছিলেন, কাজ শেষ হলে সেখান থেকে পাঁচ-ছ হাজার লোকের আক্রমণ ঠেকানো যাবে।

মহররম ছিল ২৯ আগস্ট। এ-দিনও শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় ঘোড়সওয়ার বাহিনী

টহল দিয়েছিল সারারাত। তবে উৎসবের প্রধান কেন্দ্র হোসেনি দালানে ভিড় হয় নি অন্যান্য বারের মতো। অনেকের মতে, মুসলমানরা ভীত হয়ে পড়েছিলেন খানিকটা।

১৭ সেপ্টেম্বর একশ নাবিক নিয়ে একটি স্টিমার আসাম যাওয়ার পথে থেমেছিল ঢাকায়। তাদের মধ্যে নাকি ঝোঁক দেখা গিয়েছিল বিদ্রোহের। ঢাকা ছেড়ে আর অগ্রসর হতে তারা অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট কারনাক ও লে. লুইস তাদের বাধ্য করেছিলেন নতি স্বীকারে। গুলিভরা বন্দুক ও বেয়নেট দেখিয়ে লুইস তাদের কাবু করেছিলেন। উত্তেজনা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তার বিস্ফোরণ ও সমাপ্তি ঘটেছিল ২১ থেকে ২৬ নভেম্বরের মধ্যে।

২১ নভেম্বর গোয়েন্দাসূত্রে চাটগাঁর সিপাহিদের বিদ্রোহের খবর ঢাকায় পৌঁছলে লে. লুইস সামরিক ও বেসামরিক লোকদের এক বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ঢাকায় দেশী সিপাহিদের নিরস্ত্র করা হবে।

২২ নভেম্বর সকাল পাঁচটায় জড়ো হতে বলা হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবকদের (জায়গার নাম উল্লেখ করা হয় নি, তবে ঢাকা কলেজ হতে পারে)। ঠিক সময়ে কমিশনার, জজ, কিছু সিভিলিয়ান এবং কুড়ি জন স্বেচ্ছাসেবক মিলিত হয়েছিলেন। ভোরের আলো ফোটে নি তখনও।

লে. লুইস, লে. ইটিবিয়াস, লে. ডডওয়েল ও উইলিয়াম ম্যাকফারসন অগ্রসর হয়েছিলেন লালবাগের দিকে। একই সময়ে লে. রিভ. ফরবেস, হ্যারিস, স্বেচ্ছাসেবী নলেন পোগজ, স্যামুয়েল রবিনসন ও জন জারকাস রওনা হয়েছিলেন সরকারি কোষাগারের দিকে, প্রহরীদের নিরস্ত্র করার জন্য।

তোপখানায় তখন প্রহরা দিচ্ছিলেন জনা পনের সিপাহি। তাদের অনেকেই ঘুমাচ্ছিলেন তখন। ঘুম থেকে তুলে যখন তাদের নিরস্ত্র করা হচ্ছিল তখনই শোনা গিয়েছিল লালবাগ থেকে গুলিগোলার শব্দ। ইংরেজ স্বেচ্ছাসেবীরা হঠাৎ এই গুলিগোলার আওয়াজে খানিকটা হতচকিত হয়ে গেলে, তোপখানার প্রহরীরা সে-সুযোগে পালিয়েছিলেন।

নৌসেনারা লালবাগ পৌঁছে দেখেছিলেন, সিপাহিরা প্রস্তুত। তারা বোধ হয় আগেই খবর পেয়েছিলেন। প্রহরী গুলি ছুঁড়েছিলেন। ইংরেজ পক্ষে মারা গিয়েছিলেন একজন। অন্য সিপাহিরাও গুলি ছোঁড়া শুরু করেছিলেন। নৌসেনারা অগ্রসর হয়েছিলেন কেল্লার দক্ষিণ দিকের ভাঙা ফটক দিয়ে। এই ফটক রক্ষার জন্য দুর্গের ভেতর বিবি পরীর কবরের সামনে বসানো হয়েছিল কামান। নৌসেনারা ভেতরে প্রবেশ করামাত্র উড়ে এসেছিল এক ঝাঁক গুলি। লে. লুইস সৈন্যদের নিয়ে বাঁ দিকে দুর্গপ্রাচীরের উপরে উঠে বেয়নেট চার্জ করে পিছু হটিয়েছিলেন সিপাহিদের। সিপাহিরা আশ্রয় নিয়েছিলেন নিজেদের আস্তানায় কিন্তু ইংরেজ সৈন্যরা সেখান থেকে খুঁচিয়ে বের করেছিলেন তাদের। এ-সংঘর্ষে ইংরেজ পক্ষের নৌসেনা আর্থার মেয়ো 'সাহসিকতার' জন্য পরে পেয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া ক্রস। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, লালবাগের সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন একচল্লিশ জন সিপাহি ও তিনজন ইংরেজ নৌসেনা। সংঘর্ষের পর সিপাহিরা

কেল্লা ছেড়ে পালিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির দিকে। পালিয়ে যাবার সময় নদীতে ডুবে মারা গিয়েছিলেন আরও তিনজন সিপাহি।

লালবাগের সংঘর্ষ সম্পর্কে হৃদয়নাথ মজুমদার যে-বর্ণনা দিয়েছেন তা ইংরেজ ব্রেনান্ড থেকে একটু ভিন্ন। এবং সত্য বোধ হয় লুকিয়ে আছে এ-দুয়ের মাঝে।

হৃদয়নাথ লিখেছেন, ব্যাটালিয়নের কাপ্তান একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সুবাদারকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পেনশন নিয়ে তাদের চাকরি থেকে অবসর দিলে তারা তা মেনে নিতে রাজি আছে কি না। সুবাদার সময় চেয়েছিলেন তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করার জন্য।

কিন্তু ঐ রাতেই (২২ নভেম্বর) ইংরেজরা আক্রমণ করেছিলেন লালবাগ দুর্গ। সিপাহিরা এ-ধরনের কোন আক্রমণ আশা করেন নি। নিরুদ্বেগে ঘুমিয়েছিলেন তারা। গুলিবর্ষণের শব্দে বিমূঢ় হয়ে গেলেও বিপদ দেখে ত্বরিত তৈরি করে নিয়েছিলেন নিজেদের। তাদের প্রত্যেকের কাছে ছিল দশ রাউন্ড গুলি এবং তাই দিয়ে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন তারা। অস্ত্রাগারের চাবি ছিল সুবাদারের কাছে। সিপাহিরা তাঁকে অস্ত্রাগার খুলে দিতে অনুরোধ করলে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তিনি। সুবাদারের স্ত্রীও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন অনুরোধ জানিয়ে। সিপাহিরা এ-পর্যায়ে সুবাদারকে হত্যা করে চাবি ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা তখন প্রবল হয়ে উঠেছিলেন এবং অস্ত্রের অভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল সিপাহিদের।

রেবতীমোহন দাস নামে ঢাকাবাসী আরেকজনের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, ভোরে দুর্গ আক্রমণের সময় সিপাহিরা একেবারে তৈরি ছিলেন না। কারণ তখন তারা ব্যস্ত ছিলেন, 'প্রাতঃকৃত্যাদি' সমাপনে।

সম্প্রতি আরেকটি সূত্র থেকে নতুন কিছু তথ্য পেয়েছি। বংশানুক্রমিক শ্রুতির মারফত জানা গেছে এ-তথ্য। সূত্রটি হলেন জাতীয় একতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক সরদার আবদুল হালিম (আমাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন মকবুল এলাহী চৌধুরী)। সিপাহিদের সুবাদার ছিলেন সরদার আবদুল হালিমের দাদার বাবা। আবদুল হালিম এ-সম্পর্কে জেনেছেন তাঁর দাদির কাছ থেকে। তবে এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, রতনলাল চক্রবর্তী সিপাহিদের বিচার সম্পর্কিত যে-সব দলিলপত্র উদ্ধার করেছেন সেখানে হালিম-উল্লিখিত সুবাদারের নাম নেই। হতে পারে, সরদার হালিম নামটি ভুল জেনেছিলেন।

যা হোক আবদুল হালিমের ভাষ্য—

সুবাদার ছিলেন পাঠান, নাম ছিল তাঁর আমির হাবিবুল্লাহ খান। সস্ত্রীক থাকতেন তিনি পোস্তায়, লালবাগ কমিউনিটি সেন্টারের পেছনে, সুবাদার পোস্তা ও দুর্গ দু-জায়গায়ই থাকতেন প্রয়োজনানুযায়ী। হাবিবুল্লাহ খানের একমাত্র পুত্র আমিরউদ্দিনও থাকতেন পোস্তায়। অস্ত্রাগারের চাবি রাখতেন তিনি পোস্তায় স্ত্রীর কাছে (এ-তথ্যটুকু বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি। অস্ত্রাগারের চাবি নিশ্চয় সুবাদারকে সব সময় নিজের কাছে রাখতে হত)।

২১ নভেম্বর বিকেলে হাবিবুল্লাহ ফিরে গিয়েছিলেন স্ত্রীর কাছে পোস্তায় (খুব সম্ভব হৃদয়নাথ-বর্ণিত, ব্যাটালিয়নের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করার পর)। স্ত্রীকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বিয়ের মোহরানা এবং কিনে দিয়েছিলেন নিজের কাফনের কাপড়। স্ত্রী তাঁর এই আচরণে আবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এর কারণ (হাবিবুল্লাহ হয়ত তখন তাঁকে জানিয়েছিলেন, ইংরেজরা দেশী সিপাহিদের নিরস্ত্র করতে পারে এবং এ-প্রেক্ষিতে হয়ত তিনি আশঙ্কা করেছিলেন সংঘর্ষের)। সন্ধ্যার দিকে সুবাদার ফিরে গিয়েছিলেন দুর্গে।

সুবাদারের পাশের বাসায় থাকতেন ব্যবসায়ী জমিদার গনি মিয়া (পরবর্তী কালে নবাব আবদুল গনি)-র এক আত্মীয়া। হাবিবুল্লাহর স্ত্রীকে বিষণ্ন দেখে গনি মিয়ার আত্মীয়া কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং সুবাদারের স্ত্রীও সুবাদারের আশঙ্কার কারণ জানিয়েছিলেন। আত্মীয়াটি তৎক্ষণাৎ অতিরঞ্জিত করে সংবাদটি দিয়েছিলেন গনি মিয়াকে। গনি মিয়া জানিয়েছিলেন কমিশনারকে এবং কমিশনার ইংরেজ সেনাধ্যক্ষকে, যে-কারণে হয়ত ঐ দিন রাতেই ইংরেজরা দুর্গ আক্রমণের সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন।

ইংরেজরা দুর্গ আক্রমণ করলে সুবাদারের স্ত্রী খবর পেয়ে চাবি নিয়ে ছুটে এসেছিলেন দুর্গে (কিন্তু এটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কারণ, ঐ পরিবেশে চাবি হাতে একজন মহিলার দুর্গে আসা সম্ভব নয়। হৃদয়নাথ লিখেছেন, সুবাদারের স্ত্রী দুর্গে ছিলেন। তা হতেও পারে, কারণ, পরবর্তী কালে সুবাদারের স্ত্রীকেও ফাঁসি দেয়া হয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে তথ্য দুটি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়)। খুব সম্ভবত চাবি সুবাদারের কাছেই ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ত তিনি দোটানায় ভুগেছিলেন যার ফলে অস্ত্রাগার খোলা সম্ভব হয় নি এবং গোলাবারুদের অভাবে সিপাহিরা ইংরেজদের আক্রমণও প্রতিরোধ করতে পারেন নি।

যা-হোক, এ-সব তথ্য থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশী সিপাহিরা এ-ধরনের একটি ঘটনার জন্য হয়ত প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু এত শীঘ্রই যে তা ঘটবে তা হয়ত ভাবেন নি। ইংরেজরা বিনা প্ররোচনায়, অতি আতঙ্কের কারণে দুর্গ আক্রমণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন দেশী সিপাহিদের। গ্রেফতারকৃত কুড়িজন সিপাহির মধ্যে এগারজনকে (সুবাদারের পত্নীসহ) দেয়া হয়েছিল ফাঁসি ও বাকিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। যাঁদের ফাঁসি দেয়া হয়েছিল তাঁদের অনেককে দাফন করা হয়েছিল সলিমুল্লাহ এতিমখানার দক্ষিণে, যে-অঞ্চল এক সময় পরিচিত ছিল 'গোরে শহীদ মহল্লা' নামে। শহীদদের একজন বলেছিলেন তাঁর চিতাভস্ম যেন নদীতে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

গ্রেফতারকৃত সিপাহিদের ফাঁসি দেয়া হয়েছিল বর্তমান বাহাদুর শাহ্ পার্কে যা তখন পরিচিত ছিল আন্টাঘর ময়দান নামে। স্থানীয় ইংরেজি পত্রিকা *ঢাকা নিউজ*-এ এ-সব খবর ছাপা হয়েছিল বেশ ফলাও করে। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। 'বৃহস্পতিবার সকালে, ঠিক সাতটার সময় চারজন বিদ্রোহী, যাদের ধরা হয়েছিল রোববার অপরাহ্নে এবং জজ এবার কোম্বি যাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন, তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল গির্জার উল্টোদিকে ফাঁকা জায়গায় তৈরি ফাঁসিকাষ্ঠে। ফাঁসির মঞ্চের ডানদিকে

ছিল নাবিকরা, সামনের দিকে ছিল স্বেচ্ছাসেবী পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী। তিনজন বিদ্রোহী নিজেরাই গলায় দড়ি ঝুলিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন সাহসের সঙ্গে। চতুর্থ জন ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে ঝোলাবার জন্য দরকার হয়ে পড়েছিল সাহায্যের। তাদের আহত বন্ধুদের হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল এ-দৃশ্য দেখার জন্য যারা ছিল বিশ্বস্ত তারাও ছিল সেখানে, পুরো ব্যাপারটি সম্পন্ন হয়েছিল— 'উইথ দি আটমোস্টস ডিসেন্সি এন্ড ইন কমপ্লিট সাইলেন্স।'

'আরেকজন সিপাহিকে মঙ্গলবার সকাল সোয়া সাতটায় গির্জার উল্টোদিকে ঝোলানো হল, সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে আগের মতোই সুন্দর এবং স্বাভাবিকভাবে।'

সিপাহিদের বিচারের বর্ণনা দিয়েছেন ব্রেনান্ড খুব সাধারণভাবে যেন এটাই ছিল ভবিতব্য। যেমন ৩০ নভেম্বরের রোজনামচায়, তিনি লিখেছেন, 'তিনজন বিদ্রোহীকে ফাঁসি দেয়া হল আজ সকালে। আগে দেয়া হয়েছিল আট জনকে (সরকারি হিসেব মতে দশ জনকে)। আমরা মনে করি এ-সময় এ-ধরনের উদাহরণের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ-ধরনের উদাহরণ সাধারণ মানুষের উপর সৃষ্টি করবে চমৎকার প্রতিক্রিয়ার। এখন নেটিভরা যেমন ভদ্র, আগে মনে হয় না তাদের এমনটি দেখেছি।'

সামগ্রিকভাব, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের রূপ ছিল পূর্ববঙ্গে এ-রকমই। পূর্ববঙ্গ থেকে বিদ্রোহের প্রধান প্রধান ঘাঁটিগুলি ছিল দূরে,. কিন্তু ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল বা যশোরের মতো শহরে পৌঁছেছিল তার রেশ। কলকাতা বা ঢাকার মতো শহরে যদি খোলাখুলি বিদ্রোহ শুরু হত তাহলে উত্তর ভারতের মতো বাংলায় হয়ত তা ছড়িয়ে পড়ত। তখন, বাংলা সরকারের অধীনে এমন একটা জেলা ছিল না যা প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্য দিয়ে যায় নি কিংবা আশঙ্কা করে নি ঘোরতর বিপদের।

ঢাকার উল্লিখিত বিবরণও তা সমর্থন করে। পুরো পূর্ববঙ্গই তখন কাটিয়েছিল আতঙ্কে। প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছিলেন একমাত্র চট্টগ্রামের সিপাহিরা। ঢাকার সিপাহিরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন মাত্র। কিন্তু ইংরেজদের আতঙ্কের কারণে সেটাই হয়ে উঠেছিল অপরাধের বিষয়।

ঐ সময় জমিদাররা সামগ্রিকভাবে সাহায্য করেছিলেন ঔপনিবেশিক সরকারকে। ঢাকা বিভাগের কমিশনার জানিয়েছিলেন, তাঁর বিভাগের 'নেটিভ জমিদার' ও অন্যরা তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। যেমন, শিবজয় উজির, নাজিরুদ্দিন, মনোহর, রাজকিষেণ রায়, মাহমুদ গাজি, বিবি আসানিসা, আসাদ আলি মৌলবি এবং যশোধরকুমার পাইন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল জমিদার গনি মিয়ার কথা, পরবর্তী কালে যিনি এ-কারণে পেয়েছিলেন নবাব খেতাব। গনি মিয়া বলেছিলেন, 'এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আমার উপস্থিতি সরকারকে জোগাবে সাহস। আমার অনুপস্থিতি বিস্তার করবে আতঙ্ক যা রোধে আমরা এখন শঙ্কিত।' তিনি দুর্ভেদ্য করে তুলেছিলেন নিজ বাড়ি, অস্ত্রে সজ্জিত করেছিলেন নিজ পরিবারবর্গকে, সরকারকে দান করেছিলেন মোটা অঙ্কের অর্থ, স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্য করেছিলেন হাতি, ঘোড়া, নৌকা সবকিছু দিয়ে।

মধ্যশ্রেণীর একাংশ সমর্থন করেছিল ইংরেজদের। ঢাকায় সিপাহিদের নিপাতের খবর শুনে ঢাকার ভদ্রলোকরা বেশ উল্লসিত হয়েছিলেন। তবে পূর্ববঙ্গের শহরবাসীদের (বা ঢাকারও) বিরাট অংশ যে ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিল এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বরং বলা যেতে পারে, নীরবে তারা সব অবলোকন করেছিল মাত্র।

পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ ছিল এ-সব থেকে অনেক দূরে কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও পরবর্তী সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছিল কিছু প্রতীকী মূল্যবোধের যা এ-আলোচনার বাইরে।

তথ্য নির্দেশ

Brenand, 'Echoes of the Indian Mutiny of Dacca,' *The Dacca Review*, vol v, no vii & viii, Dacca, 1915.

Buckland, C. E. *Bengal under the Lieutenant Governors*, vol i & ii, New Delhi, 1976.

Dacca News, Dacca, March-December, 1857.

Halliday, F. J. *Minute by Lt. Governor of Bengal on the Mutineers as they affected the Lower Provinces under the Government of Bengal*, Calcutta, 1885.

. Majumdar, Hridaynath, *Reminiscences of Dacca*, Calcutta, 1926.

রতনলাল চক্রবর্তী, *সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৮৪।

রেবতীমোহন দাস, *আত্মকথা*, কলকাতা, ১৯৩৪।

নির্ঘণ্ট

স্মৃতিময় ঢাকা

স্মৃতিময় ঢাকা

রমনার স্মৃতি

রমনার স্মৃতি কখনও ভুলবার নয়। ঢাকায় ফিরে আসা প্রবাসী, বা যাদের ত্যাগ করতে হয়েছে সাধের ঢাকা শহর, ঢাকাবাসী মধ্যবয়সী বা বৃদ্ধ যখনই বোনেন পুরনো কথার জাল, তখনই ফিরে ফিরে আসে রমনা। কারো কাছে পঞ্চাশ ষাট বছর আগের রমনা মোহময়ী, কারো কাছে বা কুড়ি ত্রিশ বছর আগের। একেক বয়সের কাছে একেক রূপের রমনা। বুড়িগঙ্গার কথা মনে পড়লে যেমন চলে আসে ঢাকার নাম, তেমনি ঢাকার কথা মনে হলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে রমনার বিস্তৃত মাঠ।

রমনার সীমা, প্রকৃতি, একেক বয়সীর কাছে একেক রকম। কারণ, কিছু দিন আগেও নির্দিষ্ট ছিল না রমনার সীমা। পুরনো হাইকোর্ট থেকে শুরু করে রমনা পার্ক, তারপর রমনা পার্ক পেরিয়ে মিন্টো রোড, শাহবাগ, পুরো নীলক্ষেত এলাকা, কার্জন হল থেকে মেডিকেল - কখনও কখনও পুরো অঞ্চলটিকেই বোঝানো হতো রমনা বলে। সেই বিরাট এলাকা এখন সঙ্কুচিত হয়ে টিকে আছে রমনা পার্কেই। বর্তমান প্রজন্মের কাছে শাহবাগ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বা নীলক্ষেত আলাদা আলাদা একক। পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছে পুরো এলাকাটিই রমনা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শাহবাগ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানও।

রমনার সীমা এখন যাই হোক না কেন, পুরো এলাকাটি সেই মুঘল যুগ থেকে এখন পর্যন্ত একটি বিশেষ এলাকা হিসেবেই রয়ে গেছে। এমনটি আর ঢাকার কোন এলাকার ব্যাপারে হয়নি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ঢাকা শহরে সবচেয়ে দামী এলাকা ছিল শাঁখারীবাজার ও তাঁতি বাজার।[1] পাকিস্তান আমলে ধানমণ্ডি, এখন আবার বনানী, বারিধারা। কিন্তু রমনার আভিজাত্য ঠিকই রয়ে গেছে। মুঘল আমলে ছিল এটি অভিজাত এলাকা, কোম্পানী আমলে এলাকাটি হয়ে পড়েছিলো জঙ্গলাকীর্ণ। আবার যখন সাফ করা হলো, তখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এলিটদের বিনোদন কেন্দ্র। এ শতকেও রমনা ছিল পরিপাটি একটি এলাকা, যার সঙ্গে তুলনা চলতো না অন্য এলাকার। আর এখনও তাই আছে, সৌন্দর্য বা জমির দাম— যেটিকে পরিমাপের একক হিসেবে ধরি না কেন। হয়তো ভবিষ্যৎ-এও তাই থাকবে।

সেই মুঘল আমল (১৬১০) থেকেই বিশেষ এলাকা হিসেবে রমনার ইতিহাসের শুরু। ঐ সময় বর্তমান নীলক্ষেত অঞ্চলে মহল্লা চিশতিয়ান এবং মহল্লা শুজাতপুর নামে

গড়ে উঠেছিলো দুটি আবাসিক এলাকা। শুজাতপুর ছিল বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন থেকে বাংলা একাডেমী পর্যন্ত। পুরনো রেসকোর্সের দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল চিশতীয়া। পুরো এলাকাটি ছিল মৌজা শুজাতপুরের অন্তর্গত। মৌজা শুজাতপুর নাম হয়েছিলো রাজধানী ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম খাঁ চিশতীর ভাই শুজাত খান চিশতীর নামে।[২]

শুজাতপুর মৌজা বা মহল্লা চিশতীয়া ও মহল্লা শুজাতপুরে মুঘলরাই বসবাস করতেন। 'চিশতীয়ায়' ইসলাম খাঁ চিশতীর বংশের কিছু সদস্য বসবাস করতেন। একারণেই মহল্লার নাম ছিল চিশতীয়া। তাঁদের অনেকের কবরও দেওয়া হয়েছিলো এখানে। পরবর্তীকালে এলাকাটির নাম দেওয়া হয়েছিলো 'পুরনো নাখাস' যার মানে পুরনো দাসবাজার। খুব সম্ভব, মুঘল আমলে, এখানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আনা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী বিক্রি করা হতো।

রমনা নামকরণ মুঘলদেরই। ফার্সী শব্দ এটি, ইংরেজিতে যার অর্থ ল'ন। বাংলায় ঠিক এর প্রতিশব্দ আছে কিনা জানি না। তাইফুর জানিয়েছেন, পুরোনো হাইকোর্ট ভবন থেকে নিয়ে বর্তমান সড়ক ভবন পর্যন্ত মুঘলরা তৈরি করেছিলেন বাগান, যার নাম ছিল 'বাগ-ই-বাদশাহী' বা 'বাদশাহী বাগান'। ১৯০৩ সালে, তিনি নিজে হাইকোর্ট এলাকায় বিশাল এক ফটক দেখেছিলেন যেটি তাঁর মতে ছিল খুব সম্ভব 'বাদশাহী বাগানের' ফটক। ১৯০৪-৫ সালে নতুন রাজধানী নির্মাণ কালে ভেঙে ফেলা হয়েছিলো এই ফটক এবং এ এলাকার অনেক পুরনো বাড়িঘর।[৩]

ধরে নিতে পারি, পুরো রমনা এলাকাটি মুঘল আমলে ছিল এ রকম— দক্ষিণ পূর্বে বা বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সড়ক ভবন পর্যন্ত সাজানো বাদশাহী বাগান। কলাভবন, কার্জন হল থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে দু'টি আবাসিক এলাকা— মহল্লা শুজাতপুর ও মহল্লা চিশতীয়া, যেখানে তাইফুরের মতে ছিল দু'তিন তলা বাড়ি, বাংলো, অভ্যর্থনার জন্য প্রশস্ত হলঘর।[৪] তাইফুর যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে হয় পুরো শুজাতপুরই বোধহয় ঘরবাড়িতে ভর্তি ছিল। আসলে তা সম্ভব ছিল না। মুঘল আমলে (বিশেষ করে প্রথমদিকে, যখন শুজাতপুরের পত্তন) মসজিদ নির্মাণের দিকেই খানিকটা মনোযোগ দেওয়া হয়েছিলো, আবাসিক গৃহ নির্মাণে নয়। তবে, মুঘল আমলের শেষদিকে হয়ত শুজাতপুরে দু'একটি অট্টালিকা নির্মিত হতে পারে, নির্মিত হতে পারে দু'একটি অভ্যর্থনা কক্ষও। খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে হয়তো আরো কিছু ইটের তৈরি বাড়িঘর নির্মিত হয়েছিলো। এ অনুমান করছি ১৮৩২ সালে, ওয়ালটারের দেওয়া একটি পরিসংখ্যান থেকে। ওয়ালটার উল্লেখ করেছেন, মহল্লা শুজাতপুরে মোট ঘর বাড়ির সংখ্যা ছিল ৫৯৪টি। এরমধ্যে ইটের তৈরি ছিল ৫৩টি। ৫৪১টি ছিল খড়ের [বা কুটির, দোকানপাট শুদ্ধ]। একতলা, দোতলা ও তিনতলা বাড়ির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে— ২৮, ১৮ ও ১টি। বাগান ও প্রাচীর ঘেরা বাড়ির সংখ্যা ছিল মাত্র ছ'টি।[৪ক]

যা হোক, এ দুটি এলাকা ও বাদশাহী বাগের মাঝখানের জায়গাটুকু [আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান] জুড়ে ছিল সবুজ ঘাসে ঢাকা চত্বর। এ বিস্তৃত চত্বরের নাম হয়তো হয়ে গিয়েছিলো রমনা। পরবর্তীকালে শুজাতপুর, চিশতীয়া, বাগ-ই-বাদশাহী নাম বিলুপ্ত হয়ে গেলেও রমনা নামটি গিয়েছিলো টিকে; আর এ নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলো পুরো এলাকাটি [যেমন প্রাচীন বাংলা বিভক্ত ছিল বিভিন্ন নামে ও জনপদে, বাংলা নামটি ছিল যার মধ্যে মাত্র একটি নাম। পরে, সে নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলো পুরো এলাকা। সমতট, অঙ্গ হরিকেল -- এগুলো গিয়েছিলো বিলুপ্ত হয়ে]।

রমনা পেরিয়ে উত্তরে ছিল তখন জঙ্গল। এলাকার ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিলো দু'তিনটি ক্যানাল। হতে পারে, তখন শুজাতপুর ও চিশতীয়ার অভিজাতরা বিকেল বা সন্ধ্যায় বেড়াতেন বাগ-ই-বাদশাহী বা রমনায়। হয়তো বা কখনও নৌকায় করে ঘুরে বেড়াতেন গাছে ঢাকা ক্যানালে।

ভাওয়ালে শিকার করতে গিয়ে ইসলাম খাঁ পরলোক গমন করেছিলেন। তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিলো বাদশাহী বাগে, যেখানে হাইকোর্টের মাজার দাঁড়িয়ে। তাইফুরের মতে, ইসলাম খাঁকে সমাহিত করা হয়েছিলো এখানে এবং তা পরিচিত ছিল 'চিশতী বেহেশতী' নামে। কিন্তু পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর দেহাবশেষ নিয়ে সমাহিত করেছিলেন ফতেপুর সিক্রিতে। তারপর থেকে শূন্য সমাধি অবহেলিত ভাবেই পড়েছিলো, গিয়েছিলো জঙ্গলে ঢেকে। ১৯৪৩ সালেও তিনি সমাধিটি তেমন দেখেছিলেন। এরপর দেখা গেলো চতুর এক ব্যক্তি সমাধিটি পরিষ্কার করে, সংস্কার করে, মাজার সাজিয়ে বসেছিলেন।[৫] সেই থেকে এই 'মাজার' ঢাকার বিখ্যাত 'হাইকোর্টের মাজার' নামে পরিচিত, যেখানে প্রতিদিন, বিশেষ করে বৃহস্পতিবার হাজার হাজার ভক্তের সমাগম ঘটে।

মুঘল সুবাদার মুহম্মদ আজমের আমলে, ১৬৭৯ সালে, রমনার দক্ষিণে নির্মিত হয়েছিলো হাজী শাহবাজের মসজিদ। তায়েশ, হাজী শাহবাজের পরিচয় দিয়েছেন রাজমিস্ত্রী হিসেবে।[৬] তাইফুর তাঁকে উল্লেখ করেছেন ব্যবসায়ী হিসেবে।[৭] মনে হয় তাইফুরের অনুমানই ঠিক এবং হাজী শাহবাজ যে ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ৬৮ ফুট দীর্ঘ এবং ২৬ ফুট চওড়া, তিন গম্বুজ অলা এই সমজিদটি তিনশো নয় বছর পরও আজ অটুট। এর মিম্বর চৌকাঠ পাথরের তৈরি। মসজিদের আঙিনায় শায়িত আছেন হাজী শাহবাজ।

মুঘল আমলের শেষ দিকে রমনার ক্ষয়ের শুরু। মুঘল আমলের বা পরবর্তী কালের বিভিন্ন ইংরেজ নথিপত্রে কিন্তু রমনা সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য নেই। তবুও বিভিন্ন উৎস থেকে জড়ো করা তথ্যের ভিত্তিতে মুঘল পরবর্তী রমনার একটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করবো।

ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর, ঢাকার অনেক অঞ্চল পরিণত হয়েছিলো বিরান অঞ্চলে। লোকসংখ্যা গিয়েছিলো কমে। ঢাকার বিস্তৃত সব বাগান অযত্নে অবহেলায় পরিণত হয়েছিলো জঙ্গলে। রমনার অবস্থা ছিল তখন কি রকম?

অনুমান করে নিচ্ছি, অযত্নে অবহেলায় রমনাও হয়ে পড়েছিলো জঙ্গলাকীর্ণ। মহল্লা শুজাতপুর ও চিশতীয়ার রবরবা আর ছিল না। এর অনেকটা জায়গা পরিণত হয়েছিলো কবরস্থানে। এই জঙ্গলের মাঝে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল পুরোনো ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, ভরাট হতে থাকা ক্যানাল। রমনার পাশেই ছিল নিমতলি কুঠি। লোকজন প্রয়োজন না পড়লে রমনার ধার ঘেঁষতো না।

কোম্পানি আমলে রমনার যে বর্ণনা পাই তাতেও রমনাকে উল্লেখ করা হয়েছে জঙ্গল হিসেবে, যেখানে বন্যজন্তুর কমতি ছিল না হয়তো। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকা আবার গুটিয়ে গিয়েছিলো বর্তমান পুরনো ঢাকার সীমানার মধ্যেই এবং পুরোনো ঢাকার স্বাস্থ্যনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো রমনার জঙ্গল।

হাইকোর্টের মাজার থেকে শাহবাগের মোড় পর্যন্ত জায়গাটি ছিল বোধ হয় তখন এরকম - ঝোপঝাড়, জলা-জঙ্গল, তার মাঝে উঁকি দিচ্ছে হাজী শাহবাজের মসজিদ, কালী বাড়ি। এর উল্টোদিকে গ্রীকদের কবরস্থান। তারপর জঙ্গল আর জঙ্গল। এর মাঝে হয়তো সুরু চলার পথ। শুজাতপুর আর চিশতীয়া তখন স্মৃতি।

ইংরেজ আমলে, রমনা পুনরুদ্ধারে প্রথম হাত দিয়েছিলেন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ড'স। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট তো বটেই, ঢাকা শহর উন্নয়নের জন্য গঠিত ঢাকা কমিটিরও তিনি ছিলেন একজন সদস্য। সর্বশক্তি নিয়ে তিনি মেতে উঠেছিলেন ঢাকা শহর পরিষ্কার করার জন্য। এ কারণে তাঁর নাম হয়েছিলো 'একসেনট্রিক সিভিলিয়ান'। শহর পরিচ্ছন্ন করার জন্য তিনি নিয়োগ করেছিলেন জেলের কয়েদীদের।

১৯২৫ সালে জেলের কয়েদীদের নিয়ে রমনার জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়েছিলেন ড'স। তিন মাস পর রমনার জঙ্গল পরিষ্কার করে বের করা হয়েছিলো ডিম্বাকৃতি একটি অংশ, যার ফলে শহরের উত্তরাঞ্চল পরিচ্ছন্ন হয়ে উন্মুক্ত হয়েছিলো বায়ু চলাচলের পথ। এর কিছু দিন পর পরিষ্কৃত অংশটিকে কাঠের রেলিং দিয়ে ঘিরে ড'স তৈরি করেছিলেন রেসকোর্স। মুঘলরা যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে করেছিলেন বাগান আর ইংরেজরা রেসকোর্স। রেসকোর্সের একেবারে উত্তর পশ্চিমে ড'স একটি টিলা তৈরি করে তার চারদিকে লাগিয়েছিলেন ফারগাছ। আর টিলার ওপর তৈরি করেছিলেন গথিক রীতির ছোট একটি ঘর। ড'সের তৈরি টিলাটি এখনও আছে, গথিক রীতির বাড়ির ধ্বংসাবশেষ কিছুদিন আগেও ছিল। তখনকার ঢাকার শিক্ষিত লোকজন বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন 'ড'স ফলি' বা ড'সের ভুল নামে। কেন এই নামকরণ তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে ধরে নিতে পারি প্রচলিত ধারা উপেক্ষা করে, শহরে ঘর তৈরি না করে, শহরের বাইরে টিলা ও ঘর তৈরির জন্যই বোধ হয় সবাই ভেবেছিলেন 'লোকটি কি বোকা!' তবে যাই হোক, রমনা আবার মর্যাদা ফিরে পেয়েছিলো। অভিজাত ও সাহেবরা প্রতিদিন সকালে এই এলাকায় বেড়াতে আসতেন। প্রাতঃভ্রমণ শেষে উইরোপীয়রা মিলিত হতেন ড'সের টিলায় আর ড'স তাদের আপ্যায়ন করতেন কফি দিয়ে।[৮] কিছুদিন আগে যোবায়দা মীর্জা তাঁর স্মৃতি কাহিনীতে উল্লেখ করেছিলেন ছেলেবেলায় এখানে

তিনি দেখেছিলেন পুরনো একটি দুর্গ। আসলে তা ঠিক নয়। কারণ এ এলাকায় কোন দুর্গ ছিল না। হতে পারে ছেলেবেলায় দেখাত ড'স ফলি'কেই তিনি মনে করেছিলেন দুর্গ।

মূল শহরের সঙ্গে রেসকোর্সকে যুক্ত করার জন্য ড'স রেসকোর্সের উত্তর পূর্ব দিকে তৈরি করেছিলেন একটি রাস্তা। [বর্তমান নজরুল এভেনিউ]। এর দুধারে লাগিয়েছিলেন দুস্প্রাপ্য সব গাছ [যেমন মিমোসা বা ক্যাসুরিনা] যার অনেকগুলি আনা হয়েছিলো নেপাল থেকে।[৯] এ রাস্তার প্রবেশ মুখে ড'স তৈরি করেছিলেন দুটি স্তম্ভ [বা স্তম্ভের মত] যা এখনও অটুট। প্রচলিত মত অনুসারে এ দুটি স্তম্ভের নাম মীর জুমলা ফটক। মীর জুমলার সময় নাকি শহরের উত্তর সীমা নির্ধারণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এ ফটক। কিন্তু তা ঠিক নয়। এ. এইচ. দানী স্তম্ভ দুটি পরীক্ষা করে জানিয়েছেন, মুঘল আমলে এগুলি তৈরি হয়নি। তাছাড়া স্তম্ভ দুটির গড়ন ইউরোপীয়।[১০] যাই হোক ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, রমনার প্রবেশ পথ চিহ্নিত করার জন্য ড'স তৈরি করেছিলেন স্তম্ভ দুটি।

এ প্রসঙ্গে রমনার কালী বাড়ির কথা উল্লেখ করতে হয়। কালী বাড়ি ছাড়া রমনা অসম্পূর্ণ— অন্তত আমাদের কাছে, যারা পরিচিত ১৯৭১ সালের পূর্বের রমনা সম্পর্কে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মন্দিরটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো।

শংকরাচার্যের অনুসারী দশনামী গোত্রের মন্দির ছিল এটি। ১৮৫৯ সালের তৈরি ঢাকার এক মানচিত্রে কালী মন্দিরকে উল্লেখ করা হয়েছে কৃপাসিদ্ধির আখড়া নামে। বদ্রী নারায়ণ থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে জনৈক গোপাল গিরি ঢাকায় এসে পত্তন করেছিলেন এখানে একটি আখড়ার। ধ্বংসপ্রাপ্ত কালী বাড়ির বয়স আরো কম। প্রায় পৌনে তিনশো বছর আগে এই আখড়াকে কেন্দ্র করেই জনৈক হরিচরণ গিরি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন কালী বাড়ির। অবশ্য পরবর্তী বছরগুলিতে এর অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়েছিলো। পুরনো মন্দিরের পাশ ঘেঁষেই তৈরি করা হয়েছিলো নতুন মন্দির। দানী মন্দিরের পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে লিখেছিলেন, বারো ভূঁইয়াদের একজন কেদার রায়, তাঁর গুরুর জন্যে ষোড়শ শতকের শেষের দিকে নির্মাণ করেছিলেন নতুন মন্দিরটি। গোপাল গিরি এবং হরিচরণের সমাধিস্তম্ভও ছিল এখানে। দানীর মতে, মন্দিরের সামনের দিঘীটি [যা এখনও বর্তমান] কাটিয়েছিলেন ভাওয়ালের রাণী বিলাসমনি। আবার ইংরেজ আমলে নথিপত্রে দেখা যায় কালী বাড়ির সামনে ড'স একটি দিঘী কাটিয়েছিলেন, যা মিটিয়েছিলো আশপাশের মানুষের পানি সমস্যা।[১১] এ প্রসঙ্গে রমনার আরেকটি পুকুরের কথা উল্লেখ করতে হয়। স্থপতি সামসুল ওয়ারেস আমাকে জানিয়েছেন, বর্তমান শিশুপার্ক নির্মাণের সময় তিনি ড'সের ভুলের' নিচে পুরোনো পুকুরের একটি খাত দেখেছিলেন। ইংরেজ নথিপত্রে উল্লিখিত দীঘিটি খুব সম্ভব এটিই, যেটি কাটিয়েছিলেন ড'স। কালীবাড়ির দিঘীটি খুব সম্ভব পুরনো দীঘি যা সংস্কার করেছিলেন ভাওয়ালের রাণী বিলাসমনি অথবা তিনিই কাটিয়েছিলেন দীঘিটি।

এ শতকের চল্লিশ দশকের কালী বাড়ির ভেতরের একটি সুন্দর বর্ণনা পাই

যোবায়দা মির্জার স্মৃতি কাহিনীতে। তাঁর পিতা তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর ছাত্রের অনুরোধে সম্মত হয়েছিলেন কালীবাড়ির ভেতরে যেতে। ছাত্রটি ছিলেন কালীবাড়ির সেবায়তের পুত্র।

'কালীবাড়িটা ছিল রেসকোর্সের মাঝখানে। অত্যন্ত পুরনো মন্দির রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। সাদা কাপড়ে বর্ষার দিনে তিল পড়লে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি হয়ে ছাতা পড়েছিল— কতক চাপচাপ সবুজ শেওলা, জায়গায় জায়গায় কালচে হয়ে গেছে। দিনের বেলায়ই তার পাশ দিয়ে যেতে গা ছমছম করে। তাছাড়া কালী বাড়িতে নরবলি হয় একথা সকলেই বলতো।...ভিতরে ঢুকতেই অন্ধকার। কোথায় একটা প্রদীপ মিটমিটিয়ে জ্বলে অন্ধকারকে যেন আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। ...আম্মার হাত ধরে চল্লাম অন্দরমহলে, উঁচু উঁচু ধাপওয়ালা সরু খাড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলার প্রকাণ্ড বড় একটা ঘর-- সারি সারি বাচ্চা ছেলেমেয়ে মেঝেয় পাত পেতে খেতে বসেছে।' এর পাশের একটা ঘরে ছিলেন সেবায়ত গিন্নী। তিনি যখন জানতে পারলেন অতিথিরা মুসলমান, তখন মহা হুলস্থূল কাণ্ড। ছাত্রটি পরে মাফ চেয়ে মোতাহার হোসেন সাহেবকে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর বাসায়— বর্ধমান হাউসে।[১২]

এখানে রমনার গ্রীক গোরস্থানের কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঐ গোরস্থানের একটি চিহ্ন এখনও বর্তমানে। বিশ্ববিদ্যালয় বলাভবন যাবার পথে, ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের চত্বরে গ্রীক স্মৃতিসৌধটি নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে। ঢাকায় যে একসময় গ্রীকরা বসবাস করতেন তার এই একটি স্মৃতি চিহ্নই এখন পর্যন্ত টিকে আছে। মনে হয়, ড'সের রমনার পুনরুদ্ধারের আগে থেকেই রমনার পূর্বদিকে ছিল গ্রীকদের গোরস্থান।

ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে যে গ্রীক স্মৃতিসৌধটি আছে, সেটি ডিমিট্রিয়াস নামে উনিশ শতকের এক গ্রীক পরিবারের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়েছিলো। স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে রক্ষিত আছে ন'টি এপিটাফ। এটির চারটির ভাষা ইংরেজী, পাঁচটি লেখা গ্রীক ভাষাতে।

চার্লস ড'স ঢাকা ত্যাগ করার পর, রমনা আবার পরিণত হয়েছিলো অবহেলিত অঞ্চলে। আগাছা, গাছ-গাছড়ায় আবার ভরে উঠেছিলো রমনা। ১৮৪০-এর দিকে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ঢাকা এসেছিলেন রাসেল মোরল্যান্ড স্কিনার। দু'বছর ছিলেন তিনি ঢাকায় এবং এ দু'বছরে শহর উন্নয়নের গতি তিনি আবার দিয়েছিলেন বাড়িয়ে। তাঁর আমলে রমনা পরিণত হতে চলছিলো সুন্দর এক শহরতলিতে।

১৮৪০-এর দিকে রমনার এই উত্তরাংশ অনেকে বাড়ি করতে থাকেন। বাগানবাড়ি বলা যেতে পারে এগুলিকে। প্রথম যে কজন বাগান তৈরি করে ছিলেন এখানে, তার মধ্যে আর্মেনী জমিদার আরাতুন একজন। গ্রীক কবরখানার পাশে, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন এখন যেখানে, সেখানে তৈরি করেছিলেন তিনি বাগানবাড়ি। এর খানিকটা দূরে বাড়ি তৈরি করেছিলেন জজ জন ফ্রানসিস গ্রিফিথ। অবসর গ্রহণ করার পর ১৮৪৪/৪৫-এর দিকে তিনি নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিলেন আবুদল গনির কাছে।[১৩]

১৮৫৯ সালের সার্ভেয়র জেনারেলের তৈরি ঢাকার মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে রমনাকে ভাগ করা হয়েছে দুভাগে। রেসকোর্স এবং বাকি অংশটুকু রমনা প্লেইনস। এর আশপাশের অঞ্চল আজিমপুর, আরো দূরে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত ধরে নিতে পারি রমনা ছিলো ইউরোপীয় ও ধনীদের ঘুরে বেড়াবার জায়গা। কিন্তু তারপর আবার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে রমনা হয়ে উঠছিলো জঙ্গলাকীর্ণ। ১৮৫৯ সালের মানচিত্র দেখে মনে হয়, রমনা হয়ে পড়েছিলো বিরান অঞ্চল। রেসকোর্স তখনও ছিল, কিন্তু রেস বোধ হয় আর হত না।

ডঃ সিরাজুল ইসলাম একবার আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, নবাব পরিবারের দলিলপত্র ঘাঁটার সময় তিনি একটি তথ্য জানতে পেরেছেন। তা'হলো সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির হিসাব তৈরির সময় রেস কোর্সকেও দেখানো হয়েছিলো সম্পত্তির অংশ হিসেবে।

রমনা বিরান অঞ্চলে পরিণত হলেও, এর পশ্চিমাংশ উন্নীত করে তুলেছিলেন আবদুল গনি, পরবর্তীকালের নওয়াব গনি। আগেই বলেছি, ১৮৪৪-৪৫ এর দিকে বিচারক গ্রিফিথের রমনার বাড়ি ও সম্পত্তি কিনে নিয়েছিলেন আবদুল গনি। পরবর্তীকালে এই সম্পত্তির আরো বিস্তার ঘটিয়েছিলেন তিনি। ধরে নিতে পারি, বর্তমান বাংলা একাডেমী থেকে শুরু করে কলাভবন এলাকা, শাহবাগ, পরীবাগ, ঢাকা ক্লাব পর্যন্ত ছিল তাদের সম্পত্তির অন্তর্গত। অন্যদিকে রেস কোর্সটি হয়ত তাঁরা লীজ নিয়েছিলেন সরকারের কাছ থেকে।

জজ গ্রিফিথ থেকে ছোট বাংলাটি কিনে, কয়েক বছর পর সেখানে আবদুল গনি বাগান বাড়ি নির্মাণ শুরু করেছিলেন। এলাকাটি কবে থেকে তাঁরা উন্নত করতে শুরু করেছিলেন তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে ধরে নিতে পারি, ষাট সত্তর দশক থেকেই এলাকাটির উন্নয়ন নবাবরা শুরু করেছিলেন। এখানে তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন একটি বাগানবাড়ি, ছোট বড় অট্টালিকা, দরবার কক্ষ আর বিস্তৃত বাগান। পরবর্তী কালে নবাব আহসাউল্লাহ্ এখানে একটি চিড়িয়াখানাও স্থাপন করেছিলেন। নবাব বাড়ির নাম ছিল 'এশরাত মঞ্জিল' আর পুরো এলাকাটির নাম দিয়েছিলেন তাঁরা শাহবাগ।[১৪] সে নামটি টিকে আছে এখনও। গনিউর রাজা তাঁর রোজনামচায় নবাবের এই বাগানকে উল্লেখ করেছিলেন রমনা বাগিচা নামে।[১৫]

হাকিম হাবিবুর রহমান বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন শাহবাগ সম্পর্কে। মুহম্মদ আবদুল্লাহ অনূদিত সেই বিবরণ—

'প্রত্যেক বছর পয়লা জানুয়ারী শাহবাগে সর্ব সাধারণ্যে এই আনন্দোৎসব পালিত হতো। সুবহানাল্লাহ। সে সময়কার শাহবাগ বাগান থাকতো না, তা বেহেশতের ন্যায় পরিণত হতো। এই বাগানটি নিয়ে নাস্‌সাখ্ মরহুম একটি মসনবী কবিতা রচনা করেছিলেন। সে বাগানটি ছিল যেন কয়েক একক জমিন জোড়া একটি

চমৎকার রোশনাই, তা ছিল চার দেয়ালে সুরক্ষিত, তাতে ছিল গাছ গাছড়ায় ঘেরা মার্বেল পাথরের তৈরি একটি গোলাকার বৈঠকখানা, পোক্ত অপোক্ত সরোবর, কোন কোন সরোবরের মাঝখানে প্রশস্ত গোল চত্বর, যেখানে যাবার জন্য ছিল লোহার মনোরম পুল। সেই বাগানে আরো ছিল আঁকাবাঁকা কয়েক ফার্লং দীর্ঘ নহর, তার পদপার্শ্বে ছিল গোলাকার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট অনেক ভবন তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল নিশাত মনজিল নামক একটি জাঁকালো দ্বিতল মহল, যাতে সংগৃহীত ছিল আজব আজব বস্তু, এর দক্ষিণ দিকে ছিল একটি চবুতরা, যেখানে ছিল অনেক পাকা হাউজ, যাতে সাঁতার কাটতো রং বেরংয়ের মৎস্য, প্রত্যেকটি হাউজে ছিল অদ্ভুত নির্ঝর, জলধারা কোথাও বিচ্ছুরিত হতো সোজাসুজি, কোথাও চক্রাকারে, আবার কোথাও চাদরাকৃতি রূপে। এই বাগানে স্বতন্ত্র বেষ্টনীতে ছিল একটি চিড়িয়াখানা যাতে পোষা হত নানা প্রকার পশুপাখী, তাদের জন্য ছিল যথোপযুক্ত লোহার শলাকা ও জালযুক্ত কুঠরিসমূহ। এখানে পাখিদের জন্য ছিল সুশোভিত হাউজ। ১৮৮৮ সালে আমি এখানে বাঘ, ভাল্লুক, উট পাখী ও বিভিন্ন প্রকার বানর দেখেছিলাম। এক কথায় তখনকার শাহবাগ ছিল একটি পরীস্থান যা প্রত্যেক বছর পয়লা জানুয়ারীতে এক নববধূতে পরিণত হতো।'[১৬]

হাকিম হাবিবুর রহমান মার্বেল পাথরের যে গোলাকার ঘরের কথা বলেছেন, সেটি ছিল বাগানবাড়ির দরবার কক্ষ। এখানেই ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো মুসলিম লীগ। এর কাছেই এশরাত মঞ্জিল। সেই গোল ঘরটি এখন মধুর ক্যান্টিন। আর এশরাত মঞ্জিলের কিছু অংশে নির্মিত হয়েছে কলাভবন। বাগানের ঘর বাড়ির আরেকটি চিহ্ন কিছুদিন আগেও অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলো জাতীয় যাদুঘর চত্বরে। তবে তা ভেঙে ফেলা হয়েছে সম্প্রতি।

শাহবাগ সম্পর্কে আরেকটি সংবাদ উদ্ধৃত করছি। ১৮৮৮ সালে '*ঢাকা প্রকাশ*'-এ ছাপা হয়েছিলো সংবাদটি।

'বিজ্ঞাপন।
নবাব আছানউল্লা খাঁ বাহাদুর তাঁহার ইংরেজ এবং দেশীয় বন্ধু বর্গ ও ঢাকাস্থ জনসাধারণকে এই অভিপ্রায় জানাইতেছেন যে, শ্রী শ্রীমতি মহারাণী ভারতেশ্বরীর জুবিলী উপলক্ষে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী, তাঁহার সাবাগ নামক বাগিচায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইবে, তজ্জন্য ঐ দিবস পূর্বাহ্নে ১০ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার মধ্যে উক্ত বাগিচায় সকলের আগমন বাঞ্ছনীয়।'[১৭]

নবাবদের বিখ্যাত চিড়িয়াখানাটি সম্পর্কে জানতে পারি খানিকটা ১৮১৫ সালে, সংবাদপত্রে নবাব আহসানউল্লাহর দেওয়া এক বিজ্ঞাপনে—

'ঢাকার সর্বসাধারণ ভালরূপে অবগত আছেন যে অনেকদিন আমি বাইগুনবাড়ির রক্ষিত বন ও ঢাকার দেশকোশা ও শাহবাগ বাগানের মশ্বর (সম্বর?) ও অন্য জাতীয় হরিণ, ময়ূর, বন কুককুট, তিতির ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে অনেক দুর্লভ ও মূল্যবান বিদেশী পশুপক্ষী সকলও বহুল ব্যয় ও যত্নে আনাইয়াছি। যেহেতু উক্ত পশুপক্ষী সকল সময় তাহাদের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে চলিয়া যায় ও লোকে ক্রীড়াচ্ছলে ঐ পশুপক্ষী সকলকে অন্যায় রূপে গুলি করিয়া মারে। যদি তাহারা প্রকাশ করে যে উহাদের মালিক কে জানে না কিন্তু বাস্তবিক ঐ সকল যে আমার ইহা বিশেষরূপে অবগত আছে এবং যেহেতু আমার ইচ্ছা যে এই রূপ ঘটনা পুনরায় ভবিষ্যতে আর না হইতে পারে এই জন্য এতদ্বারা সর্বসাধারণ ও শিকার অপহরণকারীগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কেহ ভবিষ্যতে আমার কোন পশুপক্ষীকে তাহাদের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে গেলে হত কিংবা নষ্ট না করে। করিলে তাহারা হানি, চুরি অথবা দণ্ডবিধি আইনের অন্য কোন ধারা অনুসারে ফৌজদারী সোপর্দ হওয়া যোগ্য হইবে ও ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবে।"[১৮]

পুরনো একটি ছবিতে দেখেছি, একপাল হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে নবাবের চিড়িয়াখানায়। অনুমান করে নিতে পারি, নব্বই দশকের দিকে রমনা হয়ে উঠেছিলো মোটামুটি পরিচ্ছন্ন এক এলাকা। একদিকে শাহবাগ, অন্যদিকে রেসকোর্স। নবাবরা এটিও পরিচালনা করতেন। ঢাকার রেস বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলো তখন। ঢাকার বাইরে থেকে ঘোড়া আসতো বাজি দৌড়বার জন্য। নগরবাসীর এক অন্যতম বিনোদন ছিল ঘোড়াদৌড় দেখা। দৌড়ের ঘোড়ার জন্য নবাবদের আস্তাবল ছিল, যার চিহ্ন এখনও কাঁটাবন বস্তির পরিত্যক্ত আস্তাবলটি। ঘোড়দৌড় কি উত্তেজনা সৃষ্টি করতো ঢাকায় তার দু'একটা নমুনা তুলে দিচ্ছি সমসাময়িক স্থানীয় এক পত্রিকা থেকে।

১. ঘোড়দৌড় উপলক্ষে এবারও ঢাকার সমস্ত অফিস আদালত বন্ধ হইয়াছিল। শনিবার একেবারেই বন্ধ, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার নাম মাত্র কিছুকালের জন্য খোলা ছিল, কোন কার্য হয় নাই। মোকদ্দমা উপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয়ে বহু দূর স্থান হইতে আসিয়া সহসা কাছারি বন্ধ দেখিয়া মনস্তাপে গভর্নমেন্টকে গালি দিতে দিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এরূপ অনিশ্চিতভাবে কাছারি বন্ধ না দিয়ে হর্সরেস হলিডে নামে একটা কাছারি বন্ধের ঘোষণা গভর্নমেন্ট প্রচার করেন তবে লোকের বহু ক্ষতি নিবারণ হইতে পারে।'[১৯]

২. 'ঢাকার ঘোড়দৌড়'

এবার ঢাকাতে অতিশয় আড়ম্বরের সহিত ঘোড়দৌড় হইয়া গিয়াছে। এখানকার প্রধান খাজে আবদুল গনি এখানকার কেয়কজন কাপ্তান ও বাবু মধুসূদন দাস এবারের

দৌড়ের ঘোড়া লইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। এবং দৌড়ের পূর্বদিন রাত্রি কলিকাতার কাপ্তান ওয়ার্লোর দুইটা দৌড়ের ঘোড়াও এখানে পৌঁছে। এখানে যে সকল ঘোড়া প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার মধ্যে গনি মিয়ার ঘোড়াগুলির সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকে এমত মনে করিত। যদি শেষোক্ত কাপ্তান ওয়ার্লো তাহার ঘোড়া এখানে না পাঠাইতেন, তাহা হইলে এখানকার ঘোড়ার দৌড় হইয়াই গনি মিয়ার ঘোড়া শ্রেষ্ঠ কি অশ্রেষ্ঠ নিশ্চয় হইত। কিন্তু উক্ত কাপ্তানের ঘোড়া দুইটি এমত উত্তম ছিল যে, এখানকার কোন ঘোড়া কোন বাজিতেই তাহার একটার সঙ্গেও জয়লাভ করিতে পারে নাই। আর এখানে সমুদায়ে অর্থাৎ ৪ দিনে ১৬ বাজি খেলা হয় তাহাতে সমষ্টিতে প্রায় ছয় হাজার টাকার বাজি হইয়াছিল। ইহার অধিকাংশই কাপ্তান ওয়ার্লো সাহেবের ঘোড়ায় জিতিয়াছে।'[২০]

ঢাকার এই বিখ্যাত রেস প্রবর্তনে, নবাবদের সাহায্য করেছিলেন তাঁদের ইংরেজ ম্যানেজার সি, এল, গার্থ। তাইফুর আরো জানিয়েছেন, ১৯৮৭ সালের পহেলা জানুয়ারির পর থেকে প্রতিবছর শাহবাগে পালিত হতো নববর্ষ'[২১] যার একটি বর্ণনা আগেই উদ্ধৃত করেছি হাকিম হাবিবুরের লেখা থেকে।

তবে যাই হোক, অন্তত ধরে নিতে পারি, ঘোড়দৌড়ের কারণে, রেসকোর্সটুকু মুক্ত রাখা হয়েছিলো ঝোপ জঙ্গল থেকে। রেসকোর্সের উত্তরাংশে ইউরোপীয়ানরা মাঝে মাঝে খেলতেন পোলো।

বঙ্গভঙ্গের পর সত্যিকারভাবে গড়ে উঠতে থাকে রমনা এলাকা। শাহবাগ তখনও ছিল নবাবদের অধিকারে। তবে, রমনা প্লেইনসের অনেকটা অংশ সরকার নিয়ে নিয়েছিলেন নতুন রাজধানী নির্মাণের জন্য। এ এলাকার নাম দেওয়া হয়েছিল রমনা সিভিল স্টেশন। এখানে গড়ে উঠেছিলো লাটভবন [পুরোনো হাইকোর্ট], কার্জন হল, সচিবালয়, সরকারী কর্মচারীদের জন্য মিন্টু রোড, হেয়ার রোড আর নীলক্ষেতে লাল রঙের বাড়ি। প্রকৃতির সবুজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য বাড়িগুলির রং ছিল লাল। এ সময়ই পত্তন করা হয়েছিলো রমনা পার্কের। রমনা এলাকা তখন মোটামুটি তিনভাবে vef ³ -- রমনা সিভিল স্টেশন, রমনা পার্ক আর রেসকোর্স।

'ঢাকা শহরের নিসর্গ পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছিলো ১৯০৮ সালে লন্ডনের কিউই গার্ডেনের অন্যতম কর্মী আর. এল. প্রাউডলকের তত্ত্বাবধানে। এ কাজে তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন অখিল বাবু। তাঁর কথায় পরে আবার ফিরে আসবো। শহরের নিসর্গ পরিকল্পনার ফল রমনা পার্ক। এ কাজ শেষ হতে সময় লেগেছিলো কুড়ি বছর। এ সম্পর্কে লিখেছেন দ্বিজেন শর্মা-- 'ঢাকাস্থ উষ্ণমণ্ডলীয় রূপসী তরু গোষ্ঠী নির্বাচনের কৃতিত্বও তাঁর। শহরে বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনার বহুমুখী সমস্যার এমন সুসামঞ্জস্য সমাধান অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য।'[২২]

তবে আজকের রমনার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশিত ড. সিরাজুল ইসলামের একটি চিঠিতে জানা যায় বঙ্গভঙ্গ রদের পর ১৯১২-১৯২০ সময় সীমার মাঝে রমনা এলাকার বিভিন্ন অংশ

[অট্টালিকাসহ] ভাড়া দেওয়া হয়েছিলো জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজকে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো রমনা সিভিল স্টেশনে। আর মিন্টো, হেয়ার রোড, নীলক্ষেত, প্রেসক্লাব পর্যন্ত বিভিন্ন ভবন বরাদ্দ করা হয়েছিলো শিক্ষকদের জন্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথিতযশা অধ্যাপকদের আগমনের কারণ ছিল ভালো বেতন আর এই সুবিশাল বাড়ি।

১৯২১ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত রমনা সিভিল স্টেশনের মালিকানা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ হয়েছিলো। সরকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ জমির জন্য ভাড়া দাবী করেছিলো। অবশেষে এক চুক্তির অধীনে সরকার বাৎসরিক এক হাজার টাকা জমায় রমনার সাতশো আটাশ বিঘা জমি ও এলাকার সব ভবন ইজারা দিয়েছিলো বিশ্ববিদ্যালয়কে। এর বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলো প্রাদেশিক সরকারকে।[২৩] সে আমলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। রমনা এলাকার সাতশো বিঘার জন্যে ছিল খুব বেশি মূল্য।

ঐ সময়ের রমনা এলাকা ছিল কেমন? বৃদ্ধদের মুখে শুনেছি এ শতকের প্রথম দুতিন দশকেও বলতে গেলে রমনা ছিল বিরান অঞ্চল। তখন এ অঞ্চলের অনেকাংশ ঢাকা-ছিল বড় বড় শনের আড়ালে।

১৯২১ সালে রমেশচন্দ্র মজুমদার যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমান বাংলা একাডেমীতে [বর্ধমান হাউজ] তিনি ছিলেন বেশ কিছুদিন। লিখেছেন তিনি তাঁর আমলের রমনা সম্পর্কে' ..

> 'ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে রমনার মাঠ নামে একটি বিস্তৃত প্রান্তর ছিল। এই রমনার মাঠে নতুন শহর পত্তন করে বড় বড় সরকারী দফতর এবং কর্মচারীদের বসবাসের জন্য সুন্দর সুন্দর অনেক বাড়ি তৈরি হয়। প্রত্যেক বাড়িতেই বড় বড় কম্পাউন্ড, বাড়িগুলিও ফাঁক ফাঁকা, প্রশস্ত এবং সুপরিকল্পিত রাস্তা।'[২৩ক]

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর রমনা এলাকায় নির্দিষ্ট তিনটি বড় বাড়ি তৈরি করা হয়েছিলো গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের জন্য। তিনটি বাড়ির একটি ছিল বর্ধমানের রাজার জন্য বর্ধমান হাউজ, যা এখন বাংলা একাডেমী। এই ঐতিহাসিক বাড়িটির ইতিহাস সবারই জানা। একটি ছিল হুদা হাউজ-- নবাব শামসুল হুদার জন্য। এ বাড়িতে একসময় ছিল উইমেন্স হোস্টেল, পরে যা রূপান্তরিত হয়েছে রোকেয়া হলে। আরেকটি ছিল হুইলার হাউজ। সম্ভবত এটি ছিল বর্ধমান হাউজের পাশে সেই বাড়িটি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময় ক্রুদ্ধ জনতা যা পুড়িয়ে দিয়েছিলো। ড. আবদুল্লাহ জানিয়েছেন, বর্তমান উপাচার্য ভবনটি নির্মিত হয়েছিলো তখন লেঃ গভর্নরের জন্যে।[২৪]

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিককার ছাত্র। তাঁর আত্মজীবনীতে

রেখে গেছেন তিনি ত্রিশ দশকের রমনার ছবি -

> '...উত্তর অংশটি সরকারী কেষ্টবিষ্টুদের বাসভূমি, মধ্যিখানে আছে বিলেতী ব্যসন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, আছে ঢাকার নাগরিকদের পক্ষে অপ্রবেশ্য ঢাকা ক্লাব, যেখানে মধ্য বিলাসী বল নৃত্যপ্রিয় শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ ও নারায়ণগঞ্জের পাটকল চালক ফিরিঙ্গিরা নৈশ আসরে মিলিত হন; আর আছে কানন বেষ্টিত উন্নত চূড়া একটি কালী মন্দির, যেখানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্ঘ্য দিতে আসেন। শাহবাগের মা'কে, সেই দিব্যবিড়াম্বিত ব্রাহ্মণী যিনি পরবর্তী কালে মা আনন্দময়ী নামে সর্বভারতে বিখ্যাত হন। কিন্তু দক্ষিণ অংশটি পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয় অধিকারভুক্ত, সেখানে ছাত্র এবং অধ্যাপক ছাড়া ভিড় দেখা যায় শুধু শীতে বর্ষায় শনিবারগুলির অপরাহ্নে যখন জুয়াড়ি এবং বেশ্যায় বোঝাই খড়খড়ি তোলা ঘোড়ার গাড়ি ছোটে অনবরত রেসকোর্সের দিকে— শান্ত রমনাকে মর্দিত করে, কলেজ ফেরতা আমাদের চোখে মুখে কর্কশ ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে...'[২৫]

প্রায় সে সময়ের রমনার আরেক অংশের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন যোবায়দা মীর্জা। তাঁর বাবার সঙ্গে তিনি প্রায়ই বেড়াতে যেতেন অখিল বাবুর বাগানে। আগেই বলেছি অখিল বাবু ছিলেন প্রাউডলকের প্রধান সহকর্মী। মনে হয় প্রাউডলক চলে গেলে, নতুন গড়ে উঠতে থাকা রমনা পার্কের পরিচর্যার ভার পড়েছিলো অখিল বাবুর ওপর। তিনি থাকতেনও বাগানের পাশে। লিখেছেন যোবায়দা মীর্জা -

> 'এখন যেখানে সড়ক ভবন, ইঞ্জিনিয়ারস ইনষ্টিটিউট, রমনা পার্ক, টেনিস কমপ্লেক্স, পি জি হাসপাতাল, হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল [বর্তমানে শেরাটন] তখন সমস্ত এলাকাটা জুড়ে ছিল এই বাগান ও কিছু কিছু জঙ্গল হাতীর পুল পর্যন্ত। এধারে বিশপস হাউস, সার্কিট হাউস, মিন্টোরোডে ছাড়া ছাড়া দু'একটা বাড়ি, রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এসে যে বাড়িটায় [পুরোনো গণভবন] ছিলেন, এমনি কয়েকটা বাড়ি নির্জন দ্বীপের মত দাঁড়িয়েছিল— আর সব ফাঁকা। সড়ক ভবনের উল্টোদিকে পেট্রোল পাম্পটাও তখন ছিল না তবে এর লাগোয়া যে প্রায় মজা পুকুরটা এটার তখন স্বাস্থ্য ভাল ছিল, এখানে ছোট্ট একটা বাড়িতে বাবু অখিল নিয়োগী থাকতেন। ...ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারের [এখনকার হাইকোর্টের ভিতরে] রমনা পার্কের দিকে সীমানায় কাটা মেহেদীর বেড়া ডিঙ্গিয়ে— বেড়ার এপারে দুধাপ আর ওপারে দুধাপ সিঁড়ি ছিল এই বাগানে যাওয়ার পথ।'[২৬]

রমনা তখন বলা যায় গাছ গাছালিতে ঢাকা, মনোরম এক শহরতলি। এই

শহরতলিতে পায়ে চলার সুরু পথ। মাঝে মাঝে লাল রংয়ের সুদৃশ্য ইমারত— রমনার সীমানার শেষ প্রান্তের [পূর্বে] বাড়িটি ছিল সত্যেন বসুর, উত্তরে এখনকার মন্ত্রী পাড়ার দু-চারটি বাড়ি, পশ্চিমে এখনকার নীলক্ষেতের শেষ প্রান্তে [পুরোনো রেললাইন] ছিল কবি মোহিতলাল মজুমদারের বাড়ি, দক্ষিণে বিশ্ববিদ্যালয় [মেডিকেল কলেজ]। এ সীমানার মধ্যে ছিল রমনা হাউস [বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এক সময় সলিমুল্লাহ ছাত্রাবাস], চামেলী হাউস [বর্তমানে সিরডাপ কার্যালয়, ভুল করে যে বাড়ির নাম বলা হচ্ছে চামেলী হাউস', এক সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীবাস] লাটভবন [পুরোনো হাইকোর্ট ভবন, এক সময়ের ঢাকা কলেজ], কার্জন হল [টাউন হল হিসেবে যা নির্মিত হয়েছিলো] ইত্যাদি। বাড়িগুলি ছিল ছিমছাম, ফুলে ফলে ঢাকা। মোহিতলাল মজুমদারের বাড়ির বাগান বিশেষ ঋতুতে গন্ধে ভুরভুর করতো। সত্যেন বোসের বাড়ি [যেটা ভেঙে নির্মিত হয়েছে প্রেসক্লাব] সম্পূর্ণ ফুলে ফলে ঢাকা ছিল। 'বড় বড় গাছগুলো থেকে আরম্ভ করে ছাদ পর্যন্ত নানা রংয়ের বাগানবিলাস। মাধবী, মালতী, হাস্নুহেনা -- আরো কত ফুল বর্ণ ও সুগন্ধি ছড়িয়ে যেন স্বপ্নপুরী সৃষ্টি করত।[২৭] যোবায়দা মীর্জা আরো জানিয়েছেন,'এখনকার রমনা পার্কের লেকটা হাইকোর্টের ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছিল। এর কিছু অংশ রেসকোর্সের মধ্যেও ছিল। খুব সম্ভব এই লেকটি মোগল আমলে তৈরি করা জলপথের একটি অংশ যা এখন রমনা পার্কেই সীমাবদ্ধ। হাইকোর্টের পুকুরটির [যা এখন ঈদগাহ] অন্যতম আকষর্ণ ছিল ভিকটোরিয়া রেজিয়া।'[২৮]

বুদ্ধদেব বসু যে শাহবাগের মা'র কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি ছিলেন নবাবের শাহবাগ বাগানের কর্মচারী বা তত্ত্বাবধায়কের স্ত্রী। তত্ত্বাবধায়কের নাম ছিল রমণী মোহন চক্রবর্তী। বাজিতপুর থেকে চাকরি নিয়ে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী মা আনন্দময়ী, তাঁর নাম দিয়েছিলেন বাবা ভোলানাথ। তিনি রমা পাগলা নামেও ছিলেন পরিচিত। সাধক হিসেবেও ছিলেন খ্যাত। শাহবাগে অবস্থানকালেই দুজন বিশেষ করে আনন্দময়ী ধর্মভীরুদের কাছে অধ্যাত্মিক শক্তির ধারক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে সাধিকা হিসেবে তিনি পূজিত হয়েছিলেন সারা ভারতে। ঢাকাতে অবস্থানকালে তাঁর ভক্তরা রমনা ও সিদ্ধেশ্বরীর কালীবাড়িতে দুটি আশ্রম তৈরি করে দিয়েছিলেন। ত্রিশ দশকের রমনার সেই আশ্রমের বর্ণনা রেখে গেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত। তিনি ছিলেন আনন্দময়ীর ভক্ত। তাঁর বর্ণনা--

'আশ্রমের প্রবেশ দ্বার পূর্ব্বদিকে। আশ্রমে প্রবেশ করিলেই পশ্চিম দিকে টিনের ছাদ দেওয়া একটি নাতিবৃহৎ নাটমন্দির দেখা যায়। পরে শুনিতে পাইলাম যে উহা শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সেন (মুন্সেফ) মহাশয় তাঁহার কন্যার স্মৃতি রক্ষার্থে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং মা উহার নামকরণ করিয়াছেন 'নামঘর'। উৎসবাদি উপলক্ষে ঐ মন্দিরে কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। উহার উত্তর দিকে ক্ষুদ্র গুহাসদৃশ

একটি ইস্টক নির্ম্মিত কোঠা আছে। উহার মধ্যে শ্রী শ্রী মায়ের পাদপদ্ম স্থাপন করা হইয়াছে। এই কোঠার সংলগ্ন উত্তর দিকে আশ্রমের মন্দির। মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপিত আছে। বেদির উপর বিষ্ণু, অন্নপূর্ণা ও কালী মূর্ত্তি এক আসনেই স্থাপিত। বেদির নিচে অন্য এক কালী মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ। অন্যান্য বিগ্রহের সহিত ইহারও পূজা হইয়া থাকে। ফটোগ্রাফ যে মূর্ত্তি তাহার বেদির নিচে এক গহ্বরে স্থাপিত। বৎসরে মাত্র একবার মা'র জন্মোৎসবের সময় ঐ মূর্ত্তি দেখা যায়। অন্য সময়ে গহ্বরের দ্বার রুদ্ধ থাকে।
এই মন্দিরের উত্তর-পূর্বদিকে একটি চৌ-চালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খড়ের ঘর আছে। উহার মেজ ও বারান্দা ইট দিয়া বাঁধান। উহাই মা'র থাকিবার ঘর।'[২৯]

অমূল্য বাবু ঐ সময়ের শাহবাগেরও একটি বর্ণনা রেখে গেছেন। তাঁর মতে বাগানের সামান্য অংশই তখন ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো। লিখেছেন তিনি –

'শাহবাগ এককালে ঢাকার নবাবদের বিলাস নিকেতন ছিল। ইহা রমনায় ঘোড়দৌড়ের মাঠের পশ্চিম দিকে এক বিশাল ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত। এই বাগানটি ফলফুলের গাছে পরিপূর্ণ। ইহার ভিতর ছোট বড় কতকগুলি ইট নির্মিত গৃহ আছে। পাথর দিয়া বাঁধান নাচঘরটি দেখিতে খুব সুন্দর। উহার পার্শ্বেই বড় একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চারিদিকে দেশী ও বিলাতী ফুলের মনোরম উদ্যান। ইহা ব্যতীত বেগমদিগের স্নানের জন্য আগাগোড়া বাঁধান একটি পুকুর। ইহা কৃত্রিম উপায়ে জলে পরিপূর্ণ করা হইত এবং ঐ জল বাহির হইবার প্রণালীও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুকুরের চারিদিক উঁচু দেওয়াল দিয়া ঘেরা। এ বাগান এত বৃহৎ যে ইহার অধিকাংশ সংস্কারাভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে। ...সাধারণের ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার নাই।'[৩০]

শাহবাগের মধ্যে এক বুজর্গের কবরের কথাও বলা আছে।

'শাহবাগের মধ্যে এক মুসলমান ফকিরের কবর আছে। কবরটি একটি দালানের মধ্যে এবং ঐ দালানের দরজার বাহির হইতে তালা দিয়া বন্ধ। তবে দালানটির কতক অংশে জালী থাকায় বাহির হইতে ভিতর দেখা যায়। [৩১]

বুজর্গের এক শিষ্যের কবরও ছিল কাছে। অনুমান করছি, বর্তমান মধুর ক্যান্টিনের পাশে কলাভবনের মূল দেওয়ালের পাশে অবহেলায় যে কবরটি পড়ে আছে, সেটিই হয়ত সেই বুজর্গের কবর।

বুদ্ধদেব বসু উল্লেখ করেছেন ঢাকা ক্লাবের কথাও। ঢাকার অভিজাত ও এলিটদের মিলনস্থল, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় ঢাকার নাগরিকদের পক্ষে অপ্রবেশ্য ঢাকা ক্লাব,

'যেখানে মদ্যবিলাসী বল নৃত্য প্রিয় শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ ও নারায়ণগঞ্জের পাটকল চালক ফিরিঙ্গিরা নৈশ আহারে মিলিত হন।'

বলতে গেলে, ঢাকার শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী ও নাগরিকরা বাধ্য হয়েছিলো এই ক্লাব গড়ে তুলতে। কারণ তাদের সামাজিকতা ও অবসর বিনোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কোনো জায়গা ছিল না। এর সঙ্গে অবশ্য ঘোড়ার দৌড়ের ব্যাপারটিও জড়িত। ঘোড়া ছিল সাহেবদের অন্যতম ভালোবাসা, সহচর, যে কারণে আমরা দেখি উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জিমখানা ক্লাবের উৎপত্তি। ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতাগুলি আয়োজন করতো এসব জিমখানা ক্লাব।

ঐ সময়, আগেই উল্লেখ করেছি, ইংরেজদের অবসর বিনোদনের প্রধান মাধ্যম ছিল ঘোড়দৌড়। আর ছিলো পোলো যা উপমহাদেশের এ অঞ্চলেই প্রথম প্রচলিত হয়েছিলো। আর রেসের আয়োজন করতো নবাবদের পর, ঢাকা ক্লাবের সহযোগী জিমখানা।

ঢাকা ক্লাবের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায় ১৯১১ সাল থেকে কারণ ঐ সময় তা রেজিস্ট্রি করা হয়েছিলো। তবে, বিভিন্ন সূত্র থেকে এর একটি পটভূমিকা [অনুমানভিত্তিক] গড়ে তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কের মূল নাম আন্টাঘর ময়দান। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এই ময়দানের পাশে ছোট এক দালানে ছিল আর্মেনীদের এক ক্লাব। এই ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলতেন আর্মেনীরা। বিলিয়ার্ড বলকে ঢাকাইয়ারা বলতেন আন্টা আর ক্লাবটিকে আন্টাঘর। সেই থেকে আন্টাঘর ময়দান। উনিশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজরা কিনে নিয়েছিলেন দালানটি কিন্তু তা এতই জীর্ণ ছিল যে সেটি ভেঙে ময়দানের আয়তন বাড়াতে বরং তাঁহারা সাহায্য করেছিলেন। এ সময় অবশ্য ঢাকা ক্লাব নামটি আমরা পাই না। কিন্তু নথিপত্রে দেখা যায়, আন্টাঘর ময়দানের কাছে বর্তমান ক্লাবের এক একর জমি ছিল [সুত্রাপুর মৌজা ঃ খতিয়ান : ৬৯৪, প্লট ৬৬৪-৬৬৫]। ঢাকা ক্লাবের পুরনো কর্মচারীদের মতানুসারে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ক্লাব ঐ এলাকায় তিন একর জমির জন্য খাজনা দিত।[৩২]

১৮৫১ সালে ঢাকা ক্লাব নামটি প্রথম পাই। এক সংবাদে জানা যায়, ঢাকা ক্লাব একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করেছিলো। বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল উপপত্নী করা ভাল না বিবাহ করা ভাল। উপপত্নী রাখার পক্ষে ছিলেন স্কুল শিক্ষক কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায় এবং বিপক্ষে ছিলেন ইংরেজ চার্লস পোট। ১৮৮৮ সালের আরেক সংবাদে জানা যায়, সাহেবদের একটি ক্লাব চলতো ঢাকার নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায়।[৩৩]

বর্তমান ঢাকা ক্লাবের সঙ্গে উপরোল্লিখিত ক্লাবের সরাসরি কোন যোগাযোগ আছে কিনা জানি না, তবে বলা যেতে পারে অষ্টাদশ শতক থেকে সাহেবদের একটি ক্লাব গঠনের প্রচেষ্টার ফলেই বর্তমান ক্লাব। কারণ ১৯১১ সালে রেজিস্ট্রি করার আগেও দেখা যায় ক্লাব পাঠাগারে রক্ষিত আছে ১৯১০ সালে সীলমোহরাকৃত বই।

ঢাকা ক্লাবের বর্তমান জমি পাওয়া গিয়েছিলো ঢাকার নবাবদের কাছ থেকে।

১৯৪১ সালে সরকার রমনা এলাকার যেটুকু নবাবদের কাছে ছিল তা তাদের থেকে নিয়ে নিয়েছিলেন এবং তার পর ক্লাবকে ইজারা দিয়েছিলেন, রমনার ৫২৪ বিঘা। এর মধ্যে রেসকোর্স ছিল দুশো নব্বই বিঘা, গল্ফ কোর্স দুশো উনিশ বিঘা এবং বাকি পনের বিঘায় ছিল ক্লাবভবন ও চত্বর। বর্তমান শেরাটন হোটেল, বেতার ভবন, ডায়াবেটিক সমিতি— এসব কিছু গড়ে উঠেছে ক্লাবের সেই জমির ওপর।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ সরকার রমনা সিভিল স্টেশন অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দু-তৃতীয়াংশ জমি ও ভবনাদি রিকুইজেশন করে নিয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত এ জমি ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি। এ তথ্য জানিয়েছেন ড. সিরাজুল ইসলাম। এছাড়া গত চল্লিশ বছরে কর্তৃপক্ষের গাফিলতির দরুন রমনা এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় অনেক জমি হারিয়েছে এবং হারাবে।

বঙ্গভঙ্গের সময়, লিখেছেন ঢাকার উকিল হৃদয়নাথ মজুমদার তার আত্মজীবনীতে— রমনার বনভূমিতে বড় লোকেরা যত পারছে জমি কিনছে, বাড়ি বানাচ্ছে। অবশ্য বঙ্গভঙ্গের পরই এই ঝোঁক হ্রাস পেয়েছিল। রমনা তখন আবার পরিণত হয়েছিলো নিরিবিলি এলাকায়। হৃদয়নাথ কিন্তু তখনই লিখেছিলেন

> কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন রমনাই হয়ে উঠবে ঢাকা শহরের সমস্ত অফিস আদালতের কেন্দ্র। তখন চক, নলগোলা, বাবু বাজার, ইসলামপুর এবং বাংলা বাজারের মতো পুরনো অঞ্চলগুলি হারিয়ে ফেলবে তাদের জৌলুস। আর উত্তরে গড়ে উঠবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।[৩৪]

হৃদয়নাথের সম-সাময়িকরাও বোধহয় কখনও ভাবেননি এ ভবিষ্যদ্বাণী একদিন সত্য হয়ে উঠবে।

পঞ্চাশ দশকের মধ্যেই রমনার বিস্তৃত ময়দানের সীমানা মোটামুটি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিলো। রমনার মূল মাঠ পরিচিত হয়ে উঠেছিলো রমনা রেসকোর্স হিসেবে, আরেক অংশ রমনা পার্ক হিসেবে। তবে এখানে উল্লেখ্য মুঘল আমলতো বটেই, এ শতকের প্রথম দশকে এবং এখনও রমনা রয়ে গেছে অভিজাত এলাকা হিসেবে।

এই রমনায় মনে পড়ে, পঞ্চাশের দশকে একটি ছোট চিড়িয়াখানা ছিল যা দেখার জন্য কৌতূহলী দর্শকের অভাব ছিল না। তবে অনেকের স্মৃতি থেকে তা হারিয়ে গেছে। সম্প্রতি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর বইয়ে সে তথ্যটুকু দিয়েছেন। ষাটের দশকে মফস্বল থেকে ঢাকায় এসে দ্রষ্টব্য হিসেবে তিনি দেখতে গিয়েছিলেন চিড়িয়াখানা। তাঁর ভাষায়—

> 'হাইকোর্টের ভিতরের মাজারটা তখন এতো জমজমাট ছিল না। হাইকোর্ট সংলগ্ন চিড়িয়াখানাটাই ছিল প্রধান আকর্ষণ। চিড়িয়াখানাটা ছিল লেইকের পূর্ব পাড় ঘেঁষে, খুব অল্প জায়গা নিয়ে। হাইকোর্ট, মাজার এবং চিড়িয়াখানার এমন

অভূতপূর্ব সহাবস্থান পৃথিবীর অন্য কোথাও কখনো ছিলো বলে মনে হয় না। চিড়িয়াখানায় দুটো রয়েল বেঙ্গল, গোটা ছয়েক ভাল্লুক, একটি সিংহ, (ভুলও হতে পারে) কিছু সংখ্যক বানর এবং চার পাঁচটা হরিণ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।'[৩৫]

পরে এই চিড়িয়াখানাটি স্থানান্তরিত করা হয়েছিলো মীরপুরে।

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত রমনার রেসকোর্স হয়ে উঠেছিলো হতশ্রী এক ময়দান যার এক পাশে ছিল রেসকোর্সের কাঠের ক্ষয়ে যাওয়া বিবর্ণ রেলিং, অন্যদিকে দাঁড়িয়েছিলো জীর্ণ কালী মন্দির। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনী মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলো কালী মন্দির। সরকারী ঘোষণা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো ঘোড়দৌড়। আর রমনা রেসকোর্সের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিলো সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

মূল রমনা এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। স্বাধীনতার পর যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তাদের কাছে এ নামেই পরিচিত হয়ে উঠবে রমনা। আমাদের কাছে এখনও যা স্মৃতি তাও একসময় হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে। ভবিষ্যতের শিশুরা যখন বাংলাদেশের ইতিহাস পড়বে তখন হয়তো মাঝে মাঝে মুখোমুখি হবে রমনা শব্দটির। কারণ, এই রমনা রেসকোর্সেই ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমান বিশাল এক জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন স্বাধীনতার কথা এবং এখানেই সেই বছরের ১৬ই ডিসেম্বরে অপরাহ্নে, ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো পাকিস্তানের বিশাল সেনাবাহিনী সৃষ্টি হয়েছিলো এক নতুন স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ।

তথ্যপঞ্জী

১. জেমস টেইলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা* [মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত] বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৬০।

২. Syed Muhammed Taifoor, *Glimpses of old Dhaka*, Dacca, 1984, pp. 261-262.

৩. Ibid.

৪. Ahmad Hasan Dani, Dacca, 1956 p. 25.

৪-ক. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Henry walter, 'census of the city of Dacca', Asiatic Researches, Calcutta, xv11. 1832.

৫. Taifoor, op cit. p. 262.

৬. মুনসী রহমান আলী তায়েশ, *তারিখ ই ঢাকা* (আ. ম. ম. শরফুদ্দীন অনূদিত], ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৮৬।

৭. Taifoor, op cit. p. 59.

৮. Sharifuddin Ahmed, Dacca, Curzon Press, U. K. p. 130.

৯. Ibid.

১০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, দানীর প্রাগুক্ত *গ্রন্থ*।

১১. ঐ।

১২. যোবায়দা মীর্জা, *সেই যে আমার নানা রংয়ের দিনগুলি*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ২৩।

১৩. শরিফুদ্দিনের প্রাগুক্ত *গ্রন্থ*, পৃ. ১৩১।

১৪. ঐ।

১৫. মুনতাসীর মামুন [সম্পাদিত], *গণিউর রাজার রোজনামচা*, বিচিত্রা, ২২.৯.১৯৭৮।

১৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ আবুদল্লাহ, হাকিম হাবিবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮১।

১৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ঢাকা, ১৮৮৮।

১৮. ঐ, ১৮৯৫।

১৯. ঐ, ১৮৯১।

২০. ঐ।

২১. তাইফুর, প্রাগুক্ত *গ্রন্থ*, পৃ. ২৫৫।

২২. দেখুন, দ্বিজেন শর্মা, *শ্যামলী নিসর্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৩. ড. সিরাজুল ইসলামের চিঠি, *দৈনিক সংবাদ*, এপ্রিল ১৯৮৭।

২৪. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ১০০।

২৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বুদ্ধদেব বসু, *আমার যৌবন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২৬. যোবায়দা মীর্জা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

২৭. ঐ, পৃ. ১৯।

২৮. ঐ।

২৯. অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, *শ্রী শ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৩৮, পৃ. ২-৩।

৩০. ঐ, পৃ. ১৬।

৩১. ঐ, পৃ. ১৭।

৩২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *Dhaka Club : Past and Present*, Dhaka, 1984.

৩৩. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববাংলার সভা-সমিতি*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৮।

৩৪. মুনতাসীর মামুন, *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর*, ব্রাক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৭।

৩৫. নির্মলেন্দু গুণ, *আমার ছেলেবেলা*, পল্লব প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৯৫।

ঢাকার পঞ্চায়েত

খাজা মোহাম্মদ আজমের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য। ১৯০৭ সালে, তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন ঢাকা পঞ্চায়েত সমূহের তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারিনটেন্ডেন্ট। নবাব পরিবার বা নবাব সলিমুল্লাহই তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন এ পদে। এতেই বোঝা যায় বেশ নির্ভরযোগ্য সদস্য ছিলেন তিনি নবাব পরিবারের। কিন্তু একটি জিনিস জানা যায়নি, তা'হলো, পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধায়ক পদ সৃষ্টি হয়েছিলো কবে থেকে? কে ছিলেন এ পদের নিয়োগকর্তা? অনুমান করে নিতে পারি ঢাকার মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নেওয়া হতো নবাব পরিবারের প্রধানকে। স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার মুসলমানদের পঞ্চায়েতের হর্তাকর্তাও ছিলেন তিনি এবং সে পদমর্যাদার কারণে পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধায়কের নিয়োগ পত্র দিতেন এবং এ পদ ছিল খুব সম্ভব অবৈতনিক।

খাজা আজম ছিলেন ঢাকার সমস্ত পঞ্চায়েতের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক। এর আগে, ঢাকার মুসলমানদের দু'ধরনের পঞ্চায়েত 'বারা' ও 'বাইশ'-এর ছিলেন দুজন আলাদা সুপারিন্টেন্ডেন্ট। ১৯০৭ সালে ঐ দুটি পদ উঠিয়ে করা হয়েছিলো তত্ত্বাবধায়কের একটি পদ এবং খাজা আজম নিযুক্ত হয়েছিলেন সে পদে।

পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার পর খাজা আজম রচনা করেছিলেন ঢাকার পঞ্চায়েতের ওপর একটি পুস্তিকা। বইটির নাম 'দি পঞ্চায়েত সিষ্টেম অফ ঢাকা।' অধুনা দুষ্প্রাপ্য এ বইটি এখনও ঢাকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ওপর একমাত্র তথ্যবহুল বই। কিন্তু সরাসরি খাজা আজমের ব্যাখ্যা মনে রেখে বইটি পড়লে একপেশে ধারণা হতে পারে। তবে যেখানে খাজা আজম,পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, কার্যাবলী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন তা নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু গ্রন্থের প্রথমাংশে যেখানে তিনি আলোচনা করেছেন পঞ্চায়েতের উদ্ভাবের ওপর তা বিনা বিচারে গ্রহণ না করাই শ্রেয়।

ঢাকা শহরের বিভিন্ন মহল্লায় মুসলমান অধিবাসীদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিলো বিভিন্ন জায়গায়। এ ব্যবস্থা ছিল বেশ কার্যকরও। কিন্তু এ ব্যবস্থার ওপর তেমন কিছু কেউই লিখে যাননি। উনিশ শতকে লেখা ঢাকার উপর দুইটি বইয়ে, লেখক জেমস টেইলর ও ওয়াল্টার্স অনেক খুঁটিনাটি তথ্য দিয়েছেন, কিন্তু

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ওপর তেমন কিছুই জানান নি। শুধু ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত জেমস ওয়াইজের বইতে এ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। এবং তারপর খাজা আজমের গ্রন্থ। আমরা কি তা'হলে ব্যাপারটি এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগের আগে ঢাকায় এ ব্যবস্থা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তা সুসংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো ঢাকার নবাবদের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ নবাব পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায়, ঢাকার প্রতিটি মহল্লার পঞ্চায়েত সুদৃঢ় হয়েছিলো। এবং নবাবরা নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার মাধ্যম হিসেবে এটিকে ব্যবহার করেছিলেন। যদি তা না হয়, তা'হলে উনিশ শতকের মধ্যভাগের আগে প্রকাশিত বইপত্রে এর উল্লেখ নেই কেন?

সুতরাং, এখন দেখা যাক, ঢাকায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিলো কি ভাবে? প্রথমে পর্যালোচনা করা যাক, ডা. ওয়াইজের মতামত

প্রতিটি মুসলমান 'কওম' বা শ্রেণীতে আছে পঞ্চায়েত। ব্যবসা বাণিজ্য এবং অন্য ব্যাপারে পঞ্চায়েতের অলিখিত আইনের কেউ বিরোধিতা করলে তার বিরুদ্ধে নেওয়া হয় কঠোর ব্যবস্থা।

প্রতিটি মুসলমান গ্রাম বা শহরের মহল্লায় আরেক ধরনের কার্যক্রম বিচারালয় আছে যা হিন্দু বর্ণের দল বা পঞ্চায়েত থেকে উদার। সাধারণ মানুষের মঙ্গলই পঞ্চায়েতের কাম্য। এ আদালত 'সেক্যুলার এবং রিপাবলিকান' যেখানে প্রতিটি সদস্যের ভোটদানের ক্ষমতা সমান যদিও পঞ্চায়েতের সভাপতির মতামতই প্রতিফলিত হয় প্রায় ক্ষেত্রে।

খাজা আজম ওয়াইজের ব্যাখ্যা নাকচ করে দিয়েছেন। লিখেছেন তিনি, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে চালু করেছিলেন পূর্ববঙ্গের মুষ্টিমেয় আদি ধর্মান্তরিত ও বহিরাগত মুসলমানরা। তাদের প্রতিবেশী হিন্দুরা সবসময় তাদের 'ম্লেছ' বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেন। সুতরাং সামাজিকভাবে নিজেদের রক্ষার জন্য এ ধরনের সংগঠনের তাদের দরকার ছিল। এছাড়া, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ওপর ফকিরদের (অর্থাৎ সাধু) প্রভাব ছিল বেশ। তারাও পঞ্চায়েত গঠনে প্রভাবিত করেছিলেন। এ প্রভাব বোঝা যায় পঞ্চায়েতে ব্যবহৃত বেশ কিছু শব্দে যেমন, 'চান্দা' যা ফকিররাই ব্যবহার করতেন। যেমন কোন কিছু ভাগ হলে পঞ্চায়েতের সর্দার দুভাগ পান, ফকিরদের ক্ষেত্রেও তাই হয়। সেজন্যে ডা. ওয়াইজ যে বলছেন, এটি হিন্দুদের থেকে ধার করা তা ঠিক নয়।

কিন্তু, খাজা আজমের এ যুক্তি মেনে নেওয়াও কষ্টসাধ্য। আদি মুসলমানরা যদি এ ব্যবস্থার উদ্ভাবক হয়ে থাকেন, তাহলেও আশেপাশের কোন ব্যবস্থা নিশ্চয় তাদের প্রভাবিত করেছিলো। কথাটা এভাবে বলা যেতে পারে, হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণ বা গ্রুপের নিজস্ব পঞ্চায়েত ছিল যা প্রধানতঃ রক্ষা করতো ব্যবসা বাণিজ্য বা পেশাগত স্বার্থ। অনেকটা গিল্ডের মতো। এ প্রথা পরে হয়তো পরিব্যাপ্ত হয়েছিলো হিন্দুদের সামাজিক জীবনেও। ধর্মান্তরিত মুসলমানরা হয়তো অসচেতনভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন (যদি প্রাচীন কালে এ ব্যবস্থা মুসলমানদের মধ্যে থেকে থাকে)। খাজা আজম নিজেও

লিখেছেন মুসলমান শাসক মুঘলরা এ ব্যবস্থা চালু করেনি। সুতরাংএ ব্যবস্থা প্রাচীন। তাহলে, সে পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যুক্তিটিই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

শুধু ঢাকায় নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় চালু ছিল পঞ্চায়েতে। সিদ্দিক খান লিখেছেন, বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন আমল থেকেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য। ওয়াইজ উল্লেখ করেছিলেন, ঢাকায় পঞ্চায়েতে পাঁচ থেকে পনেরো জন সদস্য থাকেন এবং প্রায়ই উদার ও শ্রদ্ধেয় হিন্দু ভদ্র লোকেরা এর সদস্য নির্বাচিত হন। এ তথ্যের আলোকেও খাজা আজমের যুক্তি টেকে না।

সুতরাং বলা যেতে পারে, প্রাচীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বা হিন্দুদের 'দল' প্রভাব ফেলেছিলো ঢাকাবাসীদের উপর। বিভিন্ন মহল্লায় প্রধানত নিজেদের বিরোধ মেটাবার জন্য তারা সৃষ্টি করেছিলেন পঞ্চায়েতের, ক্রমে তা পরিব্যাপ্ত করে নিয়েছিলো মহল্লাবাসীদের জীবন। তবে পঞ্চায়েত মুসলমানদের হলেও তা ধর্মীয় কোন সংগঠন ছিল না, বিশেষ করে বিচার-আচারের জন্য প্রয়োজন ছিল বিচক্ষণ উপদেশ। তাই হয়তো মহল্লার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, হিন্দু বা মুসলমান সদস্য হতেন পঞ্চায়েতের। হিন্দুদের 'দল' বা পঞ্চায়েত থেকে ছিল এটি আলাদা। কারণ, হিন্দুদেরটির ভিত্তি ছিল বর্ণ এবং খুব সম্ভব তা তাদের পেশাগত ব্যাপারেই মনোযোগ দিতো বেশি।

তবে জানিয়েছিলেন খাজা আজম, মুসলমানদের মধ্যেও পেশাগত কিছু পঞ্চায়েত ছিল। যেমন ভিস্তিদের। ঢাকা শহরের বিভিন্ন মহল্লায় বসবাসকারী ভিস্তিদের নিয়ে ছিল এ পঞ্চায়েত। মুহররমের সময় তাদের পঞ্চায়েত প্রধানকে বলা হতো নওয়াব ভিস্তি, কারণ, মুহররম মিছিলে ভিস্তিদের ছিল বিশেষ ভূমিকা এবং এ পদ ছিল বংশানুক্রমিক। কিন্তু এ ছিল পেশাগত ব্যাপার। মহল্লায় থাকলে তাকে মানতে হতো নিজ মহল্লার পঞ্চায়েতের নির্দেশ। এদিক থেকেও ঢাকার পঞ্চায়েত ছিল অন্য সব পঞ্চায়েত থেকে আলাদা।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর নবাব যখন 'ইসলামীকরণের' মাধ্যমে ঢাকার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে চাইলেন তখন গুণগত পরিবর্তন হয়েছিলো পঞ্চায়েতে। মুসলমানিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিলো পঞ্চায়েত সদস্য তথা পঞ্চায়েতের এবং নবাব পরিবার তাঁদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন পঞ্চায়েতকে।

ঢাকার শহরের আদিবাসীদের 'কুট্টি' বলা হতো। ভদ্রলোকরা কুট্টিদের থেকে নিজেদের আলাদা করে দেখতেন। কারণ, কুট্টিদের অধিকাংশ ছিলেন অশিক্ষিত ও দরিদ্র। কিন্তু ঢাকায় তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। মহল্লায় মহল্লায় তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে পঞ্চায়েত। এবং পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রণ করলে তারাও নিয়ন্ত্রিত থাকবেন। কামরুদ্দীন আহমেদও তাঁর আত্মজীবনীতে একথা লিখেছেন, অন্যভাবে। লিখেছেন তিনি, 'খাজা সাহেবরাই ঢাকার মুসলমানদের নেতৃত্ব করতেন। বুদ্ধি বা বিদ্যার জন্য নয়--বৃটিশরাজ তাদের সুনজরে দেখতেন বলে।' ১৯২১-২২ সালে আবুল হুসেন এম. এ. এল. এল. নওয়াব এসেস্টের কাগজ পত্র পরীক্ষা করে একটি চিঠি ফাঁস করে দিয়েছিলেন যার

ফলে খাজা পরিবার তাঁকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিলো। চিঠিটি লিখেছিলেন নবাব আবদুল গনি তাঁর ছেলে আহসানউল্লাহকে গত শতকের শেষ দশকে। ছেলেকে তিনি লিখেছিলেন যে, 'তিনি যেন মনে রাখেন যে ঢাকার কুট্টিরা তাদের প্রজা নয় অথচ তাদের প্রজার মত ব্যবহার করতে হবে খানদানের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এ সব লোক যদি লেখা পড়া শিখে বাস্তব অবস্থা জানতে পারে তবে খানদানের নেতৃত্বের পরিকল্পনা ছাড়তে হবে। তাদের অন্যভাবে টাকা পয়সা দিয়ে সময় সময় সাহায্য করতে কিন্তু স্কুলের ব্যবস্থা না করতে।'

খাজা পরিবারের কর্তারা তাই করেছিলেন। কুট্টি তথা পঞ্চায়েতকে তারা অর্থ সাহায্য করতেন। নবাব পরিবারের প্রধান বিভিন্ন মহল্লার পঞ্চায়েত সর্দারকে পরাতেন পাগড়ি, পড়াতেন মিলাদ এবং এই কারণেই সব পঞ্চায়েতকে একত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছিলো তত্ত্বাবধানের পদ আর সে পদে নিযুক্তি পেয়েছিলেন খাজা আজম। পঞ্চায়েতের সর্দাররাও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নবাবকে দেখতেন মুসলমানদের নেতা ও তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে, তবে সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর পরিবর্তন এসেছিলো সে ব্যবস্থায়। পরে তা আলোচনা করবো।

ঢাকা শহরের প্রতিটি মহল্লায় ছিল একটি করে পঞ্চায়েত। এর সদস্য ছিলেন মহল্লার সমস্ত মুসলমান বাসিন্দা। মহল্লার প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠান, অন্যান্য কার্যাবলী, এককথায়, মহল্লার মুসলমানদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতো এই পঞ্চায়েত। মহল্লার বিবাদ বিসম্বাদ সবকিছুর মীমাংসা হতো এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে।

১৯০৭ সালের দিকে, খাজা আজমের তথ্য অনুযায়ী ঢাকার পঞ্চায়েতের সংখ্যা ছিলো একশো তেত্রিশটি (অবশ্য, খাজা আজমের বইয়ের পরিশিষ্টে একশো বিয়াল্লিশটি মহল্লার উল্লেখ আছে)। এই একশো তেত্রিশটি পঞ্চায়েত বিভক্ত ছিল দু'ভাগে - 'বারা' (বারো) এবং 'বাইস' (বাইশ)। 'বারা' এবং 'বাইস' নাম দু'টির উদ্ভবের কারণ অবশ্য খাজা আজম জানাননি। তাঁর তথ্য অনুযায়ী ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়েছিলো পঞ্চায়েতগুলিকে। যে সব মহল্লার অধিবাসীরা 'মুসলমানী বাংলা' বলতেন তারা ছিলেন 'বারা' পঞ্চায়েতের অধীনে, যারা বলতেন উর্দু তারা ছিলেন 'বাইস' পঞ্চায়েতের অধীনে। এ পরিপ্রেক্ষিতে খাজা আজম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'বারা'র সদস্যরা ধর্মান্তরিত মুসলমানদের উত্তর পুরুষ এবং 'বাইস' এর সদস্যরা বহিরাগত মুসলমানদের। মনে হয়, 'বারা'র মুসলমানরা ছিলেন ঢাকা শহরের বাইরে থেকে যারা এসে বসতি বেঁধেছিলেন ঢাকায়, তারা। ভাষা ছিল তাদের বাংলা। 'বাইসে'র সদস্যরা ছিলেন মুঘল ও বহিরাগত মুসলমান, যারা এখানে বিয়ে করেছিলেন বা যাদের ঔরসজাত উত্তরাধিকারী ছিলেন বা যারা ঢাকা এসে ফিরে যাননি, তাদের উত্তর পুরুষরা। তারা উর্দু অথবা বাংলা উর্দু মিশেল 'ঢাকাইয়া' কথা বলতেন। তবে, 'বারা'র মুসলমানরা যে ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলতেন না এমন নয়। ঢাকা শহরে 'বারা' পঞ্চায়েতের সংখ্যা ছিল বাহাত্তরটি আর 'বাইস' পঞ্চায়েতের সংখ্যা ছিল একষট্টিটি। সমস্ত পঞ্চায়েতসমূহ আবার পরিচিত ছিল 'দায়রা-ই-মুত্তিয়ুল-ই ইসলাম' নামে।

পঞ্চায়েতের গঠন, আয়ের উৎস বা কার্যাবলী সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে তেমন হেরফের নেই। এক্ষেত্রে খাজা আজমের গ্রন্থ নির্ভরযোগ্য সুতরাং এখানে পঞ্চায়েতের গঠন, আয়ের উৎস ইত্যাদি সম্পর্কে যে তথ্য দিচ্ছি তার ভিত্তি খাজা আজমের গ্রন্থ। কিছু নতুন তথ্য দিয়েছিলেন জনাব নাছির আহমদ, লায়ন সিনেমার মালিক বিখ্যাত কাদের সরদারের ভাইপো। এ বিষয়ে ১৯৮৭ সালে রোজার সময় তাঁর সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার নেওয়ার নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগে তিনি পরলোক গমন করেন। না হলে হয়তো নতুন আরো অনেক তথ্য পাওয়া যেতো এ সম্পর্কে। জনাব নাছির যে সব তথ্য দিয়েছেন সেগুলি এ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের।

পঞ্চায়েত গঠিত হতো মহল্লার পাঁচজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে। সম্মিলিত ভাবে তাঁরা পরিচিত ছিলেন, 'পঞ্চ লায়েক বিরাদার' নামে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন সর্দার বা 'মির-ই-মহল্লা' যার নেতৃত্বে পরিচালিত হতো পঞ্চায়েত। খাজা আজম লিখেছেন, আগে পঞ্চায়েতের সর্দার গদি পেতেন বংশানুক্রমে, কিন্তু গত বিশ বছর ধরে (অর্থাৎ ১৯০৭ এর আগে) সর্দার নির্বাচিত হচ্ছেন। তবে দেখা গেছে, সর্দারের মৃত্যুর পর তাঁর ঘনিষ্ঠ কেউ বা পরিবারের প্রভাবশালী কোন সদস্যই নির্বাচিত হচ্ছেন সর্দার। পঞ্চায়েত সমূহের তত্ত্বাবধায়ক অবশ্য ইচ্ছে করলে নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করতে পারতেন। নবাব পরিবারের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই বোধ হয় করা হয়েছিলো এ নিয়ম।

সর্দার নির্বাচনের পর অন্যান্য পঞ্চায়েতের সর্দাররা মিলে ঠিক করতেন নতুন সর্দার পঞ্চায়েতের ফান্ডে কত টাকা চাঁদা দেবেন।

সর্দারী গ্রহণ করার দিন মহল্লার সবাই মিলে সর্দারকে উপহার দিতেন একটি পাগড়ি। এই পাগড়ি পরিচিত ছিল 'সর্দারী পাগড়ি' নামে। মহল্লার সবাই চাঁদা দিয়ে তৈরি করে দিতেন এ পাগড়ি। নাছির আহমেদ জানিয়েছেন, নবাব সলিমুল্লাহ বিভিন্ন মহল্লায় গিয়ে সর্দারদের পাগড়ি পরিয়ে দিতেন। সর্দারী গ্রহণ করার পর সর্দার মহল্লার সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। সর্দার কাজে গাফলতি দেখালে বা পঞ্চায়েতের কাজ পরিচালনায় অক্ষম হলে, পঞ্চায়েতের সদস্যরা তাকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন।

মহল্লার সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বিয়ের অনুষ্ঠানে সর্দারকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হতো। মহল্লার কারো মৃত্যু হলে, মহল্লাবাসীদের খবর দেওয়া, কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা এসব দায়িত্বও ছিল সর্দারের। এক কথায় মহল্লার সবকিছু নির্ভর করতো সর্দারের উপর।

কিন্তু সর্দার কারা হতেন? খাজা আজম উল্লেখ করেছেন, সাধারণত মহল্লার প্রভাবশালী (বা অর্থশালী) ব্যক্তিই সর্দার হতেন। কিন্তু তিনি কি পরিমাণ অর্থের মালিক ছিলেন? খাজা আজমের বইয়ের পরিশিষ্টে মহল্লার সর্দারদের যে তালিকা পাওয়া গেছে সেখানে সর্দারদের পেশার উল্লেখ নেই। কিন্তু নামগুলি পড়লে দেখা যায়, বেশ কিছু সর্দার হয়েছেন যাঁরা ছিলেন 'বেপারী' ও 'খলিফা'। 'বারা' পঞ্চায়েতের

সর্দারদের মধ্যে 'বেপারী' ছিলেন কয়েকজন, আর 'বাইস' এ খলিফা। দু'জন ডাক্তারের নামও পাওয়া গেছে। অনেকের নাম দেখে ধরে নেওয়া যায় তারা তেমন বিত্তবান ছিলেন না। যেমন বাদল সর্দার, হাইদু সর্দার, আছাদ সোনালাল, খাতির, হাসনু, রমজান, বুদলু রজব, দোসদী, জুম্মন প্রভৃতি। নাছির আহমেদ ছিলেন লায়ন সিনেমার গলির বাসিন্দা। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেছিলেন, সর্দারদের অনেকে, যেমন মঙ্গু খলিফা, মতি খলিফা ছিলেন দর্জি বা খলিফা। অনেকের ছিল আবার কাটা কাপড় ও পানবিড়ির দোকান। মহল্লায় যার একটি পাকা বাড়ি ও একটি দোকান ছিল তাকেই বড়লোক বলা হতো। কামরুদ্দিন আহমদ পঞ্চাশ ষাট বছর আগের ঢাকার স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, 'কুট্টিরা ওস্তাগারী, গাড়ি চালানো [ঘোড়ার], মাংস প্রভৃতি বিক্রি করতো। পরবর্তীকালে তারা চা বা সরবতের দোকান ছেড়ে কাপড়, জামা, জুতোর দোকান খুলতে লাগল। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করা যায় মীর্জা আবদুল কাদের সর্দারের। ছোটবেলায় খাজা ইসমাইল সাহেবের কাজ করত। কোকেনখোর খাজা সাহেবদের কাছ থেকে সে বেশ টাকা পয়সা গুছিয়ে নিয়েছিলো। তার প্রতাপ ছিল খুব।' কাদের সারদার পরে ঢাকার পেশাদারী থিয়েটার 'ডায়মণ্ড থিয়েটার' কিনেছিলেন এবং পরে তা পরিণত করেছিলেন 'লায়ন সিনেমায়'। এ যদি হয় বিশ ত্রিশ দশকের কথা তা হলে এর আগের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তবে মনে হয় মহল্লায় বিত্তবান হওয়াই সর্দার নির্বাচিত হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা ছিল না। 'খানদান' বা 'পেশী' ক্ষমতাও ছিল খুব সম্ভব যোগ্যতার মাপকাঠি।

পঞ্চায়েত সর্দারের পর স্থান ছিল 'নায়েব সর্দার'-এর। সর্দারের অনুপস্থিতিতে নায়েব সর্দারকে পালন করতে হতো সর্দারের দায়িত্বসমূহ।

মহল্লার দু'জন বায়োজ্যেষ্ঠও পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হতেন। তাঁরা পরিচিত ছিলেন 'লায়েক বিরাদার' নামে। পঞ্চায়েতের পঞ্চম সদস্য পরিচিত ছিলেন 'গুরিদ' নামে। তিনি ছিলেন বার্তাবহ। কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে বা কারো মৃত্যু হলে সর্দার গুরিদের মারফত খবর পাঠাতেন মহল্লার সবাইকে।

সামাজিক অনুষ্ঠানের তদারকি ছাড়াও পঞ্চায়েতের একটি প্রধান কাজ ছিল মহল্লার সব ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করা। মহল্লায় বিবাদ বিসম্বাদ দেখা দিলে সালিশীর জন্যে যে কোনপক্ষ পঞ্চায়েতের বৈঠকের জন্যে অনুরোধ জানাতে পারতো, তবে এর খরচ আহ্বানকারী পক্ষকে বহন করতে হতো। খরচ ছিল পান তামাকের, অন্য কিছুর নয়। সাধারণত এ ধরনের বৈঠক ডাকা হতো বৃহস্পতিবার রাতে। বাদী-বিবাদী ছাড়াও মহল্লার যে কেউ যোদ দিতে পারতেন 'মজলিস' বা বৈঠকে। 'লায়েক বিরাদার' এবং সর্দার প্রশ্ন করতেন বাদী-বিবাদীকে। তারপর দেয়া হতো রায়। দু'পক্ষকেই মেনে নিতে হতো পঞ্চায়েতের রায়। এবং এই রায়ের প্রতি কোন রকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা যেতো না। তবে, ইচ্ছে করলে অন্যান্য পঞ্চায়েতের সর্দারদের নিয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনালে ঐ রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যেতো। নাছির আহমেদ জানিয়েছেন, বিশ-ত্রিশ-এর দশকে, সর্দাররা কোন বিবাদ মেটাতে না পারলে যেতেন

কাজী জহুরুল হক, কাজী আলাউদ্দিন, হাকিম হাবিবুর রহমান, সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর এবং কাজী ইসমাইলের কাছে। এঁরা ছিলেন ঢাকার সে আমলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিত্ব। মনে হয়, নবাব সলিমুল্লাহর পর পঞ্চায়েতের ওপর নবাব পরিবারের আধিপত্য হ্রাস পাচ্ছিলো এবং ত্রিশ দশকে সে প্রভাব বোধহয় আর তেমন ছিল না। থাকলে, সর্দাররা উপরোক্ত ব্যক্তিদের কাছে যেতেন না। অথবা নবাব পরিবারের বিকল্প হিসেবে এঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এঁরা জমিদার ছিলেন না বটে, কিন্তু ছিলেন 'খানদানী' বংশের, সচ্ছল এবং শিক্ষিত-- এককথায় আহসান মঞ্জিলের বিপরীতে নতুন যুগের। সমাজে এঁদের আধিপত্যই তখন বৃদ্ধি পাচ্ছিলো।

তবে মহল্লার পঞ্চায়েতের রায়ের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ কেউ আপীল করতে যেতেন না। মহল্লার পঞ্চায়েতকে সহজে কেউ ঘাঁটাতে চাইতেন না। মহল্লার পঞ্চায়েতের রায় যদি কেউ না মানার সাহস দেখাতেন তবে তাকে একঘরে করা হতো। সামাজিকভাবে এই বর্জন পরিচিত ছিল 'বুন্দ' নামে। যে ব্যক্তির ওপর এই 'বুন্দ' জারি করা হতো তার সর্বনাশ হয়ে যেতো। ঐ ব্যক্তি যদি নিজের মহল্লা ছেড়ে অন্য মহল্লায়ও যেতো তাহলেও সেই 'বুন্দ' জারি থাকতো। ঢাকা শহরে তার পক্ষে তখন বসবাস করা হয়ে উঠতো অসম্ভব।

আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আরেক ধরনের শাস্তি ছিল। একথা উল্লেখ করেছেন জনাব নাছির। অপরাধীর পেটে কাঁঠাল বেঁধে বেত মারা হতো এবং তারপর বলা হতো দৌড়াতে। এরপর সর্দার সন্তুষ্ট হলে অপরাধী মুক্তি পেতো।

শহরের সমস্ত সর্দারদের একটি কাউন্সিল ছিল, এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে ১৯০১ সালের আদমশুমারীতে। কোন সর্দার কোন কারণে অভিযুক্ত হলে এই কাউন্সিলে তার বিচার হতো এবং কাউন্সিলের রায় তাকে মেনে নিতে হতো। অবশ্য কাউন্সিলের রায়ে সন্তুষ্ট না হলে, সর্দারের অধিকার ছিল পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধায়কের কাছে আপীল করার। এবং এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের রায়ই ছিল চূড়ান্ত।

পঞ্চায়েতের আরেকটি কাজ ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবে সাহায্য-সহযোগিতা করা। নবাব সলিমুল্লাহর পঞ্চায়েতকে ইসলামীকরণের সঙ্গে ছিল এটি যুক্ত। যে দুটি ধর্মীয় উৎসব পালনে পঞ্চায়েতকে বিশেষভাবে সহায়তা করতে হতো তা হলো মুহররম ও ফাতেহা ইয়াজদম।

মুহররমের এক থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত হোসেনী দালানে, শহরের বিভিন্ন পঞ্চায়েত রাতে মাতমের আয়োজন করতো। এ মাতম পরিচিত ভাটিয়ালী মার্সিয়া নামে।

গত শতকের শেষ দশকে নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের প্রধান আরেকটি উৎসব হিসেবে ফাতেহা-ইয়াজদমকে তুলে ধরেন। এ উপলক্ষে ঢাকা শহরের প্রতিটি পঞ্চায়েতকে তিনি টাকা দিতেন। এই টাকা ব্যয় করা হতো দুটি খাতে। প্রথম মহল্লা সাজানো, দ্বিতীয় মিলাদ পড়ানো। এ মিলাদেরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল— এটি পরিচিত ছিল 'ভাটিয়ালী মৌলুদ' নামে। হয়ত ভাটিয়ালী সুরে পড়ানো হতো বলেই এই নাম। নাছির আহমেদ, সলিমুল্লাহর সময়ে এক 'স্পেশাল মিলাদের' কথা উল্লেখ করেছেন।

মনে হয় এই স্পেশাল মিলাদই ছিল 'ভাটিয়ালী মৌলুদ' বা মিলাদ। তিনি জানিয়েছেন, সলিমুল্লাহ নিজে বিভিন্ন মহল্লায় এই মিলাদ পড়াতেন। মিলাদ পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহল্লায় মুসলমানদের সংগঠিত করতেন, অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতেন। এছাড়াও ফাতেহা-ইয়াজদমের সময়, পঞ্চায়েতসমূহ চকের মসজিদ সুন্দরভাবে সাজিয়ে উচ্চস্বরে সেখানে মিলাদ পড়াবার বন্দোবস্ত করতো।

মহল্লার প্রতিটি নতুন অধিবাসীকে পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার জন্য চাঁদা দিতে হতো।

মহল্লার যে কোন বিয়েতে, কনের মহল্লার পঞ্চায়েত বরের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা 'নজরানা' নিতো। এ ব্যাপারে প্রতিটি মহল্লায় নিজস্ব রেট ছিল। এই নজরানার নাম ছিল, 'পঞ্চায়েত-ই-রাকাম'। যদি কনের পিতা মহল্লার অন্য কারো জমিতে বা বাড়িতে বাস করতেন তাহলে বরকে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ছাড়াও দিতে হতো আরো কিছু অর্থ। এর নাম ছিল 'হাক্কি-ই জমিনদার' যার পরিমাণ সাধারণতঃ এক টাকার বেশি হতো না। পঞ্চায়েত ঐ টাকা দিয়ে দিতো কনের পিতার বাড়িঅলাকে। কনের মহল্লার মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যেও বরকে কিছু টাকা দিতে হতো যা পরিচিত ছিল 'হাক-আল্লাহ' নামে।

পঞ্চায়েতের স্থাবর সম্পত্তি ছিল পঞ্চায়েতের ঘর বা পরিচিত হতো 'বাংলা' নামে। এই 'বাংলা'য় দিনে মক্তব বসতো মহল্লার ছেলেমেয়েদের জন্য আর রাতের বেলা তা পরিণত হতো মহল্লার ক্লাবে। 'বাংলা'য় ব্যবহৃত এবং রক্ষিত জিনিসপত্র যেমন, সতরঞ্জি, বাতি, হুঁকো, গোলাপ পাশ, সামিয়ানা ইত্যাদিও ছিল পঞ্চায়েতের স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্গত। পঞ্চায়েত ফাণ্ডের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সর্দার।

নাছির উদ্দিন আহমদ তাঁর সাক্ষাৎকারে আমাকে আরো কিছু তথ্য জানিয়ে ছিলেন যা ঢাকার সমাজ জীবনের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে হয়তো এ বিষয়ে আরো কিছু জানা যেতো। কারণ, ঢাকায় যারা পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলতে পারতেন তাঁদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

তিনি বলেছিলেন, পঞ্চায়েতের একটি 'তোলা ব্যবস্থা' ছিল। সেটা কি রকম? মহল্লার প্রতিটি বাসায় একটি করে ঘট থাকতো। প্রতিদিন সকালে এক মুঠি চাল বা চারটি পয়সা সেখানে রাখা হতো। পঞ্চায়েত এই 'তোলা' সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতো। এই তোলা দিয়ে মসজিদ-মক্তবকে সাহায্য করা হতো ও রায়টের খরচ চলতো।

এখন এই রায়ট ও রায়টের খরচ সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। ১৯২৯ সাল থেকে ঢাকায় দাঙ্গার প্রকোপ শুরু হয়েছিলো। রায়ট শুরু হলে, পঞ্চায়েতের সর্দার তাঁর মহল্লার সব হিন্দুদের বলতেন বাড়ি থেকে না বেরুতে। সর্দার মহল্লা রক্ষা ও মুসলমানদের শৌর্য প্রকাশের জন্য লোক রাখতেন। ধরা যাক 'ক' মহল্লার দু'জন মারা গেছেন। তখন 'ক' মহল্লার সর্দারের দায়িত্ব ছিল অন্য এলাকার দু'জন কমিয়ে দেয়া। মহল্লার কেউ নিহত হলে তার সমস্ত দায়দায়িত্ব নিতেন সর্দার। দাঙ্গা যে করবে, সর্দারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উৎসাহে সে বেরিয়ে পড়তো সাইকেল নিয়ে এবং

ফিরে এসে বলতো 'পুরা হো গিয়া'। অর্থাৎ সংখ্যা সাম্য ফিরিয়ে আনা গেছে। তবে এই দাঙ্গার সময়, কেউ কারো বাড়ির ভেতর ঢুকতো না, সম্পত্তি দখল করতো না। রাস্তায় পেলে শুধু বধ করা হতো। এ কারণেই সর্দার নিজের মহল্লার হিন্দুদের বাড়ি থেকে বেরুনো নিষেধ করে দিতেন। তবে নাছির আহমদের মতে, এইসব দাঙ্গায় প্রায় ক্ষেত্রে নিহত হতো ফেরিঅলারা। ঢাকায় তখন ফেরিঅলার স্বর্ণযুগ। তারা বিভিন্ন মহল্লায় নিয়মিত ফেরি করতো। দাঙ্গার সময় না জেনে শুনে অনেকে বিভিন্ন মহল্লায় পা দিয়ে ফৌত হয়ে যেতো। তাঁর মতে, দাঙ্গার সময় এ ধরনের কার্যকলাপ ছিল 'মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারের মনস্তত্ত্ব— যে তোমার (হিন্দু) দাপট আমি মানি না। দাপট আমারও আছে।'

তা এই রায়টে নিহত ও ধৃত ব্যক্তিদের মামলা মোকদ্দমার খরচ চালাতো পঞ্চায়েত এই তোলা ব্যবস্থার মাধ্যমে। এ সময় মুসলমানদের হয়ে মামলায় লড়তেন প্রধানতঃ তিনজন এ. কে. ফজলুল হক, আবু হোসেন সরকার এবং রেজাই করিম। তাঁদের বিভিন্ন রকমের ফিস ছিল। যেমন রেজাই করিমের দুশো টাকা। কিন্তু এ ধরনের মামলায় তিনজনের ফিস ছিল বাঁধা— বিশ টাকা। এর বেশি না। এবং তাঁরাও সানন্দে বিশ টাকা নিয়ে মামলা চালাতেন।

ঢাকা শহরের পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন মহল্লার আরেকটি অবদান আছে যা আমরা ভুলে গেছি, তা হলো শহরে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি সম্ভব হয়েছিলো তা হলো জায়গীর প্রথা।

জায়গীর প্রথার চল উনিশ শতক থেকেই ছিল। ঢাকায় যিনি চাকরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন তার বাসায় এসে আশ্রয় নিতেন গ্রামের প্রতিবেশী থেকে আত্মীয়-স্বজন সবাই। এদের অনেকে ঢাকার স্কুল কলেজে পড়াশোনা করতেন। কারণ বিত্ত অর্জনের জন্য বিদ্যাও তখন ছিল প্রয়োজনীয়। অনেকে আবার আসতেন স্রেফ চাকরী বাকরির খোঁজে। তবে এটি প্রচলিত ছিল হিন্দু সমাজেই বেশি।

এ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে, গ্রাম থেকে মুসলমান যুবকরা আসতে লাগলেন ঢাকায় শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্য। এদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র কৃষকের সন্তান। ঢাকায় থেকে লেখাপড়ার খরচ চালানোর মতো সামর্থ্য তাদের ছিলো না। তখন ঢাকার এইসব মহল্লার দরিদ্র অধিবাসীরাই এদের হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছিলেন।

প্রায় প্রতিটি মহল্লায় এ ধরনের যুবকদের আশ্রয় দেওয়া হতো। তারা পড়াশোনা করতেন আর থাকতেন মহল্লায় কারো বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়ার ভারও ছিল গৃহকর্তার। এর বিনিময়ে গৃহকর্তার ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা দেখিয়ে দিতে হতো। শুধু যারা জায়গীর থাকতেন তাদের বলা হতো মাস্টার সাহেব। এই মাস্টার সাহেবদের মহল্লার সবাই দেখতেন শ্রদ্ধার চোখে; কারণ তাঁরা পড়াশোনা করছেন। আর মহল্লার অধিকাংশই তো নিরক্ষর। হাঁড়ির প্রথম খাবার তোলা থাকতো মাস্টার সাহেবের জন্য। প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারার ব্যবস্থা ছিলো তখন আদিম। সে কারণে প্রাতঃকৃত্যাদি সারার প্রথম অধিকার ছিল মাস্টার সাহেবের।

এই মাস্টার সাহেবদের অনেকের জায়গীর থাকার পরও পড়াশোনা চালাবার সামর্থ্য ছিল না। তখন অনেক ক্ষেত্রে, এর সমাধানের জন্যে গৃহকর্তারা এরকম অনেককে জামাই করে নিয়েছিলেন।

দু'দশকের মধ্যে এবং পাকিস্তান হওয়ার পর পর এই মাস্টার সাহেবরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন ছোট-বড় আমলা হিসেবে। এবং আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তারাই হয়ে উঠলেন সর্বেসর্বা।

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মাস্টার সাহেবরা অনেকে পুরনো স্ত্রী ত্যাগ করলেন 'সমাজে খাপ খায় না' দেখে। তারপর ঢাকা শহরে তাদের বাড়ির দরকার হলো। কিন্তু জমিতো সব আদি অধিবাসীদের। নাছির আহমদের মতে, তারা ঢাকায় বিভিন্ন জমি একোয়ার শুরু করলেন। নতুন রাজধানীর জন্যে জমির দরকার ছিল বটে, কিন্তু নাছির আহমেদের যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ধানমণ্ডি, কলাবাগান, গ্রীনরোড প্রভৃতি এলাকায় নতুন চাকুরীজীবীদের যে আবাসস্থল গড়ে উঠেছিল তা আদি অধিবাসীদের উৎখাত করেই। অর্থাৎ জমি একোয়ার করে আমলারা সেগুলি আবাসিক এলাকার জন্য চিহ্নিত করে নামমাত্র দরে কিনে নিয়েছিলেন। যাদের থেকে একোয়ার করা হয়েছিলো তাদের অধিকাংশের টাকা আর দেওয়া হয়নি। এবং নতুনভাবে 'এলটমেন্ট' করার সময় এমন ব্যবস্থা করা হলো যাতে কুট্টিরা নতুন এলাকায় জায়গা না পান।

জনাব নাছির জানিয়েছেন, ধানমণ্ডি, গ্রীনরোড মার্কেট, সোনারগাঁও হোটেলের সামনের জমিগুলিও ছিল বিভিন্ন সর্দারের। আলাউদ্দিন সর্দারের জমি ছিল ছয়শো বিঘা। খুব সম্ভব কলাবাগান এলাকাটা ছিল তাঁর। ঐ সময় এটি ছিল জঙ্গল এবং এলাকাটির দেখাশোনা করতেন তাঁর লাঠিয়াল ও গোয়ালা বশীরুদ্দীন [যার নামে বশীরুদ্দীন রোড]। আফিউদ্দিনের ছয়শো বিঘার অধিকাংশই একোয়ার করে নেওয়া হয়েছিলো। একোয়ার করা জমির প্রতি একরের জন্য ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছিল চারশো টাকা। এবং সে সব ক্ষতিপূরণের টাকা এখনও পাওয়া যায়নি। নতুন এই চাকরীজীবী শ্রেণী নিজেদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদি অধিবাসীদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল [যে কারণে চল্লিশ পঞ্চাশ দশকে দেখি, ঢাকার কুট্টিরা নতুন এই শ্রেণী (ছাত্রসহ)কে সুনজরে দেখেনি]। নাছির আহমদের ভাষায়, 'হাঁড়ির প্রথম দানাটা, মুরগীর রানটা বরাদ্দ ছিল মাস্টার সাহেবের জন্য। সেই মাস্টার সাহেব ডিপুটি হইয়া কোড়া মারলেন তাদের, কইলেন, এরা হইল কুট্টি বর্বর আর মাস্টার সাহেবরা আলাদা।'

এ ধরনের খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছেন কামরুদ্দিন আহমদ তাঁর আত্মজীবনীতে। লিখেছেন তিনি – 'পাকিস্তান হবার পরে বাস্তুহারাদের চাপে ও অন্যান্য জেলা থেকে স্থায়ী বাসিন্দারা ধীরে ধীরে শহরে এসে জমা হওয়ায় তারা হারিয়ে গেছে। আমার মনে হয় আয়ুব মোনেম সরকার দ্বারা নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ছিদ্দিক বাজারের মতি সর্দারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের যুগের অবসান হয়ে গেছে।'

ঢাকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কবে লুপ্ত হয়েছিলো তা জানা যায়নি। তবে ধরে নিতে পারি চল্লিশ দশক থেকেই; যখন মাস্টার সাহেবদের আগমন হতে লাগলো রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে। তখন পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও শিথিল হয়ে পড়লো। অর্থনীতির নতুন বিন্যাস, ১৯৪৭-এর পর বিশাল পরিবর্তন সবকিছু সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বোধ হয় ভাসিয়া নিয়েছিলো পঞ্চায়েতকে। তবে, ঢাকার পঞ্চায়েত, মহল্লার প্রতিটি অধিবাসীকে বেঁধেছিল এমন এক বাঁধনে, যেখানে সবাই সবার সুখ-দুঃখে অংশ নিতেন। সবাই জানতেন সবাইকে। পঞ্চায়েত আজ নেই বটে, কিন্তু সেই বাঁধনের রেশ এখনও রয়ে গেছে ঢাকার পুরনো সব মহল্লায় মহল্লায়।

পরিশিষ্ট

[খাজা আজম তাঁর গ্রন্থের শেষে একটি পরিশিষ্ট যোগ করেছিলেন। এই পরিশিষ্টে ঢাকার বিভিন্ন মহল্লা ও সর্দারদের নাম দেয়া আছে। এটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, পরিশিষ্টটি বিশ্লেষণ করলে আমরা জানতে পারবো কোন এলাকায় কোন ভাষাভাষীরা বসবাস করতেন, সর্দারদের সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি।]

ক্রমিক নং	সর্দারের নাম	মহল্লা	বিভাগ
১	গোলামুর রহমান	রায়সাহেবের বাজার	বারা
২	ফজলুর রহমান	ঐ	ঐ
৩	গোলাম হোসেন	রোকনপুর	ঐ
৪	ডাঃ আবদুল গনি	ঐ	বাইস
৫	আবদুল গনি	ঐ	বারা
৬	আবদুল মজিদ	কলতাবাজার	ঐ
৭	মঈনুদ্দিন	বাংলাবাজার	ঐ
৮	আবদুর রহমান	কাগজীটোলা	বারা
৯	হাফিজ আফতাবুদ্দিন	লক্ষ্মীবাজার	বাইস
১০	আবদুস সালাম	ঐ	বারা
১১	বাদলু সর্দার	সুত্রাপুর	ঐ
১২	হাইছু সর্দার	ফরিদাবাদ	ঐ
১৩	আবদুল	ঐ	ঐ
১৪	আব্বাস	গেন্ডারিয়া	ঐ
১৫	এলাহী	মাহুতটুলী	ঐ
১৬	ইসমাইল	আলমগঞ্জ	ঐ
১৭	আবদুল আজিজ	শরাফতগঞ্জ	বাইস
১৮	বোচা মিয়া	সাবেক শরাফতগঞ্জ	ঐ
১৯	মহিউদ্দিন	ঐ	ঐ
২০	নরসিং সর্দার	রোকনপুর	ঐ
২১	মনিরুদ্দিন	আশেক জমাদার লেন	ঐ
২২	নাজিমউদ্দিন	ঐ	ঐ
২৩	কারি সমির উদ্দিন	ঐ	ঐ

২৪	কামরুদ্দিন	জিন্দাবাজার লেন	ঐ
২৫	আবতাবউদ্দিন	ঐ	ঐ
২৬	রেঙ্গু বেপারী	কুমারটুলী	ঐ
২৭	আবদুল হাবিব	জামদানী নগর	ঐ
২৮	আসমত খান	তাঁতিবাজার	ঐ
২৯	মৌলভী ইব্রাহীন	রাজাদেউড়ি	ঐ
৩০	ইসরাইল	আলেজুম্মা	ঐ
৩১	নূর মোহাম্মদ	নারিন্দা	বারা
৩২	এলাহী বকস	কোম্পানীগঞ্জ	ঐ
৩৩	হানিফ বেপারী	দয়াগঞ্জ	ঐ
৩৪	করিম খান	করাতীটোলা	ঐ
৩৫	খলিল	ঐ	ঐ
৩৬	সোনালাল	দক্ষিণ মৈশুণ্ডি	ঐ
৩৭	হায়দার বকস	ঐ	ঐ
৩৮	ইসমাইল	ঐ	ঐ
৩৯	ওয়ালী বেপারী	ঐ	ঐ
৪০	আফির উদ্দিন	জোরপুল	ঐ
৪১	ডাঃ গোলাম রহমান	ঠাটারীবাজার	ঐ
৪২	রহিম বক্স	উয়ারী	ঐ
৪৩	মোহাম্মদ হোসেন	কাজীবাগ	বাইস
৪৪	ফাইজু সর্দার	বেগমবাজার	বারা
৪৫	কাদের বক-শ	গোপালঘাট	ঐ
৪৬	মংগু বেপারী	বাগদেসার	বাইস
৪৭	হাসান জান	আরমানিটোলা	[উল্লেখ করা হয়নি]
৪৮	রহিম উদ্দিন	সামসাবাদ	বারা
৪৯	গফুর বেপারী	ঐ	ঐ
৫০	আবদুল খালেক	ঐ	ঐ
৫১	রহমত খান	কসাইটুলী	ঐ
৫২	কামরুদ্দিন	ঐ	বাইস
৫৩	সোবহানী	ঐ	ঐ
৫৪	আজাদ বখশ	মাহুতটুলী	ঐ
৫৫	আবদুল লতিফ	ঐ	ঐ
৫৬	খাতির	ঐ	ঐ
৫৭	আলম খলিফা	সাতরওজা	ঐ
৫৮	হাসনু	চানখারপুল	ঐ
৫৯	আবদুল গফুর	মীর্জা আলীনকী দেউড়ি	ঐ
৬০	আজিজ বখশ	সিক্কাটুলী	ঐ

৬১	জালাল খলিফা	কাহারটুলী	ঐ
৬২	কেরামত আলী	মোকিমবাজার	ঐ
৬৩	আবদুস সামাদ	আবদুল হাজী বাজার	ঐ
৬৪	আবদুল গনি	আগামসী দেউড়ি	ঐ
৬৫	গুন্না খলিফা	তাতখানা	বাইস
৬৬	ইমাম আলী	মোকিম কাটরা	ঐ
৬৭	ওয়াহেদ বখশ	হোসেনী দালান	ঐ
৬৮	শমসের খান	বখশী বাজার	ঐ
৬৯	সুবা সরদার	ঐ	ঐ
৭০	নরসিং	মীর মোরাদ বাজার	ঐ
৭১	শেখ রহিম বখশ	মালিবাগ, বংশাল	ঐ
৭২	হাজী মোহাম্মদ সিদ্দিক	ঐ	বারা
৭৩	আবদুস সামাদ	সুবাদার ঘাট	ঐ
৭৪	এসহাক	ঐ	ঐ
৭৫	কাদের বখশ	পুরানা মোগলটুলী	ঐ
৭৬	আবদুল হামিদ	ঐ	ঐ
৭৭	আলম চান্দ	ঐ	ঐ
৭৮	কুদরুতুল্লাহ	ঐ	ঐ
৭৯	রমজান	মালিটোলা	ঐ
৮০	গণি	নাজির বাজার	ঐ
৮১	আবদুল মান্নান	ঐ	ঐ
৮২	বুদলু	ঐ	ঐ
৮৩	আকবর মাহমুদ	আগাসাদেক বাজার	ঐ
৮৪	আসমতুল্লাহ	ঐ	ঐ
৮৫	মোহাম্মদ হোসেন	ঐ	ঐ
৮৬	গরীবউল্লহ চৌধুরী	ঐ	ঐ
৮৭	শেখ টুনু	মনওয়ার খান বাজার	ঐ
৮৮	কাজী মঈনুদ্দীন	আলু বাজার	ঐ
৮৯	হাসান খান	ঐ	ঐ
৯০	ইব্রাহীম	ঐ	ঐ
৯১	রজব	ঐ	ঐ
৯২	মোত্তালেব	সাকিনা টোলা	ঐ
৯৩	ইজ্জত বখশ	সিদ্দিক বাজার	ঐ
৯৪	আনু খলিফা	সোয়ারী ঘাট	ঐ
৯৫	হামিদ আলী	মৌলভীবাজার	
৯৬	মুনশী মোহাম্মদ খান	বেগম বাজার	
৯৭	শরিয়তুল্লাহ	ছোট কাটরা	বাইস

৯৮	মাস্টার নেজাবত আলী খান	ইমাম গঞ্জ	
৯৯	আবদুল্লাহ	আগা নওয়াব দেউড়ি	বাইস
১০০	জাফর সর্দার	বংশী বাজার	
১০১	আবদুস সাত্তার	ঐ	বাইস
১০২	আবদুল গণি	নয়া বাজার	ঐ
১০৩	পিয়ার বখশ	বেচারাম দেউড়ি	ঐ
১০৪	করিম বখশ	নয়া সড়ক	বারা
১০৫	রহমান বখশ	চম্পাতলী	বাইস
১০৬	জালাল খলিফা	দেবীদাস ঘাট	
১০৭	নাসির উদ্দিন	রহমতগঞ্জ	বারা
১০৮	হাজী বাল্লু	ঐ	বাইস
১০৯	আজিজ উদ্দিন খলিফা	চুড়িহাট্টা	ঐ
১১০	হাফিজ মোহাম্মদ ইসরাইল	ঐ	ঐ
১১১	মীর ওমরজান	ঐ	ঐ
১১২	এম. ফিরোজ	ঐ	ঐ
১১৩	এম. মাহমুদ	মীর্জা মুন্না দেউড়ি	ঐ
১১৪	নাজিমউদ্দিন	খাজা দেওয়ান	ঐ
১১৫	এল. খায়রাতি খান	ঐ	ঐ
১১৬	ইউসুফ খলিফা	ঐ	ঐ
১১৭	আমির উদ্দিন	লালবাগ	ঐ
১১৮	হাজী রহমান	পোস্তা	ঐ
১১৯	মোহাম্মদ	কামরাঙ্গীর চর	ঐ
১২০	আবদুর রহমান	মসজিদ গং [লালবাগ]	ঐ
১২১	করিম বখশ	আমলি গোলা	ঐ
১২২	মওলা বখশ	ঐ	ঐ
১২৩	বেনজীর	চৌধুরী বাজার	বাইস
১২৪	দোসাদী	বলদিয়া টোলি	ঐ
১২৫	নাজিবুল্লাহ	নওয়াব বাগিচা	বারা
১২৬	সোবহান বখশ	মালিবাগ, নওয়াবগঞ্জ	ঐ
১২৭	দরবেশ খান	হাজারী বাজার	ঐ
১২৮	একদিল জমাদার	ঐ	বাইস
১২৯	এম. ইব্রাহীম	গোবাদ মহল	বারা
১৩০	রহমত	ঐ	ঐ
১৩১	জুম্মন	বোরহান পুর	বাইস
১৩২	কেরামত হাজী	নবীপুর	ঐ
১৩৩	বদরউদ্দীন	তেলীপাড়া	বারা
১৩৪	এসহাক সর্দার	তেলীপাড়া	বারা

১৩৫	আফির উদ্দিন	কালোনগর	ঐ
১৩৬	টিপু খান	চোবদার তলি	বারা
১৩৭	আবদুল হামিদ	দুরি আঙ্গুল	
১৩৮	নাজির বেপারী	হাটখোলা	বারা
১৩৯	মোহাম্মদ খলিল	ঐ	বাইস
১৪০	সানাউল্লাহ	কমলাপুর	বারা
১৪১	শেখ কালাই	কাকরাইল	বাইস
১৪২	কানু সর্দার	ইসকাটন	বারা

[এই তালিকা ১৯০৭ সালের]

তথ্যপঞ্জী

এ বিবরণ রচিত হয়েছে মূলত খাজা আজমের গ্রন্থ ভিত্তি করে। বিশেষ করে পঞ্চায়েতের কার্যাবলী, গঠন ও আয়ের উৎস সম্পর্কে মোটামুটি তাঁর বক্তব্যকেই তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে নতুন তথ্য যোগ করেছি উৎসের উল্লেখ করে।

K M Azam, *The Panchayat System of Dacca*, Dacca, 1911 James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, London, 1885.

M. Siddiq Khan, 'Panchayet system in old Dhaka ' A. Haider (ed), *A City and its Civic Body*, Dacca, 1966.

কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ঢাকা, ১৩৮২। মরহুম নাছির উদ্দিন আহমেদের সাক্ষাৎকার, ১৯৮৭।

গণিউর রাজার ঢাকা ভ্রমণ

ভূমিকা

উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় অনেকেই লিখেছিলেন আত্মজীবনী। রচিয়তাদের মধ্যে আছেন খ্যাত বা স্বল্প পরিচিত ব্যক্তিত্ব। আবার এমন কয়েকজনও রয়েছেন [যেমন, দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র] যাঁরা স্রেফ আত্মজীবনীর জোরে এখনও টিকে আছেন।

উনিশ শতকের বাংলার সমাজ কাঠামো নির্মাণ করতে হলে, অনেকের মতে, এই সব আত্মজীবনীর দ্বারস্থ আমাদের হ'তেই হবে। বোধহয় একথা প্রমাণের জন্য তারা অহরহ এইসব আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে আত্মজীবনীর গুরুত্ব যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি শুধু উদ্ধৃতির ব্যবহারকেই উপাদান হিসাবে গণ্য করা যায় না। কারণ, আত্মজীবনীকার যা লিখেছেন তাই কি সত্য? নিশ্চয় পুরোপুরি নয়। উনিশ শতকের আত্মজীবনীগুলি লেখা হয়েছিলো শুধুমাত্র স্মৃতির ওপর নির্ভর করে এবং যে বয়সে সবাই আত্মজীবনী লিখে থাকেন ঐ বয়সে স্মৃতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করে না এমন কথা বলা যায় না। এছাড়া আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায়। আত্মজীবনীকার যে ভাবে জীবন বা সমাজকে দেখেছেন, যিনি সামাজিক ইতিহাস লিখছেন তিনিও কি ঐ ভাবে জীবন বা সমাজকে দেখছেন? যদি তা না হয়, তা'হলে যত্রতত্র উদ্ধৃতির ব্যবহার বিভ্রমের সৃষ্টি করবে মাত্র।

উনিশ শতকের বাংলা আত্মজীবনী সম্পর্কে নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী লিখেছিলেন, 'সেগুলিতে আত্মপ্রতারণার ভাব কতখানি আছে তাহা বলিতে পারি না কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অহমিকাটুকু যে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।'[১] সব আত্মজীবনীর ক্ষেত্রেই একথা কম বেশি প্রযোজ্য। আত্মজীবনীতে 'আমি' না থাকলে আত্মজীবনী হবে কেন? তবে হ্যাঁ, সে 'আমি' যদি প্রবল হয় তবে পরিবেশ সমাজ সব আড়াল হয়ে যায়। লুসিয়েন গোল্ডম্যানও তাই মনে করেন।[২] তাই তাদের আত্মজীবনী থেকে যদি শুধুমাত্র উদ্ধৃতি ব্যবহার করে সামাজিক ইতিহাসের কাঠামো দাঁড় করানোর চেষ্টা হয় তবে তা হবে, হবসবমের ভাষায়, 'হয় রাজনীতি ব্যতীত ইতিহাস, নয়, অর্থনীতি বা সমাজের মিশ্রণে অন্যকিছু।' এ প্রসঙ্গে সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা যুক্তিযুক্ত। তিনি মনে করেন, সামাজিক ইতিহাস অন্য কোন

বিষয়ের মতো নির্দিষ্ট কিছু নিয়ে 'Deal' করে না, কারণ এর বিষয়বস্তু কোনভাবেই অন্য কোন বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করা সম্ভব নয়।[৩] সুতরাং সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে আত্মজীবনীর মূল্য স্বীকার করে নিয়ে বলতে হয়, তা থেকে শুধু উদ্ধৃতি ব্যবহার করার ব্যাপারে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। নয়তো আমরা সমাজের একটি মাত্র দিকই দেখবো এবং সে দেখা একপেশে হতে বাধ্য। কিন্তু আত্মজীবনী অন্যভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গোল্ডম্যান লিখেছেন, এই ধরনের রচনার অন্য একটি দিক আছে। তা'হলো এ ধরনের রচনার মাধ্যমে আমরা কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য (social trait) জানতে পারি। আমরা জানতে পারি লেখকের সামাজিক অবস্থান এবং ঐ অবস্থান নির্ধারণ করতে পারলেই একটি বিশেষ সময়ে, একটি বিশেষ সমাজে, একটি বিশেষ শ্রেণীর সামাজিক চালচলন, মূল্যবোধ আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে।[৪]

দেওয়ান গণিউর রাজার আত্মজৈবনিক রচনাটিকে আমরা এ পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করবো।

মরমী কবি হাছন রাজার জ্যৈষ্ঠ পুত্র ছিলেন দেওয়ান গণিউর রাজা। জন্ম তাঁর ১৮৭৬ সালে [বাংলা, ২২ আষাঢ়, ১২৮৩]। জমিদারপুত্র হিসেবেই তিনি লালিত হয়েছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার বেশি আর তাঁর পক্ষে এগোনো সম্ভব হয়নি। তবে, ঘোড়ায় চড়তে পারতেন তিনি ভালো এবং ন'বছর বয়সেই ঘোড়ার বাজি জিতেছিলেন। এ ছাড়া, তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, কৈশোর থেকেই মদ এবং বারাঙ্গনায় তাঁর আসক্তি ছিল। ঐ আমলে, প্রায় সব জমিদার বা জমিদার নন্দনের জীবনই ছিল এরকম। সাধারণ মানুষ এতে খুব একটা অবাক হতেন না।

তবে, কিছুটা ব্যতিক্রমীও ছিলেন গণিউর রাজা। এবং তা বোধহয় পিতা হাছন রাজার কারণে। ফুর্তি করে জীবন কাটালেও তিনি নিজ চেষ্টায় শিক্ষিত হতে চেয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী এর প্রমাণ। এ ছাড়া, ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সুনামগঞ্জ কোর্টের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি বেশ কিছু গানও রচনা করেছিলেন যা প্রকাশিত হয়েছিলো 'গণি সঙ্গীত' নামে। এ ছাড়া হাছন রাজার গানের সংকলন 'হাছন উদাস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৩২ সালে (১৩৩৯ সন) পরলোকগমন করেছিলেন গণিউর রাজা। এর বেশি তথ্য আর সংগ্রহ করা যায়নি তাঁর সম্পর্কে।

গণিউর রাজার এই রচনাকে যদিও আত্মজীবনী হিসেবে উল্লেখ করছি কিন্তু আক্ষরিক অর্থে ধরলে হয়ত পাঠক আত্মজীবনীর অনেক কিছুই এখানে পাবেন না। এ রচনা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বিভিন্ন সময় তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন। ১৯৩১-৩২ সালের মধ্যে অর্থাৎ মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই ভ্রমণ কাহিনী নিছক ভ্রমণ কাহিনী থাকেনি। এটি হয়ে উঠেছে এক ধরনের আত্মজৈবনিক রচনাও। এবং এখানে সেই পাণ্ডুলিপি থেকে শুধু ঢাকার অংশটুকুই নেওয়া হয়েছে। তাই ঢাকা শহরের বৃত্তান্ত ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ এখানে আসেনি।

১৮৯২ সালে গণিউর রাজা প্রথম ঢাকা শহরে পদার্পণ করেছিলেন পড়াশোনার জন্য। তিনি লিখেছেন, ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ১২/১৩ বৎসর কিন্তু তাঁর জন্ম তারিখ এবং ঢাকায় আগমনের তারিখ হিসেবে করলে দেখা যায় বয়স ছিল তখন তাঁর সতেরো বৎসর। বলা যেতে পারে, যৌবনের শুরুতেই তিনি প্রথম ঢাকা শহরে এসেছিলেন। কিন্তু পড়াশোনা করা আর হয়ে উঠেনি গণিউর রাজার। ফিরে গিয়েছিলেন তিনি সিলেটে। ১৮৯৩ সালে আবার এসেছিলেন ঢাকা শহরে বোনের বিয়ের বাজার করতে। তৃতীয় (১৮৯৫-৯৬), চতুর্থ (১৮৯৮) এবং পঞ্চমবার (১৯০৫) গণিউর রাজা ঢাকা আগমন করেছিলেন নিছক ফুর্তি করার জন্য।

এ আত্মজৈবনিক রচনা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর জীবন যাপনের ধারা— তা হলো জমিদারদের। অবশ্য বাংলা উপন্যাসে এ চরিত্র অনেকেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। গণিউর রাজা ছিলেন মফস্বলের ক্ষুদে জমিদার। তাই তিনি বারবার এসেছিলেন ঢাকায়। এ ক্ষেত্রে বড় বড় জমিদারদের কথা সহজেই অনুমেয়। তাদের লীলাক্ষেত্র ছিল রাজধানী কলকাতা এবং তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অনুপস্থিত জমিদার।

গণিউর রাজা যখন এসেছিলেন ঢাকায় তখন ঢাকার নবাব পরিবারের কর্তা ছিলেন আহসানউল্লাহ। ঢাকার নবাব পরিবার ছিলেন পূর্ববঙ্গের এক বড় ভূম্যধিকারী এবং তাঁরা অধিকাংশ সময় ঢাকায়ই থাকতেন। আহসানউল্লাহ সম্পর্কে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁকে সংস্কৃতিবান, দয়ালু, সংযমী 'নবাব' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, গণিউর রাজা আহসানউল্লাহ সম্পর্কে এক চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন। কয়েক ঘণ্টার আমোদের জন্য দশ হাজার টাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন নওয়াব [টাকার অংকের সত্যতা অবশ্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে, অংকটি এ পরিমাণ হলেও সে আমলের তুলনায় প্রচুর]। এ প্রসঙ্গে গণিউর রাজার মন্তব্য স্মর্তব্য— 'এই ইউরুপীয়ান লেডিকে প্রাপ্ত হইলে ১০,০০০ দশ হাজার টাকা কোন ছার নবাব সাহেব যদি তাঁহার ভোগবিলাসের জন্য ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা দিয়াও ঐ ইংলিশ লেডিকে রাখিয়া ফেলিতেন তাহা হইলে তাহার নাম অনেক দূর পর্যন্ত যাইত, ও ঐ লেডির জীবন বিনাশ না হইয়া বাঁচিয়া থাকিত।' শ্বেতাঙ্গদের অধস্তন ছিলেন এ দেশবাসী তা তিনি যত প্রভাবশালী হন না কেন। সুতরাং শ্বেতাঙ্গিনী রক্ষিতা রাখার যে মনোবাসনা প্রকাশ করা হয়েছে তা ছিল সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারক বা এক ধরনের অবদমিত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ।

অনেক গবেষক সম্প্রদায়িকতা আলোচনা করতে গিয়ে বাঙালী জমিদারদের হিন্দু-মুসলমান দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন যা ভ্রান্ত। আসলে জমিদার জমিদারই। এ ভ্রমণ বৃত্তান্তের এক জায়গায় দেখি, গণিউর রাজা আশ্রয় নিয়েছেন, ঢাকার এক সময়ের বিখ্যাত ধনী রাজা বাবুর বাড়ীর বৈঠকখানায়। রাজা বাবুর ভাইপো মন্তব্য করেছেন এ বলে 'জমিদার ছাড়া অন্য লোক এখানে থাকে না। কারণ, তাহারা আমাদের সমব্যবসায়ী বটেন।' অর্থাৎ জমিদার জমিদারই তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই, ছোটবড় ভেদ হয়ত থাকতে পারে।

গণিউর রাজা যে ঢাকা শহরের বর্ণনা করেছেন তা ছিল নোংরা, পূতিগন্ধময়, ধূসর শহর। গণিউর বর্ণনা করেছেন, নব্বই দশকের ঢাকার কথা। কিন্তু, এর আগে অবস্থা ছিল আরো ভয়াবহ। নব্বই দশকে ঢাকায় রাস্তা ছিল কয়েকটি, সাধারণ যানবাহন হিসেবে ছিল ঘোড়ার গাড়ী। গণিউর রাজা যে সময় ঢাকায় এসেছেন তখন ব্রাহ্ম আন্দোলন ঝিমিয়ে গেছে, হিন্দু পুনর্জাগরণ তুঙ্গে। পেশাদারী থিয়েটার চলছে আর মধ্যবিত্তরাও ছিলেন আগের থেকে শক্তিশালী। কিন্তু ঢাকায় মধ্যবিত্তের বিনোদনের তেমন কোন মাধ্যম ছিল না। তবে, ঢাকা শহর তখন বিখ্যাত ছিল বাঈজীদের জন্য। গণিউর রাজা তাঁর বর্ণনা সীমিত রেখেছেন এই বাঈজী বা 'খেমটাওয়ালী'দের মধ্যে। কারণ, তাঁর প্রতিবার ঢাকা আসার প্রধান কারণ ছিল বাঈজীদের সঙ্গ লাভ।

সঙ্গীতের জন্য ঢাকার খ্যাতি বেশ পুরনো। ১৮৫৭-এর পর এই খ্যাতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিলো কারণ, তখন লক্ষ্ণৌর অনেক বাঈজী সঙ্গীতজ্ঞ চলে এসেছিলেন মুর্শিদাবাদ এবং তারপর ঢাকায়। ঢাকার জমিদার ও ধনাঢ্যরা পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাদের। কিংবদন্তীতে পরিণত ওস্তাদ কালে খাঁ থাকতেন ঢাকার কলুটোলায়। মুড়াপাড়ার জমিদারের ছিলেন তিনি দরবারী গায়ক। ঢাকায় কয়েক বছর থাকার পর, তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এলে তিনি বলেছিলেন 'মেরা মুলুক মে কদরদান রইস্ আদমী কাহাঁ হ্যায় ঢাকাহি মেরে লিয়ে আচ্ছা হ্যায়।'[৫]

সঙ্গীতের পুরনো পীঠস্থান হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকায় ছিলেন বেশ কিছু বাঈজী যারা কলকাতার বাঈজীদের থেকেও ছিলেন দক্ষ। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ঢাকার বাঈজীদের নিয়ে যাওয়া হতো। ঢাকার বিখ্যাত বাঈজীদের মধ্যে ছিলেন আমীরজান, অটল, গুন্নু, রাজলক্ষ্মী ইমামী প্রমুখ।

এরা ছিলেন উঁচুদরের, যারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন ধনাঢ্য বা জমিদারদের। গণিউর রাজাদের নাগালের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের সংখ্যাও কম ছিল না। ঐ সময় বারাঙ্গনাদের শহর হিসেবেও ঢাকা কিঞ্চিৎ খ্যাতি অর্জন করেছিলো। সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত বাবু, গণিউর রাজাদের মতো, ছোটখাটো জমিদাররা ছিলেন এদের পৃষ্ঠপোষক। সরকারী হিসাব মতে ১৯০১ সালে ঢাকায় বারাঙ্গনাদের সংখ্যা ছিল ২১৬৪ জন। একই সময় শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৯০,৫৪২ জন। বেসরকারী হিসেব যে তার কয়েকগুণ বেশি ছিল তার প্রমাণ গণিউর রাজার ভ্রমণকাহিনী। তাঁর প্রথম ঢাকা আগমনের মাত্র আটাশ বৎসর আগে, ঢাকার একটি পত্রিকা *'ঢাকা প্রকাশ'* মন্তব্য করেছিলো -- 'সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে উত্তম উত্তম যে সকল দালান আছে, তাহার সমুদয়ই প্রায় বেশ্যাপূর্ণ হইয়াছে। বেশ্যাবাস সংশ্রব নাই, রাজপথের উভয় পার্শ্বে এরূপ উৎকৃষ্ট দালানই নাই বলিলে হয়।'[৬] এই ধরনের সংবাদ প্রায়ই ছাপা হতো তৎকালীন সংবাদপত্রে এবং অনুরোধ করা হতো বারাঙ্গনাদের যেন শহরের বাইরে কোথাও স্থানান্তরিত করা হয়।

এ প্রসঙ্গে গণিউর রাজার উল্লিখিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। এক বারাঙ্গনা তাকে বলেছিলো 'তুমি যে মুসলমান তাহা আমি পূর্বেই বুঝিয়াছি, আমরা হিন্দু রমণী মুসলমানকে জায়গা দেই না, সমাজে দূষিত হইতে হয়, আমি বলিলাম,

তোমাদের আবার সমাজ আছে না কি। সে বলিল, থাকিবে বই কি, যদিও আমরা নাম লিখাইয়াছি তথাপি আমাদের হিন্দুয়ানি সবই বজায় আছে।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ'-এ এক হিন্দু বারঙ্গনা মুসলমানকে ঘরে নেয়ার জন্য জাত যাবার ভয়ে আকুল হয়ে উঠেছিলো - একথা পড়ে এক সময় বেশ আশ্চর্য লেগেছিলো। কিন্তু, সেই উনিশ শতকের শেষ পাদেও একই ঘটনা সমাজবিদদের নিশ্চয় আগ্রহান্বিত করবে।

আগেই উল্লেখ করেছি, এই আত্মজৈবনিক রচনা থেকে ফুটে ওঠে ক্ষুদে জমিদারদের জীবন প্রণালী। তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় পুরো সময়টাই অতিবাহিত হতো ভোজন, সহবাস এবং নিদ্রায়। জানতে পারি, নব্বই দশকের ঢাকা শহর সম্পর্কে। এটা ঠিক গণিউর রাজা যদি শহরের পথঘাট এবং অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনা করতেন তাহলে আমরা আজ আরো উপকৃত হতাম। কিন্তু, আমাদের মনে রাখতে হবে, গণিউর রাজা প্রায় সময়ই ঢাকায় এসেছিলেন একই উদ্দেশ্যে এবং অন্য কোন বিষয়ে নজর দেওয়ার অবকাশ তাঁর ছিল না। তাই একই বিষয়ের বর্ণনা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর লেখায়। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় এ ধরনের অকপট আত্মজৈবনিক রচনা আর লেখা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

গণিউর রাজার এই রচনাটির প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, 'বিচিত্রা'র নির্বাহী সম্পাদক জনাব শাহরিয়ার কবির। তিনিই গণিউর রাজার আত্মীয় জনাব মমিনুল মউজদীনকে ভার দিয়েছিলেন, মূল রচনা থেকে ঢাকার অংশটুকু কপি করে দেওয়ার জন্য। এরপর আমার একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ তা ছাপা হয়েছিলো সাপ্তাহিক বিচিত্রায়। শিরোনাম ছিল— উনিশ শতকের ঢাকার সমাজচিত্র : দেওয়ান গণিউর রাজার রোজনামচা থেকে।' এখানে শিরোনামটি বদল করা হলো, সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকাও।

তথ্যপঞ্জী

১. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, বিদ্রোহে বাঙালী, উদ্ধৃত মুনীর চৌধুরী, '*বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন*', সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃ. ১৩১।

২. Lucien Goldmann, *The Human Sciences and Philosophy*, (Translated by Hayden V. White and Robert Anchor), London, p. 29. লিখেছেন তিনি, 'The historical consciousness extists only for and attitude which have gone beyond the individualistic 'I'.'

3. E. J. Hobsbawm, 'From Social History to the History of Society, '*Historical Studies Today*, eds, Felix Gibeert and S. R. Gravbard, Newyork, 1972, p. 2.

৪. Lucien Goldmann, op cit.

৫. অজয় সিংহরায়, '*পুব বাংলার উচ্চাঙ্গ সংগীত, ঢাকা ১৮৫৭-১৯৪৭,*' প্রতিক্ষণ, *সংস্কৃতি সংখ্যা*, ১৩৯৫, পৃ. ৯৩।

৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮৬৪।

প্রথমবারের ভ্রমণ

আনুমানিক সম্ভবতঃ ১২৯৯ সনের ফাল্গুন মাসে পড়ার উদ্দেশ্যে শহর ঢাকায় প্রথম যাওয়া হয়। তৎকালে সঙ্গে মৃত সেখ পাওপুছা ও মৃত সেখ নাজিমকে নেওয়া হয়। প্রায় ৪০ বৎসরের কথা সঠিক মনে পড়িতেছে না তবে যে পর্যন্ত মনে পড়িতেছে তাহাই লিখিত হইবে। বোধহয় অনুমান প্রথম দিবস অধিক রাত্রে মার্কুলি পৌছিয়া, সে স্থানেই ষ্টীমারে রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল, সে স্থানে ষ্টীমার বদলি হইয়াছিল কিনা মনে নাই। অতি ভোরে বা রাত্রাংশ থাকিতে বোধ হয় ষ্টীমার ছাড়িয়াছিল।

সারাদিন ষ্টীমার চালাইয়া কোন স্থানে পৌছিয়াছিল এখন সঠিক মনে পড়িতেছে না, পূর্বে এখনকার মত এতবেশি ষ্টীমার ষ্টেশনও ছিল না, সেই দিন রাত্রে কি তাহার পর দিবস গত রাত্রে কলাগাছিয়া নামক এক চরে রাত্র ২টার সময় আমরা নারায়ণগঞ্জ যাত্রীসমূহ পেছেঞ্জারদিগকে নামাইয়া দেওয়া হয়। ঐ কলাগাছিয়া নামক গ্রামের চরার মধ্যে আবাদির মত ঘরদ্বার বাঁধা ১৫/২০ ঘর লোকের বাস। তাহারা ষ্টীমারের হুইসেল শুনিয়া কয়েকজন আসিয়াছিল ও কয়েকজন আমরা যাত্রীদের কাছেও আসিয়াছিল ও কথাবার্তা কহিতেছিল, ষ্টীমার ছাড়িয়া ফরিদপুর-বরিশালের পথ চলিয়া গেল।

ঐ গ্রামের লোকেরা আমাদিগকে বলিল যে, এই চরাতে সাবধান হইয়া থাকিবেন, জলে নামিবেন না, কুম্ভীরে চরা হইতে মানুষ ধরিয়া লইয়া যায়, মাসেক মধ্যে ষ্টীমার যাত্রীই প্রায় ৪/৫ জন লোক চরা হইতে ধরিয়া নিয়া খাইয়াছে। এবং চরার উপরে গ্রামের দক্ষিণে যে জঙ্গল দেখিতেছেন তাহাতে অসংখ্যা ব্যাঘ্র[১] থাকে এবং প্রত্যেক বৎসরই আমাদের গ্রামের ২/৪টি গরু ও মানুষ খায়, কিন্তু সরকার ইহার action নেন না বা প্রতীকার করেন না, অবশ্য ব্যাঘ্রে ষ্টীমারের কোন যাত্রী এ পর্যন্ত খায় নাই কিন্তু কুম্ভীরে এত লোক খাইয়াছে তবুও কোম্পানী ইহার কিছুই দেখে না বা action নেয় না। এসব কথা শুনিয়া আমরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম এবং কোম্পানী যে এরূপ অসময়ে ঐ চরায় যাত্রী নামাইয়া দেয় হেতু কোম্পানীকে কতরূপ গালিগালাজ করিতে লাগিলাম, আমার সঙ্গীদ্বয়ই গ্রাম্য লোকদিগকে বলিতে লাগিল– ইনি একজন রাজার বেটা বলিয়া আমাকে পরিচয় দিতে লাগিল এবং ইনি একজন শ্রীহট্ট জিলার বড় জমিদার হাছন রাজা সাহেবের পুত্র, আগে এরূপ জানিলে ইনিকে ঢাকায় লইয়া

আসিতাম না, তাহারা বলিল এত ভয় হইলে গ্রামে চলিয়া আস, একঘর দিব রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে ষ্টীমার আসিলে চলিয়া যাইবায়। কিন্তু আমরা গেলাম না, কারণ অসংখ্য নারায়ণগঞ্জযাত্রী থাকায় আমরাও সাহস করিয়া চরায় বসিয়া রহিলাম।

পরদিন ৭টার সময় ফক্স নামক অর্থাৎ শৃগাল নামক এক ছোট জাহাজ আসিল ও সমুদয় নারায়ণগঞ্জযাত্রী ঐ স্টীমারে উঠিল, ঐ সময় বানিয়াচুঙ্গ নিবাসী এক ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইল ও সে আমার বাসা ঠিক করিয়া দিবে বলিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি ভদ্রলোক ছিলেন, গোলাব মিয়া সাহেবের কুটুম্বের মধ্যে ছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত গোলাব মিয়া সাহেব আমার চাচা সাহেবের বয়স্য ছিলেন, এবং আমার পিতা সাহেবেরও মোসাহেব ছিলেন বলিয়া উক্ত ব্যক্তির জানা ছিল বিধায়, প্রলাপে তাহার সহিত একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়া যায়। ও তিনি আমার বাসা ঠিক করিয়া দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত হন, শহর ঢাকা চৌক বন্দরে[২] ঐ বানিয়াচুঙ্গের আমিন উদ্দিনের খাঞ্চা-তাগারীর [বাসন-পত্র] দোকান থাকায় পূর্ব উল্লিখিত ব্যক্তির পরিচয়ে পরিচিত হইয়া, উক্ত আমিনউদ্দিন মিয়ার চুড়িহাট্টা নামক মহল্লায় কেরায়া [ভাড়া] এক বাড়ী থাকায়, সে বাড়ীতে তাহার ভাই আব্দুল খালেক নামক ব্যক্তি বাস করিয়া ইংরাজি অধ্যয়ন করার সুযোগে, তাহার সহিত মিলিত হইয়া, বাড়ীর কেরায়াতে কতেক সাহায্য করার ও খুরাকিতে [খোরাক-এ] কতেক সাহায্য কারার সাব্যস্ত হয় এবং পাওপুছা বেটা আমরা উভয়কে তথায় রাখিয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহে ও নাজিমকে বলে সে কয়েক দিন থাকিয়া আমার পাঠ উপযোগী বহি ইত্যাদি ক্রয় করিয়া দিয়া ও সর্ববিষয় ঠিক করিয়া দিয়া সর্ববিষয়ের সুবিধা হইলে পর সে যেন বাড়িতে চলিয়া আসে। কিন্তু ৩/৪ দিন পর আমাদের বাসার পশ্চিম দিগে প্রায় ১।/১॥ মাইল দূর এক জায়গাতে আগুন লাগিয়া কয়েকখানা বাড়ী পুড়িয়া যায়। আমরাও আগুন নিবাইবার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই। কিন্তু আমরা গিয়া পৌছিবার আগেই কয়েকখানা বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছিল, ও বাকী নির্বাণ হইয়াছে। দমকল দিয়া আগুন নির্বাণ হইয়াছিল, দালান পুড়িতে এই আমি প্রথম দেখিলাম। আমার বাসায় আইসাকালে রাস্তা ভুলিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই কিন্তু আমরা যে দালানে বাস করিতাম তাহার সামনে দিয়া ৫/৭ বার আসা-যাওয়া সত্ত্বেও ঐ দালান যে আমাদের বাসস্থান তাহা পরিচয় করিতে পারি নাই। হঠাৎ ঘরের ভিতরে লোহার শিকের ফাঁক দিয়া অতিচাকচিক্যময় আমার পরিধানের অঙ্গাবরণের উপর দৃষ্টি পড়ে, এবং তাহা চিনিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ আবদুল খালিককে ডাক দিয়া গৃহে প্রবেশ করি।

উল্লেখযোগ্য, একটি বিষয় ভ্রমবশতঃ লিখা হয় নাই বিধায় উক্ত বিষয়টি পুনরুল্লেখ করিতে হইল। পাওপুছা বেটাকে আমি ও নাজিম রেলওয়ে ষ্টেশনে টিকেট করিয়া দেওয়ার জন্য গিয়াছিলাম। তথায় যাইয়া শুনি লোকেরা বলাবলি করিতেছে যে, নবাব সাহেব ইংলন্ড হইতে ১০,০০০ দশ হাজার টাকা চুক্তিতে একজন ইউরুপীয়ান লেডি আনাইয়াছেন। সে ব্যোম যানে অর্থাৎ বেলুনে চড়িয়া লোকদিগকে আশ্চর্য্য তামাসা দেখাইবে। ২/৪ দিবস মধ্যে ঢোল পিটাইয়া কোন্ তারিখে আকাশে উড়িবে, তাহা

লোকদিগকে জ্ঞাত করা হইবে। তৎপর পাওপুছা বেটাকে টিকেট করিয়া দিয়া বাসায় চলিয়া আসি। ২/৩ দিবস পরে এক দিবস অপরাহ্নে ঢোলের কথাও সর্বজন জানিতে পায়। এবং যেদিন বেলুনে উড়িবে ঐ দিবস নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই লোক জমিতে থাকে। লোকে লোকারণ্য হওয়ায় ভিড় ঠেলিয়া যাইতে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। সমূহ লোক নবাববাড়ীর আহছান মঞ্জিলের ধারে সমবেত হয়। আহছান মঞ্জিলের পূর্বদিকে ও দক্ষিণদিকেই অধিকাংশ লোকের জনতা হইয়াছিল, তখন নবাব আহছানউল্লা ছাতের উপর আসন গ্রহণ করেন ও দেখিলাম একজনা ইউরুপীয়ান যুবা পুরুষ নবাব সাহেবের কাছে গিয়া হেট উঠাইয়া সেলাম দিল, ও হেন্ডসেকিং করিল। নবাব সাহেবও দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কি কি আলাপ করিলেন, ইতিমধ্যে আরও দুইজনা ইউরুপীয়ান লেডি তথায় উপস্থিত হইল, তাহাদের মধ্যে একজনা প্রৌঢ় বয়স্ক ও একজনা বালিকা, একজনের বয়স ৫০/৫৫ হইবে অন্যজনার ১৫/১৬ হইতে পারে, বোধ হইল। প্রায় অর্ধঘণ্টা নবাবের সহিত তাহারা দাঁড়াইয়া কি কি বিষয় আলাপ করিল, আমরা নীচে বহুদূর থাকায় ও জনকোলাহলে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনুমান করিলাম তাহারা কোথা হইতে উড়িবে ও কোথায় নামিবে সে বিষয় আলাপ হইতেছে। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা নীচে নামিয়া আসিল, সমবেত লোক হইতে ২/৪ জন শিক্ষিত লোক তাহাদের সহিত যাইয়া মিশিল ও তাহাদের মধ্যে কে উড়িবে ও কোথা হইতে উড়িবে ও কোথায় নামিবে, এ বিষয়ে নবাব সাহেব কি আজ্ঞা করিয়াছেন জানিতে চাহিল, তাহাদের মধ্যে যুবা পুরুষ নাকি বলিল, নদীর দক্ষিণ পার হইতে উড়িবার কথা নবাব বলিয়াছেন। কিন্তু যে রকম বাত্যার জোর দেখিতেছি নবাবের ছাতে নামা যাইবে কিনা সন্দেহ, বাস্তবিক সে সময় ধূ ধূ শব্দে অত্যন্ত বেগে দক্ষিণ প্রভঞ্জন বহিতেছিল। আর ঐ যুবা ইউরুপীয়ান বলিয়াছিল যে, আমি ও আমার মা বেলুনে উড়িতে অভ্যস্ত, কিন্তু আমার ভগিনী পরিপক্ক নহে। কখনও কখনও সে উড়িয়াছে বটে, কিন্তু পরিপক্ক হয় নাই। কিন্তু সে নবাবের পারিতোষিকের আশায় উড়িবার সংকল্প করিয়াছে। আমি ও আমার মা তাহাকে বুঝাইয়া আমরা দুইজন হইতে একজন উড়িবার চেষ্টা করিতেছি, দেখা যাউক কি হয়। নবাব সাহেব ১০,০০০ দশ হাজার টাকার চুক্তিতে ইংলন্ড হইতে আমাদিগকে একবার মাত্র উড়াইবার জন্য আনাইয়াছেন কিন্তু এখন তিনি বলিতেছেন যে, তোমরা নদীর ঐপার হইতে উড়িয়া আসিয়া আমার ছাতে নামিতে হইবে। আমার মেয়েছেলেরা দেখিতে চায়, আমরা বলিলাম যেরকম বাত্যার জোর দেখা যাইতেছে, আপনার ছাতে নামিতে পারিব বলিয়া গ্রান্টি দিতে পারি না। তিনি বলিলেন ঐরূপ করিতে পারিলে তোমাদিগকে আরও পুরস্কৃত করিব। আমরা বলিলাম কত টাকা? তিনি বলিলেন ৪৫০০ সাড়ে চারি হাজার টাকা আরও দিব। ইতিমধ্যে আমার ভগ্নি বলিয়া উঠিল আরও ৫০০০, পাঁচ হাজার টাকা দেন, ছাতে নামিতে পারি কিনা, আমি উড়িয়া ছাতে নামার চেষ্টা করিব। এইমাত্র কথা হইয়াছে তখন জনশ্রুতি মধ্যে মুখে ২ এই কথাসমূহ প্রচার হইয়া যাওয়ায় নৌকা করিয়া বহু লোক দক্ষিণ পারে যাইতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহবা নৌকা করিয়া নদীতে নৌকা রাখিয়া তামাসা দেখিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। আমরাও এক নৌকা

করিয়া নদীর মধ্যভাগে যাইয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে বেলুন পরিচালক ইউরুপীয়ানত্রয় কতিপয় লোকসহ ও বেলুনসহ অন্যান্য আসবাবপত্রাদি লইয়া নদীর দক্ষিণ পারে বহুতর কেরাসিনের টীনসহ ও লাকুড়ি ইত্যাদিসহ নদীর দক্ষিণ পারে নৌকাযোগে উপস্থিত হইলেন। ও বেলুনের চতুপার্শ্বস্থ রশি খুঁটাসকল বেলুন হইতে একটু দূরে সরাইয়া খুঁটা সকল মৃত্তিকায় গাড়িতে লাগিল, ও বেলুনটি যেমন ঠিক তাঁবুর মত দেখা যাইতে লাগিল। তাহার ভিতরে লাকুড়ি, কয়লা ইত্যাদি ধূম হাওয়ার সামগ্রী নিয়া কেরাসিন তৈল ঢালিতে লাগিল, ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল।

আমরা এই সময় নৌকা ছাড়িয়া নদীর উত্তর পারে আসিয়া আহছান মঞ্জিলের ধারে আসিয়া বেলুনের তামাসা দেখিতে মনোযোগী হইলাম। দেখিতে ২ বেলুন অতি বড় হইতে লাগিল, নদীর ওপারে যে গ্রাম ছিল বেলুন তাহা হইতে প্রকাণ্ড হইয়া গেল। দেখিতে ২ এই গ্রাম বেলুনের আড়ালে পড়িয়া গেল, গ্রাম হইতে বেলুন অতি বড় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উচ্চতাতেও বেলুন গ্রামের ২ বৃক্ষাদি হইতে আরও উচ্চ দেখাইতে লাগিল। আমরা অনুমান করিলাম ও লোকবাচনিক জ্ঞাত হইলাম যে, ঐ বেলুনটি রবার নির্মিত। তাহার ভিতরে ধোঁয়া করায় বেলুনের কলেবর এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা এই বেলুনপানে চাহিয়া রহিয়াছি, ইতিমধ্যে বন্দুকের আওয়াজের মত দুড়ুম করিয়া একটা শব্দ হইল, বেলুনও তাহার খুঁটা হইতে ছুটিয়া অতি দ্রুতবেগে উর্দ্ধদিগে উঠিতে লাগিল। বেলুনের নীচে ঝুলনের মত একখানা কাঠ লট্‌কান ছিল, শব্দ হওয়া মাত্রই চুড়িদার পায়জামা ও গঞ্জির মত জামা পরিহিত একজনা লোক লম্ফ দিয়া ঐ ঝুলনের মত কাষ্টাসনে যাইয়া বসিল, শেষে শুনিয়াছি এই উভয় বস্ত্রই রবার নির্মিত। অতি দ্রুত বেগে বেলুন উর্দ্ধদিকে প্রধাবিত হইল, দক্ষিণের বাতাস থাকায় বেলুন উত্তর দিকে সরিতে লাগিল, আমরা সচরাচর চিল, শকুন ইত্যাদিকে যে পরিমাণ উর্দ্ধে উঠিতে দেখিতে পাই, অনুমান তৎপরিমাণ উর্দ্ধে বেলুন উঠিল, ঠিক আহছান মঞ্জিলের উপর বেলুন আসিয়াছে বলিয়া যখন সর্বজনসাধারণের অনুমান হইল তখনি ঐ বেলুন হইতে ধুঁয়া বাহির হইতেছে সকলে দেখিল ও ঐ কাষ্টাসন হইতে পূর্ববর্ণিত লোকটি লম্ফ দিয়া পড়িয়া গেল। পড়িতে ২ দুতালা তেতালার অন্তরালে অদৃশ্য হইল। এই লোকটি কাষ্টাসন হইতে লম্ফ দেয়ার পর তাহার হাতে একটি ছাতি ছিল, সকলেই দেখিয়াছিল বেলুন পরিচালক লোকদিগের কথামত নবাব সাহেব লোক মতায়ন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ বেলুন হইতে লোকটি পড়া আরম্ভ করা মাত্রই, তাহার পতিত স্থানে লোক যেন সত্বর পৌছে নবাবের হুকুম ও সকলেরই ইচ্ছা। বিশেষতঃ দক্ষিণের বায়ু থাকায় সকলেই উত্তর দিকে ধাবিত হইয়াছিল, কেহ কেঁহবা বেলুন আরোহী ব্যক্তি লম্ফ প্রদান করার পূর্বেই অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিল। ঐ লোকটি পড়িতে ২ আহছান মঞ্জিল হইতে প্রায় ২৷৷ মাইল ৩ মাইল উত্তরে নবাবেরই রমনার বাগিচার ঝাউ গাছে ছাতি লাগিয়া আটকাইয়া যায়।

সর্বপ্রথম সেইস্থানে গাড়ী দৌড়াইয়া ঢাকা শহরস্থ পুলিশের সাহেব উপস্থিত হয়।

তখন রাত্রি হইয়াছে, আকাশে মেঘ থাকায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তখন অনুমান ৭টা বাজিয়াছে। পুলিশের সাহেব তাহার সহচর কনেষ্টবল ইত্যাদিকে বলিল-- জলদি বাম্বু লও। তখন তাহারা বাঁশ আনিয়া ঐ গাছে লাগাইয়া দিল এবং সাহেব ঐ উড়নেওয়ালী মিসকে বলিতে লাগিল, মেম সাহেব ঐ বাম্বু অবলম্বন করিয়া গাছ হইতে নামিয়া পড়। কিন্তু মিস্ বলিল, আমার মা, ও ভাইকে আনাও, রশিও লেন্টন আনাও নতুবা আমি নামিতে পারিব না। কিন্তু পুলিশ সাহেব তাহাকে ধমকাইয়া জোর গলায় বলিতে লাগিল, বাম্বু মজবুত হেয়, কুচ পরওয়া নেই, উতার যাও, হাম লোক নীচে হেয়, তখন ঐ উড়নেওয়ালী মিস বাঁশ অবলম্বন করিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। অর্দ্ধেক বাম্বু নামিলে পর বাম্বু ভাঙ্গিয়া গেল, ও মিস পাক্‌কা ভূমেতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

জনসাধারণ হাহাকার করিতে লাগিল, ও পুলিশ সাহেব পলাইল। শেষে তাহার মা ও ভাই আসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল ও পুলিশ সাহেবকে গালাগালি করিতে লাগিল, ও তাহাকে জোর করিয়া যে নামাইয়াছে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিল। পুলিশ সাহেবের বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা আনিব বলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নবাব সাহেবের মেনেজার একজন ইউরুপীয়ান সাহেব আসিল, ও তাহাদিগকে অনেক প্রবোধ দিয়া নবাব সাহেবের বাড়িতে লইয়া গেল, আমরাও চলিয়া আসিলাম।

যখন আমরা চুড়িহাট্টার বাড়ীতে খাইতে বসিলাম তখন আমাদের পরিচিত বানিয়াচুঙ্গ নিবাসী আমিনউদ্দিন মিয়া বলিতে লাগিলেন যে, যে ১০,০০০ দশ হাজার টাকার জন্য আইজ মেয়েটি মারা পড়িল, যদি আমাকে তাহার মা, ভাই ঐ মেয়েটিকে দিয়া দিত তবে আমি ঐ ১০,০০০ দশ হাজার টাকা দিতাম, তাহারও প্রাণ রক্ষা হইত, আমরা বলিলাম, বাস্তবিক ঐ মেয়েটি যেরূপ সুন্দরী ইউরুপীয়ানদিগের মধ্যেও সচরাচর এরূপ সুন্দরী দেখা যায় না। এই ইউরুপীয়ান লেডিকে প্রাপ্ত হইলে ১০,০০০ দশ হাজার টাকা কোন ছার নবাব সাহেব যদি তাহার ভোগবিলাসের জন্য ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা দিয়াও ঐ ইংলিশ লেডিকে রাখিয়া ফেলিতেন তাহা হইলে তাহার নাম অনেক দূর পর্যন্ত যাইত, ও ঐ লেডির জীবন বিনাশ না হইয়া বাঁচিয়া থাকিত। ঐ লেডির মা ভাই পুলিশ সাহেবের উপর মোকদ্দমা করিবে ও নবাব সাহেব মধ্যস্থ হইয়া আপোষে মীমাংসা করিয়া দিবেন বলিয়া ও তাহাদিগকে টাকা দিয়া বাধ্য করিবেন বলিয়া প্রকাশ হইয়াছিল। টাকা অবশ্য পুলিশ সাহেব হইতে লইয়াই দিবেন সকলে অনুমান করিয়াছিল।

এই ঘটনার ২/৩ দিন পর নাজিম আমার পাঠ্য পুস্তক ইত্যাদি ক্রয় করিয়া দিয়া ও খাওয়া-দাওয়ার সব সুবিধা করিয়া দিয়া বাড়িতে চলিয়া আসার জন্য আমার অনুমতি চাহিলে আমি কান্দিতে লাগিলাম, ও বলিলাম যে, আমাকে এত দূর দেশে একা ২ রাখিয়া চলিয়া গেলে আমি একেবারে গা [ঘা] বরাইয়া যাইব। আমার মা-বাপের কথা সর্বদাই মনে পড়ে, অতএব চল, আমিও বাড়িতে চলিয়া যাইব, এতদূর দেশে থাকিয়া পড়িতে পারিব না।

তখন অনুমান আমার বয়স ১২/১৩ বৎসর হইবে, সে বলিল— তবে চলুন আজই বাড়িতে চলিয়া যাই। তৎপর আমিনউদ্দিন মিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমরা বাড়িতে চলিয়া যাইব, তিনি বললেন, এখন ১১টা বাজিয়াছে, আপনারা ৪টার ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ যাইবেন। আমরা বলিলাম আচ্ছা, তাহাই ভাল। তৎপর ৪টার ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ যাইবেন। আমরা বলিলাম আচ্ছা, তাহাই ভাল। তৎপর ৪টার ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ আসিয়া স্টীমারে উঠিলাম ও যথাকালে বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

দ্বিতীয়বারের ভ্রমণ

সম্ভবতঃ ১৩০০ বাঙ্গলার ফাল্গুন মাসের ১ম ভাগে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণসহ আমার ভগ্নীত্রয়ের বিবাহের বাজার করার নিমিত্ত শহর ঢাকায় রওয়ানা হই। যাত্রীগণ মধ্যে ১ম গণিউর রজা ২য় সদর শ্রীহট্ট সদাগরটুলা নিবাসী আবদুল আজিজ খাঁ ওরফে ছুবা মিয়া, ৩য় মুজ্জব আলী ওরফে উদাই মিয়া ৪র্থ তের্ঘরিয়া নিবাসী সেক কলন্দর এই চারি ব্যক্তি একত্রে রওয়ানা হই, নারায়ণগঞ্জ পৌছিয়া দিবা ৮ ঘটিকার সময় ঢাকা ট্রেনে উঠি, অতি অল্প সময় মধ্যে আমাদিগকে ঢাকা শহরে পৌছাইয়া দেয়। তথ্যা হইতে ঘোড়ার গাড়ি করিয়া ছুবামিয়া সাহেবের পরিচিত রুকনপুর নামক মহল্লায় এক ব্যক্তির বাড়িতে যাই ও তথায় একবেলা আহারান্তে কিছু বিশ্রাম করিয়া শহর দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়ি। সেকালে ঢাকা শহরে একখানাও মটর গাড়ি ছিল না, সুতরাং আমরা ঘোড়ার গাড়ি করিয়া সমস্ত শহর বেড়াইয়া দিবা অবসানে রুকনপুরস্থ পূর্ব উল্লিখিত ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হই, ও রাত্র যাপনের সুবিধা কোথায় হইবে উল্লিখিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি, সে বলে যদি এক রাত্র থাকার কথা হয়, তবে বিনা ভাড়ায় কোন্ বড় লোকের বাড়িতে থাকিবার সুবিধা করিয়া দিব, বেশী দিনের জন্য হইলে একটি বাড়ি ভাড়া লইতে হইবে। আমার সঙ্গীয় লোকদের মধ্যে একজন বলিলেন তাহাই হউক, কল্যপ্রাতে বাড়ি নিজে দেখিয়া সুবিধা অনুযায়ী ভাড়া করিব, ও তখনি সে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, অনুমান অর্দ্ধমাইল দূরে এক বিস্তৃত বাড়িতে প্রকাণ্ড দালানে যাইয়া উপস্থিত হইল, ও বলিল ঐ ব্যক্তিগণ শ্রীহট্টের খুব বড় জমিদারের আত্মীয় ও ছেলে, ওরা কোন কার্য্য উপলক্ষে ঢাকায় আসিয়াছেন, অদ্য রাত্র হইয়া যাওয়ায় থাকিবার স্থানের অসুবিধা কল্যপ্রাতে বাড়ী ভাড়া করা যাইবে। খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা হইয়া গিয়াছে, কেবল নিদ্রা যাওয়ারই অসুবিধা দেখিতেছি বলা মাত্রই ঐ বাড়ির একটি ভদ্রবেশী বাবু বলিয়া উঠিলেন, বেশত, থাকুন না কেন আমাদের বাড়িতেই থাকুন; কাকাবাবুর স্বর্গারোহণের পর প্রায় ৪/৫ বৎসর হইল এই বৈঠকখানা প্রায়ই খালি থাকে, সময় ২ কোন জমিদার মহাশয়েরা আসিলে থাকেন। জমিদার ছাড়া অন্য লোক এখানে স্থান পায় না। কারণ তাহারা আমাদের সমব্যবসায়ী লোক বটেন বলিয়াই উক্ত বাবু একটি চাকরকে ডাক দিলেন, চাকর আসিলে বলিলেন— বিছানার চাদর ও বালিশ ইত্যাদি পরিষ্কার আছে কিনা? জল আছে কিনা, চাকর বলিল— সব ঠিক আছে।

তখন বাবু গাত্রোত্থান করিয়া বাড়ির ভিতর অর্থাৎ (দুতালার উপরে) উপরে উঠিতে লাগিলেন। ও আমাদিগকে বলিয়া গেলেন, যাহা কিছু দরকার হইবে ঐ চাকরকে বলিলেই আনিয়া দিবে। সে এই বৈঠকখানার ওপর কামরাতে শুয়ে, এই বলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহার শয়নের কামরা দেখাইয়া দিলেন ও চলিয়া গেলেন; আমরা বারিন্দার চেয়ার ও বেঞ্চ হইতে উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ করিয়া দেখি ঐ প্রকোষ্ঠে উজ্জ্বল বাতি জ্বলিতেছে, প্রশস্থ ফরাসের উপর দুগ্ধ ফেননিভ শুভ্র চাদর পাতা আছে, তদুপরি ৪/৫টি গির্দ্দিক বালিস ও ৩/৪টি উপর সে বালিস, অতি পরিষ্কার উসার মণ্ডিত রহিয়াছে। ঘরটি নীরব, নিস্তব্ধ। নিকটস্থ হোটেলে পূর্বেই আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, আমরা তৎক্ষণাৎ খাইতে চলিলাম ও এক ঘণ্টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং পূর্ব উল্লিখিত গৃহে ফরাসের উপর নিদ্রা গেলাম। পরদিন অতিপ্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে ফেরিওয়ালাকে ডাকিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বহিষ্কৃত হইলাম। ও পূর্ব উল্লিখিত ব্যক্তির বাড়িতে যাইয়া তাহাকে আমাদের সঙ্গে আনিলাম, ও গোয়ালনগর নামক স্থানে একটি বাড়ি ভাড়া নিলাম, ও সেথায় অবস্থানক্রমে অল্পে ২ আমাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলাম ও তখন শুনিতে পাইলাম গতরাত্রে আমরা যে বাড়িতে শয়ন করিয়াছিলাম ঐ বাড়ি ঢাকার সুবিখ্যাত জমিদার রাজা বাবুর ছিল। আজ ৪/৫ বৎসর হইল তিনি পরলোকগামী হইয়াছেন, ঐ রাজা বাবুরই নবাব আব্দুল গণি ওরফে গণিমিয়া সাহেবের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ঐ রাজা বাবুর মৃত্যুকালে গণি মিয়া সাহেব স্বয়ং আসিয়া রোদন করিয়াছিলেন, ও সেবা শুশ্রূষা ও রোগীর পথ্যাপথ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এত করিয়াও বন্ধুকে রোগের হাত হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া নিরতিশয় দুঃখিতান্তকরণে রোদন করিয়াছিলেন। ও রোগীর প্রার্থনানুযায়ী কতেক সম্পত্তি নিজ হাতে আনিয়া রোগীর মৃত্যুর পর তাহাকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন।

ঢাকায় চৌক বন্দর [চক বাজার] নামক স্থানে একব্যক্তি আমাদের পরিচিত ছিল, সে মধ্যে ২ আমাদের বাড়িতে আসিত, তাহার নাম ফয়েজ বক্স ছিল, ও সদাগর ব্যবসা থাকা বিধায়, তাহার সাহায্যে মূল্যবান জিনিসাদি ক্রয় করিতে আমরা কোনরূপ ঠকাই নাই। দুই দিবস তথায় অবস্থানের পর মশ্রব আলী ওরফে উদাই মিয়া ঐ বিবাহের কাজে ২টি হাতী ক্রয় করার নিমিত্ত ট্রেনযোগে মোকাম ময়মনসিংহ চলিয়া যান ও আমরা তিন ব্যক্তি সে বাড়িতে অবস্থান করি। ২/৩ দিবস পর উক্ত উদাই মিয়া হাতী না পাইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। একদিন রাত্রে আমাদের বাসাতেই ছুবা মিয়া সাহেব তামুকের মধ্যে চরশ মিলাইয়া দেন, আমরা না জানিয়া সমস্তেই খাইয়া ফেলি, আমাদের মধ্যে উদাই মিয়ার একটু বেশি নেশা হইয়া পড়ে, ও তিনি নানা প্রকার গল্প, গুজব করিতে থাকেন, তিনি যে সব কথা বকিতেছিলেন ও গল্প গুজব করিতেছিলেন, তাহা এখনো কতেক ২ আমার মনে আছে, বাহুলতার ভয়ে লিখিলাম না। অন্য একদিন চৌক বন্দর হইতে আমি ও ছুবা মিয়া সাহেব ও রুকনপুর নিবাসী আমীরুদ্দিন মুল্লা চরশ পানান্তে বাসা প্রত্যাবর্তনকালে, কতেক স্থান অতিক্রমের পর, মাইয়ালি সরলা

নাম্নী খেমটাওয়ালীর বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সিঁড়ি বাইয়া দুতালাতে উঠিতে আরম্ভ করি, তখন রাত্রি ৭টা হইবে। উল্লিখিত দুইজনা সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া দুতলায় উঠেন, আমি উঠিবার অল্প সিঁড়ি বাকি থাকে, তৎকালে আমার মনে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হয়, কারণ সে সময় শহরে ভয়ানক ওলাউটা [ঠা] ছিল, ও চরশ খাওয়াতে আমার অত্যন্ত নেশা হইয়াছিল, ভয় হওয়া মাত্রই আমি সঙ্গীদ্বয়কে বলিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে আরম্ভ করি। সঙ্গীদ্বয় আমাকে উপরে নেওয়ার জন্য অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেন, কিন্তু আমি তাহাদের কথায় কান না দিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া বাসায় চলিয়া আসি, তাহারাও আমার পিছে ২ তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করেন।...

ইহার পর আরও ৮/১০ দিন ঐ শহরে থাকিয়া আমাদের আবশ্যকীয় বাকী জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি খরিদ শেষ করিয়া বাড়িতে আসিতে প্রস্তুত হই, সেই চৈত্র মাস অত্যন্ত রৌদ্র ও শহরে অত্যন্ত গরম পড়ায় আমরা দিবাভাগে রওয়ানা না হইয়া চৌক বন্দর নিবাসী ফয়েজ বক্স মিয়ার পুত্র আব্দুল করিমকে সঙ্গে লইয়া ৩/৪ খানা ঘোড়ার গাড়িতে দ্রব্যাদি বোঝাইক্রমে রাত্রি যোগে নারায়ণগঞ্জ রওয়ানা হই।...

তৃতীয়বারের ভ্রমণ

সম্ভবতঃ ১৩০২ কি ১৩০৩ বাংলার কিংবা আনুমানিক ১৩০৪ বাংলার চৈত্র কি বৈশাখ মাসের ১ম ভাগে সেক লরু উরফে টেকইর বাপকে সঙ্গে লইয়া পৈন্দা নদী দিয়া ইতনা স্টেশন হইয়া নারায়ণগঞ্জ যাই ও নারায়ণগঞ্জ হইতে ট্রেনযোগে শহর ঢাকায় পৌছি, তথায় পৌছিয়া কোন স্থানে বাসা লই তাহা আমার সঠিক মনে পড়িতেছে না, কোথায় আহার করিতাম তাহাও মনে নাই, ভবিষ্যতে মনে পড়িলে লিখিব। যে ২ বিষয় সম্প্রতি মনে পড়িতেছে, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি, তথা যাইয়া গোয়ালনগরস্থ পূর্ব ভাড়াটিয়া বাসাতেই সম্ভবতঃ বাসা লই, ও আমার পূর্ব পরিচিত আলী আকবর মিয়া যিনি ঢাকা নবাবের কুঠিতে বাস করিতেন, তিনি কতেক দিবস আমার বাড়িতে, আমার বেতনভোগী হইয়া, আমাকে বাদ্যশিক্ষা দিতেন ও গজল গান ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। তিনি নবাব ফেমিলির লোক বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহাকে ঢাকা শহরে পাইয়া আমার মন অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছিল।

অপরাহ্ন ৩টা ৪টা হইতে ঘোড়ার গাড়ি করিয়া তিনি ও আমি রাত্র ৯টা হইতে ১টা ২টা পর্যন্ত নানাস্থান ঘুরিয়া বেড়াইতাম, মাদক দ্রব্যাদি পান করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্তন করিতাম। এক দিবস অপরিমিত মাদক দ্রব্য সেবনে আত্মবিস্মৃত হইয়া ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাসায় প্রত্যাবর্তন করিতে পারি নাই। গোলাব নাম্নী খেমটাওয়ালীর বাড়িতে পড়িয়া থাকিতে হয়, অতি প্রত্যুষে দেখি আলী আকবর মিয়া ঘোড়ার গাড়ি লইয়া উপস্থিত, তৎক্ষণাৎই গাড়িতে চড়িয়া রওয়ানা হইব। ও পথিমধ্যেই রুটি গোস্ত ইত্যাদি ক্রয় করিয়া গাড়ি মধ্যেই প্রাতঃকালীন ভোজন সমাধা করি। অন্য একদিন মাদক দ্রব্যাদি সেবনান্তে মেয়েলী সরলা নাম্নী খেমটাওয়ালীর বাড়িতে গান

বাজনা উপলক্ষে বসি, অন্ততঃ ২/১ ঘণ্টা পর আসর জমিলে আলী আকবর মিয়া উঠিয়া উক্ত খেমটাওয়ালীকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া কি চুপি ২ কথাবার্তা করেন ও আমার সঙ্গীর লোক টেকইর বাপ হইতে ৪ টাকা নিয়া উক্ত খেমটাওয়ালীর হাতে দিয়া আমাদের অলক্ষ্যে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হন।

তখন ক্রমে ২ সভা ভঙ্গ হইতে থাকে, যখন দেখিলাম আমি ও আমার সঙ্গীয় লোক ছাড়া তথায় আর কেহ নাই, তখন গানবাদ্য বন্ধ হয়, আমি আমার হাত হইতে তবলা রাখিয়া দেই, ও খেমটাওয়ালীকে গান বন্ধ করিতে বলি, তখন খেমটাওয়ালী তাহার দাসীকে ডাকে এবং তামাক সাজাইতে বলে এবং পূর্ব দিকের কামরায় আমাকে যাইবার কথাও বলে এবং প্রস্রাবের জায়গা আমাকে যাইবার কথাও বলে, আমি সেই কামরায় গিয়া দেখিলাম যে বৈঠকখানার কামরা হইতে সেই শয়নের কামরা আরও বেশি সাজান বটে এবং ঐ চাকরানী বিছানা ঠিকঠাক করিতেছে। আমি তথায় গিয়াই বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করিতে রহিলাম।

অন্ততঃ ১৫/২০ মিনিট পর উল্লিখিত খেমটাওয়ালী ঐ বিছানায় আসিয়া বসিল, এবং আমার হাতখানি ক্রোড়ে টানিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল এবং হস্তস্থিত সুবর্ণ নির্মিত অঙ্গুরীয় খুলিয়া নিল এবং ঐ অঙ্গুরীয় নিজ হস্তে পরিয়া এখন হইয়াছে বলিতে লাগিল এবং আমার সঙ্গীয় আলী আকবর মিয়াকে বাটপাড় ইত্যাদি বলিয়া কটুক্তি করিতে লাগিল, এবং বলিল, সে আমাকে টাকার লোভ দেখাইয়া এবং তোমাকে যত্নে রাখিবার জন্য বলিয়া ৪ চারি টাকা মাত্র আমার হাতে দিয়া পলাইয়া গিয়াছে, আমি মনে করিলাম, সে আমাদের সহরের লোক সর্বদাই তার সঙ্গে উঠা বসা করিয়া থাকি, সে আমাকে ঠকাইতে পারিবে না। যদিও সে তোমাকে হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল কিন্তু তুমি যে মোসলমান তাহা আমি পূর্বেই বুঝিয়াছি, আমরা হিন্দু রমণী মোসলমানকে জায়গা দেই না, সমাজে দূষিত হইতে হয়, আমি বলিলাম, তোমাদের আবার সমাজ আছে নাকি? সে বলিল, থাকিবে বই কি যদিও আমার নাম লিখাইয়াছি তথাপি আমাদের হিন্দুয়ানি সবই বজায় আছে। এই যে আমাদের পাড়া দেখিতেছ, এই পাড়ায় হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতি মেয়েমানুষ নাই, অন্যান্য পল্লীতে মোসলমান ইত্যাদি অন্যান্য জাতি মেয়ে মানুষ আছে। কিন্তু আমাদের পাড়াতেও কতওয়ালীর ধারে ও শাঁখারী পট্টিতে হিন্দু ছাড়া অন্য জাতি মেয়ে মানুষ নাই। তাহারাতে ও আমরাতে ঐ এক সমাজ বটে। এইরূপ কথাবার্তাতে অনেক রাত্র হইয়া যায় ও আমার নিদ্রাকর্ষণ হয়। তৎপর একটি শিশু সন্তানের ক্রন্দন ধ্বনি দ্বারা জাগরিত হইব। এবং দেখি যে ঐ বিছানারই এক পাশে একটি শিশু সন্তান শয়ান। আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া একি ২ বলিতে আরম্ভ করি। তখন ঐ খেমটাওয়ালী ঐ শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার স্তনপান করাইতে আরম্ভ করিল ও চাকরানী ঝিকে চেঁচাইয়া ডাকিতে লাগিল, ঝি আসিয়া শিশুসন্তান ক্রোড়ে লইল, আমিও দরজা খুলিয়া ভোর হইয়াছে দেখিয়া সিঁড়ি বাইয়া দুতালা হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। নীচে নামিয়াই আলী আকবর মিয়াকে দেখিতে পাই, তিনি গাড়ি লইয়া আসিয়াছেন। আমি তাহার সহিত গাড়িতে উঠিয়াই

জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি বাসা হইতে আসিয়াছেন নাকি? তিনি বলিলেন না, এতরাত্রে নেশার ঝোঁকে বাসায় পর্যন্ত যাইতে পারি নাই, নিকটেই কোন এক বারবণিতার ঘরে পড়িয়া রহিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম তাহাকে কত দিতে হইয়াছে?

তিনি বলিলেন, আট আনা মাত্র--

আমি বলিলাম, এত সস্তা কেন? টাকা, দুই টাকা দিয়া ভাল মাগির ঘরে গেলেন না কেন?

তিনি বলিলেন, আমি যে মাগির ঘরে গিয়াছিলাম সে মন্দ নহে দেখিলে আপনারই পছন্দ হইবে। আমি কম পয়সায় ভাল মাল পাইয়াছিলাম।

আমি বলিলাম তা বুঝা গিয়াছে আপনার সবই ভুল, ও গোণ্ডগোল। আমাকে যে গোণ্ডগোলে ফেলিয়াছেন তাহা সময়ান্তে বলিব, না পারিয়া শেষে আমার হাতের অঙ্গুরী দিয়া জান বাঁচাইয়াছি।

তিনি বলিলেন, একি কথা বলেন? দেখি আপনার হাত? বলিয়া আমার হাত টানিয়া নিয়া দেখিলেন হাতে অঙ্গুরীয় নাই।

.তিনি বলিলেন, আমি তাহার ভিজিট ফুরাইয়া (দরদাম করে) অগ্রিম দিয়া আসিয়াছি, তবে এই কি অভদ্রতা করিল? এবং বলিলেন আপনার গায়ের শাল কোথায়?

আমি বলিলাম, গায়েই ছিল, শুইয়া পড়ার পর আর কিছুই বলিতে পারি না। ভোরে শিশু সন্তানের ক্রন্দনে জাগরিত হইয়া ব্যস্ততার সহিত দ্বার খুলিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়াই আপনার দেখা পাই, অতিরিক্ত নেশার দরুন মাথাটা ধরিয়াছিল, এখনও ঠিক হয় নাই। তিনি বলিলেন, আপনাকে বাসায় পৌছাইয়াই আমি যাইব ও ঐ হারামজাদি হইতে ভিজিটের টাকা, শাল ও অঙ্গুরীয় লইয়া আসিব।

আমি বলিলাম, তা দিবে কি?

তিনি বলিলেন দিবে না কেন?

যদি আমি ঐ সব দ্রব্য এখনই না আনিতে পারি তবে আমি আমার বাপের ঘরের নহি।

আপনি যাহাই বলেন না কেন, ভিজিটের টাকা আনিবেন না।

তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই আনিব; কিন্তু যদি আপনি তাহার সহিত অতিরিক্ত সহবাস করিয়া থাকেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা—

আমি বলিলাম, না— আমি মোটেই সহবাস করি নাই, করিবার অবসরও পাই নাই, নেশার ঝোঁকে মাথা ঠিক করিতে পারি নাই, শেষরাত্রি, ঘুমের দরুন মাথা কিছু ঠিক হওয়ার পর সহবাসের ইচ্ছা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে একটি শিশু সন্তানের ক্রন্দন ধ্বনিতে সে ইচ্ছাও দূর হইয়া গিয়াছিল, তিনি বলিলেন, বাস্তবিকই তাহার একটি ৩/৪ মাসের মেয়ে আছে, কিন্তু তাহার ঘরে লোক গেলে মেয়েটাকে শয়নের কামরায় আনে না। অন্য কামরায় তাহার মা ও দাসীর নিকট মেয়ে থাকে। তবে কেন ভিজিট ফেরত আনিব না বলিতেছেন। এইসব কথাবার্তা হইতে হইতেই বাসায় আসিয়া পড়ি, আমাকে

বাসায় নামাইয়া দিয়াই তিনি গাড়িসহ চলিয়া যান, ও অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া আমার অঙ্গুরীয় ও শাল ফিরাইয়া দেন, আমি তাহা কিছুই গ্রহণ না করিয়া তাহাকে উক্ত শাল ও অঙ্গুরীয় বকশিস দিয়া ফেলি। পরে তিনি ভিজিটের টাকা ফেরত আনিয়াছেন বলিয়া আমাকে জানান, আমি তাহাকে কিছু মন্দ-সন্দ বলি ও ঐ টাকা কোন ভাল গণিকাকে দিয়া রাত্রি যাপন করিতে বলি।

পরদিন হইতে আমরা কিছু বেলা থাকিতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া ৭টা সাড়ে ৭টার সময় বাহির হইয়া পড়ি, এক এক পাড়া করিয়া সমস্ত শহরের নামজাদা গায়িকা বাইজি ও খেমটাওয়ালী সকলের ঘরে যাইতে থাকি ও আমাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া প্রত্যেকের ঘরে গিয়া এই ছলনায় গান শুনিতে থাকি যে আমাদের বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষে একজন বাইজি ও একজোড়া খেমটাওয়ালীর আবশ্যক পড়িয়াছে। অতএব আমরা নিজে গান শুনিয়া পছন্দ করিয়া বাইজি খেমটাওয়ালী নিব, বা পছন্দ করিয়া বায়না করিয়া যাইব। বিবাহের তারিখ মত চিঠি লিখিয়া শেষে তাহাদিগকে নেওয়াইব। এইরূপ ভান করিয়া আমরা প্রত্যেক রাত্রে ৫০/৬০ জনার ঘরে যাতায়াতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু প্রত্যেক ঘরেই প্রায় ১০ মিনিট ১৫ মিনিটের বেশি সময় কাটাইতাম না। তাহারাও আমাদের ছলনাপূর্ণ কথা শুনিয়া একছিলিম ও একখিলি পানের বেশি দিত না। এইরূপ প্রায় ৩/৪ দিন গত হয়। তৎপর মনোহরা নাম্নী খেমটাওয়ালীকে আমার খুব পছন্দ হয়, ও রাণী নাম্নী বাইজিকেও পছন্দ হয়, তাহাদিগকে বায়না করিব বলিয়া আশ্বাস দেই, ও যে বাড়ি হইতে টাকা লইয়া শীঘ্রই লোক আসিবে। অদ্য আবার ২য় তাগিদ টেলিগ্রাম করিয়া বলিয়া মনোহরার নিকট একরাত্রের ভিজিটের প্রস্তাব করিলাম। প্রস্তাবকারী আলী আকবর আমাকে বলিল যে, আপনার মোসলমানী পোষাক আচকন পায়জামা বা আনিয়া হিন্দুয়ানী পোশাক শার্ট, কোট ধুতি পরিয়া আসিলে ৮ আষ্ট টাকা ভিজিটে অদ্যই কর্য্যোদ্ধার হইবে। কিন্তু সে রাত্রে আইসা অসুবিধা হওয়ায় কল্য আসিব বলিয়া চলিয়া আসি।

কিন্তু বাস্তবিকই মনোহরার অনিন্দিত রূপরাশিতে আমি মোহিত হইয়া পড়ি। পরদিবস এইভাবে ঘরে ২ ঘুরিতে ২ রাত্র ১১টার সময় আমিরজান নাম্নী গণিকার ঘরে যাইয়া বসি। কয়েকদিন কোন রকম নেশা না খাওয়াতে নেশা খাওয়ার জন্য মন আমার ও আলী আকবরের চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন ঐ গৃহিণী বাইজিকে বলায়, সে তাহার ভৃত্য দ্বারা ও আমাদের টাকা দ্বারা ১ বোতল গ্রিনছিল হুইচকি ও সুডা ওয়াটার আনাইয়া দেয়। তখন আমরা ৩ তিন জনে অর্থাৎ আমি ও আলী আকবর মিয়া ও গৃহিণী আমিরজান তিন জনেই পান আরম্ভ করি। আলী আকবর তবলা হাতে নেয় ও আমিরজান গান গাইতে থাকে। এইরূপে প্রায় ১৷৷ দেড় ঘণ্টা অতিবাহিত হয় ও বোতল ফুরাইয়া যায়। ও আমি ঐ গৃহিণীর পালঙ্কে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ি। আমার সংগীয় টেকইর বাপ পালঙ্কের ধারে নীচে মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়ে।

অখন আলী আকবর মিয়া মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছি না বলিয়া নিকটবর্ত্তী অন্য গণিকার ঘরে চলিয়া যায়। ভোরে আমাকে পাইবেন বলিয়া যায়। শেষ রাত্রিতে

আমিরজান বাইজির চেঁচানিতে টেকইরবাপের নিদ্রাভঙ্গ হয় ও উঠিয়া বসিয়া পড়ে। ও আল্লা খুনের দায়ে ঠেকাইবে নাকি বলিতে থাকে। ভোরে আলী আকবরের ডাকাডাকিতে নিদ্রাভঙ্গ হয় ও গাত্রোত্থান করিয়া গাড়িযোগে বাসায় যাই ও বাসা হইতে স্নানোপযোগী বস্ত্রাদি ও সাবান-তৈল ইত্যাদি লইয়া বুড়িগঙ্গাতে যাই ও স্নান করি। স্নানান্তে বাসায় ফিরিয়া আসি, বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আহারাদির পর বিশ্রাম করি ও নিদ্রা যাই, অনুমান ৪টার পর নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালনান্তে গাড়ি আনাইয়া আমরা আবার শহর ভ্রমণান্তে বহির্গত হইয়া যাই, রাত্র ৮টার সময় ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ আসিয়া জাহাজে উঠি ও ঐ জাহাজেই বাড়িতে আলী আকবর মিয়াসহ আমরাত্রয় লোকই চলিয়া আসি।

চতুর্থবারের ভ্রমণ

সন ১৩০৫ বাংলার ফালগুন কি চৈত্র মাসে আমার স্ত্রী বিয়োগের ৩/৪ মাস পর এক দিবস ৭টা ৮টার সময় বগার বাপের বাড়ি বসিয়া গাঁজা খাইতেছিলাম, হঠাৎ ভাটীয়াল স্টীমারের হুইছেল আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, আমি ৫/৭ দিন পূর্ব্ব হইতেই মনে ২ স্ত্রী বিয়োগজনিত দুঃখে দুঃখিত হইয়া ও নানা অসুবিধায় পড়িয়া বিদেশ যাওয়ার কল্পনা মনোমধ্যে করিয়াছিলাম। ও আগামীকাল্য ভাটীয়াল জাহাজে ঢাকায় একা চলিয়া যাইব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। স্টীমারের হুইছেল শুনা মাত্রই গাঁজার কল্কি বগার বাপের হাতে দিয়া তাহার বাড়ি হইতেই পূর্বমুখী 'পাগলা'র সড়কে উঠিলাম। উঠিয়াই উত্তরমুখী গোদামঘাটে গেলাম। গিয়া নারায়ণগঞ্জের টিকেট কিনিলাম, বাগারবাপ ও মসতী আমার সঙ্গে ঢাকা যাইবে বলিয়া উভয়েই অতিশয় কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল। কিন্তু আমি তাহাতে কান না দিয়া কাহাকেও সঙ্গে নিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম। সঙ্গে নিলাম মাত্র ১ খানা কম্বল, যাহা নিচে বিছাইয়াছিলাম। ও নিলাম একটা ইলেকট্রিক বেটারীর বাক্স, ও একটি মখমলের চৌগা, যারহা দ্বারা রাস্তায় বালিশের কাজ লইয়াছিলাম, একখানা জরীর শাল, পরনে ছিল একখানা ধুতি, গায়ে ছিল একটি ওয়াস্কোট, গলায় ছিল আমার পিতৃব্যের সময়ের একছড়া তছবী, ধুতি খুটে বাঁধা ছিল ৫৫, পাঁচপঞ্চাশটি টাকা, ওয়াস্কোটোর পকেটে ছিল ২০০ দুইশত টাকার নোট, হাতে ছিল একটি বেতের গল্লা, এইমাত্র দ্রব্যাদিসহ রওয়ানা হইলাম। স্টীমার ছাড়িয়া দিল, বগারবাপ ষ্টীমার হইতে উঠিয়া বোধ হয় আমাকে দেখাইবার জন্য ক্রন্দনের হাবভাব দেখাইতে লাগিল, ও কপট ক্রন্দন করিতেছিল, যাহা হউক তৎপ্রতি মনোযোগ না করিয়া আমি 3rd Class-এর পেছেঞ্জারগণের নিকট যাইয়া পূর্বোক্ত কম্বল বিছাইয়া, ইলেকট্রিক বেটারীর বাক্স, চৌগা, ও শাল উপাধান বানাইয়া পড়িয়া রহিলাম, ও মনে ২ স্ত্রী সম্বন্ধে ও অন্যান্য কতকিছু ভবিতে লাগিলাম।

ষ্টীমার চলিতে লাগিল ও দিবস বাড়িতেও কিছুই খাওয়া হইয়াছিল না, ষ্টীমারেও

কিছু খাওয়া হইল না সন্ধ্যার পর মার্কুলি বড় ষ্টীমারের গায়ে ভিড়িল, তখন পেছেঞ্জারগণ যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। আমিও আমার দ্রব্যাদিসহ বড় জাহাজে উঠিলাম। তখন ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছিল, বড় ষ্টীমারে সন্দেশের দোকান ছিল, আমি ঐ দোকানে যাইয়া সকল সন্দেশই দেখিলাম কিন্তু কিছুই পছন্দ না হওয়াতে, মনে নাই একটি কি দুইটি মতিচোর লাড্ডু ক্রয় করিলাম ও খাইলাম। তৎপর নীচের তলায় যাইয়া পানির কলে চাপ দিতে থাকিলাম। ও প্রচুর জল উঠাইয়া পান করিলাম। তাহার পর আবার উপরে উঠিলাম এবং নিদ্রা গেলাম, ষ্টীমার রাত্র অনুমান ১টার সময় ছাড়িয়া দিল, সমস্ত রাত্র ষ্টীমার চালাইয়া পরদিবস সমস্ত দিনও চালাইল, রাত্র ১২টার সময় নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমার পৌঁছিল, পৌঁছামাত্রই পেছেঞ্জারগণও উঠিতে আরম্ভ করিল, কেহবা গোদামঘরে প্রবেশ করিল কেহবা অন্য জাহাজে গেল, কেহ-কেহবা হুটেলের দিকে গেল। কিন্তু আমি একা এখন যাই কোথায় তাহাই মূল ভাবনা এইরূপ ভাবনায় অনেক সময় কাটিয়া যাওয়ায়, জাহাজ নীরব, নিস্তব্ধ হইতে লাগিল, প্রায় সকল পেছেঞ্জারই চলিয়া গিয়াছিল যাহারা অবশিষ্ট রহিয়াছিল, তাহারাও এখন নিদ্রামুখে বিভোর হইয়াছিল, ইতিমধ্যে একজন টিকেট কালেকটার ছোকরা বাবু আসিয়া নিদ্রিত পেছেঞ্জারগণকে জাগাইয়া টিকেট চেক করিতে লাগিল, আমার টিকেট চাওয়ায় আমি বলিলাম, সকালে দিব, সে বলিল ১২টার ট্রেনে যদি পলাইয়া যাও তবে কি হইবে?

এই কথা লইয়া তাহার সহিত আমার কিছু বচসা হইল, আমিও ক্ষুধার্ত থাকায় অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল, কিন্তু শেষে রাগ থামাইয়া পকেট হইতে টিকেট দিলাম। সে চেক করিল ও ষ্টীমার হইতে পারে [পাড়ে] উঠিয়া যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিল। আমিও একজন সঙ্গী পাইয়া উপরে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম, সেও চলিল, আমিও তাহার পিছে পিছে চলিলাম, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবু কোথায় যাইবেন?

সে বলিল, আমি একটু ঘুরে-ফিরে আসি।

আমি মনে ২ বলিলাম, এতরাত্রে কোথা থাকি ঘুরে আসবে?

এই শালা বদমাস। বোধহয় বেশ্যা বাড়িতে যাইবে।

সে চলিল, আমিও চলিলাম, মনে করিলাম উভয়ই এক পথের পথিক, দেখি শেষ কি হয়?

গোদামঘর পার হইয়া যখন উচ্চ পোলের উপর উঠিলাম, তখন এক-দুইজন লোক তথায় দাঁড়াইয়া ষ্টীমারের পেছেঞ্জারগণকে নিজ ২ হুটেলে নিতেছে, আমরা উভয়কে জিজ্ঞাসা করিল হুটেলে যাইবেন কি?

আমরা উত্তর করিলাম, না, তখন তাহারা ষ্টীমারের দিকে চলিয়া গেল, কেরানী আমার অগ্রে ছিল, সে দ্রুত গতিতে লাগিল, আমি ক্ষুধাতুর থাকায় তাহার সহিত যাইতে পারিলাম না, পিছনে পড়িয়া গেলাম, যখন বেশ্যা বাড়িতে প্রবেশ করিলাম তখন দেখিলাম, ঐ শালা ফিরিয়া আসিতেছে, 'আবার পূর্বাবচসার কথা মনে পড়িয়া রাগ জন্মিল ও গল্লা হাতে লইয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলাম। সে ভয় পাইল,

ত্রস্তের সহিত সরিয়া পড়িল, আমি মনকে বলিলাম, মন একি তোমার দুঃসাহস। একা বিদেশে আবার বেশ্যা বাড়ির সাক্ষাতে একি দুষ্কর্ম করিতে বসিয়াছ, একি এ সময় তোমার সাজে?

সম্মুখস্থ বেশ্যার দরজা খুলিল, সম্ভবতঃ বেশ্যার ঘর হইতেই ঐ কেরানী বাহির হইয়াছিল, ও উত্তম আলোক প্রকাশ পাইল, আমিও গৃহে প্রবেশ করিলাম, ও বারবনিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার এখানে থাকিতে পাইব? কত দিতে হইবে?

সে বলিল, তোমার বাড়ি কোথায়?

আমি বলিলাম- – আমার বাড়ি ছিলেট।

বস। আমার কথা শুন।

সম্প্রতি আমাদের এখানে পুলিশের অত্যন্ত কড়াকড়ি ও দৌরাত্ম্য, তুমি বিদেশী লোক, তোমাকে পাইলেই থানায় নিয়া যাইবে, ও পরিচয় ইত্যাদি লিখিয়া রাখিবে, ও কলে-কৌশলে কিছু আদায় করিতে পারিলে আদায় করিবে, আমি এই জন্য সতর্ক করিতেছি যে, তোমাকে দেখিতে ভদ্রলোকের মত বোধ হয়, কেন অনর্থক থাকিয়া বিপদে পতিত হইবে?

. আমি বলিলাম, নিকটে কোন হুটেল আছে কিনা? রাত্রে কোথায় থাকিব?

সে বলিল, সিধাসিধি বাহির হইয়া পশ্চিমমুখী গেলেই উত্তরের গলিতে যত ঘর দেখিবে সমস্তই হুটেল, এই কথাবলা মাত্রই আমি উঠিয়া গেলাম। এবং তাহার কথামত হুটেলের সন্ধান পাইলাম এবং এক ঘরে প্রবেশ করিলাম।

হুটেলওয়ালাকে বলিলাম, ভাত প্রস্তুত আছে কি?

সে বলিল, আছে।

আমি বলিলাম দাও, সে দিল।

আমি সন্তুষ্ট হইয়া খাইলাম, মাছের ঝোল ও সিম তরকারী, ডাইলও ছিল, আমি তৃপ্তির সহিত খাইয়া শুইব কোথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল, ঐ যে নিচে ঘুমাইয়াছে দেখিতেছ, ওদের ধারে শুইলে এক পয়সা লাগিবে। ও ঐ যে কম্বল বিছান দেখিতেছ চৌকির উপরে, ঐখানে শুইলে দুই পয়সা লাগিবে। আমি দেখিলাম, চৌকির উপরেও একজনা লোক শুইয়া আছে, কিন্তু আরও দুই-তিনজন শুইতে পারে এই পরিমাণ প্রচুর জায়গা আছে।

আমি প্রায় দুই দিনের উপবাসী ছিলাম, এখন তৃপ্তির সহিত খাওয়াতে পেটভারী হইয়াছে, ও নিদ্রা আকর্ষণ করিয়াছে, চৌকিতে শোয়া মাত্রই নিদ্রাকর্ষণ করিল। নিদ্রাকর্ষণ করার পর স্বপ্নে দেখিলাম আমার জেঠাত ভাই— যিনি এখন নিরুদ্দেশ তিনি পূর্বেই সংসার বিরাগী হইয়া আউলিয়া স্বভাবপন্ন হইয়া গিয়েছিলেন, তিনি আমাকে বলিতেছেন— বদমাস্ আমি তোর জুতা [অর্থাৎ স্ত্রীকে] নিয়া গিয়াছি ও তুই বদমাসি করার জন্য এত দূর আসিয়াছিস? বলিয়াই মোটা এক ঠেঙ্গা হাতে লইলেন। আমি দৌড়াইতে লাগিলাম। তিনি ঠেঙ্গা হাতে আমাকে মারিবার জন্য দৌড়াইতে লাগিলেন,

আমি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে জাগিয়া উঠিয়া বসিলাম। ও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনুমান রাত তখন ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। হুটেলওয়ালা হুটেলবাসী, পথিকগণকে জাগাইতেছে ও বলিতেছে, যাহাদের পয়সা বাকী আছে সকাল দেও, কোন ২ জাগার ট্রেন এখনি ছাড়িবে। কেহ ২ পয়সা দিতে লাগিল, কেহ কেহবা দিতেছি বলিতে লাগিল, আবার কেহ ২ বলিতে লাগিল আমি যে ট্রেনে যাইব তাহা ছাড়িবার অনেক বিলম্ব আছে, একটু শুইতে দেও, যাবার আগেই পয়সা দিয়া যাইব, অনেকজন নিজ ২ জিনিসপত্রাদি গুছাইতে লাগিল, আমি কোন কথা কহিলাম না দেখিয়া হুটেলওয়ালা বলিল, তুমি কেন কিছুই বলিতেছ না?

তখন আমি বলিলাম, আমি ঢাকা মেইলে ৭টা কি ৮টার সময় যাইব, এত আগে কথা কহিয়া লাভ নাই।

সে বলিল, পয়সা দিয়া শুইয়া থাক, শেষে তোমার ৮টার মেইলে বা ৪টার মেইলে যাও কোন বাধা নাই।

আমি বলিলাম, আমি তোমার পয়সা না দিয়া যাইব না।

সে বলিল, এসব কথা সকলেই বলিয়া থাকে, শেষে লোকের ভিড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়, দেখাই যায় না।

এই কথা শুনিয়া আমার মনে কিছু রাগের উদ্রেক হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার পয়সা সাড়ে তিন আনা কি পনে [পৌনে] চারি আনা ফেলিয়া দেই, ও আমার পূর্ববর্ণিত উপাধানটি বগলে দাবাইয়া ষ্টেশনের দিকে ধাবিত হই, তথায় যাইয়া দেখি একটা কি দুইটি গাড়ি ছাড়িয়া গিয়াছে। ঢাকা মেইল ছাড়িবার অনেক বিলম্ব আছে, তখন ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করিতে থাকি, কিছুক্ষণ পরে ঢাকা মেইলের টিকেটের ঘণ্টা বাজিতে থাকে, দেখিলাম অনেকেই টিকেট কিনিতেছে,

আমিও গেলাম, ও দুই আনা পয়সা দিয়া একখানা 3rd class-এর টিকিট কিনিলাম, দেখিতে ২ ষ্টেশনের ঘড়িতে ৮ আটটা বাজিয়া গেল। ট্রেনেও হুইছেল দিল ও যাত্রীগণ ট্রেনে উঠিতে আরম্ভ করিল। আমিও যাইয়া ট্রেনে উঠিলাম, ট্রেন ছাড়িলে পর অনুমান অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে ঢাকা ষ্টেশনে পৌছাইয়া যাত্রীগণকে নামাইয়া দিল, আমিও নামিলাম ও ওয়েটিং রুমের এক বেঞ্চে বসিয়া চিন্তা করিলাম, এখন কোথায় যাই, কোথায় খাইব, ও কোথায় থাকিব ভাবিতে ২ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সাময়িক ভাবনাতে যাহা স্থিরকৃত হইয়াছিল তাহারি সাহায্যে কার্য করিব বলিয়া উঠিলাম, ও বহু পূর্ব্ব পরিচিত রুকনপুর নামক মহল্লার আমিরুদ্দীন মোল্লার বাড়ির ঠিকানার উদ্দেশ্যে চলিলাম, লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তথায় পৌছিয়া দেখি তথায় পূর্ব্বকার ঘরবাড়ি কিছুই নাই। দোকানাদি বসিয়া গিয়াছে। এক দোকানে কতকগুলি ছেলেপিলে বসিয়া টুপী বানাইতেছে। ও কারচুপির কাজ করিতেছে। আমিও তথায় বসিয়া পড়িলাম। ও ছেলেরাকে আমিরুদ্দীন মুল্লার বাড়ি ছিল কিনা? এখন সে কোথায়? তাহাকে পাওয়া যাইবে কিনা? তাহারা বলিল— আমিরুদ্দীনের বড় ভাই এই মহল্লায়ই আছে। তাহারা এই বাড়ি বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছে, আমিরুদ্দীনকে কোথায় পাইবেন বলিতে পারি না। বোধহয়, এই সহরেই সে আছে, মধ্যে ২ দেখিতে পাই

কিন্তু তাহার ঠিকানা জানি না। ইতিমধ্যেই সরকারি রাস্তা দিয়া আমিরুদ্দীন যাইতেছে আমি দেখিতে পাইলাম। ও অতি ত্রস্তভাবে গিয়া তাহাকে ধরিলাম। ও বাড়ি বিক্রি করিয়া কোথায় গিয়াছে ইত্যাদি প্রশ্ন করিলাম। সে বলিল, এই সহরেই আছি। আমাদিগকে ঋণজালে জড়িত করায় আমরা উভয় ভ্রাতাই বাড়ি ও দোকান বিক্রি করিয়া ঋণদান হইতে মুক্ত হইয়াছি। ভাইয়ে একটু জায়গা রাখিয়া ঘরবাড়ি করিয়াছেন। আমি আমার ভগ্নীপতির বাড়িতে থাকি ও ছাপাখানায় কাজ করি। তাহাতেই খুরাকী চলে। আপনে কি উদ্দেশ্যে ও কি উপলক্ষে এথায় আসিয়াছেন বলুন।

আমি বলিলাম, সেসব কথা পরে হইবে।

এখন চল স্নান করিয়া আসি। বলিয়াই তৎসমভিব্যাহারে বুড়ীগঙ্গাতে গেলাম। যাইবারকালেই পথে একখানা ধুতি ও একখানা তৌলিয়া খরিদ করিলাম। বুড়ীগঙ্গাতে গিয়া ভালরূপ স্নান করিয়া উক্ত গামছা বা গাত্র মার্জনী দ্বারা গা ভালরূপ মুছিয়া ধুতি পরিধান করিলাম। ও পূর্ব পরিচিত হুটেলে যাইয়া উভয়েই আহার করিলাম। আহারান্তে কিছু বিশ্রামের পর সহর বেড়াইতে বহিষ্কৃত হইলাম ও আমি একা আসিয়াছি বলায় সে আশ্চার্যান্বিত হইয়া গেল, ও কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম, যে, প্রায় ৩/৪ মাস হইল একটি সন্তান হইয়া আমার স্ত্রী মারা পড়িয়াছেন। তজ্জন্যই আমার মন ৩/৪ মাস অবধি অত্যন্ত খারাপ।

মন ভাল হওয়ার জন্য ও কিছু আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য এথায় একা চলিয়া আসিয়াছি। সঙ্গে লোক আনি নাই যে, তাহারা আমার কার্যকলাপ দেখিয়া বাড়িতে যাইয়া বলিবে। ও আমার অসৎ কর্মের বাধা দিবে, এবং আমার অসৎ কর্ম দেখিয়া বাড়িতে গিয়াও জানাইতে পারে, বিধায় একজনা লোকও সঙ্গে আনি নাই। বাস্তবিক আমি কুকার্য করিব বলিয়া বাড়ি হইতেই আসিয়াছি। এবং তুমি আমার ক্লাসফ্রেন্ড তুমিই আমার সহায় বলিয়া একা একা আসিতে সাহস করিয়াছি। তোমার বাড়িতে আসিয়া যখন দেখিলাম ঘরবাড়ি ইত্যাদি কিছুই নাই, বাড়িঘর বিক্রি করিয়া কোথায় গিয়াছ নিরুদ্দেশ জানিতে পারিয়া আমার মন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া ছিল। ও অদ্যই বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম কিন্তু হঠাৎ আপনার দেখা পাইয়া মন আনন্দিত হইয়া মনের পূর্বাভাব জাগরিত হইয়াছে। চল এখন যাই আমোদ প্রমোদ করি গিয়া, তিনি বলিলেন বহুৎ আচ্ছা চলুন, তৎপর পদব্রজে উভয়েই যাত্রা করিলাম। আমরা সহরের নানা স্থান ঘুরিয়া চৌক বন্দরে গেলাম, ও ঘুরিতে লাগিলাম ও তন্নিকটবর্তী ঢাকা চৌক সকেদ নামক স্থানে বঙ্ক বিহারী সাহা নামক ব্যক্তির সহিত পূর্ব পরিচয় থাকায় তাহার দোকানে যাইয়া বসিলাম ও তাহার গদিতে ২৩০ কি ২৪০ টাকা জমা রাখিলাম। ও বলিলাম আমার আবশ্যক মতে যখন যত টাকার দরকার হইবে আসিয়া নিব বা রুক্কা [চিঠি বা চিরকুট] দ্বারা লোক পাঠাইব। আপনি তৎকালীন অবিলম্বে টাকা দিতে হইবে। বলিয়া তাহার ঘরে পান তামাক খাইয়া সন্ধ্যার পর পূর্বমুখী আমিরুদ্দিনের বাড়ির দিকে রওয়ানা হইলাম। পূর্বমুখী কতেক দূর আসিয়াই এক গণিকার দুতালার উপরে বসিলাম ও গানবাদ্য শুনিতে আরম্ভ করিলাম। আমিরুদ্দিনের পরিচিত কয়েক জনা লোকও আসিয়া জুটিল ও তাহাদের দ্বারা বিলাতি

সুরা, সুডা ওয়াটার আনান হইল, ও পান আরম্ভ হইল, প্রায় তিন বোতল খাওয়া হইল লোক ছিল বেশী, আমি ও আমিরুদ্দিন ও বাড়িওয়ালী গণিকা তিনজনা ও আমিরুদ্দিনের পরিচিত ইয়ার বা বন্ধু ৩/৪ জনা ছিল, মোটের উপর সমস্তে ৬/৭ জনা সুরাপায়ী জমিয়াছিল।

সকলেই সুরা পান করিতে চায়, আমি ব্যতীত আর কেহই টাকা দিতে পারে না। আমিও মহাজনের ঘরে টাকা জমা রাখিয়া অবশিষ্ট যে ৫/৭ টাকা আনিয়াছিলাম তাহাও প্রায় নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমার নিকট আর টাকা নাই বলিয়া প্রকাশ করিলাম।

তখন দেখিলাম সুরাপায়ীদের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহারা মুখে যদিও কিছু প্রকাশ করিল না। কিন্তু তাহাদের ভাবভঙ্গীতে সমস্তই আমি টের পাইলাম। ও ঐ গৃহকর্ত্রী গায়িকাও যেন স্ফূর্তিহীন হইয়া এককোনে বসিয়া রহিয়াছে। গান করিবার কথা বলিলেই সে মনের অভাব জানাইয়া গান বন্ধ করিয়াছে দেখিয়া আমি ও আমীরুদ্দিন পরামর্শ করার জন্য ঐ দু'তালার বারিন্দায় বাহির হইলাম। ও আমি বলিলাম ঐ সব মাতাল জমাইয়া কি লাভ হইয়াছে। মদেরও টাকা দেয় না কেবল খায় উহাদিগকে কোন ভান করিয়া বাহির করিয়া দেও নতুবা আমি আর মদের টাকা দিব না। কথা মাত্রই সে উহাদিগের একেক জনকে ডাকিতে আরম্ভ করিল ও বলিল যে উক্ত জমিদার সাহেবের সঙ্গীয় লোকদিগকে না জানাইয়া তিনি চৌক বন্দর হইতে আসিতেছেন বলিয়া আমি আনিয়াছি। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি। তাহারা খানা ইত্যাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছে, এদিকে অনেক রাত্র হইয়া পড়িয়াছে, এখন যদি আমি তাহাকে ফিরিয়া লইয়া না যাই, তবে তাহাদের হাতে আমার ইজ্জত রাখা কঠিন হইবে। এবং যদি তাহারা অবাধ্য হইয়া যথাযথ অবস্থা বাড়িতে লিখিয়া দেয় তবে তিনিও বাটিতে তাহার পিতাকে কি প্রকারে মুখ দেখাবেন, তাই ভাবিতেছি যদি আমরা একজন ভদ্রলোককে আমোদ-প্রমোদ করিতে ডাকিয়া আনিয়া এরূপ বিপদগ্রস্ত করি তবে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকে কই, যদি তাহার সঙ্গের লোকেরা কোনরূপ গণ্ডগোল না করে তবে তিনি আরও কয়েকদিন এথায় থাকিবেন। যতদিন এথায় থাকবেন, ততদিনই প্রত্যহ আমরা আমোদ-প্রমোদ করিতে পারিব। কোন গণ্ডগোল হইলে তিনি আগামীকল্যই ফিরিয়া যাইবেন।

অতএব এখন তাহাকে লইয়া বাসায় যাইতে চাই, তাহাতে এই কথা শুনিয়া সমস্ত চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আমি ও আমিরুদ্দিন বাসায় যাইবার ছল করিয়া পূর্বমুখী রওয়ানা হইলাম, ও পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সমস্ত মাতালই দিক বিদিক চলিয়া যাইতেছে। আমরা আস্তে ২ মদের দোকানের দিকে অগ্রসর হইলাম। ও আমিরুদ্দিনের দ্বারা একটি বোতল ও একটি পাইট আনাইলাম। অন্য দোকান হইতে ৩/৪টি সুডার বোতল ক্রয় করিয়া আমরা উভয় পূর্ব উক্ত গানেওয়ালীর দুতালার উপরে উঠিলাম, ও গৃহকর্ত্রীকে বলিলাম এই নেও বোতল, ও গান গাও স্ফূর্তির সহিত।

সে উচ্চ হাসি করিয়া উঠিল ও গ্লাস ধুইয়া দিল। ও আমরা ৩ তিনজনেই পান করিতে লাগিলাম। কিন্তু গোপর্দা চলিয়া যাওয়াতে বিনাবাদ্যে গান সাদা ২ বোধ হইতে লাগিল। বোতল শেষ হইয়া গেল তখন পাইট খাওয়া আরম্ভ করিলাম। দূর ঘড়িতে ঠং ২ করিয়া ১১টা বাজিয়া গেল। তখন অতি মন্দ গতিতে পানপাত্র চলিতে লাগিল। আমিরুদ্দিন নেশার ঝোঁকে মাটিতে মাথা ফেলিয়া দিল, গানেওয়ালীও ঝিমাইতে লাগিল। বিশেষতঃ রাত অধিক হইয়া যাওয়ায় সকলেরই ঘুমের আবির্ভাব হইয়াছিল। সকলে মিলিয়া পূর্বযাত্রী মাতালরা সহ প্রায় ৭/৮ বোতল মদ খাওয়া হইয়াছিল তাহাতে আবার সবগুলিই বিলাতী সরাব অতিনেশা উদ্দীপক, হুইচকি ও ব্রান্ডি, আমিও নেশার ঝোঁকে ঢুলিতে ২ অসহ্যবোধ করায় চেয়ার হইতে উঠিয়া উক্ত নর্তকীর পালঙ্কের উপর যাইয়া উঠিলাম ও কাইত হইয়া রহিলাম। গৃহটি নীরব নিস্তব্ধ হইল।

অনেকক্ষণ পর আমি নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম ও আমিরুদ্দিনকে জাগাইলাম ও তাহার বাড়ির দিকে রওয়ানা হইলাম। অনুমান ২ মাইল পূর্বদিকে আসিয়া অর্থাৎ আমিরুদ্দিনের বাড়ির ধারে আসিয়া অনুমান তাহার বাড়ি হইতে প্রায় সওয়া মাইল পশ্চিম দিকে এক বড় বাড়ির বৈঠকখানায় গান বাজনা হইতেছে শুনিতে পাইলাম। আমরা ঐ বৈঠকখানার দ্বারে করাঘাত করিলাম, দ্বার খুলিল ও ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম ঐ পাড়ার সাধারণ লোকেরা ও বাসাচাকর প্রভৃতি গানবাদ্য করিতেছে। অনেকেই আমিরুদ্দিনকে চিনিতে পারিল, ও হাত উঠাইয়া সেলাম দিল। ওরা সমস্তই আমিরুদ্দিনের পাড়াপড়সী ও পরিচিত লোক। তাহাদের গানবাদ্য দেখিয়া আমার হাসি পাইল ও তাহাদের হাত হইতে তবলা কাড়িয়া আনিয়া বাজাইতে লাগিলাম। তাহাদের মধ্যে একজনা বেহালাও বাজাইল ও দুই তিন জনা ক্রমশঃ একা ২ গাইল, তৎপর সভা ভঙ্গ হইল।

সেটা গাঁজার মজলিশ থাকায় আরও দুই তিন ছিলিম গাঁজা উড়িল, আমরাও খাইলাম, সকলই চলিয়া গেল, কেবল দুজনা রহিল। একজনা ঐ ঘরের মালিক ভদ্রলোক ও একজনা চৌকিদার, ঐ মালিকের চাকর, মালিক ঐ চাকরের দ্বারা ঐ দালানের গদিতে আমাদের শয়নের বন্দোবস্ত করাইয়া দিলেন ও চলিয়া গেলেন।

আমরা উভয়েই শুইয়া রহিলাম, চাকরও অপর পার্শ্বের গদিতে শুইয়া রহিল। সে রাত্রে আমার অত্যন্ত জল পিপাসা হইল, আমি আমিরুদ্দিনকে জাগাইলাম, সে সমস্ত ঘর তাল্লাস করিয়া বিন্দুমাত্রও জল পাইল না, চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল জল কোথায় পাওয়া যাইবে, সে বলিল এখন কোথাও জল পাইবেন না। রাত্রি প্রায় ৩টা ৩।।টা বাজিয়াছে। তবে যদি সাক্ষাতের মসজিদে যান সেখানে অজুর জল থাকিলে পাইতে পারেন।

শুনিয়া আমি ও আমিরুদ্দিন উভয়েই বাহির হইলাম ও মসজিদে যাইয়া কলসী তাল্লাস করিয়া জল পাইলাম না তাল্লাস করিতে ২ একটা ছোট মাটীর ঘটীতে অল্প জল পাইলাম ও তাহা দ্বারা পিপাসা শান্ত করিলাম। ও ঘরে আসিয়া নিদ্রা গেলাম। তখনই প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে, কারণ গরুর গাড়ি করিয়া মেথরেরা ময়লা নিয়া

যাইতেছে শব্দ শুনিয়া টের পাইলাম। তারপর আমিরুদ্দিনের সঙ্গে তার ভগ্নীপতির বাসায় পাক্কা ঘাঁট বান্ধা পুষ্করিণী দেখিতে পাইয়া, পরিষ্কাররূপে হাতমুখ ধুইয়া গতরাত্র যাপনের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি সেখানে জনমানবের কোন চিহ্ন নাই। আমরা ঘরে প্রবেশ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে গৃহস্বামী আসিলেন।

আমিরুদ্দিন বলিল চাকর কোথায়?

আমরা বাহ্য হইতে আসিয়া তাহার কোন উদ্দেশ পাইলাম না, গৃহমধ্যে আমদের কিছু জিনিসপত্রও রহিয়াছে, গৃহে প্রবেশ না করিলে কেমনে পাইব? এই কথা বলামাত্র গৃহস্বামী হরে ২ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু হরের কোন উত্তর পাইলেন না। বোধহয় চাকরের নাম হরে ছিল। শেষে গৃহস্বামী অপর দোকান হইতে ঐ তালার মাপের চাবি ক্রয় করিয়া আনিয়া উক্ত দরজা খুলিলেন।

আমরা প্রবেশ করিয়া দেখি আমি বাহ্যে যাওয়ার পূর্বে আমর শরীর হইতে যে কোট, সার্ট মোজা ইত্যাদি খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম তাহা কিছুই নাই। সার্টের পকেটে ছিল ২ তোলা চরশ ও দুইটি টাকা তাহাও নাই। গৃহস্বামী বলিলেন এইসব আর কে নিবে এইসবই হরের কাণ্ড, আচ্ছা তাহাকে তাল্লাস করিয়া পাইলে আপনাদের সমস্তই দেওয়াইব। অবশেষে আমরা বুড়িগঙ্গাতে যাইয়া স্নান করিলাম। স্নানান্তে নিকটস্থ হুটেলে যাইয়া আহারাদি শেষ করিলাম, ও কিছু বিশ্রাম করিয়া সহর বেড়াইতে বাহির হইলাম। সহর ঘুরিতে ২ অপরাহ্নে কিঞ্চিত জলযোগ করিলাম, ও আরও বেড়াইয়া প্রায় ৭।।টার সময় সাচিবন্দর সারদা নাম্নী খেমটাওয়ালীর দুতালার উপরে উঠিলাম। ও উক্ত খেমটাওয়ালীকে গান-বাজনার যোগাড় করিতে সোপর্দা, ছামাজি ইত্যাদিকে ডাকাইয়া আনাইবার কথা বলিলাম, ও হুইচকি' ব্রান্ডি সুডা ওয়াটার ইত্যাদির জন্য কতেক টাকা দিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্তের যোগাড় হইয়া গেল।

ছামাজি সারঙ্গ বাজাইতে লাগিল, সোপর্দা তবলা বাজাইতে আরম্ভ করিল ও মদ্যপায়ীদের মধ্যে ৫/৭ যে জনা হইয়াছিল তন্মধ্যে খেমটাওয়ালীই একজনকে ছাকি [অর্থাৎ পান পাত্র দাতা] নিযুক্ত করিল, ও সুডা ওয়াটার খুলিয়া মিশ্রিত করিয়া আমরাসহ প্রায় ৮/১০ জনাকে ক্রমান্বয়ে পাত্র বিলি করিতে লাগিল।

ওদিকে খেমটাওয়ালী গান আরম্ভ করিল, ও সোপর্দা, ও ছামাজি ইত্যাদি একযোগে সাদত করিতে আরম্ভ করিল। গানবাদ্য খুব জমিল, সুরাপাত্রও অনবরত চলিতে লাগিল, মধ্যে ২ চরশ ও গাঁজা খাওয়া আরম্ভ হইল, ঐ মাতালদের মধ্যেই গাঁজাখোর ছিল, তবলচি বঙ্ক নামক ব্যক্তিও ভয়ানক গাঁজাখোর ও চরশখোর ছিল, মোটের উপর একা আমিরুদ্দিন ও খেমটাওয়ালী ভিন্ন অপর সকলেই গাঁজা চরশ খাইতে লাগিলাম। বোতল ফুরাইল আবার আসিতে লাগিল, কে আনে, কে কি করে তাহা আমার লক্ষ্য ছিল না, কেবল পাত্র দে এই শব্দটী মধ্যে ২ উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। প্রায় ১১টা ১১॥ টার সময় আমার নেশা খাওয়াতে অত্যন্ত জল পিপাসা হইল।

তখনই সরবৎ আনার জন্য বলিলাম, বলা মাত্রই মস্তফা নামক দর্জ্জি উঠিল ও

সরবৎ আনার জন্য গমন করিল, অল্প সময়ের মধ্যেই এক সুরাহি পূর্ণ করিয়া গোলাপ জল মিশ্রিত ভাল সরবৎ আনিয়া উপস্থিত করিল।

প্রথম আমি সুরাহির মুখ হইতে একটী গ্লাস লইয়া পান করিলাম ও বাকীটুকু গ্লাস সহিতে উক্ত খেমটাওয়ালীর হাতে দিলাম, সে সুরাহি হাতে লইয়া দালানের দেওয়ালের সহিত নেশার ঝোঁকে ঠেস লাগাইয়া গ্লাস সহিত ভাঙ্গিয়া ফেলিল। উক্ত বেলোয়ারের সুরাই ও গ্লাস ভাংগিয়া ফরাসে পড়ায় তাহার বামপদের কতেক স্থান কাটিয়া গেল আমারও বাম হাতের অংগুলির সামান্য স্থান কাটিয়া গেল ও উক্ত খেমটাওয়ালী টক হাসি হাসিয়া বলিল দেখ দেখ আমার কেটেছে পা ও তোমার কেটেছে হাত, অন্যান্য ব্যক্তিরা তৎক্ষণাৎ আমার হাতে ও তাহার পায়ে ভিজা পট্টি বান্দিয়া দিল ও বার ২ হাত ভিজানির জন্য এক লোটা ভরিয়া জলও আনিয়া দিল।

আবার গ্লাসের উপর গ্লাস চলিতে লালিল। গানবাদ্যও থামিল না আবার পূর্বের ন্যায় স্ফূর্তি চলিতে লাগিল, কিন্তু হাত কাটিয়া যাওয়ায় আমার গাঁজা ও চরশ খাইতে অসুবিধা হইয়া উঠিল। রাত অত্যন্ত অধিক হইয়া যাওয়ায় আমি আমিরুদ্দিনকে গোপনে ইঙ্গিত করিলাম, ও দুতালার সিঁড়ি বাইয়া নীচে অবতরণ করিতে লাগিলাম।

তখন খেমটাওয়ালী শিকার পলাইতেছেরে বলিয়া আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। আমরা নিম্নে আসা মাত্রই আমাকে আসিয়া ধরিল এবং কোথায় যাইতেছ বলিতে লাগিল।

আমি বলিলাম যাইব না, এই আসিতেছি। কিছু জলযোগ করিব। সে বলিল যাইতে হইবে না যাহা চাও সমস্তই এখানে ঘরে আনাইতে পারিব।

কোন হুটেলে খাওয়া-দাওয়া কর বলিলে তখনই সেই হুটেলওয়ালাকে থানা সহিত এখানে আনাইব। আমরা হুটেলের নাম না বলিয়া আমি এক রকম জোর করিয়া তাহার হাত হইতে ছুটিয়া দ্রুত গতিতে পূর্ব দিকে চলিলাম। আমিরুদ্দিনও আমার পিছে আসিতে লাগিল। পূর্বদিকে প্রায় ১ মাইল চলিয়া আসিলে কতওয়ালীর ধারে আসিলাম ও পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে উক্ত খেমটাওয়ালী আর আসিতেছে না অনুমান করিলাম কিছু পথ আসিয়াই সে ফিরিয়া গিয়াছে।

পর দিবস ৪টার সময় আবার বাহির হইলাম, ও ৬টা সাড়ে ৬টার সময় আবার গত রাত্রের খেমটাওয়ালীর বাড়িতে ছাচিবন্দর উপস্থিত হইলাম, ও গত রাত্রের ন্যায় মদ্যাদি পান করিতে রহিলাম।

এই দিবস বঙ্কবিহারী সাহার দোকান হইতে রুক্কাযোগে টাকা আনাইতে হইয়াছিল ও ঐ টাকা দ্বারা রাত্রি ৮টা হইতে ভোর ৭টা পর্যন্ত বিলাতী সুরা, সুডা ওয়াটার, চরশ, গাঁজা ইত্যাদি অতিরিক্তরূপে খাওয়া হইয়াছিল। পান করিতে ২ সমস্ত ব্যক্তিই আত্মবিস্মৃত হইয়া নানারূপ নৃত্যগীত ও নানা অঙ্গভঙ্গি করিয়া প্রাতে নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল। প্রায় ৮টার সময় উক্ত খেমটাওয়ালী তাহার ২টি চাকরাণীর সাহায্যে আমাকে টানিয়া গোসলখানায় নিল ও মাথায় জল ও তৈল দিতে লাগিল। তৈল-জল দিতে ২ আমার কিছু জ্ঞান হইলে খেমটাওয়ালী স্বয়ং আমাকে স্নান

করাইতে আরম্ভ করিল, বহুতর কলসীর জলদ্বারা স্নান করাইল ও ধোপাবাড়ীর ধৌত করা ধুতি আনাইয়া পরাইল।

পূর্বেই আমি অজ্ঞান থাকা অবস্থায় আমিরুদ্দিন হইতে আমরা কোন হুটেলে খাই তাহার ঠিকানা খেমটাওয়ালী জানিয়াছিল ও তিনজনার খানা তৈয়ার করিয়া তাহারই বাড়িতে আনার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল, অনুমান ৯॥ টা পনে দশটার সময় ছলিম নামক হুটেলওয়ালা তাহার সঙ্গীয় ২ জন চাকরসহ আমরা ৩ ব্যক্তির খানা লইয়া উপস্থিত হইল। খেমটাওয়ালী খানার টেবিল ও চেয়ার ইত্যাদি দেখাইয়া দিল।

ছলিম সুচারুরূপে সব সাজাইয়া ঠিক করিল, খেমটাওয়ালীও আমাকে টানিয়া নিয়া এক চেয়ারে বসাইল, তখন আমার উঠিবার শক্তি হইয়াছে অতি। কিন্তু আমিরুদ্দিন এখনও উঠে নাই ও উঠিবার শক্তি হয় নাই। সে ফরাসের চকিতে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু হুটেলওয়ালা ছলিমের চীৎকারে সে বেশীক্ষণ পড়িয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া গেল ও মুখ ও মাথা ধুইয়া আসিল। ও এক চেয়ারে বসিয়া গেল, হুটেলওয়ালা রুটী ও মাংস দিতে লাগিল, আমরা খাইতে লাগিলাম। মাংস ও রুটী খাইতে ২ শেষে অল্প ভাত ও মাংসও খাইতে দিল, তখন জল খাইয়া খানি [খাওয়া] সমাপ্ত করিলাম। ও বিছানায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। রাত্র জাগরণহেতু অবিলম্বেই নিদ্রা আসিল ও আমরা উভয়েই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

সারদা কাল মাগী ছিল, বয়স অনুমান ৩৫/৩৬, তৎকালে আমার বয়স ছিল প্রায় ২২/২৩, বয়াধিক্যবশতঃ অথবা কাল রঙ্গ [ঙ] থাকায়ও আমার মন তাহার প্রতি অনাসক্ত হইয়াছিল না। সে অত্যন্ত লম্বা মাগী ছিল, ও তাহার স্বর কোকিল বিনিন্দিত ছিল, আমি তাহার গান শুনিয়া বিমোহিত হইয়া ছিলাম। তাহার অতি উৎকৃষ্ট আওয়াজ শুনিয়া ও গান বাতানী [অঙ্গভঙ্গী সহকারে] দেখিয়া আমি মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অনুমান ৩॥টার সময় নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিলাম। ইত্যবসরে আমাকে না জানাইয়া উক্ত খেমটাওয়ালী তাহার লোক দিয়া গাড়ি আনাইয়াছিল, আমাকে টানিয়া ঐ গাড়িতে তুলিল, ও একপার্শ্বে সে স্বয়ং উঠিল, গাড়ি তাহার মনোনীত স্থানে যাইবার জন্য চালাইয়া দিল ও অল্পক্ষণের মধ্যে জিন্দাবাহার গলিতে এক দুতালার সামনে গিয়া গাড়ি রাখিল। ও খেমটাওয়ালী বলিল, চল, আমার মেয়ের বাড়িতে যাই?

এই বাড়ির সৌদামিনী নামক মেয়েটি আমাকে ধর্ম্মের মা ডাকিয়াছে, আমিও তাহাকে পেটের সন্তানের মত ভাবিয়া থাকি। আজ ৪/৫ দিন হইল তাহাকে আসিয়া দেখবার জন্য খবর দিতেছে, কিন্তু অনবসরবশত আসিতে পারি নাই, আজ তোমাকে লইয়াই আসিলাম, তুমিও দেখিয়া যাইতে পারিবে, বলিয়াই সে গাড়ি হইতে অবতরণ করিল, ও আমাকে টানিয়া বাহির করিল। সে ঐ বাড়ির দুতালা বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, আমাকেও তাহার সঙ্গে ২ ডাকিয়া নিতে লাগিল। অতঃপর আমরা উভয়েই দুতালার উপরে উঠিলাম। উঠিয়া দেখিলাম প্রকোষ্ঠটী খুব সাজান বটে। টেবিল চেয়ার ছিল, আমরা চেয়ারে বসিলাম, মধ্যস্থলে বিস্তৃত ফরাসের চৌকিতে গালিচার উপর সাদা

বিছানা ছিল, দুই পার্শ্বেই দুইখানা বড় ২ দর্পণ রহিয়াছে।

ঐ মাগী বসামাত্রই আমার পকেট হইতে হাত প্রসারণ করিয়া টাকা লইয়া গেল। টাকার সংখ্যা মনে না থাকায় এখন লিখিতে পারিলাম না, টাকা হাতে লইয়াই তাহার মেয়ে সৌদামিনীকে ডাকিল, ডাকিবামাত্রই অন্য প্রকোষ্ঠ হইতে সৌদামিনী আসিল। ও তাহার হাতে কয়েকটি টাকা দিয়া বলিল, বিলাতী মদ ও সুডা ওয়াটার ও সোপর্দদা ছামাজিকে আনাও, বিলম্ব করিও না। অতিসত্বরে সে বলামাত্রই তাহার ঘরের ঝিকে ডাকিয়া তামাক পান দিবার কথা বলিয়া নামিয়া নীচে চলিয়া গেল। প্রায় ১৫ মিনিট মধ্যে একজন লোক সঙ্গে ও তবলচি ও ছামাজিকে সঙ্গে লইয়া ২/৩টি বোতলসহ ফিরিয়া আসিল।

তাহারা সকলেই আসিয়া ফরাসের চৌকিতে বসিল। কেহ কেহ বাজাইবার যন্ত্রাদি ঠিক করিতে লাগিল। ও একজনা ঝিকে ডাকিয়া ২/৩টি গ্লাসের যোগাড় করিল, ও বোতল খুলিয়া সুডা ওয়াটার মিশাইতে লাগিল। ৫ মিনিট মধ্যেই সকলকে দুইভাগে বিভক্ত বাড়িওয়ালী সৌদামিনীর কথামতে একজন লোক বিলি করিতে লাগিল।

এবং ঐ খেমটাওয়ালীদের পরিচিত নবাব সাহেবের কুঠির নরসিংহ নামক একব্যক্তি, তাহারা ৪ জনেতে এক গ্লাসে ও আমরা ৩ জনে এক গ্লাসে পান করিতেছিলাম। অত্যধিক মাত্রাতে সুরা পান করায়, সহজেই সকলেরই নেশা হইয়া গিয়াছিল। নরসিংহ নামক ব্যক্তি আবার মধ্যে ২ চরশ খাবাইতে ও খাইতে লাগিল। প্রায় ১ ঘণ্টা মধ্যে অত্যন্ত নেশা হইয়া পড়িয়াছিল। তখন দিবাভাগেই আমাদের রাত্রি বলিয়া অনুমান হইয়াছিল, নরসিংহ নামক মাতাল ঘরে ঝুলান ঝাড়েতে দিয়াশলী দিয়া বাত্তি জ্বালাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল। বাড়িওয়ালী ও তাহার মাতার তীব্র নিষেধ শুনিয়া জ্বালাইতে অক্ষম হইয়াছিল। তখন গান বাজনা সুখ অপসৃত হইয়া বিশৃঙ্খলভাব ধারণ করিয়াছিল বিধায় সকলেই উঠিয়া পড়িলাম।

সকলেই স্ব স্ব স্থানের দিকে গেল, আমি ও সারদা খেমটওয়ালী গাড়িতে উঠিলাম। ও সারদা তাহার মেয়ে সৌদামিনীকে ডাকিয়া গাড়িতে তুলিল এবং আমার একপার্শ্বে বসাইয়া দিল, সে একপার্শ্বে ও তাহার মেয়ে একপার্শ্বে ও আমি মধ্যখানে বসিলাম। নরসিংহ নামক মাতালগাড়ির পেছনে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি ছাড়িয়া চৌকবন্দর গেল, ও উক্ত সারদা আমাকে বলিল যে, এখানে কোন ঘরে তোমার টাকা জমা আছে, আমি হস্ত ইঙ্গিতে দেখাইলাম যে, ঐ ঘরে আমার টাকা জমা আছে, সে বলিল ঐ ঘর হইতে আমার জন্য একখানা গোলাবত্তন শাড়ি আনাইয়া দেও। ও আমার মেয়েকেও একখানা ভাল শাড়ি আনাইয়া দিতে হইবে। আমি আমিরুদ্দিনকে বলিলাম ঐ দোকান হইতে একখানা গোলাবত্তন শাড়ি আনিয়া দেওয়ার কথা, সে অল্পক্ষণ মধ্যে একখানা শাড়ি নিয়া আসিল। কিন্তু খেমটাওয়ালীর ঐ শাড়ি পছন্দ হইল না। সে ঐ শাড়িকে অবহেলাক্রমে বলিতে লাগিল ছি ছি, এ শাড়ি কি পরিবার উপযুক্ত, এখনই ফেরত দেও। দাম কত? জিজ্ঞাসা করিলে আমিরুদ্দিন ইহার কোন উত্তর করিতে পারিল না, দেখিয়া আমি বিরক্ত

হইয়া গাড়ি হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া, নিজেই ঐ দোকানমুখী চলিলাম। দোকানও গাড়ি হইতে বেশি দূরে ছিল না, আমি গিয়াই দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এই শাড়ির মূল্য কত বলিয়া দেও নাই কেন?

সে বলিল, এই শাড়ির মূল্য আঠার টাকা মাত্র, ইহা আপনার লোকের কাছে পূর্বেই বলিয়া দিয়াছি।

সে বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছে, আমি বলিলাম এই শাড়ি কোন কাজের নয়, এই জাতের মধ্যে খুব একখানা শাড়ি দেও, কিন্তু সে আমার চোখমুখের ভাব দেখিয়া ও উত্তেজিত কথাবার্তা শুনিয়া বলিল যে, আমি এখন এ অবস্থায় কিছুই দিব না। আপনার পিতা সাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, তিনি যখন ঘোড়া সঙ্গে লইয়া ঢাকায় আসিয়াছিলেন চৌকবন্দরের উত্তরদিকস্থ দুতালা বাড়ি ভাড়া করিয়াছিলেন, সেইসময় আমাদের দোকানের বহুতর জিনিস জরীর কাপড় ইত্যাদি বিক্রি করিয়াছি।

এই রকম সদাশয় পুরুষের ছেলে এইভাবে, অযথা টাকা পয়সা ব্যয় করিতে আমাদের চক্ষে সইবে কেন? সে এই কথা বলামাত্রই আমিও রাগ করিয়া গাড়িতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। গাড়িতে আসিয়াই দেখি গাড়ির ভিতর সারদা খেমটাওয়ালী ও তাহার মেয়ে সৌদামিনী বসিয়া আছে। ও ইত্যবসরে তাহারা নরসিংহ দ্বারা— পাত্র অর্থাৎ মদ খাইবার গ্লাসের যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। ও সৌদামিনীর বাড়ি হইতে অবশিষ্ট মদের বোতলে যাতা ছিল, তাহা বোধহয় পূর্বেই সঙ্গে আনিয়াছিল। আমি আসামাত্র সারদা খেমটাওয়ালী আমাকে টানিয়া নিয়া তাহাদের মধ্যখানে বসাইল, ও পানপাত্র হস্তে দিল, আমিও, বাক্য ব্যয় না করিয়া অবিলম্বে পান করিলাম, তাহারা উভয়েও খাইল, আবার নরসিংহকেও ডাকিয়া আনিয়া একপাত্র দিল।

বাহিরে তামেসগীর অনেক লোক জুটিয়াছিল, পুলিশও আসিয়াছিল। গাড়োয়ানকে ধমকাইল, যে মিউনিসি পালিটির ভিতরে গাড়ি এক জায়গায় ৫ মিনিটের বেশি রাখিতে নিষেধ জানত? তবে কেন তোমার গাড়ি প্রায় অর্ধঘণ্টা একস্থানে আছে।

ইত্যাদি কথা লইয়া পুলিশ ও গাড়োয়ান মধ্যে তর্কবিতর্ক হইতেছিল, পুলিশ গাড়োয়ানকে থানায় লইয়া যাওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু গাড়োয়ান যাইতে অস্বীকৃত হইয়া তর্ক করিতেছিল।

ইতিমধ্যে আমাদের সুনামগঞ্জ সাবডিবিশনের এলাকার আতুয়াজান পরগনার সৈদপুর মৌজায় বাড়ি বলিয়া একব্যক্তি পরিচয় দিয়া বলে যে, বানিয়াচুঙ্গের আজমান রাজা সাহেবের ভাগিনেয় বেড়াইতে ২ এদিকে আসিয়াছিলেন, আপনাকে গাড়ির ভিতরে দেখিয়া চিনিয়া আমাকে পাঠাইয়াছে না আপনে একটিমাত্র কথা গাড়ি হইতে বাহির হইয়া শুনুন। তারপর তিনি বাসায় চলিয়া যাইবেন। যদি আপনে তাহার সহিত না দেখা করেন, তবে আপনি যেখানেই থাকিবেন তিনি সন্ধান লইয়া যে প্রকারেই হউক অদ্য রাত্র হইলেও যাইবেন। বলামাত্রই আমি গাড়ি হইতে বাহির হইতে চাহিলাম। কিন্তু আমার একহাতে সারদা ও ওপর হাতে সৌদামিনী ধরিয়া যাইতে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু আমি তাহাদের বাধা না

মানিয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। এবং সাক্ষাতেই তাহাদের দেখা পাইয়া এক দোকানে বসিলাম।

তিনি আমাকে বলিলেন আপনে এইরকম নামজাদা ব্যক্তির ছেলে হইয়া এই কি অসম্ভব কার্য করিতেছেন? দিবাভাগে দুইদিকে দুই মাগী লইয়া অথচ ঢাকা সহরে মুসলমান নাম ধারণ করিয়া মদ্যপান করিতেছেন? আপনার কি লজ্জা নাই?

আপনি আমাদের জিলার সমস্তকেই লজ্জিত করিলেন। আপনার বাসার ঠিকানা আমাকে বলিয়া দেন। আমি বাসায় যাইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিব। আমি বলিলাম, আমি এখনও কোন বাসা ভাড়া করি নাই, আছি সারদার ঘরে, খাই ছলিমের হুটেলে। বলিয়াই তাহাকে আদাব দিয়া ত্রস্তপদে গাড়িতে আসিয়া উঠিলাম। তারপর দেখিলাম, গাড়োয়ানে আর পুলিশে অত্যন্ত লাগিয়া পড়িয়াছে। গাড়োয়ানের পক্ষে নরসিং অতিদর্প সহকারে পুলিশকে যা ইচ্ছা তা বলিতেছে। পুলিশেরা ২/৩ জন থাকায় জোর করিয়া গাড়ি থানায় লইয়া যাইতে চাহিতেছে। সারদা খেমটাওয়ালী পুলিশকে মারিবার জন্য গাড়োয়ানকে হুকুম দিয়াছে। পুলিশেরাও নরসিংকে গাড়ির পিছন হইতে নামাইয়া ফেলিয়াছে।

তখন সারদার সঙ্কেতে ও ইঙ্গিতে গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়িয়া দিল। গাড়ি পশ্চিমদিকে ছুট্যাইল, পুলিশ বাধা দেওয়ায় পুলিশের কোন বাধা শুনিল না, ঘোড়াকে ঘন ২ চাবুক মারিতে লাগিল, ও ঘোড়াকে চাবুক মারিতেছে ভান করিয়া পুলিশকেও চাবুকের ভয় দেখাইতে লাগিল, একটি চাবুকাঘাত একজন পুলিশের হাতেও লাগিয়াছিল। কিন্তু পুলিশগণ তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিল না। তাহারা নরসিংকে গাড়ি হইতে নামাইয়া তাহারই কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, ও তাহাকে ধমকাইয়া ও ধমকাইয়া কতওয়ালীর দিকে লইয়া যাইতেছিল।

কিন্তু গাড়ি অবিশ্রান্ত গতিতে পশ্চিম দিকে বহুদূর চলিয়া আসিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই গাড়ি সৌদামিনীর বাড়িতে পৌছিল, ও সৌদামিনী নামিয়া গেল ও উপরতলায় উঠিয়া নিস্ক্রান্ত হইল। সন্ধ্যা হইয়া গেল গাড়ি আবার ছাড়িল, ও কিছুক্ষণ পরে ছাচি বন্দর সারদার বাড়িতে পৌছিল। তখন সারদা আমার হাত ধরিয়া নামাইল, আমিরুদ্দিনকেও নামিতে বলিল। আমরা উভয়েই নামিলাম, ও তাহার পশ্চাৎ ২ দুতালায় উঠিলাম।

উঠিয়াই সারদার প্রস্তাবমত স্লিপদ্বারা বঙ্ক বিহারী সাহার দোকান হইতে কত টাকা মনে নাই আনিবার জন্য আমিরুদ্দিনকে পাঠাইলাম, ও সে আসিবার সময় আমাদের নিত্যব্যবহার্য জিনিস অর্থাৎ মদ্য ও সুডাওয়াটার যেন সঙ্গে আনে তাহার পরিমাণও বলিয়া দিলাম। প্রায় ২ ঘণ্টার মধ্যে টাকা ও আমাদের বলিয়া দেওয়া জিনিসাদিসহ আমিরুদ্দিন ফিরিয়া আসিল।

খেমটাওয়ালী সুরা ও সুডা একত্র করিয়া আমাকে ও আমিরুদ্দিনকে দিতে লাগিল। ও সে স্বয়ং পান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রাত্র অনুমান ১০টা ১০॥ টা বাজিয়া গেল। কে যেন সিঁড়ি বাহিয়া উপরতলায় উঠিতেছে, জুতার শব্দ শোনা গেল। উপরে উঠিয়াই দরজায় করাঘাত করিল ও উপরোক্ত খেমটাওয়ালীকে ২ বলিয়া দরজা খুলিয়া দিল। খোলা মাত্রই ২/৩ জনা লোক গৃহে প্রবেশ করিল। সকলেই খেমটাওয়ালীর অপরিচিত

বলিয়া সে কোন কথা কহিল না, আমি চাহিতে চাহিতে চিনিলাম একজনা পূর্ব দিনের দেওয়ান গউছুর রাজা— যিনি বানিয়াচুঙ্গের আজমান রাজা সাহেবের ভাগনেয় বলিয়া আমাদের কাছে পরিচিত। ২য় জনা সাকিন বাগময়না আতুয়াজান কিন্তু সে বলে তার সাকিন সৈদপুর নাম তপেয়জুল হোসেন, তাহার সহিত আমার সুনামগঞ্জে অনেকবার দেখা হইয়াছিল; কিন্তু তাহার নামধাম জানি না। আমি সকলকেই বসিতে বলিলাম।

খেমটাওয়ালীও চাকরানীকে ডাকিয়া পান তামাক দেওয়ার কথা বলিল ও দেওয়াইল। তাহারা খাইতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে তপেয়জুল হোসেন ঠিক যেন আমার মুরব্বীর মত কথার স্বরে আমাকে কিছু ২ তিরস্কার করিতে লাগিল। দেওয়ান সাহেবও পূর্বদিনের ধরনের কয়েকটি কথা বলিলেন যে, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন? ভাল বাসা ঠিক করিয়া দিব, ২/৪ দিন থাকিবার ইচ্ছা হইলে ভদ্রলোকের প্রথামতে থাকিয়া বাড়িতে চলিয়া যান। আমি আপনাকে নারায়ণগঞ্জ গিয়া ষ্টীমারে উঠাইয়া দিয়া আসিব। এদিকে পাত্রের বিরাম নাই, খেমটাওয়ালী পাত্র চালাইয়াছিল। আমি ও আমিরুদ্দিন পান করিতেছিলাম। ১১টা বাজিবার পর তপেয়জুল হোসেন আমার হাতে ধরিয়া বলিতে লাগিল উঠ, রাত্রি অধিক হইয়াছে। তোমাকে এথায় ফেলিয়া যাইব না, অদ্য রাত্রে দেওয়ান সাহেবের বাসায় থাকিবায়। কল্য যাহা করিতে হয় করা যাইবে। আমিও উঠিয়া গেলাম। দেওয়ান সাহেবও উঠিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে খেমটাওয়ালী তপেয়জুল হোসেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল কি মামা? ওকে লইয়া কোথায় চলিলে? সে উত্তর করিল যে, ও আমার ভাগিনেয়। মদ টানিয়া ইহার চরিত্র কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে, আজ ৩/৪ দিন অবধি তাহার কোন খোঁজখবর পাইতেছি না, এখন তাহাকে বাসায় নিয়া যাব, নিয়া শাসন করিব। এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার তুই কে রে মাগী? বলা মাত্রই মাগী উপরতলার একটা জানালা খুলিয়া শিস দিতে আরম্ভ করিল, অমনি চতুর্দিক হইতে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় কংকর বৃষ্টি হইতে লাগিল, অর্থাৎ অবিশ্রান্ত গতিতে কংকর দ্বারা চতুর্দিক হইতে কে বা কাহারা জানি ঢিল মারিতেছিল। ইহা দেখিয়া ও শব্দ শুনিয়া তপেয়জুল হোসেন অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল। ও সে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল যাও বাবা, যেখানে তোমার ইচ্ছা যাও, তখন মাগীও অন্যরূপ সংকেতে আর একটি শিস দিল তখন কংকর বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল, মাগীও আমার হাতে ধরিয়া উপর কামরাতে লইয়া গেল, ও বিছানাতে শুয়াইয়া দিল।

প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া ঐ দুষ্টা মাগী গত রাত্রের বাকী মদ আবার সেবন করাইতে লাগিল, অনুমান ৮টার সময় বোতল নিঃশেষ হওয়ায় আবার আমার পকেট হইতে টাকা লইয়া আরও একটি বোতল ও ২ বোতল সুডাওয়াটার আনাইল। গান শেষ হইতে ২ প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। তখন ঐ মাগী সেদিনকার মত আমাকে টানিয়া গোছলখানায় নিল, ও তৈল-জল মাথায় দিতে ২ স্নান করাইল, ইত্যবসরে ঝিকে ছলিমের হুটেলে পাঠাইয়া খানা নিয়া আসিবার কথা জানাইয়াছিল, ছলিমও অবিলম্বে খানা নিয়া আসিল। আমরাও আহারকার্য সমাধা করিলাম ও পান তামাক

খাইতে খাইতে পূর্ব দিনের ন্যায় নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে শায়িত হইলাম। ৪টার সময় ঘুম হইতে উঠিয়া মুখ প্রক্ষালনপূর্বক বেড়াইবার জন্য আমি ও আমিরুদ্দিন প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু খেমটাওয়ালী একা আমাদিগকে কোথাও যাইতে দিবে না বলিল, ও দিল না। সে গাড়ির জন্য লোক পাঠাইল, গাড়ি আসিলে পর সে গাড়িতে উঠিল, ও আমাকে উঠিতে বলিতে লাগিল।

আমরা উভয়ে পরামর্শ করিয়া আমরা দুইজন মধ্যে আলাপ করিতে লাগিলাম যে, সেইদিন মাগীর সঙ্গে চৌকবন্দরে যাইয়া পুলিশের সঙ্গে যে গণ্ডগোল হইয়াছে, তাহা সকলেই জানিতে পারিয়াছে, ও অত্যন্ত বদনাম হইয়াছে অতএব এই মাগীর সঙ্গে আর কোথাও যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমরা যে, লাক্‌কু [ডাইনী] বেশ্যার পাল্লায় পড়িয়াছি কেমনে মুক্ত হইব? আমাদিগকে সারা জীবন মেড়া [ভেড়া] বানাইয়া রাখিবে নাকি? ইহার কোন উপায় না করিলে কোন রকমেই রক্ষা নাই। কেমনে বা উদ্ধার পাই? কেমনে বা বাড়ি যাই? আমিরুদ্দিন মুক্তির জন্য মনোমধ্যে যেসব ফন্দি আঁটিয়াছিল তাহা আমার নিকট বলিল কিন্তু তাহা আমার পছন্দ হইল না। আমি বলিলাম তুমি ঢাকাই ফককরেই ফন্দিতে কিছুই হইবে না, আমার কথামত চল ও আমার সঙ্গী হও, ২ ঘণ্টা মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্তি প্রদান করিব, ও মুক্ত হইব। এই বলিয়া তাহাকে ইসারা করিয়া গাড়িতে উঠিলাম। ঐ গাড়ির মধ্যে খেমটাওয়ালীর একজনা লোক থাকায় তাহাকে নামাইয়া দিলাম। আমি ও আমিরুদ্দিন একদিকে বসিলাম। খেমটাওয়ালী অপরদিকে বসিল। নানাস্থান ঘুরিয়া সন্ধ্যার পূর্বে অর্থাৎ কোন ঘরে বাতি জ্বালিয়াছে কোন ঘরে বাতি জ্বলে নাই এমত সময়ে চৌকবন্দরে উপস্থিত হইলাম।

খেমটাওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল তোমার যে ঘরে টাকা জমা রাখ ঐ ঘর কত দূর আছে, আমি বলিলাম এইত অতি নিকটে, সে বলিল আমাকে যে সেদিন শাড়ী আনিয়া দিয়াছিলাম সেই শাড়ী কোথায়, তাহার পরিবর্তে ও তাহা হইতে ভাল শাড়ী আনিয়া দেও নাই, ও আমার মেয়েকেও কোন শাড়ী দেও নাই, এ নিমিত্ত আমি লজ্জিত হইয়া আছি। শাড়ী দিতে না পারিলে নগদ টাকা দিলেও চলিবে, আমি মনে ২ বলিলাম, এ আমার পলাইবার সুযোগ আসিয়াছে।

আমি বলিলাম, তোমার একখানা শাড়ী ও তোমার মেয়ের একখানা শাড়ীর মূল্য কত দিতে হইবে? বলিতে পারিলে টাকা দিয়া দিব, সে বলিল, উভয় শাড়ীতে আনুমানিক ৪০/৫০ টাকা হইবে। আমি বলিলাম, তুমি এই শাড়ীসহ আমার জন্য অপেক্ষা কর, আমি অন্ততঃ ১ ঘণ্টা ১॥ ঘণ্টা মধ্যে টাকা লইয়া আসিতেছি। সে বলিল, এত সময় কেন লাগিবে? দোকান ত নিকটে বলিতেছ। আমিও বলিলাম, এখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সে তহবিল মিলাইবে। ও গদিতে ধূপ ধুনা দিবে, তৎপর অন্যকাজ করিবে। সে বলিল দেখিও শাড়ীর মূল্য ৪০/৫০ টাকা আনিবে, মদের জন্যও ১০/১৫ টাকা আনিতে ভুলিবায় না। আমি উর্দ্ধশ্বাসে রওয়ানা হইলাম।

আমিরুদ্দিনও আমার পিছে ২ চলিল আমরা ঐ বঙ্ক বিহারী সাহার দোকানে উঠিয়াই বাজে কথা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তৎপর তাহাকে বলিলাম, যখন টাকার

আবশ্যক হইবে রুক্কা পাঠাইয়া সর্ব্বদাই টাকা নেওয়াই, তাহাই করিব বলিয়াই উঠিয়া পড়িলাম। ও আমি অগ্রে ২ আমিরুদ্দিন আমার পশ্চাতে আমরা উভয়ে দৌড়, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে ২ প্রায় ১ মাইল গিয়াই দাঁড়াইলাম ও কিংকর্তব্য উভয় মধ্যে পরামর্শ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে দেখিলাম কতওয়ালীর ধারে নলিনী খেমটাওয়ালীর বাড়ির সম্মুখে আমরা আসিয়াছি, দেখিয়াই তাহার দুতলার উপরে উঠিতে লাগিলাম, উপরে উঠিয়াই আমি এক চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম ও আমিরুদ্দিন অন্যদিকে গেল। হঠাৎ শব্দ শুনিলাম আমিরুদ্দিন বলিতেছে মা সরস্বতী আমাকে কৃপা কর না কেন? বলিয়াই সে ভক্তিতে পড়িয়া গেল। আমি দেখিলাম সে নলিনী খেমটাওয়ালীর পাকের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকেই ভক্তি করিতেছে, ও মা সরস্বতী বলিয়া ডাকিতেছে। সে অত্যন্ত রাগান্বিতা হইয়া পাতের সমস্ত ভাত জানালা দিয়া ফেলিতেছে, ও আমিরুদ্দিকে কটুক্তি করিতেছে। আমি একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম; কি হে? ব্যাপার কি? তখন নলিনী বলিল না, কিছু নহে, আমি খাইতে বসিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে তোমার সঙ্গের মাতালটি পাকের ঘরে প্রবেশ করিয়া কি ২ বলিতেছে, ও ভক্তি করিয়া মাতলামি করিতেছে। আমি বলিলাম, ঐ মাতাল আজ সমস্ত দিন ও গত রাত্রে শুধু মদ খাইয়া আছে, গতিকেই এত মাতাল হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি তুমি ভাত খাও নাই, সমস্তই জানালা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছ। সে বলিল না, আমার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, শুধু ক্ষীরের বাটীটি টান দিয়া খাওয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখনই সে পাকের ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, আমি ক্ষীরের বাটীর সমস্ত ক্ষীর ফেলিয়া দিয়াছি মাত্র। তাহার মা বাহির হইয়া বলিল, না বাবা, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে হইয়া এইসব মাতাল ছোটলোক সকলকে লইয়া চলাফেরা করিলে চলিবে না। তোমার সঙ্গের ঐ মাতালটি আজ আমার মেয়েকে উপবাস করাইল, ইত্যাদি বলিতে থাকে। আমারও অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল। ঐ মেয়ে মানুষের উপর রাগ কি, আমিরুদ্দিনের উপর রাগ হইয়াছি।

কিন্তু তখনই আমি কাহারও সঙ্গে কোন কথা না বলিয়া রাগের চুটে পর ২ করিয়া নীচে নামিয়া পড়িলাম, আমিরুদ্দিনও আমার পিছে ২ নামিয়া গেল। নামিয়াই পূর্ব্বমুখী আমিরুদ্দিনের বাড়ির দিকে ছুটিলাম, তাহার বাড়ির নিকটে এক হুটেলে আসিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন অনুমান ৩॥ টার সময় হাতমুখ ধুইয়া সহরে বাহির হইয়া পড়িলাম। কতেকদূর অগ্রসর হওয়ার পর তপেয়জুল হোসেন ও দেওয়ান গউছুর রাজা সাহেবের সহিত রাস্তায় দেখা হইলে পর বলিলেন, তাহারা আমাদেরই অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু কথাবার্তার পর আমরা সহরের দক্ষিণ, পশ্চিমদিকে গেলাম ও সন্ধ্যার সময় উক্ত দেওয়ান সাহেবের বাসায় পৌছিলাম, তিনি ঐ সহরের একজন বড় মার্চেন্টের আলয়ে বাসা লইয়াছিলেন। ঐ সদাগরের পুত্রকে নাকি পড়াইতেন ও বাসা ভাড়া ফ্রি ছিল। তাহার কোক সেডে তাহারই নিজের লোক পাকশাক করিত, ও খাওয়া-দাওয়া হইত।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, জ্যোৎস্না প্রকাশ পাইতে লাগিল, দেওয়ান সাহেব

আমাদিগকে তেতালার ছাদের উপর লইয়া গেলেন, ও সেখানে ভৃত্যদ্বারা কয়েকখানা চেয়ার নেওয়াইলেন। ভৃত্য তামাকু আনিয়া দিল, সকলেই পান করিতে লাগিলাম। তেতালার উপরে ছাদে অত্যন্ত বাত্যা বহিতেছিল, কারণ ঐ তেতালা বুড়িগঙ্গার পারে ছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক সেই স্থানে বসিয়া আলাপ প্রলাপ করিলাম। তাহার পর দেওয়ান সাহেব সকলকে পাকের ঘরে নিয়া গেলেন। খাওয়াদাওয়ার পর আবার পূর্ব্বোক্ত চেয়ারে যাইয়া বসিলাম ও ধূমপান করিত লাগিলাম। অনেক সময় গল্প গুজারি হওয়ার পর আমার অত্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ হইল, দেওয়ান আমাদিগকে লইয়া ঐ তেতালার উপরেই ছোট এক কুঠায় প্রবেশ করিলেন, তথায় ছোট ২ ২/৩ খানা চৌকির উপর বিছানা রহিয়াছে।

আমি দেওয়ান সাহেবের কথামত এক বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন ৮টার সময় গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালনপূর্বক কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। জলযোগের সমস্তই তৈয়ার পাইলাম। জলযোগান্তে দেওয়ান সাহেব, তপেয়জুল হোসেন ও আমি বাসা অনুসন্ধানে বহিষ্কৃত হইয়া পড়িলাম। চৌকবন্দরের উত্তরদিকে কিঞ্চিৎ পূর্বে অর্থাৎ চৌক বন্দরস্থিত বড় মসজিদের ঈশান কোণে, মহল্লার নাম এখন মনে নাই সেই স্থানে একটা ভাড়াটিয়া বাড়ি খালি পাওয়া গেল। বাড়িটি মধ্যম রকমের বটে, বাড়ির চতুর্দিকে উচ্চ দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত শুধু দক্ষিণ দিকে সরকারী সড়কে উঠিবার রাস্তা ছিল। সেই রাস্তায়ও কপাট লাগান ছিল। বাড়ির ভিতরে কিঞ্চিৎ দূরে পরিষ্কৃত ২ খানা পায়খানা ছিল, তাহাও নিত্য নিত্যই মেথর দ্বারা পরিষ্কৃত হইত। বাড়িখানা আমরা ৪ চারি টাকা মাসিক দেওয়া সাব্যস্তে ভাড়া করিলাম ও বারিন্দার প্রকোষ্ঠে মালিককে স্থান দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম। তখনই আমরা বিছানার চৌকি, তোষক, বালিশ ইত্যাদির যোগাড় করিয়া ফেলিলাম। কারণ টাকা হইলে ঢাকা শহরে সমস্তই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। এবং পাকের জন্য একজনা মেয়েলোক ২ ঘণ্টার মধ্যে যোগাড় হইল, ও এক অক্তের খাওনের সমস্ত সামগ্রীয় মূল্য হিসাব করিয়া লইয়া গেল, ও অল্পক্ষণ মধ্যেই বাজার স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া পাক চরাইয়া দিল।

আমি তপেয়জুল হোসেনকে সঙ্গে লাইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলাম। রাস্তায় দেখিলাম ঐ সারদা খেমটাওয়ালী এক গাড়ি ভাড়া করিয়া আমারই অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছে। আমাকে দেখাইয়াই বলিল কোন বাড়ি ভাড়া করিয়াছ? আমাকে দেখাইয়া দেও? আমি তাহার সঙ্গে দ্বিরুক্তি করিলাম না, নদীতে চলিয়া গেলাম। স্নান করিয়া আসিয়া আহার করিয়া নিদ্রা গেলাম। ৪টার পূর্ব্বে সহর বেড়াইবার জন্য যখন গাত্রোত্থান করিলাম দেখিতে পাইলাম যে দেওয়ান গউছুর রাজা আমাদের বাসায় আসিয়া এক চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন। তখন তপেয়জুল হোসেন তামাক আনিয়া দিল, ও আমরা উভয়ে পান করিতে লাগিলাম। তখনও বাড়ির মালিক চৌধুরীর পুত্র গাত্রোত্থান করে নাই, আমাদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলাম যে, ঐ চৌধুরীটি কে? ও কোথায় বাড়ি? তখন তপেয়জুল হোসেন বলিল ইনি চৌধুরী ভদ্রলোক, বাড়ি বোধহয় সিলেট

জিলায়, অথবা ময়মনসিংহ জিলায় উনি ভয়ানক আফিংখোর। ছোট সময় অবধি এই ঢাকা শহরে আছে এখন বয়স অনুমান ৬৫/৭০ হইবে। প্রথম বয়সে ইনি এই সহরে আসিয়া আফিং ও সরাব খাইয়া মাগীদের বাড়িতে বেড়াইয়া থাকিতেন, সেকালে এক মাগীর মোহজালে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া থাকেন। ঐ মাগীর মার কিছু টাকা পয়সা ছিল। আবার জামাই চৌধুরী বলিয়া তাহাকে সসম্মানে কিছু ২ মদ আফিং-এর পয়সা যোগাইত, ও সমাদর করিত। তৎপর ঐ মাগীর মেয়ের গর্ভে ক্রমান্বয়ে দুইটি মেয়ে ও একটা ছেলে জন্মে। ছেলেটা পিতার সঙ্গে আছে, সেও মদ খায় ও ঘুমায়। তাহার নাম ওবেদ, বয়স অনুমান তখন ১৭/১৮ ছিল। মেয়ে দুইটি প্রথম অবস্থায় এই ঢাকা শহরে ছিল বহুতর পয়সা রোজি করিয়াছিল, যে বাড়িতে এখন বুড়া চৌধুরী থাকে ও ভাড়া দিয়া খায়; ঐ বাড়ি উপরোক্ত মেয়েদের উপার্জিত সম্পত্তি বটে। ঢাকাতে ইহাদের উপার্জনের মাত্রা কমিয়া যাওয়ায় তাহারা ভগ্নিদ্বয় কলিকাতা শহরে চলিয়া গিয়াছে, সেখানেও তাহারা এরকম নামজাদা বাইজি হইয়াছে। তাহারা নানাস্থানে গানের দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া থাকে ও স্থানে ২ মুজরা করিয়া বহুতর টাকা হাতে করিয়াছে। পিতাকে মাসিক আফিং খাওয়ার জন্য কিছু ২ পাঠায় ভ্রাতাও সময় কিছু ২ আদায় করিয়া লইয়া আসে, এই গেল ইহাদের প্রস্তাব।

তৎপর আমি ও দেওয়ান সাহেব বেড়াইবার জন্য উঠিলাম, কতেক দূর যাওয়ার পর ছোটখাট কাল রঙ্গের এক বেশ্যা মাগী তপেয়জুল হোসেনকে দেখিয়া যা ইচ্ছা তা কটুক্তি করিতে লাগিল। ও বলিল কিরে হারামজাদা, এতদিন হইল আমার পয়সা দেছ না কেন? আমি তোর বাপের মুখে জুতা মারিয়া আমার পয়সা উশুল করিব। এই বলিয়া ছোটখাট পাও হইতে একখান চটিজুতা হাতে তুলিয়া লইল, ও মারিতে আক্রমণী হইল দেখিয়া আমি ও দেওয়ান সাহেব তপেয়জুল হোসেনকে, ছিঃ এসব কি?

পয়সা ফেলিয়া দেও, বলা সত্ত্বেও সে পয়সা ফেলিয়া দিতে পারিল না। আমরা আগে ২ দৌড়াইতে লাগিলাম, ও ঐ মাগী তপেয়জুল হোসেনকে জুতা ছুড়িয়া মারিল, ও ভাগ্যগুণে জুতা তাহার উপর না পড়িয়া এক দোকানদারের দোকানে পড়িয়া গেল, ঐ দোকানদারও তপেয়জুল হোসেনকে গালি দিতে লাগিল, বলিল পয়সা দিবার ক্ষমতা নাই আবার কি মুখে মাগী বাড়ি যাস?

এইভাবে একদিন অপরাহ্নে চৌকবন্দর বেড়াইতেছি ইতিমধ্যে হঠাৎ আমার বাড়ির লোক সেক লুরু উরফে টেকইর বাপকে দেখিলাম, দেখিয়াই বলিলাম, তুমি কোথা হইতে আসিলে? কি জন্যই বা আসিয়াছে? সে বলিল আজ প্রায় ১৫/২০ দিন হইল আপনি বাড়ি হইতে একা চলিয়া আসিয়াছেন। আপনার মাইজি আপনার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যাগত আছেন, আপনে বাড়িতে না যাওয়া পর্যন্ত কিছুই খাইবেন না। চলুন, আপনাকে এখনি লইয়া যাইব। আমি বলিলাম, আচ্ছা রাখ, আগামীকল্যই রওয়ানা হইব, সঙ্গে যে টাকাটুকা আনিয়াছিলাম, তৎসমস্তই ব্যয় হইয়া গিয়াছে, এখন বাড়িতে যাই কি প্রকারে, সে বলিল বাড়ি হইতে টেলি করিয়া টাকা আনাইব,

তবেইত সময়ের আবশ্যক। এই বলিয়াই বাসাতে আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম দেওয়ান সাহেব আসিয়াছেন। দেওয়ান সাহেবকে বলিলাম এই দেখুন আমাকে নেওয়ার জন্য বাড়ি হইতে লোক আসিয়াছে। বাড়ি যাওয়ার খর্চও আমার হাতে নাই। তপেয়জুল হোসেনের কাছে আমার যে টাকা আছে, তাহা হইতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ও কত টাকা তাহার নিকট আছে, তাহারও কোন উত্তর দেয় না, টাকাও দেয় না, এখন আপনার সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করিব, তখনই সে অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠিল ও বলিতে লাগিল কি? আমি কি চোর? না তোমার ১০/৫ টাকা খাইয়াছি, খুলিয়া বল না কেন? আমি কি তোমার গোলাম নাকি? তোমার ঘরের তলে ঘর? আমি তোমার কথামত বঙ্কবিহারী সাহার ঘর-হইতে তোমার রুক্কা দ্বারা ৫৫ পাঁচপঞ্চাশ টাকা আনিয়াছিলাম। আমি বলিলাম তাহা বলিলেইত হয়, ও কিসে কত খর্চ দিয়াছ তাহার হিসাব দিলেইত আর কোন কথা নাই। আগে কেন এসব কথা বল নাই, এখন দেওয়ান সাহেবকে দেখিয়া এসব কথা বলিতেছ নাকি? সে বলিল দেওয়ান সাহেব কি? আমরা কি তাহার ঘরের তলে ঘর। আমি বলিলাম কথা বাড়াইও না, ঐ ৫৫ টাকা হইতে কিসেতে কত খর্চ দিয়াছ ও কত টাকা তোমার নিকট আছে তাহা দেও ও খর্চের হিসাব দেও, বেশি কথা আলাপ করিয়া লাভ নাই, দেওয়ান সাহেব দুয়াত কলম লইলেন ও সে খর্চ লিখাইতে লাগিল, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমি বলিলাম এখন সন্ধ্যার সময় এসবের কাজ নাই, কাল সকালে হইবে, আমিত ৮ টার ট্রেনে বা বিকালে ৮টার ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ রওয়ানা হইব, এত ত্রস্ত করিয়া লাভ কি? বলিয়াই আমি ও তপেয়জুল হোসেন বাহির হইয়া পড়িলাম, দেওয়ান সাহেবও বাসায় যাইবেন বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন, ঝি-কে ডাকিয়া অতিরিক্ত একজনের ভাত তৈয়ার করিবার কথা বলিয়া গেলাম। ও টেকইর বাপকে বলিলাম, তুমি এখানে বস, খানা তৈয়ার হইলে ঐ ঝি খাওয়াইবে, খাইয়া এই ঘরে শুইয়া থাকিও, আমরা বেড়াইয়া আসিতেছি।

পরদিন সকালে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক আমরা ত্রয় ব্যক্তিই নাস্তা করিলাম। নাস্তাওয়ালা প্রায় অর্ধঘণ্টা পূর্ব হইতেই নাস্তা লইয়া আসিয়া বসিয়া রহিয়াছিল। তৎকালে নাস্তাওয়ালাতেও তপেয়জুল হোসেনের মধ্যে ঝগড়া-কলহ, তর্কবিতর্ক এমন কি মারামারির ভাব হইতেছিল, ইতিমধ্যে দেওয়ান সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন, মারামারির ভাব থামাইয়া দিলেন, কিন্তু তর্কবিতর্ক তখনও হইতে রহিল। নাস্তাওয়ালা বলিতেছিল, গত রাত্রে এই ব্যক্তি ছলিমন বাইজির ঘরে ছিল। সে নিদ্রিত হওয়ার পর তাহার কাপড়ের খুট হইতে চাবি খুলিয়া তাহার বাকস হইতে প্রায় ১০০/১৫০/ দেড়শ' টাকা সুবর্ণের অলঙ্কার চুরি করিয়া চম্পট দিয়াছে। কিন্তু তপেয়জুল হোসেন অস্বীকার করিতেছে ও বলিতেছে মাগীর ঘরে আমি টাকা দিয়া রহিয়াছিলাম বটে। কিন্তু অপর সমস্ত কথা মিথ্যা। ইতিমধ্যে একজনা টাউন জমাদার ও হেড কনেষ্টবল ও অপর দুইজন কনেষ্টবলসহ তথায় উপস্থিত হইল। প্রথমে তপেয়জুল হোসেনের জবানবন্দি লইল পরে আমাদিগেরও চুম্বক জবানবন্দি করিল ও চলিয়া গেল। তৎপর আমরা খানা খাইলাম, ইতিমধ্যে আবার নাস্তাওয়ালার সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গ লইয়া বচসা আরম্ভ হইয়া মারামারির উপক্রম হইল।

নাস্তাওয়ালাও ঘুষি লইয়া তপেয়জুল হোসেনকে মারিতে আক্রমণ করিল, তপেয়জুল হোসেনও পকেট হইতে একখানা ছুরি খুলিয়া নাস্তাওয়ালাকে মারিতে আক্রমণ করিল, ইতিমধ্যে দেওয়ান সাহেব তপেয়জুল হোসেনকে ধরিলেন, ও টেকইর বাপ নাস্তাওয়ালাকে ধরিল, গোলযোগ মিটিয়া গেল। আমরা খানা খাইলাম, ও প্রায় ২টা ৩টার সময় সহর ভ্রমণ বহির্গত হইয়া গেলাম।

প্রথমে ঢাকা চৌকবন্দরে বঙ্কবিহারী সাহার গদিতে উপস্থিত হইলাম, ও কাহার মারফতে কত টাকা আসিয়াছে, তাহার এক টুকা লইলাম। মোট কত টাকা তাহার ঘরে জমা ছিল ও এখন আর আছে কিনা জ্ঞাত হইলাম, ও তাহারই পূর্ব্বদিকে এক দর্জির ঘরে আমার কাপড় প্রস্তুতের জন্য দিয়াছিলাম, তাহার নিকট হইতে কাপড় আনিতে তাহার দোকানে বসিলাম, ও তাহার পাওনা চুকাইয়া দিয়া কাপড় আনিলাম। তৎকালে ফয়েজ বক্স মিয়া নামক আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত উস্তাদজি অর্থাৎ পহেলওয়ান আসিলেন, ও তপেয়জুল হোসেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, হারামজাদা, বদমাস্ আমি তোর সব বদমাইসির কথা শুনিয়াছি, আমি তোকে এখনি দুরুছ করিয়া দিব। তুই কেন এই ভদ্রলোকের ছেলেকে লইয়া মাগীদের বাড়িতে ঘুরিতেছিস? ও মদ খাইয়া তাহার মর্যাদার ত্রুটি করিতেছিস? আমার ইহার পিতার সহিত পরিচয় আছে, আমি তাহাদের বাড়িতেও ২/৪ বার গিয়াছি, যখন ঢাকাতে ইহার পিতা সাহেব ঘোড়াসহ আসিয়াছিলেন তখন আমি ঐ উত্তরদিকস্থ দুতালা মোকাম ভাড়া করিয়া দিয়াছিলাম, ঘোড়দৌড়েও আমি তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। ঐ মিয়ার যেকোন বিষয় অভাব হইলে আমাকে জানাইলেই দিতাম, কিন্তু তুই তাহা না করিয়া যাহাতে তাহার সম্মানের হানি হয় তাহাই করাইয়াছিস, আমি এখনি তোকে দুরুছ করিব। এই বলিয়া পাও হইতে জুতা খুলিয়া তপেয়জুল হোসেনের মুখের কাছে মারিতে আনিল, আনা মাত্রই তাহার ছেলে আব্দুল করিম ও মাহমদ হুসেন উভয়ে ভ্রাতা মিলিয়া তাহাদের পিতাকে ধরিল। ও বলিতে লাগিল, বাবাজান? ক্ষান্ত হউন ২ এই কুত্তার বাচ্চাকে মারিয়া আপনার ন্যায় লোকের হস্ত কলঙ্কিত করিবেন না, আপনি হুকুম করিলে, আমরাই ত ইহাকে যা ইচ্ছা তা করিতে পারি। ফয়েজ বক্স মিয়ার পুত্রদ্বয় তাহাদের পিতাকে ক্ষান্ত করাইয়া সেখান হইতে লইয়া গেল, আমরাও আস্তে ২ বাসার দিকে আসিলাম। বাসাতে আসিয়াই সমস্ত জিনিস বাঁধিয়া ফেলিলাম, ও নিকটে যে পোষ্টাপিশ ছিল, সেই পোষ্টাপিশে গিয়া আমার পিতার নামে টেলিগ্রাম করিলাম যে আমাদের বাড়িতে আসিবার খর্চ নাই ২৫ টাকা টেলিগ্রাম মনিওর্ডারে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইবেন, পরের দিবস যথাকালে ২৫ টাকা টেলিগ্রাম মনিওর্ডারে আসিয়া পৌছিল আমরাও রওয়ানা হইতে ২ সন্ধ্যা হইয়া আসিল। একজন মুটীয়া আসিলে জিনিসপত্র তাহার মাথায় দিলাম। স্টেশনে উপস্থিত হইলে ১০/৫ মিনিট পর গাড়িতে হুইসেল দিল, ও টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠিলাম, ও গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে নামাইয়া দিল, আমরা নামিয়াই মার্কুলির লাইনের ষ্টীমার আসিয়াছে কিনা খোঁজ করিলাম, কিন্তু তৎকালে সেই ষ্টীমার পৌছে

নাই দেখিয়া স্টেশনেই আমরা বিছানা পাতিয়া বিশ্রাম করিতে রহিলাম। রাত্র ১২টা পর্যন্ত স্টীমার আসিল না, তৎপর নিদ্রিত হইয়া গেলাম। অতি ভোরকালে স্টীমার আসিয়াছে জানিতে পারিয়া সুনামগঞ্জের টিকেট কিনিয়া স্টীমারে উঠিলাম...। পরদিন বেলা অনুমান ১২টার সময় সুনামগঞ্জ নিজ বাটিতে পৌঁছিলাম।

শেষবারের ঢাকা ভ্রমণ

সন ১৩১২ বাংলার ১২ই ভাদ্র তারিখে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী রওসান আক্তার বানু উরফে বাদশার মা স্বর্গারোহণ করেন— তাহার স্বর্গারোহণের প্রায় দুইমাস পর আমি ও আমার সঙ্গে রাজ সরকারের পুত্র মায়ার বাপকে সঙ্গে লইয়া একত্রে ঢাকা শহরে রওয়ানা হই, পরদিবস আদনা স্টেশন পার হইলে পর আমার পূর্ব পরিচিত মৌলবী রেহানউদ্দিন পেশগারের সহিত দেখা হয়। ইহার ৮/১০ বৎসর পূর্বে আমি যখন শ্রীহট্ট দরগা মহাল্লায় থাকিয়া গবর্ণমেন্ট স্কুলে পড়িতাম তখন তিনিও ঐ শহরের মজুমদার সাহেবগণের বাড়িতে থাকিয়া ঐ স্কুলে আমা হইতে ৩/৪ শ্রেণী উপরে পাঠ করিতেন, তখনই তাহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। দরগা মহল্লার সাহেবান ও মজুমদার সাহেবান মধ্যে কুটুম্বিতা থাকায় সর্বদাই আত্যাগর্ব হইত, আমরাও মধ্যে ২ মজুমদার সাহেবান ও ছাত্রবৃন্দ মধ্যে দরগা মহল্লায় আসিতেন।

তদুপলক্ষেই রেহানউদ্দিনের সহিত আমার পরিচয় ইহয়াছিল, হঠাৎ তাহাকে স্টীমারে পাইয়া কুশল বার্তাদি জিজ্ঞাসাবাদের পর, তিনি কি উপলক্ষে কোথায় যাইতেছেন প্রশ্ন করি, তিনি উত্তর দেন যে, বর্তমানে আমি হবিগঞ্জ রেভিনিউ কোর্টে পেশগারের কার্য করি, আমার ৩/৪টি ছেলেমেয়েসহ পরিবারসহ তথায়ই বাস করি, বর্তমান কালে আমার শরীর অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছে, বৎসরের মধ্যে প্রায় ৬ মাস ৮ মাস বিছানায় শয্যাগত থাকি, এখন রোগ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত শহর ঢাকায়ও সাপাড় [সাভার] নামক স্থানে ভাল আয়ুর্বেদী কবিরাজের উদ্দেশ্যে যাইতেছি, আপনি কোথায় যাইবেন? আমি বলিলাম আমিও ঢাকা শহরে যাইব আমারও পীড়া আছে, ঢাকা শহরে নাকি ভগবান কবিরাজ খুব ভাল নামজাদা বটেন, তাহাকেই আমার রোগ নির্ণয় করাইতে ও রোগ দেখাইতে যাইতেছি, কতেক বিদস পূর্বে আমার অতিশয় সাঙ্ঘাতিকভাবে মেহ রোগ [গনোরিয়া] প্রকাশ পাইয়াছিল, তৎকালে আমাদের সুনামগঞ্জে চন্দ্রকুমার কবিরাজ আমাকে কাঁচা পারা খাওয়াইয়াছিল, এখন সর্বশরীরে ও হাতে পায়ে দাদের রকম ক্ষত হইয়াছে, ঐ ক্ষত দিন ২ বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যান্য চিকিৎসককে দেখাইলে কেহ বলে ইহা পারদ দোষ, অজারিত কাঁচা পারা খাওয়ানে এরূপে হইয়াছে, আরও অনেক রূপ দোষ হইয়া অজারিত পারদ খাওয়াজনিত আরো অনেক রোগ জন্মিতে পারে। কেহ বলে যে, রক্ত দোষজনিত ইহা একরূপ দাউদের মত হইয়া গিয়াছে, এখন ঢাকা গিয়া ভগবান কবিরাজকে দেখাইলে তিনি কি বলেন, তদুদ্দেশ্যেই আসিয়াছি, দেখা যাউক ভগবান কি করেন।

আমরা যে দিবস রাত্রে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিলাম, সেই দিবস রাত্রের গাড়িতেই ঢাকা শহরে আসিলাম, ও ঢাকা বাবুবাজার নামক স্থানে সাধারণ হুটেলে রাত্রি যাপন করিতে রহিলাম, আমি ও রসিকচন্দ্র দে ও মায়ার বাপ এক হুটেলেই রহিলাম, ও মৌলবী রেহানউদ্দিন পেশগার নিকটবর্তী অন্য ঘরে রহিলেন। প্রাতঃকালে হুটেলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোথায় বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাইবে সন্ধান করিতে লাগিলাম, কারণ সাধারণ হুটেলে থাকিতে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল, ঐ হুটেলওয়ালার ঘরে একজন মেয়ে মানুষ চাকরানী ছিল, সে কতেকদিন আমাদের সুনামগঞ্জ ঢাকা নিবাসী আব্বাছ খলিফা ও তমিজ উদ্দিন খলিফা ভ্রাতৃদ্বয়ের দোকানে চাকরানী স্বরূপ ছিল, তদুপলক্ষে সে আমাদের নাম শুনিয়াছিল ও পরিচয় করিয়াছিল, তমিজউদ্দিন খলিফা হঠাৎ রোগগ্রস্ত হইয়া সুনামগঞ্জে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ঐ চাকরানী আমার অতিশয় যতন নিতে লাগিল ও বাড়ি ভাড়া করিয়া দিবে বলিয়া ঘুরিতে লাগিল। অপরাহ্নে ঐ মেয়ে মানুষটি আসিয়া বলিল, সামনে মহল্লা আছে তাহার নাম ছাচি পন্দরিপা [সাচিবন্দর] সেখানে জীবন মিয়া নামক একজন ভদ্রলোকের বাস, তিনিই আপনাকে তাহার বাড়ির মধ্যে এক কোঠা ভাড়া দিতে রাজি হইয়াছেন। গোছলখানা ও পায়খানা তৎসঙ্গে পৃথক দিবেন। কিন্তু আপনারা কয়জন লোক আছেন, তাহাকে অদ্যই জানাইতে হইবে, আর আপনারা হুটেলে খাইতে পারিবেন না, তাহার বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, আপনারা খুরাকী খর্চ যাহা লাগে হিসাব করিয়া দিবেন। তাহার লোক আপনাদের কথামত পাক করিয়া দিবে, আমরা বলিলাম, বেশ হইয়াছে, কোন্ সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে? ও কোন সময় তাহার বাটীতে যাইতে হইবে? ঐ মেয়ে মানুষ বলিল, এখনি আমার সঙ্গে আসুন অসুবিধা মনে করিলে আরও এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা পরে আপনাদের সুবিধা মত চলুন। আমরাও অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া প্রায় ৫টার সময় ঐ মেয়ে মানুষটিকে ডাকিয়া বলিলাম চল, এখনি আমাদের সুবিধা। সে আসিল, আমি ও মৌলবী রেহানউদ্দিন, রসিক সরকার, মায়ার বাপ অর্থাৎ আমরা সমস্তই চলিলাম, কিছু আগে বাড়িয়াই দেখিলাম ও মনে ভয় পাইতে লাগিলাম, কারণ ৫/৪ বৎসর পূর্বের কথা স্মরণ হইয়া পড়িল, দেখিলাম আমাদের পূর্বদিকে কতেক দূহেই পূর্বেকার সারদা নামক খেমটাওয়ালীর দূতালা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, ও আমি মনের ভয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গীগণ এ বিষয়ে কিছুই অবগত নহে বিধায়, তাহারা আমাদের সঙ্গীরা হোটেলওয়ালা মেয়ে মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন কই কতদূর সে বাড়ি? কোনদিকে যাইতে হইবে? তখনি সে অগ্রগামী হইল, ও বলিল আর বেশি দূর নহে, এইত আসিয়া পড়িয়াছি, এই সরু গালি দিয়া দক্ষিণমুখী চলুন, সে অগ্রে, আমরা তাহার পশ্চাৎ ২ চলিলাম, অল্প অগ্রসর হইয়াই ঐ মেয়ে মানুষ একটি কপাট ঠেলিল ও কপাট খুলিয়া গেল, আমরা সমস্তই ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

একতালা এক দালানে চৌকি শয়নের স্থান ও বসিবার সামান্য চেয়ার, টেবিল ইত্যাদিও আছে, কিন্তু সমস্ত জিনিসপত্রই জীর্ণশীর্ণ ও ময়লা রকম দেখা যায়, আমরা

চেয়ারে বসিলাম। আমরা যে দালানে বসিলাম, তাহা ঐ বাড়ির পূর্বদিকে অবস্থিত বলিয়া অনুমান করিলাম, অল্প সময় পরে ঐ বাড়ির উত্তর দিকে অবস্থিত দুতালা হইতে এক ব্যক্তি খড়ম পায়ে দিয়া নামিয়া আসিল ও আমাদের নিকটবর্তী চেয়ারে বসিল, ও ঐ মেয়ে মানুষটাকে ডাকিয়া বলিল, কি? ইহারা নাকি? সে বলিল হ্যাঁ ইহারাই। সে বলিল, বাবা এখন বাহির হইবেন না, কাল সকালে, তাহার সহিত দেখা হইবে, আমি ইহাদের সমস্তই যোগাড় করিয়া দিতেছি বলিল, কে যাবেন আসুন, সব দেখাইব, আমি সব দেখাইব, আমি ও রসিক সরকার গেলাম, প্রথম আমাদেরকে নিয়া গোছলখানা দেখাইল, তৎপর পায়খানা দেখাইল, তাহা দেখিয়া আমি বলিলাম, এই পায়খানা বড় ময়লা, ইহা দ্বারা চলিবে না। সে বলিল, অতি প্রত্যুষেই মেথর আসিয়া সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইবে, কিছুমাত্র ময়লা থাকিবে না। রসিক সরকার বলিল, তাহা হইলেও সুবিধা হইবে না কারণ আমাদের সাহেবের জন্য একা একটি পায়খানার আবশ্যক, অন্য লোক যে পায়খানায় যায় সাহেব সেই পায়খানায় যাইতে পারেন না, তাহার জন্য একা একটি পায়খানা আবশ্যক। ভাড়া যতই হউক কেন, কোন চিন্তা করিবেন না, সে বলিল এই পায়খানাই সাহেবের জন্য, খুব ভাল রকম পরিষ্কার করাইয়া দিব, এই পায়খানায় যেন অন্য কেহ না যায়, নিকটেই সরকারী পায়খানা আছে, সেটাতে সকলেই পায়খানা যাইবে, এইটা সাহেবের জন্য থাকিবে, ঐ কথা বলার পর পূর্বস্থানে সকলেই ফিরিয়া আসিলাম। তৎপর কথা হইল আপনারা কয়জনে এখানে খানা খাইবেন। আমি বলিলাম আমরা সমস্তই এক স্থানে খাইব, যেখানে খাই আমরা চতুষ্টয় ব্যক্তিই খাইব, সুনা মিয়া বলিল যে আমাদের বাড়িতে হুটেল হইতে খানা আনাইয়া দিতে গেলে কিছু অধিক ব্যয় পড়িবে, কিন্তু আমাদের বাড়ির চাকরানীর নিকট হিসাব করিয়া পয়সা দিলে, আপনাদের কথামত জিসিনাদি আনিয়া বাড়ির ভিতরে পাক করিয়া এখানে খানা আনিয়া খাওয়াইতে পারিবে, খর্চ্চ বোধহয় হুটেল হইতে কম পড়িবে, এখন দেখুন আপনাদের ইচ্ছা, আমরা বলিলাম হুটেল হইতে খর্চ্চ কিছু বেশি লাগিলেও এখানে ভাল।

খাওয়া দাওয়ার পর ধূমপানান্তে ৩/৪ খানা বিছানা পাতিয়া শ্রেণী মতে ও সকলের সুবিধামত স্থানে শুইয়া পড়িলাম, আমরা যে ঘরে শুইয়াছিলাম তাহার লগ্ন পূর্বদিকে সরকারী সড়ক ছিল, যে সড়ক অনুমান ১০/১২ হাত প্রশস্ত হইতে পারে, তাহারই অপর পাড়ে অর্থাৎ আরও পূর্বে সড়কের লগ্নস্থানে বহু লম্বা অর্থাৎ উত্তরে-দক্ষিণে লম্বা একখান ঘর ছিল, ঐ ঘরে ভাড়াটিয়া গাড়োয়ানদের গাড়ি ও বহুতর ঘোড়া ছিল, রাত্র অনুমান ৩/৪টা হইলে ঐ গাড়োয়ানরা হিন্দুস্থানী ভাষায় গান গাইতে লাগিল, ও রসিক সরকার ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিল, তোরা কে? সুনামগঞ্জ ককাই শেখের বাড়ির উত্তরে রাখিয়া আসিলাম, তোরা এখানে ঢাকা আমাদের কাছে আসিলে কি প্রকারে? তোরা কি আমাদের সঙ্গ লইলে নাকি? রেহানউদ্দিন পেশগার এই সব কথার কোন তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিলাম যে, আমাদের গ্রামের ককাই শেখের বাড়ির উত্তরে ও সুনামগঞ্জ বাজারের দক্ষিণে এক হিন্দুস্থানী রাজমিস্ত্রি বাস করিত, সে প্রায় রাত্রেই ইহাদের মত অর্থাৎ এই গাড়োয়ানদের মত ভজনগান করিত,

সরকার মহাশয় ঐ রকম গান শুনিয়া এসব কথা বলিয়াছেন। তৎপর ক্ষণেককাল কথাবার্তা কহিয়া ও হাসিঠাট্টা করণান্তে সকলেই শুইয়া পড়িলাম।

প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকার্যাদি সমাপনান্তে মুখ প্রক্ষালন করিয়া ফেরীওয়ালাকে ডাকিয়া কিঞ্চিত জলযোগ করিলাম, ও মৌলবী রেহানউদ্দিন বলিলেন যে, শ্রীহট্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন রাজমোহন বাবু তিনি শেষে সাবডিবিশন অফিসার হইয়া সুনামগঞ্জ গিয়াছিলেন, তাহার পুত্র হরেন্দ্র আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল, সে আপনাকেও চিনে বলিয়াছে, সে তাহার পিতাসহ এই শহরে আছে, এক্ষণে বেগমবাজার কি নবাবপুরাতে তাহাদের নিজ বাটি বটে, কল্য তাহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে, বাজে আলাপের পর সে সমস্ত কথা শুনিয়া অদ্য আপনাকে লইয়া তাহাদের বাড়িতে যাওয়ার কথা বলিয়াছে।

আমি আপনাকে লইয়া যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন ভাবিতেছি কোথায় যাইব, তাহাদের বাড়ি নবাবপুরা কি বেগমবাজার এখন আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না। আমি বলিলাম চলুন, রাজমোহন বাবু বিখ্যাত লোক আছে, লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার বাসস্থান জানিতে পারিব, বলিয়াই পদব্রজে রওয়ানা হইলাম। বেগমবাজার গিয়া তাহাদের বাসস্থানের কোনই সন্ধান পাইলাম না, কিন্তু নবাবপুরাতে যাইয়াই লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহার বাটি দেখাইয়া দিল, আমরা তাহাদের বাটিতে যাইয়াই দেখিলাম প্রকাণ্ড বাটি, বড় একটি দুতালা দালানই বাড়ির সামনে রহিয়াছে সুতরাং সেই দুতালাকে বৈঠকখানা মনে করিয়া নীচের তালাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলাম। ইতিমধ্যে মৌলবী রেহানউদ্দিন উপরের দিকে চাহিয়াই বলিলেন হরেন্দ্র, আমরা আসিয়াছি, হরেন্দ্র বলিল, আসুন ২ উপরে আসুন বলামাত্রই আমরা সিঁড়ি বাইয়া উপর তালাতে উঠিলাম, উপর তালার সামনের বারিন্দাতে আমাদিগকে বসাইল ও পান তামাক ইত্যাদি আনাইয়া দিল, অন্ততঃ ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা হরেন্দ্রের সহিত খুস আলাপ ও গল্পগুজবেতে কাটিল!

হরেন্দ্র বলিল, আপনারা বাসা লইয়াছেন কোথায়? আমরা বলিলাম যে, আমরা ছাচিবন্দর আছি। সে বলিল সেত, বহুদূর রাস্তা এখন রৌদ্র তেজিয়া গিয়াছে, এতদূর পদব্রজ যাইতে আপনাদের কষ্ট হইবে। রসিক সরকার বলিল, সামনেই গাড়োয়ানদের ঘর আছে, সামনে গিয়াই আমরা গাড়ি ভাড়া করিয়া লইব, হরেন্দ্র বলিল তাহা লইতে হইবে না, আমার নিজের গাড়ি দ্বারা আপনাদিগকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিব, বলিয়াই তাহার কোচয়ানকে ডাকিল, ও গাড়ি প্রস্তুত করিয়া আনার কথা বলিল, অতি অল্প সময় পরেই গাড়ি নিয়া দুতালার নীচে আমাদের সামনে গাড়ি আসিল, আমরা দুতালা হইতে অবতরণ করিয়াই গাড়িতে উঠিলাম, গাড়ি ছাড়িয়া দিল, প্রায় অর্ধঘণ্টা মধ্যেই ছাচিবন্দর মৌলবী রেজা রব্বানির নিজ বাড়িতে আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিল। গাড়ি ফিরিয়া আসিল, আমরা অল্পক্ষণ সুস্থাইয়া স্নানের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় বাড়িওয়ালা সুনা মিয়া আসিয়া বলিল কি করিতেছেন, আমরা বলিলাম স্নানে যাইব, কোন্ দিকের রাস্তায় যাইতে হইবে? তিনি বলিলেন আমার সঙ্গে চলুন, আমিও স্নান করিব, বুড়িগঙ্গায় যাইতে হইবে। তখন তাহার সমভিব্যাহারে বুড়িগঙ্গার পাড়ে এক

একতলা বাটীতে যাইয়া বসিলাম, ও দেখিলাম সেখানে এক মিয়া আছেন, সে ঐ সুনা মিয়ার সম্পর্কিত ভাই বটে।

তাহার নাম নান্না মিয়া, সে ঢাকার বিখ্যাত জমিদার মৌলবী গোলাম মওলা সাহেবের পুত্র, আমরা কথা প্রসঙ্গে জানিলাম যে, ঐ নান্না মিয়ার চাকর গত রাত্রিতে তাহার পোর্টমেণ্ট হইতে নগদ প্রায় ১০০-১৫০ টাকা ও তাহার রক্ষিতা খেমটাওয়ালীর ততোধিক টাকার অলংকারপত্র ও কাপড় চোপড় লইয়া পলাইয়াছে। তখনই সুনা মিয়া নান্না মিয়ার রক্ষিতা মাগীকে ডাক দিল, সে অবিলম্বে আসিল, আসিয়াই ঐ চুরি সম্বন্ধে আলাপ-প্রলাপ করিতে লাগিল ও এমন চোর চাকরকে কি বিশ্বাস করিতে আছে? বলিয়া নান্না মিয়াকে তিরস্কার করিতে লাগিল, নান্না মিয়া বলিল, এসব প্রসঙ্গ এখন বাদ দাও, আমি তাহাকে পুলিশ দ্বারা ধরাইয়া আককেল দিব, তবে ছাড়িব, বলিয়াই ঐ মাগীকে ইশারা করিল, মাগী দ্রুতপদে ঐ ঘর হইতে অন্য ঘরে গেল ও অনতিবিলম্বে এক গাঁজা কল্কি হাতে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল, ও নান্না মিয়ার হাতে দিল তিনি খাইয়া সুনা মিয়ার হাতে দিলেন, সুনা মিয়া না খাইয়াই রসিক সরকারকে বলিলেন, সরকার মশায় চলে কি? কিন্তু সরকার মশায় চলে বলিয়াই আমাকে ঈশারা দিয়া দেখাইয়া দিলেন। তখন সুনা মিয়া কল্কি হাতে দিল, আমিও একদম মারিয়া সরকারের হাতে দিলাম, সরকার খাইয়া আবার সুনা মিয়ার হাতে দিল, সুনা মিয়াও খাইয়া পূর্ব্ব উল্লিখিত খেমটাওয়ালীর হাতে দিলেন। খেমটাওয়ালী খাইয়া ২ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমার হাতে যখন কল্কি আসিয়াছিল তখনই মৌলবী রেহানউদ্দিন আচতাকপিরউল্লাহে বলিয়া দৌড়িয়া ২ বুড়িগঙ্গাতে ঝাঁপ দিল ও স্নান করিতে লাগিল। আমরাও গাঁজার কল্কি উপরোক্ত খেমটাওয়ালীর হাতে গেলে পর নউজবিল্লা বলিয়া জলে নামিয়া গেলাম ও স্নান করিতে আরম্ভ করিলাম। স্নানান্তে আবার সকলেই ঐ নান্না মিয়ার ঘরে আসিলাম ও কাপড় ইত্যাদি বদলাইতে লাগিলাম, কারণ আমরা সমস্তের কাপড় স্নানে আসাকালে সঙ্গে আনিয়া ঐ ঘরে রাখিয়াছিলাম। আমরা কাপড় বদলাইতে ২ দেখিলাম ঐ নান্না মিয়াও স্নান করিয়া আসিতেছেন, তাহার রক্ষিতা মাগী কোথা হইতে একখান ধুতি আনিয়া দিল, আমরা ঐ ধুতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম, কারণ ঐ ধুতির পাইড়ে গোলা বত্তনের কাজ করা ছিল, জমিনও অতি উত্তম তাঁতীর হাতের বাইন, আমরা ঐ ধুতির মূল্য জিজ্ঞাসা করায় ২৫, কয়আনা হইয়াছে জানিলাম, এবং রাস্তাতে সুনা মিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ঐ নান্না মিয়া ঐ মাগীকে কি প্রকারে রাখিয়াছেন।

তিনি প্রকাশ করিলেন যে, ঐ মাগীর বেতন মাসিক ১০০ টাকা, একজন মেয়ে চাকরানীও আছে, বেতন ১৷৷ টাকা ও-একজন পুরুষ চাকরও আছে, বেতন ৫ টাকা। এছাড়া নাপিত ধোপা সরকারী, খোরাকীতে এই মাগীর তলে মাসিক ১০, ১২ টাকা যায়। মোটের উপর এই মাগীর নীচে আনুমানিক ১২৫, ১৫০ টাকা লাগে, আমি বললাম এই মাগী শুধু গাঁজা খায় নাকি? গাঁজার পয়সাও তিনি দেন নাকি? সুনা মিয়া বলিলেন— মাগী গাঁজা মদ উভয়টাতেই অভ্যস্ত কিন্তু গাঁজা কিছু বেশি খায়, সমস্তই নান্না মিয়া দেন ও সমস্তে আনুমানিক ১২৫, ১৫০ টাকা বা ততোধিক কোন ২ মাসে তাহার তলে খরচ

যায় বলিয়াই বলিয়াছিল। এইসব কথাবার্তা হইতে ২ বাসায় চলিয়া আসি, ঘড়ি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম ১১টা বাজিয়াছে। সেইকালেই আমি ঢাকা হইতে একটি ক্রুড্রাইজার ওয়াচ ছিলভারের চেইন সহিত খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম।

৪৷৷টার সময় মুখ ধুইয়া শহর বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমি একজন, রসিক সরকার ও মায়ার বাপ এবং সুনা মিয়া— মোট ৪ জন। এক মোক্তারের ছেলে তাহার নামও নান্না মিয়া, তাহার সহিত নান্না মিয়ার বিশেষ বন্ধুত্ব থাকায় সেও রওয়ানা হইল, একুনে আমরা পাঁচ ব্যক্তি রওয়ানা হইলাম। অনেকদূর গিয়াই এক একতলা বাড়িতে সর্ব্বাগ্রে সুনা মিয়া পশ্চাতে আমরা সমস্তই ঐ বাড়িতে প্রবেশ করিলাম, সেখানে একজন জমিদার-পুত্র আছেন, বয়স ১৮/২০ বৎসর হইবে। কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, তিনি হয়বৎ নগরের দেওয়ান হেলিমদাদ খান ওরফে মেনু মিয়া সাহেবের শ্যালকপুত্র— নাম মাহামদ মিয়া, তাহার নিজেরও কতেক ভূসম্পত্তি আছে, ভাওয়ালী বজরা আছে, নায়েব, ম্যানেজারও আছে, মধ্যে ২ তিনিও বজরায় চড়িয়া মদ ও মাগী সঙ্গে লইয়া মফস্বল যান, ও প্রজাগণ হইতে খাজনা ইত্যাদি আদায় করিয়া নিয়া আসেন, আবশ্যক হইলে পূর্ব্বেই নায়েব মুহুরি পাঠাইয়া দেন ও পরে তিনি যান। আমি বলিলাম আপনে যে খাজনা আদায়ে যাইবারকালে মদ-মাগী সঙ্গে নেন তজ্জন্য প্রজাদের কাছে লজ্জিত হন কি না? তিনি বলিলেন— না, আমরা কোন লজ্জা করি না, আমার পিসা মেনু মিয়া সাহেবও এই প্রকার গমনাগমন করিয়া থাকেন। ইহাতে কোন লজ্জাবোধ করেন না, আমাদের দেশেরই এই প্রথা, হিন্দু জমিদারগণের তো কোন কথাই নাই, আমার ক্ষুদ্র জমিদারী হইলেও বাৎসরিক আয় প্রায় ৯/১০ হাজার টাকা, তাহাতে আমলাদের বেতন দিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা আমার বাবুগিরিতেই উড়িয়া যায় অর্থাৎ মদ-মাগী, বজরা ভাড়া ইয়ার দুস্ত সহিত খাওয়াদাওয়ায় ভালরূপ পুসায় না, এইসব কথাবার্তা হওয়ার পরই সুনা মিয়া বলিল, চলুন এখানে বসিয়া কোন লাভ নেই, কোন খেমটাওয়ালীর ঘরে গিয়া গান-বাজনা দেখাশুনা উচিত।

তখনই রসিক সরকার হাঁ বলিয়া উঠায় সকলেই রওয়ানা হইলাম ও রাস্তাতে যাইয়া এক দোকান হইতে ২/৩টি বিছাইব নামক অতিশয় নেশার সুরা (যাহার দাম ৭৷৷ টাকা প্রত্যেক বোতল) লইলাম। তৎপর এক দুতালার উপর সকলেই উঠিলাম, সেখানে যাইয়া বৈঠকখানার ফরাশের উপর সকলেই বসিলেন, কেবল আমি ও মাহামদ মিয়াকে ২ খানা চেয়ারে সুনা মিয়া বসাইল, ও বাইজিকে ডাকিল, ঐ বাইজি মুসলমানী ছিল। সুনা মিয়া বাইজিকে দেখাইল যে এই দুই সাহেব উভয়ই জমিদার বটেন, একজনা ময়মনসিংহ-এর এবং একজনা শ্রীহট্টের। তখন বাইজি আমাদের নিকট আসিয়া আদাব দিল, ও কি প্রকার গান শুনিতে চাই জিজ্ঞাসা করিল, মাহামদ মিয়া বলিলেন, পার্শি, উর্দ্দু, বাংলা এই তিন ভাষার মধ্যে যে ভাষাতেই তোমার গাইবার সুবিধা গাইতে পার ঐ গৃহকর্ত্রী বাইজি কাজী সাহেবের মেয়ে বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তৎপর ১২টা বাজিয়া গেল দূরস্থান হইতে গজল শুনা গেল, ও দুতালা বাহিয়া আমার অপরিচিত আরও ২/৩ ব্যক্তি আসিয়া ঐ ঘরে প্রবেশ করিল, কথাবার্তা প্রসঙ্গে ঐ

ব্যক্তিগণ যে সুনা মিয়া প্রভৃতির বিশেষ পরিচিত বলিয়া বুঝা গেল। ঐ আগন্তুকদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিল জমির সে সুরাপানে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া অনুমান হইল, ও চরশ পানে অনভ্যস্ত ছিল বলিয়া সকলেই টের পাইলাম। সে আবার চরশে দম মারিয়া ঐ দুতালার পিছনের বারান্দায় প্রস্রাব করিতে গেল, হঠাৎ নেশার ঝোঁকে সে দুতালা হইতে পড়িয়া গেল। ঈশ্বারনুগ্রহে হাত, পাও ভাঙ্গিল না, প্রাণেও মরিল না। আমরা টের পাইয়া বাতি জ্বালাইয়া পিছনের বারান্দায় বাহির হইলাম, তৎক্ষণাৎই সে সামনের সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিল, পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল চরশ বেশি খাওয়াতেই বোধহয় হঠাৎ আমার মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলাম, ঈশ্বারনুগ্রহে দুই দেওয়ালের কোণের দিকে পড়িয়াছিলাম, এক দেওয়ালে আমার ওষ্ঠে লাগা ছিল, ও আমার হাতও দেওয়ালে লাগান ছিল, হাতের তালা দেওয়ালে ঘষিয়া ২ আসিতেছিল। কতেক স্থান পড়িলে পর দেওয়াল গাত্রের এক মুরিয়ার ছিদ্র বিশেষ ফাঁক দিয়া আমার এক হাতের অঙ্গুলি প্রবেশ করিল। তাহাতে ভয় পাওয়ায় সাহায্য পাইয়া রক্ষার হেতু পাইলাম, কিন্তু আমার প্রাণের আশা একরূপ ত্যাগ করিয়াই আবার দেওয়ালে পূর্ব্বানূরূপ হাত সংলগ্ন রাখিয়া নীচে পড়িতে লাগিলাম। ঐ কাজী সাহেবের মেয়েই তাহার দুতালার পিছনে পাকের জন্য একটা একতালা বানাইবেন বলিয়া বহুপূর্বেই কতেক ইট আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে ছিল না, তাহা বোধহয় মাটি হইতে ১০/১২ হাত উপরে ছিল, আমি পড়িতে ২ হঠাৎ পায়ের নীচে ভর পাইলাম ও আল্লা বাঁচাইলেন, বলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম, তৎপর আপনারা বাতি জ্বালাইয়া বাহির হইলেন। আল্লা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, এই জীবনে আমি আর সরাব গাঁজা ইত্যাদি কোন প্রকার মাদকদ্রব্য খাইব না বলিয়া আপনাদের সকলের সাক্ষাতে কছম করিলাম, এই কথা বলামাত্রই তাহার সঙ্গীয় একজন লোক যাহার পরনে টুটাফাটা অর্থাৎ ছেঁড়া কোট পেন্টলুন ছিল, সেই ব্যক্তিকে দেখিলে কালাজ্বরের রোগী বলিয়া অনুমান হয়, হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া পড়িল, ও উক্ত জমিরকে বলিতে লাগিল এ শালা প্রতিজ্ঞা যে করিলে, দেখি তোর প্রতিজ্ঞা কয়দিন ঠিক থাকে, বলিয়াই সে ছোপর্দার তবলার তালে ২ নৃত্য করিতে লাগিল, এই আমি সর্বপ্রথম পুরুষ লোকের নাচ দেখিলাম, সে অনেকক্ষণ নাচিল ও সুরা চরশ ইত্যাদি পান করিতে লাগিল।

প্রায় ১২॥ টাকার মদ ও ২ টাকার চরশ উড়িয়া গেল। তবু ঐ মাতালদের পিপাসা মিটিল না। তখন গৃহকর্ত্রী কাজী সাহেবের মেয়ে বলিল, রাত্র প্রভাত হইয়া যাইতেছে, তখন সুনা মিয়া বলিল ব্যস্ত হইও না এতই আমরা চলিয়া যাইতেছি, আইজ সাহেবদেরও অত্যন্ত নেশা হইয়াছে, অদ্য তাহাদিগকে বাসায় লইয়া যাইতেছি। অন্যদিন তোমার ঘরে লইয়া আসিব, এই বলিয়াই সে উঠিয়া পড়িল ও আমাদিগকে বলিল চলুন, আমরাও সিঁড়ি বাহিয়া অবতরণ করিতে লাগিলাম, নীচে নামিয়া পশ্চিম দিকে বাসার রাস্তা ধরিয়া চলিলাম, কতেক পথ অগ্রসর হইলে পর একজন পাহারাওয়ালাকে যা জিজ্ঞাসা করিল, তখনই সুনামিয়া, নান্নামিয়া, জমির ও শুকনা কালাজ্বরি দৌড়িয়া তাহার দিকে ধাবমান হইল, তাহার নিকটে গিয়াই কিল থাবা ইত্যাদি মারিতে লাগিল, পাহাড়াওয়ালা বলিতে লাগিল, বাবা ২ আপনারে চিনিতে না

পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আর কখনও আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

ইহাদের এই গণ্ডগোল দেখিয়া আমি, রসিক সরকার ও মায়ার বাপ প্রায় পাওয়া মাইল বাসার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলাম, বাসার গলির মোড়ে যাইয়া আমরা দাঁড়াইলাম ও তাহারা আসিয়া পৌছিল, তখন রাত্র প্রায় প্রভাত হইতেছে। বাসায় আসিয়া বিছানায় মাথা রাখিলাম, কিন্তু ঘুম হইল না, শীঘ্রই প্রভাত হইয়া গেল।

ফেরিওয়ালাগণ বাহির হইয়া পড়িল, সুনা মিয়া এক ফেরিওয়ালাকে ডাকিয়া রুটি ইত্যাদি ক্রয় করিলেন ও তিনি নিজে অতিকষ্টে রসিক সরকারকে জাগাইয়া একটা টাকা লইল ও মায়ার বাপকে সঙ্গে লইয়া এক দোকান হইতে মাখন, এণ্ডা ও মুরগীর মাংস ক্রয় করিয়া আনিল, আমি অতি কষ্টে উঠিলাম কারণ, নেশার জন্য চোখ মেলিতে পারিতেছিলাম না, তথাপি উঠিয়া বসিলাম, মুখ ধুইলাম না, অগ্নি মুখে বিস্বাদ লাগা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ রুটি ও মাখন খাইলাম, কিছু মাংসও খাইলাম, মায়ার বাপকেও খাওয়াইলাম। সুনা মিয়াও খাইল ও মৌলবী রেহানউদ্দিনকে খাওয়াইলাম, ইতিপূর্বেই তিনি ঘুম হইতে জাগিয়া অজু করিয়া নামাজ পড়িয়া বসিয়া রহিয়াছিলেন, এমন সময় তাহার সম্মুখে খাবার দেওয়াতে অত্যন্ত খুশি হইয়া খাইয়াছিলেন, কিন্তু রসিক সরকারকে বহু চেষ্টাতেও কেহই জাগাইতে পারিল না।

জলযোগের পর মৌলবী রেহানউদ্দিন পেশগারের কথামত গাড়ি আনাইয়া ভগবান কবিরাজের বাসায় গেলাম, তিনি ও আমি উভয়েই রোগদৃষ্টি করাইয়া মৌখিক কবিরাজের লক্ষণাদি বলিয়া উভয়েই রোগের ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করিলাম, রোগ নির্ণয় জন্যও ব্যবস্থা লইতে কবিরাজের কথামতে আমরা প্রত্যেকে ২ টাকা করিয়া কবিরাজকে ভিজিট দিলাম। কবিরাজ আমার রোগ বাতরক্ত ও পেশগারের রোগ ডিসপেপসিয়া অর্থাৎ অজীর্ণ বলিয়া নির্ণয় করিলেন। কিন্তু আমরা সাপাড় যাইয়া অন্যান্য আরও চিকিৎসককে দেখাইয়া ঔষধ করিব বলিয়া কবিরাজের নিকট প্রকাশ করিলাম। তৎপর আমি গাড়িযোগে বাসায় চলিয়া আসিলাম। রেহানউদ্দিন পেশগার কতেক পথ আসিয়াই বলিলেন যে, হরেন্দ্রের বাড়ির নিকট আসিয়াছি, আমি বাসায় পদব্রজেই যাইব, হরেন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া আসি, কারণ কাল পরশুই সাপাড় যাইব, কি জানি তাহার সহিত আর দেখা করিতে পারি কি না? বলিয়াই তিনি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন, আমি ও রসিক সরকার ঐ গাড়িযোগেই বাসায় চলিয়া আসিলাম, বাসায় আসিয়া মায়ার বাপকে সঙ্গে লইয়া আমরা ত্রয় ব্যক্তিই স্নান করিবার নিমিত্ত বুড়িগঙ্গায় গেলাম।

স্নান করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম, রেহানউদ্দিন পেশগার ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে হরেন্দ্র নিজ গাড়ি দ্বারা পাঠাইয়া দিয়াছেন। তখনই অন্দর হইতে খানা আসিল ও আমরা সকলেই ভোজন শেষ করিলাম, নিকটবর্ত্তী হিন্দু হস্টেলে যাইয়া রসিক সরকার খাইয়া আসিল। আহারান্তে সকলেই যার ২ বিছানায় বিশ্রাম করার নিমিত্ত শয়ন করিলাম। সুনা মিয়া ও মোক্তারের পুত্র নান্না মিয়া আরও তাহাদের বন্ধুবর্গ ২/৩ জনা তাস দ্বারা জুয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিল, আমরা শুইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলাম, কেহবা ১০, ৫ টাকা হারিল ও কেহবা ১০, ৫ টাকা জিতিল, এবং তাদের মধ্যে মৃদু ২ স্বরে

আমাদের বিষয় যে আলাপ হইতেছিল, তৎসমুদয়ই আমরা শুনিয়া ফেলিলাম, কারণ আমরা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া তাহারা বুঝিয়াছিল, এবং আমরা জানিয়া শুনিয়া ও আমাদের প্রসঙ্গে কথা হইতেছে বুঝিতে পারিয়া কতকটা নিদ্রার ভান করিয়াছিলাম।

তাহাদের মধ্যে একজনা সুনা মিয়াকে বলিল, ইহাদের মধ্যে একজনাকে তুলিয়া আমাদের খেলাতে সামিল কর, তাহা হইলে বোধহয় অক্লেশে কতক টাকা আমরা হস্তগত করিতে পারিব। অন্যজনা বলিল নিশ্চয়ই হস্তগত করিতে পারিব। কারণ ইহারা গ্রাম্যলোক সহজেই আমরা খেলাতে ঠকাইতে পারিব। অন্যজনা সুনা মিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল ইহাদের বাড়ি কোথায়? সুনা মিয়া বলিল কি জানি ছিলেট নাকি বলিয়াছে। ছিলেট জিলার অন্তর্গত সুনামগঞ্জ সাবডিবিসনে কোন গ্রামে ইহাদের বাড়ি মনে নাই, কিন্তু তোমরা যাহা মনে করিয়াছ তাহা সম্ভবপর নহে। আমরা কখনও ইহাদিগকে ঠকাইতে পারিব না। আমি মদ খাওয়াতে ইহাদিগকে একপ্রকার পরীক্ষা করিয়া ফেলিয়াছি। আমরাত সহরের লোক সর্বদাই মদ খাওয়াতে অভ্যস্ত, ইহারা গ্রামের লোক, ইহাদের অনভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ইহারা দুইজনেই সাংঘাতিক মদ খাইতে পারে, আর ইহারা এখানে আসিয়াছে অবধি কোনরূপ মৎস্য স্পর্শ করে না, আমি মৎস্য খাওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহারা তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়, মদেতে অজস্র ব্যয় করে ও গাড়িভাড়া ইত্যাদি যে কোন খর্চ্চে পশ্চাদপদ হয় না।

তাহাদের মধ্যে একজনা আবার নামাজ পড়েন, টাকা-পয়সা ইত্যাদি ব্যয়ের বিষয় উত্থাপন করিলে তাহারা টাকা-পয়সাকে অত্যন্ত তুচ্ছ করে, সেদিন রাত্রে কাজি সাহেবের মেয়ের ঘরে বসিয়াছিলাম, ঐ বাইজির পানদানে কিছু ২ দেওয়ার কথা হইলে ময়মনসিংহ-এর জমিদার মাহামদ মিয়া ।০ আনা দিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে যে প্রধান ব্যক্তি সে আমাকে কত দিবে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি বলিলাম আপনিও ।০ আনা দেন, এইভাবে দেওয়ারই নিয়ম। কিন্তু তিনি আমার কথা না শুনিয়া ঐ পানদানে ৪ টাকা দিয়া ফেলেন। তখন আমরা সকলে স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই, কিন্তু ২ জনাই কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, আবার আমাদের বাড়ির গলির মুখে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর পাওয়া যায়, ও তাহারা বলিতে থাকে, যে পাহারাওয়ালার কর্তব্য অসময়ে লোক পাইলে ধরিয়া থানায় নিয়া যাইবে তবে আপনারা কেন অবিচারে পাহারাওয়ালাকে মারিলেন। আমরাত ভয়ে দৌড়িতে ২ হয়রান হইয়াছি, কি জানি পাহারাওয়ালা দলবলসহ আসিয়া আমরা সকলকে গ্রেফতার করে। আমরা বুঝিলাম এইসব কথাবার্তা কেবল তাহাদের ভণ্ডামি, আমরা সন্দেহ করিলাম, সেই সময় শূন্যে উড়িয়া তাহারা এস্থানে আসিয়াছে। অথবা তাহারা নিজমূর্তি ধারণ করিয়াছিল বিধায় আমরা রাস্তায় তাহাদিগকে দেখিতে পাই নাই, নিশ্চয়ই ইহারা মনুষ্য নহে। মনুষ্যের রূপ ধারণ করিয়া ইহারা আতশি ঢাকা শহরে আসিয়াছে।

আরও বহুতর গল্পগুজব শুনিয়াছি যে জীনেরা মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া শহরে আসিয়া থাকে একবার এক জীন তাহার পুত্রের খতনা করাইবার জন্য এই ঢাকা শহরে আসিয়াছিল ধরা পড়িয়া শেষে এ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যায়, ও নবাব আবদুল গণি

সাহেব জীবিত থাকাকালে ঐ জীনে বাদশার বেটার সহিত আসিয়া ইয়ারানা করিয়াছিল ও তালবে এলিম বলিয়া নবাব সাহেবের পিতা খাজা অলি [ম] উল্লা সাহেবের নিকট পরিচিত হইয়া নবাব সরকারেই জায়গীর লইয়াছিল। কয়েক বৎসর পর ঐ তালবে এলিমের বিবাহ উপলক্ষে বাড়িতে যাইবে বলিয়া নবাবকে বলে যে, দোস্ত আমার বিবাহে আপনে না গেলে চলিবে না, নবাব সাহেব বলিলেন বাবার কাছে এই কথা বলিবেন, তিনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি নিশ্চয়ই যাইব। পর দিবস খাজা সাহেবের নিকট উক্ত তালবে এলিম যাইয়া বলিল, যে তাঁলে সাহেব আমার বিবাহ সুস্থির হইয়াছে। এই বিবাহকালে আমার দোস্ত না গেলে চলিবে না, আপনাকে দাওয়াত করার জন্য আমার পিতামাতা অনুরোধ করিয়াছেন, এখন আপনার কি মর্জি হয়, তাহাদের শীঘ্রই জানাইতে হইবে। তিনি বলিলেন তোমার বাড়ি কোন জায়গায়? কতদূরে জানিতে পারিলে এই কথার উত্তর দিব, আমার শরীর বার্ধ্যকের জন্য সর্বদাই ভাল থাকে না সুতরাং আমি প্রবাসে যাইব না, তোমার দোস্ত যদি যাইতে চায় তবে তাহাকে নিতে পার। কিন্তু তোমার বাড়ি কোথায় ও কতদূরে তাহা পূর্বেই আমাকে জানাইতে হইবে। সে বলিল, আচ্ছা, কাল কি পরশু একথার উত্তর দিব। তিনি বলিলেন, একথার উত্তর দিতে কোন পরামর্শ লাগে না, তুমি এখনই একথার উত্তর দিতে পারিবে। তালবে এলিম আর কিছু না বলিয়া খাজা সাহেবকে আদাব দিয়া চলিয়া আসিল। তৎপর তিনি তাহার পুত্র নবাব গণি মিয়াকে তলব দিলেন। গণি মিয়া সাহেব তলব পাওয়া মাত্রই পিতৃ-সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। খাজা সাহেব বলিলেন তোমার দোস্ত যে তালবে এলিম তাহার বিবাহ উপলক্ষে তোমাকে নিতে চায় তাহার বাড়ি কোথায় জান কি? তাহার কাছে যেসব চিঠিপত্র আসিয়া থাকে, তাহার ডাকমোহর তুমি দেখিয়াছ কিনা, এবং কথা প্রসঙ্গে তাহার বাড়ি কতদূর, তাহার নাম, পিতার নাম, এসব সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছ কিনা। গণি মিয়া সাহেব বলিলেন এসব বিষয় কিছুই আমি অবগত নই, কিন্তু অতি আশ্চর্য ঘটনাবলী আমি দৃষ্টি করিয়াছি। প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, আরও নানা বিষয় সন্দেহ হওয়ায় তাহার কোন কথা প্রকাশ করিতে ভয় করি, তাহার বাড়ি যেখানেই হউক বিবাহ উপলক্ষে আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিয়া দেন, আমার দোস্ত যদিও মনুষ্য না হন তথাপি আমার কোন প্রকার ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট করিবেন না, ইহা আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছি। পরদিবস উক্ত তালবে এলিম খাজা সাহেবের নিকট যাইয়া সেলাম দিয়া প্রকাশ করিল যে আমার বাড়ি কোহেস্থান, আমার নাম জিন্নাত আলী, দূরত্ব প্রায় মাসেকের পথ কিন্তু আমাদের জন্য ঘণ্টা ২ ঘণ্টা অন্য কোন কথা প্রকাশ করিতে আমার বাবা নিষেধ করিয়াছেন, আমি পিতৃভক্ত সন্তান আমার পিতার কথা কখনই এড়াইতে পারিব না, ইহাই আপনার জুনাবে আরজ করিলাম, বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

খাজা সাহেব গণি মিয়া সাহেবকে আনাইয়া তালবে এলিমের বিবাহে যাওয়ার অনুমতি দিয়া দিলেন ও তালবে এলিমকে ডাকাইয়া গণি মিয়া সাহেবের সাক্ষাতে আনাইলেন ও গণি মিয়াকে বলিলেন যে, তুমি যে তোমার দোস্তের বিবাহ উপলক্ষে যাইতেছ সে দেশে আমাদের দেশের টাকা ও নোট ইত্যাদি চলে কি না জানিতে

হইবে, কারণ বিবাহের সিউলি ইত্যাদি দিতে হইবে। তালবে এলিম বলিল এ আপনার এত চিন্তা করিতে হইবে না। কারণ অদ্যই বাবাকে আপনার নিকট আনিব ও আপনে তাহার নিকট যাহা দিবেন, তাহাই তিনি লইবেন ও অন্য দেশের টাকার সহিত বদলাইতে পারিবেন।

সন্ধ্যার সময় তালবে এলিম শুভ্রকেশ গুম্ফধরী এক ব্যক্তিকে লইয়া আসিয়া গণি মিয়ার সামনে দাঁড়াইল ও বলিল ইনিই আমার বাবা, গণি মিয়া সাহেব একথা শুনিয়া ঐ ধবল কেশ গুম্ফধারীর পায়ে ধরিয়া সেলাম করিলেন। তৎপর ঐ শুভ্রকেশ গুম্ফধারী খাজা সাহেবের সন্নিধানে যাইয়া তাহাকে আদাব দিলেন, ও তালবে এলিম খাজা সাহেবের পদচুম্বন করিয়া বলিল, তালে সাহেব এইত বাবা আসিয়াছেন, তখনই খাজা সাহেব অতি সমাদরে ঐ বৃদ্ধকে বসাইলেন।

উভয়বিধ মধ্যে নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল, তৎপর তালবে এলিমের বিবাহের সিউলি সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল, তালবে এলিমের পিতা বলিল যদিও আমাদের সন্নিবর্ত্তী স্থানে তুরস্কের সুলতানের টাকা প্রচলিত কিন্তু আমরা স্বাধীন, আমাদের কাছে সমস্ত সম্রাটের টাকা চলে, বিশেষতঃ আমরা সর্ব্বাদা এক সম্রাটের জায়গায় থাকি না, তুরস্কের, পারস্যের বৃটিশের রাজ্য আমরা নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াই, আমরা পৃথিবীর সর্মস্ত রাজ্যের টাকাই চালাইতে পারি, কোন অসুবিধা হয় না। তখন খাজা সাহেব বুঝিতে পারিয়াই ঐ বৃদ্ধের হাতে ১০০ সুবর্ণ মুদ্রার এক থলে দিলেন ও বলিলেন ইহা গ্রহণ করুন। আপনার ছেলের বিবাহের সিউলি দিলাম। ইহা আমার বাবার আমলের পারস্য সম্রাটের নামাঙ্কিত মোহর বটে, বৃদ্ধ বলিলেন যাহারই নামাঙ্কিত হউক খাঁটি সোনা হইলে যেকোন রাজ্যে চলিবে, বলিয়াই আচ্ছালাম আলীকুম, বলিয়া বাহির হইলেন ও উড়িয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেন।

সুনা মিয়া এই গল্প তাহার সঙ্গীদের কাছে বলিয়া আবার বলিল আমার পিতা মৌলবী রেজা রব্বানি সাহেব নিকট গণি মিয়া সাহেবের পুত্র নবাব আহছানউল্লা সাহেব তাহার পিতা গনি মিয়া সাহেবের নিজমুখে শুনিয়া বলিয়াছেন। এইসব লোকদের মধ্যে জীনের অনেক কার্যকলাপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বিশেষ ইহারা কেহই মাছ ভক্ষণ করে না, সমস্তেই মাংস, ডাইল, আনাজ তরকারী খায়, আমি বিশেষ অনুরোধ করা সত্ত্বেও একদিনও মাছ খাওয়াইতে পারিলাম না, জীনেরা মৎস্যভোজী নহে। তৎপর তাহাদের আলাপ প্রলাপ ও গল্পগুজব শেষ হইলে এবং তাহাদের খেলাও ভঙ্গ হইয়া গেল, আমরা কপট নিদ্রা হইতে উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করিলাম। ও তাহাদেরই কথামতে জ্ঞাত হইলাম যে, এইদিন শুনা মিয়া ১০/১৫ টাকা খেলাতে জিতিয়াছে, তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল যে আজ শুনা মিয়া হইতে মদের টাকা লইতে হইবে। কিন্তু শুনা মিয়া ঐরূপ করিতে অসম্মত দেখায়, আমি বলিলাম যে না স্বয়ং দাতা যখন অসম্মত হইতেছেন তখন এইরূপ পান করিতে ও আমোদ করিতে আমি সম্মত নহি, আজকের আমোদে যত ব্যয় হইবে ততসমুদয়ই আমি দিব।

তখন রসিক সরকার বলিল, আপনাদের পূর্ব আখ্যায়িকা আমরা শুনিয়াছি। আমরা

স্বীকার করিতে পারি যে, আমরা সমস্তই জীব বটে কিন্তু আমাদের সাহেব জীন নহেন, তিনির নামও গণি মিয়া বটে। আমাদের সাহেবের সঙ্গে অন্য এক জীনের বাদশাহ পুত্রীর মিত্রতা বা দুস্তি আছে। বলামাত্রই হাসির ধুম পড়িয়া গেল। এইকথা শুনামাত্র মৌলবী রেহানউদ্দিন বলিলেন যে, কবিরাজ মহাশয়ের বাসা হইতে আইসাকালে রাস্তায় আমি আপনার সে দোস্তের বাড়িতে গিয়াছিলাম তিনি আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন যে, অদ্যই সন্ধ্যার পর তিনি গাড়ি পাঠাইবেন, আপনি ও আমি যাইবার জন্য কিন্তু সঙ্গে অন্য লোক নিবেন না। আমি বলিলাম আচ্ছা তখন শুনা মিয়া প্রভৃতি হাসিতে লাগিল, ও বলিতে লাগিল ঐ শুনা ২ তাহাদের কথা ও ক্রীয়াকলাপে আমার বর্ণিত কথার সাহায্য করে কিনা? ক্রমে সন্ধ্যা হওয়ার উপক্রম হইতে লাগিল, আমরা হরেন্দ্রর গাড়ির প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম, অল্পক্ষণ পরেই কচোয়ান একজন আরোহীসহ উপস্থিত হইল, আমি ও পেশগার সাহেব গাড়ির নিকটবর্তী হইলে পর গাড়ির আরোহী গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া আমাদিগকে সেলাম দিল, ও বলিতে লাগিল আমাদের বাবু আপনাদিগকে নেওয়ার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমিই তাহার খানসামা বা চাপরাশি, বলামাত্রই আমি ও উল্লিখিত পেশগার সাহেব গাড়িতে উঠিলাম, ও মায়ার বাপকে ডাকিয়া গাড়ির পেছনের দিকে উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য বলিলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিল ও অল্পক্ষণ মধ্যেই গাড়ি আমার পূর্ব্ব পরিচিত জিন্দাবাহারের গলিতে প্রবেশ করিল, তথায় যাইয়া এক দুতালার সামনে গাড়ি থামিল ও গাড়ির পিছনের পাদান হইতে হরেন্দ্রের খানসামা করিম বক্স ও মায়ার বাপ উভয়ই নামিয়া পড়িল।

করিম বক্স আমাদের সামনে আসিয়া বলিল আসুন বাবু, আমাদের বাবু ঐ উপর তলায় আছেন আপনাদিগকে সেখানে লইয়া খাওয়ার কথা বাবু পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন। তবে আসুন, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন আমরা তাহার পশ্চাদগামী হইলাম। দুতালার উপরে উঠিয়াই দেখি, ঐ দুতালার উপরে ৩টি প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। দুইদিকে দুইটি কক্ষ এক সমান রহিয়াছে, কিন্তু মধ্যেরটি তদুভর প্রকোষ্ঠ হইতে অতি প্রকাণ্ড, প্রকোষ্ঠের মেঝেতে চৌকির ফরাস রহিয়াছে। চৌকির উপরে সতরঞ্জি বিছান আছে, সতরঞ্জির উপর সাদা চাদর আছে, ও ফরাসের চুতর্পাশ্ব ঘুরিয়া বড় বড় গির্দ্দক বালিশ আছে, প্রোকোষ্ঠের দুইধারে অতি প্রকাণ্ড দুইখানা দর্পণ রহিয়াছে। অনুমান উভয় দর্পণেরই আয়তন দীর্ঘে ৫ হাত ও প্রস্থে ৩ হাত হইবে। ঐ প্রকোষ্ঠের এক কণা দিয়া একখানা ছোট টেবিল আছে, ও ২/৩ খানা চেয়ার রহিয়াছে তাহারই একখানাতে হরেন্দ্র বসিয়া রহিয়াছে। আমরা ঐ গৃহে প্রবেশ করা মাত্রই হরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল, ও মৌলবী রেহানউদ্দিনকে হস্ত ইঙ্গিত দ্বারা ফরাসে বসিবার নিমিত্ত দেখাইয়া দিল ও আমাকে অন্য চেয়ারে তাহার ধারে বসিবার কথা বলিল, আমি তাহার ধারে বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু ঐ ফরাসের উপর গৃহকর্ত্রী খেমটাওয়ালী বসান থাকায় পেশগার সাহেব তথায় উঠিয়া বসিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, ঘরের মেঝেতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, আসুন মৌলবী সাহেব ফরাসে উঠিয়া বসুন, এ ঘর অন্য কাহারও নয় আমারই বটে, উক্ত খেমটাওয়ালী আমার রক্ষিতা, জ্ঞানদা, আপনি আমার ক্লাস

ফ্রেন্ড, কোন চিন্তা করিবেন না, ইহা আপনারই ঘর মনে করিবেন তবুও মৌলবী সাহেব নড়িলেন না, হরেন্দ্র ও আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলাম, ওই খেমটাওয়ালীর দুই পাশে আমরা দুইজন বসিলাম, ও হরেন্দ্র তার খানসামাকে ডাকিল ও তাহাকে বলিল করিম বক্স আধখানা (অর্থাৎ আধা বোতল একশা No. 1) ও ২ বোতল সুডা ওয়াটার লইয়া আস, যদি আধখানা অর্থাৎ এক পাইট না পাওয়া যায় তবে আমার কথা বলিও পুরা বোতল ভাঙ্গিয়া তোমাকে আধখানা দিবে ও অবিলম্বে লইয়া আসিবে।

অল্প সময় মধ্যেই এক বোতল ভাঙ্গিয়া আধখানা (একশা No. 1) ও দুই বোতল সুডা ওয়াটার লইয়া উল্লিখিত খানসামা করিম বক্স আসিয়া উপস্থিত হইল ও তৎসমুদয় জিনিসই জ্ঞানদা খেমটাওয়ালীর নিকট দিল, খেমটাওয়ালী গ্লাস আনিয়া এক গ্লাসে হরেন্দ্রকে দিল, অন্য গ্লাসে আমাকে দিল ও অনুপাত অনুসারে সুডা ওয়াটারও মিশাইল। হরেন্দ্র খাইলে পর ঐ গ্লাসে আর এক ডউজ ঢালিল, আমি খাইলে পর আমার গ্লাসে অন্য এক ডউজ ঢালিল, করিম বক্স মদের জন্য যাওয়া কালের পরই আমি ও হরেন্দ্র অতিকষ্টে ও কতেক জোর পৌঁছাইয়া মৌলবী রেহানউদ্দিনকে ফরাসের উপর আমাদের ধারে আনিয়া বসাইয়াছিলাম, আমি ও হরেন্দ্র দুইজনে ২ ডউজ খাইলে পর খেমটাওয়ালীও ১ ডউজ খাইল মৌলবী রেহানউদ্দিনকে একগ্লাস দিল, কিন্তু তিনি গ্লাস হাতে না লইয়া আচতাকপিরউল্লা, নউজবিল্লা তওবা, তওবা আমি এই সমস্ত জিনিস কখনও স্পর্শ করি নাই ও করিবও না, কি হরেন্দ্র? এই বুঝি ক্লাস ফ্রেন্ডের পরিচয় দিতেছ? ছেলেবেলাত তোর স্বভাব ভাল ছিল, এখন ঢাকায় আসিয়া তুই মাগীবাজ, বদমাইশ হইয়া গিয়াছিস নাকি? যদিও তুই গণি মিয়ার ক্লাস ফ্রেন্ড নহিস তথাপি তোমরা উভয়েই মদ্যপায়ী ও মাগীবাজ, তোমাদের মধ্যেই এসব খাটিবে।

তখন আমাদের ইঙ্গিতানুসারে খেমটাওয়ালী গান গাওয়া আরম্ভ করিল, ও বাতাইতে লাগিল, ও নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে হস্তদ্বারা মৌলবী সাহেবকে দেখাইতে লাগিল, আমরা খেমটাওয়ালীকে মৌলবী সাহেবের ক্রোড়ে বসাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মৌলবী সাহেবের লম্বা দাড়ি দেখিয়া খেমটাওয়ালী রাজি হইল না। তৎপর বোতল ফুরাইয়া গেল। হরেন্দ্র আবার করিম বক্সকে বোতলের জন্য ইশারা করিল, তখন করিম বক্স কতখানা আনিবে, জিজ্ঞাসা করিল, হরেন্দ্র সেই আধখানা আনিবার কথা বলিল ও সুডা, সিগারেট আনার কথাও বলিয়া দিল, অল্পক্ষণ পরে সমস্ত জিনিস লইয়া করিম বক্স ফিরিয়া আসিল, ও সেই লাল টুকটুকা মাল, জ্ঞানদা খেমটাওয়ালীর হস্ত হইতে পূর্বানুসারে, আমরা উভয় ব্যক্তি পান করিতে লাগিলাম। খেমটাওয়ালী মধ্যে মধ্যে গান গাইতে ও বাজাইতে লাগিল, মৌলবী সাহেব সিগারেটও খাইলেন না।

বলিলেন সরাব খাইয়া তোমরা ইহা স্পর্শ করিয়াছ, আমি ইহা খাইব না। তখন খেমটাওয়ালীর বাড়ির দ্বারবানকে হরেন্দ্র ডাকিল ও একটি ফরসী হুক্কা তাহার দ্বারা আনাইয়া ও খামিরা ও তামাক আনাইয়া ঐ দ্বারবান দ্বারা মৌলবী সাহেবকে খাইতে দিল। মৌলবী সাহেব খাইতে লাগিলেন, আমি তাহার অলক্ষ্যে হুক্কা আনিয়া খাইতে লাগিলাম, কতেকক্ষণ পর ঐ হুক্কা ফিরাইয়া মৌলবী সাহেবকে দিলাম। মৌলবী

সাহেব নউজবিল্লা বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন, ও চেয়ারে যাইয়া বসিলেন, ও বলিলেন, তোমরা সরাবী, হুক্কা স্পর্শ করিয়াছ, আমি আর এইটাতে খাইব না বলিয়া উঠিয়া গেলেন ও বলিলেন, হরেন্দ্র আমি চলিয়া যাইতেছি আর ভাল লাগে না।

আমি বলিলাম একি একি একা একা কোথায় যাইবেন আবার হাঁটিয়া, নিশ্চয়ই আপনাকে পুলিশে ধরিবে। রাত্র এখন প্রায় ১টা বাজিয়াছে তখন হরেন্দ্র উঠিল, ও বলিল চলুন সকলেই এক গাড়িতে যাই তখন সকলেই এক গাড়িতে আসিলাম। রাস্তায় আসিয়াই হরেন্দ্র ও করিম বক্স গাড়ি হইতে নামিয়া গেল, আমাদিগকে বাসায় পৌছাইয়া দিবার কথা হরেন্দ্র তাহার গাড়োয়ানকে বলিয়া দিল, গাড়োয়ান আমাদিগকে ছাচিবন্দর জীবন মিয়ার বাড়িতে পৌছাইয়া নামাইয়া দিল, আমি, মৌলবী সাহেব, মায়ার বাপ রসিক সরকারকে ডাকিয়া দেউড়ির কবাট খুলাইলাম ও ভিতরে প্রবেশ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন আমাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিলাম। ও কয়টা বাজে ট্রেনে উঠিলাম এখন মনে পড়িতেছে না গতিকে লিখিতে পারিলাম না, সম্ভবতঃ পরের দিনের রাত্র ৮টার ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ আসিলাম, ও জাহাজে উঠিয়া বাড়িতে চলিয়া আসিলাম।

সামান্য একটি বিষয় ভ্রমবশতঃ যথাকালে বর্ণনা করা হয় নাই বিধায় নিম্নে বর্ণনা করিলাম। ঐ জ্ঞানদা খেমটাওয়ালীর ঘরে বসাকালে আমি তাহার ফরাসের উপরের গির্দ্দক ঠেক দিয়া অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিলাম ও ফরাসের উপর ২৭টি গির্দ্দক আছে বলিয়া গণনা করিয়াছিলাম। অন্যমনস্কভাবে ৫/৭ মিনিট বসিয়া থাকায় বোধহয় নেশার ঝোঁকে নিদ্রাকর্ষণ করিয়াছিল। তখন ঐ হরেন্দ্র আমার অলক্ষ্যে বোধহয় প্রস্রাব করিতে গিয়াছিল, তখন মৌলবী সাহেব আমার ঘাড়ে ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন অদ্যকার মদের খর্চ্চে ও গাড়িভাড়া ইত্যাদিতে অর্থাৎ মদ, সুডা ওয়াটার, সিগারেট, পান, তামাক ইত্যাদিতে যাহা ব্যয় হইবে তাহা হরেন্দ্রর ও তোমার অর্দ্ধাঅর্দ্ধিভাবে দিতে হইবে। তাহা সে আমাকে প্রথম দিবসেই তোমাকে জানাইবার জন্য বলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ভুলে আমি তোমাকে জানাই নাই তবে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে বলিয়া জানাইল কেন? অথচ গাড়িখানাও তাহার বাড়িরই বটে, ভাড়াটিয়া গাড়ি নহে, আমি তাহাকে চিনি সে জাতে বানিয়া! আমিও ছেলেটি চাচা, আমি শালাকে এক পয়সাও দিব না, তাহার রক্ষিতা মাগীর গান শুনিয়াছি মাত্র।

বানিয়া কেন নিমন্ত্রণের কথা বলিয়াছিল, এই কথা বলিয়াই উঠিলাম ও গাড়িতে আসিয়া চড়িলাম। পথে হরেন্দ্র নামিয়া গেল, গাড়োয়ান আমাদিগকে বাসায় পৌছাইয়া দিল। ইহাই লিখার অবশিষ্ট ছিল পূরণ করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে হরেন্দ্রর চাপরাশী আমাদের বাসায় ঐ খর্চ্চের অর্দ্ধাংশ ৫/৭ টাকা নেওয়ার জন্য আসিয়াছিল কিন্তু আমরা বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাকি জিনিসপত্র খরিদকরণার্থে চৌকবন্দরে চলিয়া গিয়াছিলাম। সে বসিতে বলিয়া গিয়াছিল। বিকালে সে আবার আসিয়াছিল, তখন আমরা বাড়ি যাওয়ার জিনিসপত্র গুছাইতেছি, ভাড়াটিয়া গাড়িও আমাদের বাড়ির সাক্ষাতে দাঁড়ানো ছিল, আমরা স্টেশনে যাওয়ার জন্য জিনিসপত্র গাড়িতে উঠাইতে ছিলাম। তখন করিম বক্স টাকার জন্য আসিয়া রসিক সরকারকে তাগিদ করিতেছিল, রসিক সরকার

বলিতেছিল, যে কিসের টাকা, আমরা ত কোন টাকার কথা জানি না। মৌলবী সাহেবের জবানী জানিয়াছিলাম, যে তোমাদের বাবু আমাদের সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, মৌলবী সাহেব আমরা সাহেবের সঙ্গীর কাহাকেও না নিয়া সাহেবকে লইয়া তিনি একা গিয়াছিলেন টাকা-টুকার কোন কথা শুনি নাই।

তোমাদের যদি টাকা পাওনা হইয়া থাকে তবে এ মৌলবী সাহেব হইতে লও, তুমি এখানে দাঁড়াও, তিনি এখনই বাহির হইবেন, তিনিও আমাদের একসঙ্গে আমাদের এই গাড়ি দ্বারা স্টেশনে যাওয়ার কথা ছিল, এইত এখনই ৬টা বাজিবে। ৬টা বাজিলে নারায়ণগঞ্জে স্টেশনের ট্রেন ঢাকা হইতে ছাড়িয়া দিবে বলিয়াই গাড়োয়ানকে রসিক সরকার বলিল চালাও চালাও ও বলিল শেষ যদি ট্রেন ধরাইতে না পার, ট্রেন ছুটিয়া যায় তবে তোমার পয়সা পাইবা না। অতিকষ্টে ট্রেন ধরাইয়া দিল ও আমরা ত্রস্তগতিতে ট্রেনে উঠিলাম ও গাড়ি বিদায় করিয়া দিলাম। ট্রেন ছাড়িল ও ১৫/২০ মিনিট মধ্যে নারায়ণগঞ্জ পৌছাইয়া দিল। টাইম মতে আমরা ষ্টিমারে উঠিলাম ও নিয়মিতকাল মধ্যে বাড়িতে আসিয়া পৌছিলাম।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. প্রায় পুরো পূর্ববঙ্গে উনিশ শতকে বন্যবরাহ এবং বাঘের আধিক্য ছিল বেশি। ১৮৫০-এর দিকেও হাতিয়া, দাউদকান্দি, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহীতে বন্যবরাহের সংখ্যা ছিল প্রচুর। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে এবং রংপুরে পাওয়া যেতো গণ্ডার। বন্য মহিষের দেখা পাওয়া যেতো বাখরগঞ্জে। আর ছিল বাঘ। ১৮৬০-এর চট্টগ্রাম সম্পর্কে ইংরেজ সিভিলিয়ান ক্লে লিখেছিলেন, দিনে দুপুরে সেখানে বাঘের গর্জন শোনা যেতো। ১৮৭০-এর এক সংবাদে জানা যায়, মানিকগঞ্জে 'ব্যাঘ্রের অতিশয় প্রাদুর্ভাব' হয়েছিল, 'এমনকি সন্ধ্যার পরই ঘরের বাহির হওয়া দুষ্কর কিঞ্চিৎ অধিক রাত্রি হইলেই ব্যাঘ্র গর্জনে গ্রাম কাঁপিতে থাকে।' বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন—
Frank. B. Simson, *Letters on Sport in Eastern Bengal,* London, 1885.
C.S. [A. L.Clay], *Leaves from a Diary in Lower Bengal,* London, 1896.
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, ৭/৭, জানুয়ারী ১৮৭০।

২. চক বাজার।

৩. রাজা বাবু ছিলেন ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার ভিখন লাল ঠাকুরের পুত্র। লক্ষ্মীবাজার ও নারায়ণগঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভিখন লাল। হৃদয়নাথ লিখেছেন, রাজা বাবু ছিলেন ঐ আমলের ঢাকার গান বাজনার 'রাজা'। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত তবলচী আতা হুসেনের পিতা হুসেন বক্সের শিষ্য ছিলেন রাজাবাবু। দেখুন, মুনতাসীর মামুনের, *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর,* ঢাকা, ১৯৮৫।

শব্দ সূচি



পুরানো ঢাকা উৎসব ও ঘরবাড়ি

মুনতাসীর মামুন

পুরানো ঢাকার উৎসব

দেড়শো দু'শো বছর আগে ঢাকা ছিল নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, অসুন্দর নোংরা এক শহর; নিরানন্দ তো বটেই। তবুও প্রতিবছর বিশেষ বিশেষ সময়ে হঠাৎ দু'একদিনের জন্য বদলে যেতো ঢাকা শহরের চেহারা। মেলা, রঙ্গীন নিশান, লোকজনের ব্যস্ত চলাফেরায় ঢাকা পড়ে যেতো শহরের নোংরা চেহারাটা। নিরানন্দ শহর দু'একদিনের জন্য হলেও ঝলমল করে উঠতো, জমকালো সব মিছিল দেখতে সাড়া পড়ে যেতো। এর মূলে ছিল কয়েকটি উৎসব— ঈদ, মুহররম ও জন্মাষ্টমী।

উনিশ শতক পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে এ তিনটি উৎসবই ছিল প্রধান উৎসব। এ কথা ঠিক, মূলতঃ তিনটি উৎসবই ধর্মীয়, কিন্তু মুহররম ও জন্মাষ্টমী ধর্মীয় গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেকাংশে পরিণত হয়েছিলো সর্বজনীন উৎসবে। ঈদ বা ঝুলন সে অর্থে ধর্মের গণ্ডী ছাড়াতে পারে নি। মুহররম বা ঈদ বাংলাদেশের বাইরে থেকে আমদানী করা হলেও অজস্র লোকায়ত উপাদান এদের আমদানীকৃত কঠোর শুদ্ধ চরিত্র বদলে দিয়েছিলো। ফলে, এক সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো আরেক সম্প্রদায়ের উৎসবে যোগ দেওয়া। এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, ঈদ, মুহররম এবং জমাষ্টমী, এই তিনটি উৎসবেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মিছিল। জমকালো, উল্লাসমুখর সে মিছিল এখন স্মৃতি।

এখানে, ঢাকার সেই তিনটি উৎসব ও ঝুলন এবং হোলির কথাই প্রধানতঃ আলোচনা করবো। কারণ, ঐ তিনটি এবং শেষোক্ত উৎসবই ছিল শহরের প্রধান উৎসব। আলোচনা সীমিত থাকবে ঢাকা শহরের মধ্যেই। আলোচনার শুরুতে প্রতিটি উৎসবের উৎস, তারপর ঢাকায় এর বিকাশ এবং স্থানীয়, সামাজিক ও লোকায়ত উপাদান কিভাবে সৃষ্টি করেছিলো আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের, তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো; এসব উৎসব সম্পর্কিত উপাদান অপ্রতুল। তাই যতটুকু উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে তার পুরোটাই ব্যবহার করা হয়েছে কিছুটা পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও। ঢাকা শহরের মধ্যে আলোচনা সীমিত রাখলেও, বর্তমান বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই সে আলোচনা করা হবে।

মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ দুটি উৎসব হচ্ছে ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা। আমাদের দেশে এ দুটি ধর্মীয় উৎসব পালিত হয় যথেষ্ট ধুমধামের সঙ্গে। ঈদ-উল-ফিতর আবার যুক্ত মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র মাস রমজানের সঙ্গে আর ঈদ-উল-আজহা যুক্ত পবিত্র হজ ব্রতের সঙ্গে। এখানে, এখন যেভাবে ঈদ পালিত হচ্ছে, একশো বা দেড়শো বছর আগেও কি সাধারণ মানুষ সেভাবে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকতেন ঈদের দিকে? বা কিভাবে পালিত হতো ঈদ? এ দুই উৎসবের ওপর কি প্রভাব ফেলেছিলো কৃষিজীবী মানুষের লোকায়ত বিশ্বাস?

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, বিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা মেলে না; জ্ঞানের উৎস জিজ্ঞাসা। আর রসূল (দঃ) নিজেও বলেছেন, জ্ঞানার্জনের জন্যে প্রয়োজন হলে সুদূর চীনেও যেতে। সুতরাং বর্তমান আলোচনা সে পরিপ্রেক্ষিতেই, কারো ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার জন্য নয়।

সম্প্রতি 'ইসলামী পার্বণের সামাজিক নৃতত্ত্ব' নামক এক প্রবন্ধে বাহারউদ্দিন সামগ্রিকভাবে ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন তিনি রমজান, হজ সম্পর্কেও, মূলতঃ প্রাচীন লোক বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে।[১]

প্রবন্ধকার জানিয়েছেন, 'ঈদ, সওম এবং রমজানের মূল অর্থ তাদের উৎসভূমির ভিত্তিতেই অনুমান হয় রোজার উপবাস জন্ম দিয়েছে কৃষিনির্ভর সমাজে হয়ত বা প্রাচীন সিরিয়ায়।'

রমজান মাস মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র মাস এবং কোরানে একমাত্র এ মাসের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ মাসেই নাজেল হয়েছিলো কোরান, প্রথম অহী পেয়েছিলেন মুহম্মদ (দঃ), গিয়েছিলেন তিনি মেরাজে। বাহারউদ্দিনের মতে, মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার আগে রমজানের সঙ্গে পরিচয় ছিল না মুসলমানদের। এর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিলো হিজরতের পরেই। এ অনুমানের ভিত্তি 'রমজান' শব্দটি আরবি 'রমজ' ধাতু থেকে আগত। রমজ মানে দাহ তাপ, পোড়ানো। আরবি শব্দ তাত্ত্বিকদের ধারণা, চান্দ্রমাস চালু হওয়ার [চন্দ্র বর্ষই নিয়ন্ত্রিত করে মুসলমানদের উৎসব] অনেক আগে, প্রাচীনকালে গরমের মওসুমে এই মাস পড়ত বলে এর নাম হয় রমজান। রমজানের সঙ্গে উপবাসের আরবি প্রতিশব্দের ধ্বনিগত কোন মিল নেই। উপবাসের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে সওম। এর অর্থের সঙ্গেও উপবাস ব্রতের কোন মিল নেই। এর অর্থ হল আরাম বা বিশ্রাম থাকা। ...এবং হিজরতের পরেই সম্ভবত ইহুদীসিরিয়াক সূত্র থেকে উপবাসের প্রতিশব্দ হিসেবে সওম শব্দটি গ্রহণ করেন মুহম্মদ। কোরানের ১৯ নং সূরা মরিয়মের ২৭ নং আয়াতে সওম শব্দটি আছে।'[২]

দ্বিতীয় হিজরীতে নির্দেশ এসেছিলো অবশ্য কর্তব্য হিসেবে রমজান পালনের এবং এ উপবাসের সঙ্গে মিল আছে আবার পূর্বাঞ্চলীয় খ্রীস্টানদের, যাঁরা নির্দিষ্ট

সময়ে চল্লিশ দিন পালন করেন উপবাস।

রমজান শেষে ঈদ-উল-ফিতর। ঈদের অর্থ উৎসব। তবে আভিধানিক অর্থ 'পুনরাগমন' বা বারবার ফিরে আসা। ধর্মীয় অনুষ্ঠানজ্ঞাপক অধিকাংশ শব্দের মতো ঈদ শব্দটি মূলত সিরিয়াক। আরো লিখেছেন তিনি – 'ঈদ শব্দটির অর্থের সংগে আজকের অর্থের কোন যোগাযোগ নেই, কিন্তু সামাজিক উৎসবের প্রকৃতিকে অর্থবহ করে তোলে তার আদি অর্থ। সামাজিক উৎসব বারবার ফিরে আসে, আর ঈদ শব্দের আদি অর্থেও আছে তার ইঙ্গিত। ঈদ শব্দটির আদি অর্থ ও তার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম খতিয়ে দেখে মনে হয়, হয়ত এককালে এই ধরনের এক সামাজিক উৎসবের সঙ্গে পরিচিত ছিল–– সিরিয়ক জনগোষ্ঠী। হয়ত তার কৃষিজ আচারে অন্তর্ভুক্ত ছিল এই উৎসব এবং তাদের কাছ থেকেই আচার-অনুষ্ঠানজ্ঞাপক শব্দের মতই আরবরা আমদানি করেছেন এই উৎসব ও তার প্রকৃতিকে।'[৩]

একই কথা প্রযোজ্য ঈদ-উল-আজহা ও হজ সম্পর্কে, যার সঙ্গে যোগ আছে 'আরব কিংবা অন্য কোন সেমেটিক জনগোষ্ঠীর নবান্ন' উৎসবের।

বাংলাদেশে যেভাবে এ উৎসব দুটি পালিত হতো, তাতে আমরা দেখবো সেখানে প্রভাব ফেলছিলো কৃষিজীবী মানুষের লোকায়ত বিশ্বাস। এবং সে লোকায়ত বিশ্বাস বিশ্লেষণ করলে সহজেই প্রমাণিত হয় সে মিথের যে এ দেশের মুসলমানরা বহিরাগত। কারণ, যেভাবে পালিত হতো উৎসব দুটি, তাতে লোকায়ত বিশ্বাস বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে হিন্দু ধর্মের রীতিনীতির প্রভাব ছিল বেশী।

উৎসব হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ ঈদের দিনটি কিভাবে পালন করতেন, সে সম্পর্কে অবশ্য খুব বেশি কিছু জানা যায় না। এ ধরনের উৎসব সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল আত্মজীবনী, সাহিত্য বা সমসাময়িক সংবাদ-সাময়িকপত্রে। সাহিত্যে, সংবাদ-সাময়িকপত্রে ঈদের তেমন কোন বিবরণ পাই না। আর হিন্দু বা মুসলমান যিনিই আত্মজীবনী লিখে গেছেন তিনিই দুর্গাপূজো, জন্মাষ্টমী, মুহররম, এমনকি রথযাত্রা বা বিভিন্ন পূজোর কথা উল্লেখ করেছেন; করেননি উল্লেখ শুধু ঈদ সম্পর্কে। অবশ্য এ শতাব্দীর প্রথম দু'তিন দশকে যারা জন্মেছিলেন তাদের আত্মজীবনীতে ঈদ-উল-আজহা বা কোরবানি বা রমজান সম্পর্কে খানিকটা তথ্য আছে।

এ থেকে যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, ঈদ-উল-ফিতর বাংলাদেশে তেমন বড় কোন উৎসব হিসেবে পালিত হয়নি, তাহলে কি ভুল হবে? মনে হয় না। আজ আমরা যে ঈদের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করি বা যে ঈদকে দেখি আমাদের একটি বড় উৎসব হিসেবে, তা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্য মাত্র।

এর কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। ঔপনিবেশিক আমলে যে উৎসব সবচেয়ে ধুমধামের সঙ্গে পালিত হতো এবং যে ধর্মীয় উপলক্ষে সবচেয়ে বেশি ছুটি বরাদ্দ ছিল, তা হলো ক্রিসমাস। এর কারণ স্বাভাবিক। ইংরেজরা ছিল শাসক। সুতরাং তাদের উৎসব যে শুধু জাঁকালো হতো তা নয়, এ নিয়ে মাতামাতিও কম হতো না। স্থানীয় ভদ্রলোকেরাও যোগ দিতেন ক্রিসমাসে। তৎকালীন বাংলার কলকাতা ছিল

ক্রিসমাস উৎসব পালনের প্রধান কেন্দ্র। কারণ, কলকাতা ছিল রাজধানী এবং শাসকগোষ্ঠী ও শহরে সম্পন্ন ভদ্রলোকদের বেশির ভাগ সেখানেই থাকতেন। তবে, গ্রামাঞ্চলের কথা দূরে থাক, শহর বা মফস্বলের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না।

ঐ সময় বিত্ত-বিদ্যার দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের থেকে হিন্দুরা সম্প্রদায় হিসেবে এগিয়ে ছিলেন অনেক। ফলে ক্রিসমাসের পর সরকারীভাবে তো বটেই, সম্প্রদায়গত আধিপত্য এবং ঐতিহ্যের কারণেও এ অঞ্চলের দুর্গাপূজো হয়ে উঠলো সবচেয়ে জাঁকালো এবং গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। সরকারী ছুটির পরিমাণ ঈদের থেকেও পূজোর জন্য ছিল বেশি। পূজোর ছুটিতে সম্পন্ন ভদ্রলোকরা বেরিয়ে পড়তেন ভ্রমণে। চাকরিজীবীরা ফিরতেন গ্রামের বাড়িতে; আসতেন জমিদাররা শহর থেকে প্রজাদের খোঁজখবর নিতে। বিত্ত ছিল তাদের। সুতরাং ধুমধামের সঙ্গে উৎসব পালনে বাধা ছিল না। পূজো চলতো বেশ কয়েকদিন এবং সে উপলক্ষে হতো যাত্রা, কবিগান, নাচ। গ্রামের সাধারণ মানুষের তো বিনোদন বলতে কিছু ছিল না [এখনও নেই], তাই ছেলে বুড়ো সবাই সাগ্রহে যোগ দিতেন উৎসবে। এসব কিছুর একটা ঝলমলে, রঙ্গীন দিক ছিল, তাই পূজোর বর্ণনা আমরা প্রায় সব আত্মজীবনীতেই পাই। অন্যান্য নথিপত্রেও পূজো সম্পর্কে আছে পর্যাপ্ত তথ্য।

ইংরেজ আমলের মুসলমান চাকুরেদের আবেদনপত্রে দেখা যায়, তাঁরা আবেদন জানাচ্ছেন ঈদে ছুটি বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু কর্ণপাত করা হয়নি তাতে। আর ছুটি বৃদ্ধি করলেই বা কি হতো? বড় জোর গ্রামের বাড়িতে ফিরে পরিবার পরিজনদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতে পারতেন। ঈদকে উৎসবে পরিণত করা সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে। কারণ গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন বিত্তহীন।

ঈদ মুসলমানদের প্রধান উৎসব হিসেবে পালিত না হওয়ার আরেকটি কারণ, বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা। ফারায়েযী আন্দোলনের আগে গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের কোন ধারণা ছিল না বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে। ইসলাম ধর্মে লোকজ উপাদানের আধিপত্য ছিল বেশী [প্রায় ক্ষেত্রে হিন্দু রীতিনীতির]। ১৮৮৫-এর দিকে জেমস ওয়াইজ লিখেছিলেন, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সরল অজ্ঞ কৃষক। ইসলাম ধর্মে যে সব বিজাতীয় রীতিনীতি প্রবেশ করেছিলো তারা এখন তা উৎপাটন করতে চাইছে। কিন্তু এরপর ওয়াইজ যে উদাহরণ দিয়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে, কৃষকরা এর পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। লাক্ষ্যা নদীর তীরে, কোরবানী ঈদের সময় গ্রামবাসীরা জমায়েত হয়েছেন ঈদের নামাজ পড়বেন বলে। কিন্তু জমায়েতের একজনও জানতেন না কিভাবে ঈদের নামাজ পড়তে হয়। তখন নৌকায় ঢাকার এক যুবক যাচ্ছিলেন। তাকে ধরে এনে পড়ানো হয়েছিলো নামাজ।[8]

অন্যদিকে, মুকুন্দরাম আবার চণ্ডীকাব্যে লিখেছিলেন, মুসলমানরা বড়ই ধার্মিক এবং প্রাণ গেলেও 'রোজা নাহি' ছাড়ে--

ফজর সময়ে উঠি, বিছানা লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
সোলেমানি মালা ধরে, জপে পীর পয়গম্বরে
পীরের মোকামে সেই সাঁজ।
দশবিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন কিতাব কোরান।
বড়ই দানিসমন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ে।'[৫]

মনে হয়, মুকুন্দরাম এ বর্ণনা লিখেছিলেন বহিরাগত মুসলমানদের দেখে।

মির্জা নাথানও বহিরাগত মুসলমানরা কিভাবে রমজান এবং ঈদ পালন করতেন তার বর্ণনা রেখে গেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতিনিধি সুবেদার ইসলাম খাঁ ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন ১৬১০ সালে। নাথান ছিলেন তাঁর একজন সেনাপতি। বাংলাদেশের মুঘল অভিধানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন নাথান তাঁর গ্রন্থ 'বাহারিস্তান-ই-গায়বী'তে। রমজান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন— রমজান মাসের শুরু থেকে ঈদ পর্যন্ত প্রতিদিন বন্ধুবান্ধবরা পরস্পর মিলিত হতো পরস্পরের তাঁবুতে।[৬] এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো সাধারণ এক রীতি।

ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে আগত মুঘলরা বাংলার সাধারণ মানুষের তুলনায় ইসলাম সম্পর্কে জানতেন বেশি। কিন্তু বিশুদ্ধ ধর্ম পালনে তাঁরা বেশি উৎসাহী ছিলেন না। ধর্মে আছে ঈদ মানে খুশী। সুতরাং, রমজান থেকেই মোটামুটি তারা সচেষ্ট থাকতেন যতোটা পারা যায় আনন্দ নিংড়ে নিতে। সুরা পানেও এ সময় তাদের অনাগ্রহ ছিল না।

ঢাকার ঈদ প্রতিপালন সম্পর্কে সবচেয়ে পুরনো তথ্যটি পাই আজাদ হোসেন বিলগ্রামীর 'নওবাহারই মুর্শীদ খান' গ্রন্থে। ঐতিহাসিক আব্দুর রহিম সে গ্রন্থ অবলম্বন করে লিখছেন :

'মুসলমানরা সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রা করে ঈদগায় যেত। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা উৎসবের সময় মুক্ত হস্তে অর্থ ও উপহারাদি পথে ছড়িয়ে দিতেন।'[৭]

এ বর্ণনা থেকে মনে হতে পারে, দু'তিনশো বছর আগে ঢাকায় বোধ হয় খুব ধুমধামের সঙ্গে ঈদ পালিত হতো। আসলে তা ঠিক নয়। এ বর্ণনাটির পরিপ্রেক্ষিত সঠিক নয়। আর এতো ধুমধামের সঙ্গে ঈদ পালিত হলে অন্যান্য উৎসবের মতো ঈদের বর্ণনা থাকতো বিভিন্ন গ্রন্থে। মূল ব্যাপারটি ছিল এরকম - [যদুনাথ সরকারের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে]

দ্বিতীয় মুর্শীদ কুলি খাঁর সময় (১৭২৯) জয় করা হয়েছিলো ত্রিপুরা। ২৯ রমজান নবাব এ খবর পেয়ে এতো উল্লসিত হলেন যে, তিনি যেন দুটি ঈদ পালন করছেন।

ঈদের দিন, এ কারণে তিনি মীর সৈয়দ আলী ও মীর মোহম্মদ জামানকে আদেশ দিলেন গরীবদের মধ্যে এক হাজার টাকা বিতরণ করতে। ঢাকা কিল্লা থেকে এক ক্রোশ দূরে ঈদগা যাবার পথে রাস্তায় ছড়ানো হয়েছিলো মুদ্রা।[৭ক]

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, ঈদের দিন যে হৈ চৈ টুকু হতো তা বহিরাগত উচ্চপদধারী বা ধনাঢ্য মুসলমানদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। এ সবের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ছিল যোজনব্যাপী ব্যবধান। আর রইসরাও ঈদের দিন 'পথে প্রচুর পরিমাণ টাকাকড়ি ছড়িয়ে দিতেন' না [একবার দেওয়া হয়েছিলো বিশেষ কারণে]। তবে, কিছু দান-খয়রাত হয়ত করতেন।

এরপর এ শতকের আগের ঈদের বর্ণনা তেমন আর পাই না। তবে, মুঘলরা ঈদের গুরুত্ব দিতেন। তা বোঝা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় [যেমন, ঢাকা, সিলেট] শাহী ঈদগাহের ধ্বংসাবশেষ দেখে। এরকম একটি ঈদগা আছে ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায়, যার কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি।

ধানমণ্ডির ঈদগাহটি মাটি থেকে চার ফুট উঁচু একটি সমতলভূমি। দৈর্ঘ্য এর ২৪৫ ফুট, প্রস্থ ১৩৭ ফুট। বিস্তৃত তিনদিকে। পশ্চিমে ১৫ ফুট উঁচু প্রাচীর, যেখানে রয়েছে মেহরাব বা মিম্বর। পাশ দিয়ে তখন এর বয়ে যেতো পাণ্ডু নদীর একটি শাখা। এই শাখা নদী জা'ফরাবাদে সাতগম্বুজ মসজিদের কাছে মিলিত হতো বুড়ীগঙ্গার সঙ্গে। শাহ সুজা যখন বাংলার সুবাদার তখন তাঁর আমাত্য মীর আবুল কাসেম ১৬৪০ সালে নির্মাণ করেছিলেন ঈদগাহটি। সুবাদার, নাজিম ও অন্যান্য মুঘল কর্মকর্তারা নামাজ পড়তেন এখানে। ইংরেজ আমলে জরাজীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় ছিল ঈদগাহটি। ঐতিহাসিক তায়েশের বিবরণ থেকে জানা যায়, তবুও উনিশ শতকে [খুব সম্ভব শেষের দিকে] শহরের মুসলমানেরা ঈদের নামাজ পড়তেন এই ঈদগাহে এবং এখানে আয়োজন করা হতো একটি মেলার।[৮] অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে, ঈদ উপলক্ষে এখানে হতো মেলা যেখানে যোগ দিতেন শহর ও আশেপাশের এলাকার লোকজন।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, মুঘল আমলে ঈদের দিন ঈদগাহে যেতেন মুঘলরাই, সাধারণ মানুষের স্থান সেখানে ছিল কিনা সন্দেহ। তবে, তায়েশ উল্লিখিত মেলার বর্ণনা থেকে অনুমান করে নিতে পারি, উনিশ শতকের শেষে এবং এ শতকের গোড়ায় ঈদের দিন আনুষঙ্গিক আনন্দ হিসেবে সাধারণ মানুষ যোগ করেছিলেন একটি লোকায়ত উপাদান— মেলা। তায়েশের বর্ণনা ছাড়া [তাও সম্পূর্ণ নয়] মেলার কথা আত্মজীবনীতে অবশ্য তেমন পাওয়া যায় না। বয়োবৃদ্ধদের কাছে শুনেছি, ছেলেবেলায় ঈদ উপলক্ষে তাঁদের কোথাও কোথাও মেলা বসার কথা মনে পড়ে। সম্প্রতি, আশরাফউজ্জামান তাঁর আত্মজীবনীমূলক এক নিবন্ধে এই মেলার কথা উল্লেখ করেছেন। 'ঈদের মেলা হ'ত চকবাজারে এবং রমনা ময়দানে। বাঁশের তৈরি খঞ্চা ডালা আসত নানা রকমের। কাঠের খেলনা, ময়দা এবং ছানার খাবারের দোকান বসতো সুন্দর করে সাজিয়ে। কাবলীর নাচ হ'ত বিকেল বেলা।'[৯] আবদুস সাত্তারও প্রায় একই কথা উল্লেখ করেছেন।[১০] তাঁরা যে সময়ের কথা লিখেছেন তা সম্ভবত ত্রিশ-চল্লিশের দশক।

চকবাজার, কমলাপুরে এখনও হয়ত সেই মেলার রেশ ধরে মেলা বসে।

ঈদ সম্পর্কে যে স্বল্প বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে ধরে নেওয়া যায়, রমজান মাস থেকেই শুরু হতো ঈদের প্রস্তুতি। এ উৎসাহের শুরু হতো রমজানের ঈদের চাঁদ দেখা থেকে। মনে হয়, এটি মুঘল প্রভাবের কারণ এবং তা সীমাবদ্ধ ছিল শহরে বিশেষ করে ঢাকার এবং মফস্বল বা গ্রামের সম্পন্ন বা মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে।

১৯৪৭-এর আগে, বাংলাদেশে একমাত্র ঢাকায়ই ঈদ যা একটু ধুমধামের সঙ্গে পালিত হতো। ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান ও মুঘল শহর। তাই মুঘল ঈদের প্রভাব ছিল বেশি। তা ছাড়া, এখানে থাকতেন নওয়াব ও অন্যান্য মুসলমান ধনাঢ্য ও শরীফ ব্যক্তিরা। ফলে ঈদ পেতো পৃষ্ঠপোষকতা।

ঢাকার উপরের স্তরে যে রীতিনীতি চালু ছিল, তা হলো খোসবাস বা সুখবাস সমাজ প্রভাবিত। হাকিম হাবিবুর রহমান লিখেছেন— 'ঢাকার সমাজ ব্যবস্থা ও তাহযীব-তমুদ্দন মূলত আগ্রারই সমাজব্যবস্থা ও তখনকার তাহযীব-তমুদ্দন। কিন্তু এই সমাজ কাঠামোতে ইরানীদের আধুনিক তমুদ্দন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। এদের মাধ্যমে শিয়া মত সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করেছে। এই ধর্মীয় মতবাদটি অজ্ঞাতসারে উর্দুভাষী সুন্নীদেরকেও প্রভাবিত করেছে।'[১১] উনিশ শতকের শেষার্ধে ও এ শতকের প্রথম দু'তিন দশকের পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্তব্য করেছিলেন হাকিম হাবিবুর রহমান। এর রেশ ঢাকা শহর থেকে এখনও মিলিয়ে যায়নি।

খোসবাস সংস্কৃতির একটি উদাহরণ ছিল ঢাকার ঈদের মিছিল। এ ধরনের মিছিল বাংলাদেশের কোথাও বেরোত না। এ সম্পর্কে, জানা যায় আলম মুসাওয়ারের এক চিত্রমালা থেকে।

আলম মুসাওয়ার নামে এক শিল্পী, খুব সম্ভব উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকার ঈদ ও মুহররম মিছিলের ৩৯টি ছবি এঁকেছিলেন, যা রক্ষিত আছে জাতীয় জাদুঘরে। এ চিত্রমালা দেখলে বোঝা যায়, নবাবী আমলের ঢাকার মুহররম ও ঈদ মিছিলের বর্ণাঢ্য রূপ ও ব্যাপকতা। ছবিগুলো দেখে অনুমান করে নিতে পারি, নায়েব-নাযিমদের বাসস্থান নিমতলি প্রাসাদের ফটক থেকে [বর্তমান এশিয়াটিক সোসাইটির পেছনে] বিভিন্ন পথ ঘুরে, চকবাজার, হুসেনী দালান হয়ে সম্ভবত মিছিল আবার শেষ হতো মূল জায়গায় এসে। মিছিলে থাকতো জমকালো হাওদায় সজ্জিত হাতি, উট, পালকি। সামনের হাতিতে থাকতেন নায়েব নাযিম। কিংখাবের ছাতি হাতে ছাতি বরদার, বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ছিল কাড়া-নাকড়া শিঙা। রঙবেরঙের নিশান মিছিলের রূপ দিতো আরো খুলে। দর্শকরা সারি বেঁধে থাকতেন রাস্তার দু'পাশে,- ছাদে। এঁদের মধ্যে ছিলেন দেশীয়, মুঘল [বহিরাগত], ইংরেজ সাহেব মেম। রাস্তায় রাস্তায় ফকির যেমন ছিল, তেমনি ছিল খেলা দেখানেওয়ালা।

এ মিছিল কবে শুরু হয়েছিলো, তা জানা যায়নি। খুব সম্ভব নায়েব নাযিমরা যখন থেকে নিমতলি প্রাসাদে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন, [অষ্টাদশ শতকে] তখন থেকেই এই মিছিলের শুরু। নওয়াবরা খুব সম্ভব এ মিছিলের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন

ঢাকার বিখ্যাত জন্মাষ্টমী মিছিল থেকে। এবং নিজেদের আধিপত্য ও ঈদে জাঁকজমক দেখাবার জন্য শুরু করেছিলেন তাঁরা এ মিছিল। ঈদের মিছিল আবার কবে ঢাকা থেকে মিলিয়ে গিয়েছিলো, তাও জানা যায় না। খুব সম্ভব উনিশ শতকের মাঝামাঝি ঢাকার নায়েব নাযিমদের বংশ লুপ্ত হয়ে গেলে, সমাপ্তি ঘটেছিলো এ মিছিলের। কারণ, ধনাঢ্যের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত এ ধরনের মিছিল সংগঠিত করা দুরূহ।

এ শতকের বিশ ত্রিশের দশকে ঢাকায় রমজানের শুরুতেই ঘরবাড়ি মসজিদ সব সাফ সুতরো করে রাখা হতো। রমজানের চাঁদ দেখার জন্য বিকেল থেকেই বড় কাটরা, আহসান মঞ্জিল, হুসেনী দালানের ছাদে ভীড় জমে যেতো। 'চাঁদ দেখা মাত্রই চারিদিক হইতে মোবারকবাদ, পরস্পর সালাম বিনিময় এবং গোলাবাজি ও তোপের আওয়াজ হইতে থাকিত'।[১২]

ঢাকার রমজান ও ঈদের বড় আকর্ষণ ছিল খাবার। রোজায় ঘরে অনেক রকম ইফতারি থাকলেও সবাই একবার চকে ছুটে যেতো। চক সেই মুঘল আমল থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য, খাবার দাবার, আড্ডার কেন্দ্র। চকের ইফতারীর কিছু বিবরণ রেখে গেছেন আবু যোহা নূর আহমেদ। খাবারগুলো ছিল— শিরমাল, বাকেরখানি, চাপাতি, নানরুটি, কাকচা কুলিচা, নানখাতাই, শিক কাবাব, হাণ্ডি কাবাব, মাছ ও মাংসের কোফতা, শামী ও টিকা কাবাব, পরোটা, বোগদাদী রুটি, শবরাতি রুটি, মোরগ কাবাব, ফালুদার শরবত ও নানারকম ফল। চক এখনও প্রায় সে ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

ঢাকার তোরাবন্দি খাবার ছিল বিখ্যাত। বিশেষ বিশেষ উৎসবে এর ব্যবস্থা করা হতো। তার মানে ঈদের দিন রইস আদমীরা তোরাবন্দি খাবারের আয়োজন করতেন। এ ধরনের খাবারের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করছি আবু যোহা নূর আহমদের লেখা থেকে '...রইসদের বাড়িতে এইসব খাবার প্রস্তুত হইত। নৌকা বানাইয়া লাল বানাতের নীচে সারি সারি বরতন ও পেয়ালা সাজাইয়া মেহমানদের সামনে এইসব খাবার রাখা হইত। এই খাবারের সারিতে থাকিত চারি প্রকারের রুটি; চারি রকমের পোলা ও চারি রকমের নানরুটি; চারি প্রকারের কাবাব; পানির বোরানি চাটনি অর্থাৎ প্রত্যেক পদের খাবার; চারি পদের থাকিত। মোট চব্বিশ পদের নীচে থাকিত না।'[১৩]

ঈদ-উল-ফিতর যেমন বাংলাদেশের বড় কোন ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়নি, তেমনি পালিত হয়নি ঈদ-উল-আজহাও। না হওয়ার একটি কারণ উনিশ শতকে সম্প্রদায়গত বিরোধ। আজকে আমরা যে ধুমধামে ঈদ-উল-আজহা পালন করি, তা চল্লিশ/পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস মাত্র। সারা বাংলাদেশে, বিরোধ যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলো, সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য আছে, নেই শুধু ঢাকা শহর সম্পর্কে। তবে, উনিশ শতকের শেষার্ধে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে যখন গরু কোরবানী নিয়ে প্রবল বিতর্ক ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিলো, তখন ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সারস্বতপত্র' [গোঁড়া হিন্দুদের মুখপত্র] লিখেছিলো [১৮৮৩] –

এটা সত্যি যে ঢাকার সমাজের অনেক ত্রুটি ও দুর্নাম আছে। কিন্তু এখন যখন দেখি গরু কোরবানী নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন চলছে সে সময় ঢাকা এসব থেকে

মুক্ত। ঢাকার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে নিখুঁত ভালো সম্পর্কই বিদ্যমান। উভয়ে উভয়ের ধর্মীয় উৎসবাদিতে যোগ দেয় এবং কেউ কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিতে চায় না। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের উচিত ঢাকাকে অনুসরণ করা।[১৪]

মুহররম

বাংলাদেশে তো মুহররমের জাঁকজমক হওয়ার কথা ছিল না। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সুন্নী, মুহররমের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক ক্ষীণ। যাঁরা গোঁড়া সুন্নী, তাঁদের কাছে মুহররমের অনেক আচার পৌত্তলিকতার শামিল, যদিও শিয়ারাও মুসলমান। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এ শতকের ষাটদশক পর্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়েছে মুহররম, এখনও যার রেশ বিদ্যমান।

সুন্নীরা বিশ্বাস করেন এক আল্লা ও শেষ পয়গম্বর হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এ। শিয়ারাও যে তা অবিশ্বাস করেন, তা নয় কিন্তু তাঁরা এও বিশ্বাস করেন যে হজরত আলী ও তাঁর দুই পুত্র হাসান হোসেনের মধ্যেও পড়েছে 'ঐশ্বরিক প্রচ্ছায়া।' তাঁরা বিশ্বাস করেন ইমামতন্ত্রে। আয়াতউল্লাহ খোমেনী তাই শিয়াদের কাছে ইমামতো বটেই 'রুহুল্লাহ'ও, যার অর্থ 'ঈশ্বরের আত্মা'। ইসলাম তো বটেই, সুন্নীদের কাছে এ ব্যাখ্যা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। সম্প্রতি প্রকাশিত, 'ইসলামী পার্বণের সামাজিক নৃতত্ত্ব' প্রবন্ধে বাহারউদ্দিন যা লিখেছেন, তা যুক্তিযুক্ত—

'প্রাচীন ইরানীরা বিশ্বাস করত, রাজার মধ্যেই বিকশিত হন ঈশ্বর। রাজাই ঈশ্বরের মানবিক বিকাশ। অতএব রাজার সামনে অবনত হওয়া, তাঁর প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলা প্রতিটি প্রজারই কর্তব্য। রাজাই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অবতার। প্রাচীন ইরানের এই অবতার তত্ত্ব নির্মূল করতে পারেনি ইসলাম। বরং ইসলামিক বিশ্বাসেই ইরানী অবতারতত্ত্বকে চাপিয়ে দে'ওয়া হয় শিয়া মতবাদের মাধ্যমে। ...ইমাম তত্ত্বেই আশ্রয় নিল অবতার তত্ত্ব। বংশ পরম্পরায় ইমামই শিয়াদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা। একমাত্র তাঁর সাহায্যেই মুক্তি পেতে পারেন বিশ্বাসীরা। এই ইমামতন্ত্রের জোরেই ৭৯ সালের রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে ইমাম শাসিত কঠোর শিয়া ইসলাম প্রবর্তিত হয় ইরানে।'[১৫]

শিয়া মতবাদ গড়ে উঠেছিলো ইরাকে, কারণ, হোসেন শহীদ হয়েছিলেন সেখানে। আদি শিয়ারা তাই ইরাকী ও আরব বংশজাত। ঐ সময় সে সব অঞ্চলে এ্যাডোনিস তামুজ পূজোর ছিল ব্যাপক প্রচলন। প্রবল তাপে, পানি না পেয়ে মৃত্যু হয়েছিলো দেবতার। দেবতার শব নিয়ে তাই বের করা হতো মিছিল। এ্যাডোনিস তামুজ পূজো পদ্ধতির সঙ্গে মিল আছে মুহররমের আচার অনুষ্ঠানের। ৯৬২ খ্রীঃ প্রথম পালিত হয়েছিলো মুহররম এবং তার দুশো বছর পরও আরমেনিয়া, খুজিস্তান ইরাকের আশেপাশে প্রচলিত ছিল এ্যাডোনিস তামুজের পূজো।[১৬]

পশ্চিম এশিয়া, বিশেষ করে সিরিয়া ও ইরাকে গ্রীক চার্চের প্রভাব ছিল এ সময়।

যীশুকে তাঁরা দেখেন এমন একজন মহাপুরুষ হিসেবে, যিনি মানুষের পাপের ভার নিজের কাঁধে নিয়ে, মানব মুক্তির জন্যে শহীদ হয়েছিলেন। 'গ্রীক চার্চের বিশ্বাসে হোসেনের আত্মবলি সংক্রান্ত জন-বিশ্বাস প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে।'[১৭]

মুহররম পালিত হয় প্রবলভাবে ইরান, সিরিয়া, ইরাক, লেবাননে। এবং সেটার স্বাভাবিক কারণ, সেখানে শিয়া সম্প্রদায়ের আধিপত্য বেশি। এসব এলাকার শিয়া-বিশ্বাস বা মুহররম সংক্রান্ত আচারবিধি প্রভাবিত করেছে লোক ও বিভিন্ন কাল্টের বিশ্বাস।

ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে - বিশেষ করে হুগলী, মুর্শিদাবাদ, ঢাকায় এক সময় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শিয়া মতবাদ বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তবে এখানে বলে রাখা ভালো, মুঘল সম্রাটরা ছিলেন সুন্নী এবং সুন্নী মতবাদকেই করেছিলেন তাঁরা উৎসাহিত। প্রকাশ্যে শিয়া মতবাদকে তাঁরা উৎসাহিত করেননি। আওরঙ্গজেব এদের বলতেন 'বিধর্মী', 'অধার্মিক'। তুর্কী এবং পাঠান সুলতানদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। সম্রাট শাহজাহান, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, শাহ সুজার সুবাদারী আমলে বাংলায় শিয়ারা আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন। সুজা নিজে সহানুভূতিশীল ছিলেন শিয়াদের প্রতি। এবং তাঁর আমলে, প্রধানতঃ ইরান থেকে অনেক শিয়া পরিবার ভাগ্যান্বেষণে চলে এসেছিলেন বাংলায়। তাঁরা লাভ করেছিলেন বিভিন্ন রাজপদ, ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্জন করেছিলেন বিত্ত এবং নিজেদের উন্নীত করতে পেরেছিলেন অভিজাত পর্যায়ে। বাংলার নায়েব নাজিমরা ছিলেন শিয়া। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে শিয়া আধিপত্য হয়ে উঠেছিলো প্রবল- ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলীতে।[১৮] ইমামবাড়ি নির্মিত হয়েছিলো বিভিন্ন জায়গায়।

বাংলদেশে ঢাকা ছিল মুহররম পালনের প্রধান কেন্দ্র। কারণ ঢাকা ছিল নায়েব নাযিমদের বাসস্থান। প্রশাসনিক কেন্দ্র। হাকিম হাবিবুর রহমান লিখেছেন 'ঢাকার জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি মূলত আগ্রারই জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি। কিন্তু এই কাঠামোর উপর ইরানীদের আংশিক ও সজীব সংস্কৃতি অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছে।'[১৯]

তিনি অবশ্য, আঠারো উনিশ শতকে বসবাসরত উচ্চবর্গের প্রসঙ্গেই এ মন্তব্য করেছিলেন।

বাংলাদেশে মুহররমের প্রচলন হয়েছিলো কবে? নির্দিষ্ট সময় অবশ্য বলা যাবে না। ধরে নিতে পারি, মুঘল আমলে, সতের শতকে বাংলাদেশে প্রচলন হয়েছিলো মুহররমের, বিশেষ করে ঢাকায়। গ্রামাঞ্চলেও হয়ত তখন কোথাও কোথাও তা পালিত হতো। তবে মনে হয়, গ্রামাঞ্চলে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো উনিশ শতকে। যদিও মুহররম শোকের মাস, মুহররম মানেই আমাদের মনে হয় বিবাদ, কিন্তু বাংলাদেশে তা রূপান্তরিত হয়েছে উৎসবে যদিও এর ভিত্তি বিষাদ। মুহররম নিয়ে গ্রামাঞ্চলে রচিত হয়েছে পুঁথি। এমনি সময় তো বটেই, মুহররমের মাসে তা সুর করে পড়া হয় নিয়মিত। তবে মনে হয় মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' [১৮৮৫-৯১]। প্রকাশের পর বাংলাদেশে নতুন মাত্রা পেয়েছিলো মুহররম।

আগেই উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশে যে মুহররম পালিত হতো বা হয়, তার প্রবর্তক প্রধানত ইরানের শিয়ারা। কিন্তু, আচার অনুষ্ঠানে কালক্রমে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন এখানকার হিন্দু ও লোকায়ত নানা আচার-বিধি, যা আবার এ অনুষ্ঠানকে দিয়েছিলো আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। যেমন, জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, ভারতীয় মুহররমের মিছিলে শবযান থাকে দু'টি পারস্য বা ইরানে একটি। বাঙালী মুসলমান বিশ্বাস করেন, আলীর দুই ছেলেই শাহাদত বরণ করেছিলেন একই দিনে [হয়ত এ কারণেই বলা হয় 'হায় হাসান! হায় হোসেন।'] এবং আশুরার দিন রোজা রাখা হয় তাদের দুজনের স্মৃতিরই সম্মানে। কিন্তু আসল ঘটনা তো তা নয়। হাসানকে বিষপানে হত্যা করা হয়েছিলো মদীনায় ৬৭০ খৃস্টাব্দে। আর হোসেন শাহাদত বরণ করেছিলেন কারবালায় ৬৮০ খৃস্টাব্দে।[২০]

এখানে বলে রাখা ভালো, মুহররম শিয়াদের উৎসব হলেও সব সম্প্রদায়ের লোকজনই তাতে অংশগ্রহণ করতেন। শিয়ারা ধর্মীয় কারণে, অন্যেরা জাঁকজমক বা আনন্দের জন্য, কিন্তু তা অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে নয়। কারণ, আগেই উল্লেখ করেছি, ধর্ম নিয়ে সাধারণের তেমন কোন জ্ঞানও ছিল না, ছিল না ঔৎসুক্যও।

শুরু থেকেই ঢাকা ছিল মুহররম পালনের কেন্দ্র। কারণটিও স্বাভাবিক, মুঘল আমলে ঢাকায় আধিপত্য ছিল শিয়াদের। তাছাড়া ঢাকা ছিল নায়েব নাযিমদের বাসস্থান।

ঢাকায় মুহররম উৎসবের কেন্দ্র ছিল [এবং এখনও] শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামবাড়ি— হুসেনী দালান। আগেই বলেছি, ঢাকায় কবে থেকে মুহররম পালিত হচ্ছে তা জানা যায়নি। তবে, অধ্যাপক দানী জানিয়েছেন, জনশ্রুতি অনুযায়ী ঢাকায় সন্ধান পাওয়া গেছে বেশ কিছু ইমামবাড়ার এবং তা থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়, প্রাচীনকাল থেকেই ঢাকায় বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হতো মুহররম।[২১] এ শতকের ষাট দশক পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল এখন যা প্রায় লুপ্ত।

আজিমুশশান উল্লেখ করেছেন ঢাকার সবচেয়ে পুরনো ইমামবাড়া ছিল ফরাশগঞ্জের বিবি কা রওজা মহল্লায়। জনৈক আমীর খান তা নির্মাণ করেছিলেন ১৬০০ সালে অর্থাৎ ঢাকায় ইসলাম খাঁর রাজধানী স্থাপনের আগে। আজিমুশশান এ তারিখের ভিত্তি উল্লেখ করেননি। ফলে এটি মেনে নেওয়া মুশকিল। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, ১৮৬১ সালে জনৈক ফার্সী আর এম, দোসানজী এটি আবার সংস্কার করেছিলেন।[২২] ফার্সীর সঙ্গে শিয়াদের সম্পর্ক খুব নিকটের বলে মনে হয় না।

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছেও ছিল একটি ইমামবাড়া [হুসেনী দালান]। ১৮৬৯ সালের ঢাকার মানচিত্রে একে উল্লেখ করা হয়েছে পুরনো হুসেনী দালান বলে। ফুলবাড়িয়ার কাছে ছিল মীর ইয়াকুবের হুসেনী দালান। আর দুটো পুরনো হুসেনী দালান ছিল ছোট কাটরা এবং মুকিম কাটরায়।[২৩]

বর্তমান যে হুসেনী দালানটি আমাদের কাছে পরিচিত, তার তারিখ নিয়েও বিতর্ক আছে। সমস্ত যুক্তি বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে, সুবাদার মুহাম্মদ আজমের সময় মীর মুরাদ বর্তমান হুসেনী দালানের জায়গায় একটি ইমামবাড়া নির্মাণ করেছিলেন।

তিনি ছিলেন নওয়ারা মহলের দারোগা ও অট্টালিকাসমূহের তত্ত্বাবধায়ক। মীর মুরাদ মুহররমের সময় দুঃখীদের এখানে অন্নদান করতেন। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে, নায়েব নাযিম জেসারত খান পুনর্বার হুসেনী দালানটি নির্মাণ করেছিলেন। হতে পারে, মীর মুরাদের ইমামবাড়াটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিলো। তাই সেটি ভেঙ্গে জেসারত খান পুনর্নির্মাণ করেছিলেন ইমামবাড়াটি, যা বর্তমানের হুসেনী দালান। টেলর জানিয়েছেন, ঢাকার নায়েব নাযিম বছরে আড়াই হাজার টাকা পেতেন মুহররমের সময় হুসেনী দালানে উৎসব পালনের জন্য।[২৪]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নিমতলি প্রাসাদ থেকে হুসেনী দালান দূরে নয়; নায়েব নাযিমরা হয়ত সেখানে প্রায়ই যেতেন, তত্ত্বাবধান করতেন। ঢাকার শিয়াদের ওপর স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের কর্তৃত্ব ছিল। নওয়াব নুসরাত জং, নওয়াব শামসুদ্দৌলা, নওয়াব কামরুদ্দৌলা ও নওয়াব নাজমৌদৌলার কবরও এখানে। এসব কিছু মিলিয়ে, উনিশ শতকের বর্তমান হুসেনী দালানই শিয়া সম্প্রদায়ের উপাসনার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলো।

নায়েব নাযিমের বংশ লুপ্ত হলে, ঢাকার নতুন নবাব পরিবার [খাজা আলিমুল্লাহর পরিবার] হুসেনী দালানের মোতওয়াল্লি নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২৫] ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে বর্তমান দালানটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে নওয়াব আহসানউল্লাহ তা আবার সংস্কার করে দিয়েছিলেন।

ঢাকার মুহররম পালন সম্পর্কিত সবচেয়ে পুরনো যে সংবাদটি যোগাড় করতে পেরেছি তা ১৮৫০ সালের। ঢাকা থেকে জনৈক ভ্রমণকারী ১৮৫০ সালে কলকাতার 'রস সাগর' পত্রিকায় মুহররমের একটি বর্ণনা পাঠিয়েছিলেন, যা উদ্ধৃত করা হয়েছিলো, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এ। এখানে বিবরণটি তুলে দিচ্ছি ঢাকার মুহররম উৎসব সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়ার জন্যে---

'মুসলমানের মহররম পর্ব্ব। সর্ব্বত্রে প্রচার আছে মুরশিদাবাদে এবং ঢাকায় আশুরায় মহাসমারোহ হয়, অতএব আমি উক্ত পর্ব্বে এখানে যাহা ২ দেখিয়াছি সংক্ষেপে লিখি বিদিত হইবেন, হোসেন দেওয়ালাখ্যা চতুর্দ্দিগ প্রাচীরবদ্ধ এক মনোহর আলয় আছে, উক্ত বাটী নবাবের বাটীর দূরবর্ত্তী আমি কতিপয় বন্ধুর সহিত উক্ত মসজিদে বৈকালে দেখিলাম বেগম বাজার হইতে হোসনী দালান পর্যন্ত রাজমার্গে দুই পার্শ্বে অসংখ্য দিন-দরিদ্র অন্ধ পঙ্গুদুঃখী লোকেরা সম্মুখে বস্ত্র বিস্তার করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, তাবৎ মুসলমানেরা মসজিদ ইহতে প্রত্যাগমনকালে চাউল, কড়ি, পয়সা যাহার যাহাছেনচ্ছা বাঙ্গালিদিগের সম্মুখস্থ বস্ত্রচয়ে নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছে, পরন্তু ঐ অপূর্ব্ব পুরী মধ্যে গিয়া দেখিলাম প্রায় সহস্রত্রয় মেঠাই ইত্যাদির দোকান বসিয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যস্থিত সরোবরের দক্ষিণ দিগে ভদ্রলোকের বসিবার জন্য ধাপার কুতঘরের ন্যায় তক্তা দ্বারা পাটাতন করা উচ্চ ঘর সুচারু আসনাদিতে সজ্জীভূত দেখিলাম। আমরা পূর্ব্বশ্রুত ছিলাম পাদুকা লইয়া হোসেনী দালানে যাইতে নিষেধ, কিন্তু আমরা পাদুকা সহিত ঐ মসজিদে প্রবিষ্ট হওয়াতেও কেহ কিছু বলিলেন না। গৃহ

মধ্যে দেখিলাম বহুমূলের এক সিংহাসন স্থাপিত রহিয়াছে এবং তাহার নিকট স্বর্ণ বিনির্ম্মিত মহম্মদীয় ধর্মানুসারে দ্রব্যাদি রহিয়াছে, তাতে আরবী ভাষায় কোরানের কয়েক পদ লেখা আছে। ঐ সিংহাসনের নিকট সকলে সরায় করিয়া সিন্নি দিতেছেন। হোসেনী দেওয়ালের পূর্ব্বদিগে নবাব নুসরত জঙ্গ বাহাদুরের কবর। লোকে ঐ কবরের নিকটেও সিন্নি দিতেছে। রজনীযোগে ঐ ধামে বহুমূল্যে ঝাড়াদিতে আলোকময় হয় এবং মোল্লারা মরচি আদিদ গীত করে, হোসেনী দেওয়ালে মহররমের কয়েক দিবস এ রূপ নানা কাণ্ড দেখা যায় এবং তোপগস্তের দিবস বহু সংখ্যক পতাকা, হাতি ঘোড়া প্রভৃতি লইয়া মান্য ২ মোগলেরা চকের চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া পুন উক্ত মসজিদে গমন করেন, শেষ দিবস পিরখানার দিনের সকল কারবোলায় [আজিমপুরে?] যান এবং তথ্যা উপলক্ষে অতিশয় জনতা হয়। এবং উক্ত নসরত জঙ্গের গোরের কথা যে উল্লেখ করিলাম তাহার নিকট অনেক লোকে অনেক মানতা করে অর্থাৎ যদি কাহার কাঁঠাল বৃক্ষ ফলবান না হয় সে আসিয়া তথায় বলে 'নবাব সাহেব আমার গাছে কাঁঠাল হইলে প্রথম ফলটি আপনাকে দিব।'[২৬]

দ্বিতীয় বর্ণনাটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৬৬ সালে, ঢাকার সাপ্তাহিক পত্রিকা '*ঢাকা প্রকাশ*'-এ। এখানে সেটিও উদ্ধৃত করছি—

'এখানে হোসেনী দালান নামক একটা প্রাচীন দালান আছে। ইহা মুসলমানদিগের মহরম পর্ব্বানুষ্ঠানের প্রধান স্থান। মহররমের সময় ঢাল তরবার এবং অন্য নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা ইহার মধ্যভাগ উত্তমরূপে সুসজ্জিত করা হইয়া থাকে। এবং দালানের প্রাচীরের কোন কোন স্থল কৃষ্ণ বস্ত্রে আবৃত অথবা মসী দ্বারা রঞ্জিত করা হয়।... মহরমের সময় হোসেনী দালানের চারদিকে একটা বাজার বসিয়া যায়। যতদিন ১০ম দিবস অতীত না হয়, ততদিন রাত্রি-দিনের মধ্যে প্রায় এবং মুহূর্তকালও বাজার অবরুদ্ধ হয় না। যখন যাও, তখনি ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, দেখিতে পাইবে। রাত্রিকালে হোসেনী দালান আলোক-মালায় বিলক্ষণ সুশোভিত করা হয়। হিন্দুদিগের চৈত্রোৎসব নিকটবর্তী হইলে অনেক সামান্য লোকে যেমন ভজন শিক্ষা করিয়া থাকে, অত্রত মুসলমানরাও তেমন মহরমের সময় নিকটবর্তী হইলে 'ইয়া হোসেন' বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে অভ্যাস করে।...জারী গানের চীৎকার ধ্বনি এবং করাঘাতের দুপদাপ শব্দে মুহূর্তের মধ্যে কণ্ঠ বধির প্রায় হইয়া উঠে। ইহাদিগের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের অভাব থাকে না। ...৭ম দিবস পর্যন্ত এইরূপ ধুমধাম চলিতে থাকে। ৮ম দিবস তোপগস্তের দিন। এই দিবস সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে হোসেনী দালান হইতে একটা মিছিল বাহির হয়। মিছিলের অগ্রভাগ কয়েকটি হস্তী এবং কতকগুলি পতাকা দ্বারা সুশোভিত করা হয়। পতাকাধারীর পশ্চাৎভাগে কতকগুলি বাদ্যকর থাকে। তৎপশ্চাতে কয়েক ব্যক্তি লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং তরবারী চালাইতে চালাইতে চলে। তৎপর দুইখানি *শিবিকা দৃষ্ট হয়। শিবিকার পশ্চাৎভাগে কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য শোক প্রকাশ* করিতে করিতে যায়। তৎপর একদল গাথক একটি শোকসূচক গান গাইতে গাইতে দর্শন পথে উপস্থিত হয়। অনন্তর একটি সুসজ্জিত অশ্বে হোসেনের কৃত্রিম শব লইয়া

যাওয়া হয়। শবের চারদিকেই বীজন হইতে থাকে। এতৎপশ্চাতের একটা আহত অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়।...সর্বশেষে কয়েকজন মোদ্দল [মোগল?] শোকসূচক কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া আরব্য ভাষার একটি গান গাহিতে এবং বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে যাইতে থাকে। নবম দিবস রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত চকের মাঠে ষষ্ঠি ক্রীড়া ইত্যাদি হইয়া থাকে। ১০ দিবসে ঢাকার পশ্চিম ভাগে একটা কল্পিত কারবালার ময়দানে তাজিয়াসহ গমন করিয়া মহরম পর্ব শেষ হইয়া যায়।

....আমরা কোন কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিলাম অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, কায়েতটুলি প্রভৃতি স্থানবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে মহরমের সময় মুসলমানদিগের ন্যায় উপবাসাদি করিয়া থাকে। এবং কেহ কেহ মৎস্য আহার করে না।'[২৭]

আলম মুসাওয়ার নামে এক শিল্পীর ঢাকায় ঈদ ও মুহররম মিছিলের ৩৯টি ছবির কথাতো আগেই উল্লেখ করেছি। এ চিত্রমালা দেখলে বোঝা যায় নবাবী আমলের ঢাকার মুহররম [ও ঈদ] মিছিলের বর্ণাঢ্য রূপ, ব্যাপকতা। সেখানে হুসেনী দালানের একটি ছবিতে দেখা যায়, হুসেনী দালানকে সাজানো হয়েছে। এর চত্বরে বসেছে মেলা। সেখানে হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকই আছেন।

সবশেষে হাকিম আহ্সানের একটি বর্ণনা তুলে দিচ্ছি। এ বর্ণনা এ শতকের প্রথমার্ধের। 'জাদু' পত্রিকায় প্রকাশিত এ বর্ণনাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন দানী।—

'মুহররমের চাঁদ দেখার পরই শুরু হয় মুহররমের অনুষ্ঠান। চাঁদ দেখার রাত থেকেই হুসেনী দালানের নহবৎখানা থেকে শুরু হয় নহবৎ বাজানো। মজলিসও শুরু হয় ঐ সময় থেকে। প্রথম তিন রাত হুসেনী দালানের প্রাচীরে জ্বালানো হয় অসংখ্য মোমবাতি। অনুষ্ঠান জমে ওঠে চতুর্থ দিন থেকে। ভাটিয়ালি মার্সিয়া [ভাটিয়ালির সুরে শোকগাথা] শোনার জন্য হুসেনী দালানের বারান্দা ওঠে ভরে। গানের জন্য বিশটি মহল্লকে 'হাদি' ও 'গিরওয়া' নামে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এক পক্ষ গান করে প্রশ্ন রাখে, অন্য পক্ষ গানের মাধ্যমে তার উত্তর দেয়। মার্সিয়া গায়করা দলবেঁধে আসে, প্রতি দলের সামনে থাকে নিশান, যা পরিচিত অরণি নামে। ষষ্ঠ ও সপ্তম দিন পোড়ানো হয় বিভিন্ন মহল্লায় আতশবাজী। মার্সিয়াতে সুন্নী, শিয়া দু'সম্প্রদায়ই যোগ দেয়।

' মুহররমের পঞ্চম দিন ভিস্তিরা মিছিল করে বের হয় রাস্তায়। তারা সুন্নী। তাদের পরনে বিশেষ ধরনের পোশাক— সবুজ লুঙ্গী, সবুজ শার্ট, মাথায় পাগড়ী, গলায় 'কাফনী' [কাফনের কাপড়] কব্জীতে ও গলায় সোনালী তাগা। এক হাতে তাদের পানির গ্লাস, সঙ্গে পানির পাত্র, অন্য হাতে চিত্রিত লাঠি, পা খালি।

ষষ্ঠ দিন ভিস্তিরা হোসেনী দালানে গিয়ে তাদের লাঠিগুলি মাঠে কাঁচির মতো রেখে দেয়। লাঠির নীচে জ্বলে মোমবাতি এবং তারপর হাজার হাজার মানুষকে বিলানো হয় নিয়াজ।

সপ্তম দিন হচ্ছে 'জলুস' [মিছিল]। ঐদিন হুসেনী দালান সাজানো হয় আলো

দিয়ে। অষ্টম দিন আশেপাশের গ্রাম থেকে মহিলারা আসেন জারি গাইতে। অপরাহ্ণে এ জারি গাওয়া হয় দেখে এর নাম 'দুপহরিয়া মাতম'। এ সময় পুরুষেরা ত্যাগ করে হুসেনী দালান। বিকেলে হুসেনী দালান থেকে বের হয় বিশাল মিছিল। যার নাম 'তুগ-গাস্ত' [তুর্কী শব্দ তুগ মানে পতাকা; গাস্ত মানে ঘুরে বেড়ানো]। বকশীবাজার, উর্দু রোড, বেগম বাজার, দেওয়ান বাজার হয়ে তা এসে পৌঁছে চকে। মিছিলের বরদার থাকে কয়েকটি আখড়া {অর্থাৎ আখড়ার সদস্য] তারপর আমল বরদার [পতাকাবাহী]। এরপর নিশান নিয়ে হাতি। হাতির পর ঘোড়া। ঘোড়ার সঙ্গে থাকে আশাবরদার [লাঠিয়াল] তারপর গানের দল। প্রথমে মহল্লার কোন এক দল-যারা শোকের সুর বাজায়। এর পর ঘোড়ার পিঠে 'নহবৎ' তারপর বাদকদল, সবশেষে একটি ডংকা। ডংকার পর জোড়া জোড়া 'বিবি কা দোলা'। পালকিগুলি মোড়া থাকে কালো কাপড়ে। পালকির সঙ্গে পয়সা বিলোবার জন্য থাকে লোক। দোলার দু'দিকে সরদারদের নেতৃত্বের মাঝে মাঝে শ্লোগান দিতে দিতে যায় ভিস্তিরা। আগে দোলাগুলি নেয়া হত উঠের পিঠে করে। দোলা যখনই যায়, তখনই দুধারের লোক দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। দোলার পর 'দুলদুল'কে নিয়ে কালো অথবা সবুজ পোশাক পরা শোকাহত জনতার মিছিল। সবশেষে থাকে একটি হাতি ও দু'জন ঢোল বাদক।

নবম দিনে অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেলে। ঐ দিন বিবি কা রওজা থেকে বের হয় মিছিল। রাত এগারোটায় চক হয়ে ওঠে জনাকীর্ণ, বিভিন্ন আখড়ার কলাকৌশল দেখতে। আখড়ার মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় রাত তিনটায়। আবার 'তুগ-গাস্ত'-এর মত মিছিল করে সবাই ফিরে যায় হুসেনী দালানে।

আশুরার দিন আজিমপুরে বসে বিরাট মেলা, তা এখনও লুপ্ত হয়ে যায় নি। বিভিন্ন ইমামবাড়া থেকে ঐদিন তাজিয়া নিয়ে মিছিল করে সবাই আসে আজিমপুরের কাছে হাসনাবাদে। সেখানে তাজিয়াগুলি বিসর্জন দেওয়া হয়, কিন্তু অন্যান্য প্রতীক কবরগুলি কালো কাপড়ে ঢেকে নিঃশব্দে নিয়ে আসা হয় হোসেনী দালানে। এভাবেই মুহররম পর্ব শেষ হয়।'[২৮]

কবি শামসুর রাহমান ছোটদের জন্য লেখা তাঁর আত্মজীবনীতে মুহররম ও মুহররম মিছিলের দীর্ঘ বর্ণনা দিতে ভোলেন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন চল্লিশের দশকের মুহররম মিছিলের কথা— 'মুহররমের মিছিল সবচেয়ে ভালো লাগতো চকে। মাঝরাতের মিছিল। নানীর সঙ্গে যেতাম চকবাজারের একটা বাড়িতে রাত্তিরে মিছিল দেখবো বলে। নানী বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন আর আমি মিছিলের জন্যে অপেক্ষা করে ঝিমুতাম। কখন ঘুমপাড়ানী মাসিপিসী তাদের রূপালী সোনালী পাখা দুলিয়ে সবচেয়ে মিষ্টি এক সুরে গান গাইতে গাইতে হাজির হতেন চকের সেই বাড়িটার আঁধার ভরা বারান্দায়, টের পেতাম না। ....একটু পরেই চোখের সামনে ঝলমলে মিছিল। আলম বরদার, আশা বরদার, কালো কাপড়ে ঢাকা বিবি কা দোলা— একে একে সবকিছু চোখের সামনে। আমার চোখ লুট করতে শুরু করে সিল্কের নিশান, লাঠির ঠোকাঠুকি, তলোয়ারের ঝলসানি, আগুনের চরকি। ফাঁকে ফাঁকে শোনা

যায় তেস্তাদের 'এক নারা, দোনারা, বোলো বোলো ভে-স্তা।

চোখ জুড়িয়ে যেত লাঠি ঘোরানোর কায়দা দেখে, আগুনের চরকির খেলা দেখে। মনে হতো, যদি আমিও ফুরফুরে বাতাসে দু'লে ওঠা ঐ সুন্দর সিল্কের রঙ্গিন নিশান নিয়ে ভেস্তাদের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিতে পারতাম। লোভে নতুন পয়সার মতো চকচকিয়ে উঠতো আমার চোখ দুটো। ঐতো চলছে কাগজের কবর। আর চলেছে দুলদুল ঘোড়া। দেখি, ওর তীর বেঁধা গায়ে একটা চাদর, চাদরে নকল রক্তের ছোপ। আর দেখি সিল্কের রঙ্গিন নিশানের ঝাঁক। ঝিলমিল ঝিলমিল, নীল, লাল, সবুজ, হলদে হরেক রকম। দেখি ভেস্তার দল। পরনে টিয়ের ডানার রঙ্গের মতো সবুজ লুঙ্গি, সবুজ কুর্তা। খালি পা। হাতে রূপালী তারের কাঁকনের মতো কী যেন একটা। দূর থেকে মনে হয়, তারা জ্বলছে ওদের কব্জিতে। আর শুনি ভেস্তার দল বলছে : 'একনারা, দো নারা, বোলো বোলো ভে-স্তা।'[২৯]

মুহররমে ঢাকার ভিস্তিদের বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে গেছেন ঢাকার পঞ্চায়েতের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক খান মোহম্মদ আজমও। তিনি বর্ণনা করছেন, মুহররমের সময় ঢাকার অনেক হিন্দু ও মুসলমান [সুন্নী ও অন্যান্য সম্প্রদায়] ভিস্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এবং প্রাচীনকাল থেকেই মুহররমের দশদিন ভিস্তিরা নিজেদের সাময়িক পঞ্চায়েত গঠন করে। তখন এর প্রধান সর্দারকে বলা হয় নওয়াব ভেস্তা।[৩০]

সম্প্রতি বাংলা একাডেমীর ফোকলোর বিভাগের কর্মীরা ঢাকার মুহররম পালন সম্পর্কে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একটি বিবরণ তৈরি করেছেন। এর সময়কাল এ শতকের ত্রিশের দশক। পূর্বে উল্লিখিত হাকিম আহসানের বিবরণের সঙ্গে দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া এ বিবরণের তেমন কোন তফাৎ নেই। বাংলা একাডেমীর বিবরণে যে নতুন তথ্যগুলি পাই, সেগুলি তুলে ধরছি— 'হোসেনী দালানের সামনের চত্বরে পাঁচই মুহররম থেকে নয়ই মুহররম পর্যন্ত প্রতি রাতেই অনুষ্ঠিত হতো মাড়োয়া সম্প্রদায়ের বাঁশের ঝাড়ি পিটান নাচ-এর মাতম। আর দক্ষিণ দিকের পুকুরের পাশে হতো মহল্লার কবিয়ালদের ভাটিয়াল জারী গানের প্রতিযোগিতা। ভাটিয়াল জারী বা শোকজারী শোকানুষ্ঠান হলেও শেষ পর্যায়ে মহল্লা মহল্লায় এ প্রতিযোগিতা অনেকটা কবি গানের মতো হয়ে যেতো। দক্ষিণের পুকুরটির মাঝে পাঁচটি পিলার দিয়ে সে পিলারের উপর প্রতিরাতেই অসংখ্য মোম জ্বালিয়ে দেয়া হতো।...হুসেনী দালানের সামনের চত্বরে এগার ও বারোই মুহররম সম্মিলিত অসংখ্য মহিলারা মর্সিয়া ও মাতমখানি করতেন। এ সময়ে হুসেনী দালান চত্বরে পুরুষদের প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। অপর দিকে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও অচ্ছুত সম্প্রদায়ের লোকজন মুহররম উপলক্ষে কাঠ, বাঁশ ও রঙ্গিন কাগজে সজ্জিত বিরাট তাজিয়া বহন করে হুসেনী দালানে এসে উৎসর্গ করে যেতো।'[৩১]

বর্তমানে ঢাকা শহরে, হোসেনী দালান ও বিভিন্ন মহল্লার [পনেরটি] ইমামবাড়ায় সেই প্রথামত মুহররম পালিত হয়। তবে, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের সামান্য কিছু পরিবর্তন এসেছে মাত্র। কিছু আচার-অনুষ্ঠান লুপ্ত হয়েছে, আর ১৮৪৭-এর

শিয়া মুহাজেরদের কারণে নতুন কিছু সংযোজিত হয়েছে। তবে, মুহররমে দশ দিনের মূল আচার-অনুষ্ঠানে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি।

ঢাকার মুহররম অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল মিছিল ও মেলা। মিছিল অনুষ্ঠানের চল নির্দিষ্ট কবে থেকে, তা জানা না থাকলেও, অনুমান করে নিতে পারি, মুঘল আমলে অষ্টাদশ শতকে এটি শুরু হয়েছিলো। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধেও মিছিলের যে জাঁকজমক ছিল [ষাটের দশকেও যা আমি নিজে দেখেছি] বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে ক্রমে তা হ্রাস পেয়েছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত উল্লিখিত ঢাকার এই 'দ্বিতীয় ব্যাপক উৎসব' এ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত চালু ছিল।[৩২] কিন্তু তা যেন ছিল মূল মিছিলের কংকাল। এখন মূল যে মিছিল বের হয়, তা সকালে শুরু হয় হুসেনী দালান থেকে। সেখান থেকে বকশীবাজার, আজিমপুর পুরানা পল্টন হয়ে বিকেলে ধানমণ্ডির ঝিলে গিয়ে শেষ হয়। তাজিয়া বিসর্জন করা হয় কারবালার ঝিলে। [পুরানা পল্টন লাইনের কাছে, এখন সে ঝিল আর নেই]। ঢাকার মুহররমের একটি প্রধান আকর্ষণ মেলা। মুহররম উপলক্ষে মেলা বসে হুসেনী দালান, বকশীবাজার, ফরাসগঞ্জ ও আজিমপুরে। এর মধ্যে আজিমপুরের মেলাটিই সবচেয়ে বড়। এ ছাড়া, বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলেই মুহররম পালিত হোক না কেন, এর আনুষঙ্গিক উপাদান হিসেবে মেলা থাকবেই।

জন্মাষ্টমী

সে উৎসব এখন স্মৃতি, অথচ এক সময়-এ অঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে ঢাকাবাসীরা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতেন জন্মাষ্টমী বা জন্মাষ্টমী মিছিলের জন্যে। বলা যেতে পারে, জন্মাষ্টমী পালন এ অঞ্চলের একটি প্রাচীন উৎসব। বিশেষ করে ঢাকা শহরের-যে উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন হিন্দু মুসলমান সবাই। শুধু তাই নয়, জন্মাষ্টমীর সময় ঢাকা শহরে যে মিছিলে বেরুতো, তা বিখ্যাত ছিল সারা বাংলায়।

শ্রাবণ বা ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি জন্মাষ্টমী। শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই তিথিতে। তাই হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে এ মাস পবিত্র। জন্মাষ্টমী পালনের ফল সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, জন্মাষ্টমী ব্রতের ফল ভবিষ্যর মতে, ঐ দিনে কেবলমাত্র উপবাসেও সপ্তজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। মন্বন্তর প্রভৃতি পুণ্য দিবসে স্নান পূজাদি করিলে যে ফল জন্মে, জন্মাষ্টমী দিনে তাহার কোটিগুণ ফল জন্মিয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্তের মতে— ঐ দিনে কেবল তর্পণ করিলেও শতবর্ষব্যাপী গয়া শ্রাদ্ধের ন্যায় পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়। স্কন্দ পুরাণের মতে— জন্মাষ্টমী ব্রত স্ত্রী-পুরুষ সাধারণেই প্রতিবৎসর কর্ত্তব্য। এই ব্রত করিলে সন্তান, সৌভাগ্য, আরোগ্য, অতুল আনন্দ এবং ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি ইহকালে লাভ করিয়া পরকালে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।'[৩৩]

উপমহাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কোন না কোনভাবে এ তিথি উদযাপিত হয়

ধর্মীয় উৎসব হিসেবে। বাংলার 'উৎসব ছাড়া উপবাস ও রাত্রিতে কৃষ্ণের সাড়ম্বর পূজার ব্যবস্থা আছে। কোথাও মৃন্ময় মূর্তির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী প্রদর্শন করা হয়।'[৩৪]

বাংলাদেশে জন্মাষ্টমী কিভাবে পালিত হতো, তার বিশদ বর্ণনা আমার চোখে পড়েনি। তবে, অনেকেই ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলের উল্লেখ করেছেন। এতে মনে হয়, বিভিন্ন জায়গায় জন্মাষ্টমী অন্যান্য ধর্মীয় তিথির মতো সাধারণভাবে পালিত হলেও ঢাকায় বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো। মিছিল ছিল সে অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ এবং তাই ঘুরে ফিরে বিভিন্ন বর্ণনা বা স্মৃতি কথায় মিছিলের বর্ণনাই করা হয়েছে। এখানেও তাই জন্মাষ্টমী পালনের বর্ণনার মধ্যে মিছিলের কথাই এসেছে।

জন্মাষ্টমী পালনের অঙ্গ ছিল এর মিছিল। এবং এ মিছিলের বর্ণাঢ্য বিবরণ ছড়িয়ে আছে সংবাদপত্রে, বিভিন্ন স্মৃতিকথায়। কিন্তু কবে থেকে এবং কেন এ মিছিলের শুরু, তার ইতিহাস জানা যায়নি। মিছিলের ইতিহাস জানা যায় মাত্র একটি পুস্তিকা থেকে। এ প্রসঙ্গে আমি আর কোন সূত্রের সন্ধান পাই নি। ঢাকা থেকে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত এ পুস্তিকাটি লিখেছেন শ্রীভুবনমোহন বসাক। সম্ভবত, নবাবপুরের বসাক পরিবারের সদস্য ছিলেন তিনি। তাই মিছিল সম্পর্কে কিছু তথ্য তিনি দিতে পেরেছিলেন। লেখক বয়োবৃদ্ধ ঢাকাবাসীদের স্মৃতি অবলম্বন করে রচনা করেছিলেন পুস্তিকাটি। তাঁর তথ্য অনুযায়ী—

ইসলাম খাঁ ঢাকায় আসার আগে [অর্থাৎ ১৬১০ সালের পূর্বে] বংশালের কাছে পিরু মুনশীর পুকুরের পাশে বাস করতেন এক সাধু। ১৫৫৫ সালে [ভাদ্র মাসে, ৯৬৩ বাংলা সন] তিনি শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর উপলক্ষে বালক ভক্তদের হলুদ পোষাক পরিয়ে এক মিছিল বের করেছিলেন। এর দশ বারো বছর পর সেই সাধু ও বালকদের উৎসাহে 'রাধাষ্টমীর কীর্ত্তনের পরিবর্তে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে জন্মাষ্টমীর নন্দোৎসবের সময় অপেক্ষাকৃত জাঁকজমকের সহিত একটি মিছিল' বের করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিলো। প্রথম জন্মাষ্টমীর মিছিল বের হয়েছিলো ১৫৬৫ সালে [ভাদ্র মাসে]। পরে মিছিলের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ভার অর্পিত হয়েছিলো নবাবপুরের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী কৃষ্ণদাস বসাকের পরিবারে ওপর।[৩৫]

কালক্রমে সেই মিছিল একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে এবং প্রতি বছর জন্মাষ্টমী উৎসবের নিয়মিত অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। যতীন্দ্রমোহন উল্লেখ করেছেন, কৃষ্ণদাস মুচ্ছুদ্দিই ঢাকায় প্রথম এ মিছিলের প্রবর্তন করেছিলেন। ধারণাটি বোধ হয় ঠিক নয়। কৃষ্ণদাস বসাক যেহেতু ছিলেন ধনাঢ্য, তাই কালক্রমে তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিলো মিছিলের ভার। এবং লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই[৩৬] এ উৎসবের তিনি সূচনার করেছিলেন। মুসলমানরা এই মিছিলের নামকরণ করেছিলেন 'বার গোপালের মিছিল'।

কৃষ্ণদাস বসাকের সময় থেকে কিভাবে জন্মাষ্টমীর মিছিল কালক্রমে বিশাল উৎসবে পরিণত হয়, তার ধারাবাহিক খানিকটা ইতিহাস জানা যায় যতীন্দ্রমোহনের লেখায়। তিনি লিখেছেন—

'অনুমান ১০২০ (১৬১৩) বঙ্গাব্দে পর ব্রজলীলার সং লইয়া মিছিলের উৎকর্ষ সাধন আরম্ভ হয়। নন্দোৎসব প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা সম্পর্কীয় সং ব্যতীত অন্য কিছু জন্মাষ্টমীর অঙ্গভুক্ত করিবার আবশ্যকতা তখনও উপলব্ধি হয় নাই। তৎকালে কৃষ্ণ বলরামসহ নন্দ যশোদাদি একটা কাষ্ঠ নির্মিত মঞ্চ মধ্যে স্থাপিত করিয়া বাহির করা হইত। তৎসঙ্গে দধি নবনী প্রভৃতি ভারবাহী ও অন্যান্য নর্ত্তনপর গোপ ও বাদ্যাদি করিয়া চলিত। ইহাই প্রথমাঙ্গ নন্দোৎসব বটে। সেই সঙ্গে ভক্তিমান পরম বৈষ্ণব বসুক বৃদ্ধগণ পীত বসন পরিহিত ও পুষ্পমালাদি ভূষিত হইয়া খোল করতাল যোগে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উহার প্রত্যুদগমন করিত। অনন্তর কৃষ্ণদাসের মৃত্যু হইলে ১০৪৫ বঙ্গাব্দের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিপাদ সমন্বিত চৌকিতে ভগবানের অবতারাদির মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইতে লাগিল। তৎসঙ্গে ক্রমশঃ পতাকা নিশানাদি ও বন্দুক বর্ষা [বর্শা] প্রভৃতি এবং আশাসটা বল্লম ছড়িধারী পদাতিক ও অন্যান্য সাজসজ্জাসহ মিছিলের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাই মিছিলের পরবর্ত্তী উন্নতাবস্থা।'[৩৭]

এরপর নবাবপুরের অন্যান্য অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি নিজ নিজ মিছিল বের করা শুরু করেছিলেন। প্রায় একশো বছর অতিক্রান্ত হলে, উর্দু বাজারের গঙ্গারাম ঠাকুর নামে জনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণও নবাবপুরের বসাকদের অনুকরণে শুরু করেছিলেন জন্মাষ্টমী মিছিল। তাঁর মিছিল আসতো উর্দু থেকে নবাবপুর পর্যন্ত। অন্যান্য মিছিলগুলিও সাধারণত নবাবপুর, বা নবাবপুর থেকে বাংলাবাজার হয়ে নবাবপুরেই প্রত্যাবর্তন করতো।[৩৮]

তবে গঙ্গারাম ঠাকুরের মিছিল বেশিদিন চলেনি। কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এবং মনে হয় কালক্রমে, নবাবপুরের বিভিন্ন মিছিলগুলি সমন্বিত করে একটি মিছিলে রূপ দেওয়া হয়েছিলো যা পরিচিত হয়ে উঠেছিলো নবাবপুরের মিছিল নামে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে পান্নিটোলার গদাধর ও বলাইচাঁদ বসাক ছিলেন ধনে মানে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী। খুব সম্ভবতঃ নবাবপুরের মিছিল দেখে তাঁদেরও বাসনা হয়েছিলো নিজ এলাকা [ইসলামপুর] থেকে একটি মিছিল বের করার। সেই ইচ্ছানুযায়ী ১৭২৫ সালের দিকে ইসলামপুর থেকেও জন্মাষ্টমীর একটি মিছিল বের হতে থাকে।[৩৯]

'এই মিশিল উহাদিগের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের প্রীত্যর্থেই বাহির হইতে থাকে। এই সময়ে বলাইচাঁদ ও গদাধর শহরের মধ্যে সম্পদ গৌরবে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। তাঁহারা মিশিলের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া মহাসমারোহে নবাবপুর পর্যন্ত মিছিল আনয়ন করতে থাকেন। এই প্রতিযোগিতার ফলে এই মিশিল যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ক্রমশঃ উভয় পক্ষে নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকার মনোরঞ্জন চিত্র প্রভৃতি সং এর অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। এই সময়েই বড়চৌকি, সোনারূপার চতুর্দ্দোল, হস্ত্যশ্ব সমূহের জন্য সাচ্চার কাজ করা জরীর সাজ মিশিলের সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। গবর্ণমেন্টের পিলখানার হস্তী-সমূহ শোভাযাত্রার অঙ্গীভূত হইল। উভয়পক্ষ হইতে প্রভূত অর্থব্যয় সাধিত হইয়া বিবিধ পদচারী ও মঞ্চ স্থাপিত সং মনোরম সাজসজ্জায় জন্মাষ্টমীর উৎসবকে জাঁকাল করিয়া তুলিল। তৎসঙ্গে ঢাকার

পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা নবাবগণ যে প্রকার মিছিল সমভিব্যাহারে অতি সমারোহে নগরে বাহির হইতেন, তাহারও কতক অনুকরণ করিয়া ঐ নবাব-সোয়ারীর অংশ মিশিলের কোন কোন স্থানে সন্নিবেশিত হইয়া উহার অবয়ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।'[৪০]

যতীন্দ্রমোহন আরো উল্লেখ করেছেন, শুরু থেকে এ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মাত্র পাঁচবার নবাবপুরের মিছিল বের হয়নি। প্রথমবার বর্গীয় হাঙ্গামার ভয়ে, দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন দেওয়ান 'রাজদ্রোহী হইয়া' যে বছর ঢাকা লুট করেছিলেন সে বছর, তৃতীয়বার প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময়, চতুর্থবার, সামাজিক দলাদলির ফলে ও পঞ্চমবার '১২৬০ সনে ইসলামপুরের প্রতিযোগিতায় বিবাদ বিসম্ববাদের আশঙ্কায়।'

শেষোক্ত বক্তব্যটি সম্পর্কে খানিকটা সন্দেহ আছে। কারণ, ঐ বছর, [১৮৫৩ সালে] ইসলামপুর ও নবাবপুর— দু'জায়গা থেকেই মিছিল বের হয়েছিলো এবং সংঘর্ষ হয়েছিলো রায়ের বাজারের পুলের কাছে। তখন, বাংলার লেঃ গভর্ণর স্যার সিসিল বিডন নিজে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ঠিক করে দিয়েছিলেন, একেক দিন একেক দল [অর্থাৎ নবাবপুর ও ইসলামপুর] মিছিল বের করবে এবং তখন থেকেই এ নিয়ম চলে আসছিলো।

এ সময় অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যেই ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল জমকালো হয়ে উঠছিলো। এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো সারা বাংলাদেশে। দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসতো ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখতে। পুরো ঢাকা তখন হয়ে উঠতো উৎসব নগরী। সে সময় মিছিল বা শোভাযাত্রা হতো কি রকম? তার একটি বিবরণ পাই ঢাকার একটি সংবাদপত্রে–

...তামাসায় কতকগুলো বড় চৌকি ও ছোটচৌকি এবং হাতিঘোড়া ও পদাতিকের মিছিল বাহির হইয়া থাকে। বড় চৌকিতে পৌরাণিক ঘটনার প্রতিমূর্তি প্রদর্শিত হয়, ছোট চৌকিতে নাচ বা বিবিধ প্রকার সঙ্গ [ং] ও প্রভৃতি বাহির হয়। এই সমুদয় চৌকি বেহারারা স্কন্ধে করিয়া মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যায়। এই সমুদয় চৌকিতে যে সকল সঙ্গ [ং] ও কৌতুকজনক অনুকরণ বাহির হয়, তাহাতে অনেক প্রকার অশ্লীল গানাদি হইয়া থাকে। এই রূপ অশ্লীল গানাদি অনেক কমিয়া আসিতেছে। সর্বদাই এক পক্ষ অন্য পক্ষের [অর্থাৎ নবাবপুর ও ইসলামপুর] গালি দিতে অথবা কোন হাস্যজনক কার্য্যের অনুকরণ করিতে ত্রুটি করে না। একটি হাস্যজনক উদাহরণ লিখেতেছি। নবাবপুরের তামাসা কর্তৃপক্ষীয় কোন ব্যক্তির গাড়ি বোধহয় জীর্ণ অবস্থায় ছিল। গত সন তাহার নকল করিয়া ইসলামপুর পক্ষ হইতে ছোট চৌকির সঙ্গে (একখানি) যারপরনাই জীর্ণ গাড়ি ও তাহার সঙ্গে ২ সংযুক্ত একটা শীর্ণ ঘোড়া বন্ধন করা হইয়াছিল আর গাড়ির মধ্যে একটা মাস্তুল লাগাইয়া তাহাতে পাল ও কয়েক গাছ গুণ দেওয়া হইয়াছিল এবং গাড়ির ছাদের উপর বসিয়া এক ব্যক্তি দাঁড় ও লগি মারিতেছিল। এই রূপ চৌকি প্রায় বছরই বাহির হইয়া থাকে।

বড় চৌকিগুলো তামাসার প্রধান অংশ। কাঠ, বাঁশ ও কাগজ দিয়া কয়েকটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চৌকি প্রস্তুত হয়। তাহাতে নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র হয় এবং অভ্যন্তরে

পৌরাণিক ঘটনার অনুরূপ থাকে। গত সাল, পাণ্ডবদিগের দ্বারা দ্রুপদ রাজার লক্ষ্য ভেদ এবং আরকিমিডিস কর্তৃক কাঁচফলক দ্বারা রোমানদিগের পোত ও সৈন্য বিন্যাশ, এই দুটি ঘটনার অনুকরণ দুই খানি সুখদৃশ্য বড় চৌকি বাহির হইয়াছিল। এবার হনুমান কর্তৃক গন্ধমাদন পর্বতরাজীর আনয়ন, সুগ্রীব রাবণের কথোপকথন কমলে কামিনী দর্শন প্রদর্শিত হইয়াছিল।[৪০]

এর আট বছর পর, সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেকটি বিবরণে দেখা যায়, এলিটরা মিছিলের 'অশ্লীল'তার বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর। বিস্তারিত সে প্রতিবেদনটি উদ্ধৃত করছি।—

'গত মঙ্গলবার ও বুধবার অপরাহ্নে ঢাকার প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির হইয়াছিল। প্রথম দিবস ইসলামপুরের এবং দ্বিতীয় দিবস নবাবপুরে মিছিল বাহির হয়। সাধারণতঃ সকলেরই সংস্কার আছে কাহাদিগের মিছিল পরে বাহির হয়। তাহাদিগেরই প্রায় হার হইয়া থাকে। কারণ পূর্বদিবসীয় তামাসা দর্শন করিয়া পর দিবসীয় তামাসার উৎকর্ষ সাধন করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু এবার ইহার বিপরীত ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। এবার পূর্ব দিবস মিছিল বাহির করিয়াও ইসলামপুরীয়েরা প্রায় সর্বাংশেই জয় লাভ করিয়াছে। কেবল অশ্লীল কুৎসা গানে এবং প্রতিপক্ষের গুপ্ত গৃহচ্ছিদ্র প্রদর্শনে নবাবপুরীদিগের নিকটে ইসলামপুরীয়েরা বোধ হয় পরাজিত হইয়া থাকিবে। ইহার নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় যে আমার বরাবরই উক্তরূপ জঘন্য প্রথা নিবারণার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আমাদিগের সে অনুরোধ অরণ্য রোদনবৎ নিষ্ফল হইতেছে। একান্ত অশ্রাব্য কুৎসিৎ বিষয় সকল অবলম্বন করিয়া পরস্পরের পরস্পরকে অশ্লীল ভাষায় গালি দেওয়ার রীতি পূর্বেও যেরূপ প্রচলিত ছিল, এখানে তাহাই রহিয়াছে, উভয় পক্ষে আধুনিক কৃতবিদ্য লোকের প্রবেশ হাওয়াতেও তাহার কিছুমাত্র ন্যূনতা লক্ষিত হইতেছে না। এতএব আমরা অন্য উপায় না দেখিয়া স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলাম, যে তাহারা এই জঘন্য রীতি উঠাইয়া দিতে মনোযোগী হউন। যেস্থানে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন প্রচলিত আছে সেস্থানে প্রকাশ্য মিছিলে যাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত সুসভ্য ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষগণ এদেশীয় আপামর সাধারণ ভদ্র কুলবধূরা পর্যাপ্ত গমন করিয়া থাকেন পরস্পর পরস্পরকে অশ্লীলভাবে গালাগালি করে, ইহা সামান্য আশ্চর্যের বিষয় নহে। অতএব কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে লোকে তাহাদিগকে দোষ প্রদান করিবে এ আশংকা বৃথা। প্রত্যুত ভবিষ্যতে আর এই ভদ্রজন বিনিন্দিত ইতরত্ব প্রতিবাদক রীতি দর্শন করিতে না হয়, সকলেরই ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গ ঃ আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। যদিও আজি কালিকার জন্মাষ্টমীর মিশিল দেখিলে বিশেষ কিছুই নয়। এবং দিন দিনই ইহার প্রতি অনেকের হতাদর হইতেছে, কিন্তু ইহা নিশ্চয়, নানা কারণে এই জন্মাষ্টমীর মিশিল উপলক্ষে ঢাকায় যত লোক সমারোহ হইয়া থাকে; বৎসরের আর কোন সময়েই এত লোক সমাগম হয় না। এ সময়ে প্রায়

সকল বিষয়েরই বাণিজ্যের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। দুই তিন দিবস পর্যন্ত বড় রাস্তার লোক ঠেলিয়া চলা সুকঠিন হয়। বিশেষতঃ মিছিলের দুই দিবস পর্যন্ত (যে ২ রাস্তা দিয়া মিছিল বহির্গত হয়) এত লোকের ভিড় হইয়া থাকে যে, দুর্বল প্রকৃতির লোকদিগের পদব্রজে গমনাগমন করা অসাধ্য 'ব্যাপার হইয়া উঠে। ইহার মধ্য দিয়া আবার হস্তী ও শকট গমনাগমন করাতে লোকের কেমন কষ্ট হয় সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে। অতএব অন্তত মিশিল বাহির হইবার সময়ে হাতী ও গাড়ি রাস্তায় বাহির হইতে না পারে— পূর্বেই আসিয়া এক নির্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান থাকে সাধারণরূপে এরূপ আজ্ঞা প্রচার করা কর্তব্য, যখন উক্ত সময়ে হস্তী অথবা শকট রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিলে লোকের আঘাত প্রাপ্তির, প্রাণহানির পর্যন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন যে স্থানীয় শক্তি রক্ষক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, তাহাতে দ্বিরুক্তি হইতে পারে না।[৪২]

উনিশ শতকের শেষের দিকে ঢাকা শহরে জন্মাষ্টমী পালনের বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন গৃহবধূ মনোদা দেবীও। জানিয়েছেন তিনি, ঢাকার এই মিছিল দেখার জন্য গ্রাম গ্রামান্তর থেকে তো বটেই, কলকাতা থেকেও লোকজন এসে 'আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি উঠিয়া তাহাকে আনন্দ মুখরিত করিয়া তুলিত, তা ছাড়া, বুড়ীগঙ্গায় ছোট-বড় বিপুল সংখ্যায় নৌকা সারিবদ্ধভাবে নঙ্গর গাড়িয়া থাকিত ও যথাসময়ে, মিছিল দেখিতে নৌকা হইতে বাহির হইয়া মিছিল দেখিয়া পুনরায় নৌকায় ফিরিত, বলা বাহুল্য ঐ সব আরোহীরা দৈনিক হিসাবে ভাড়া করিয়া লইত।' কখন কখনও নির্দিষ্ট দিনে মিছিল বের হতো না বৃষ্টির কারণে। কিন্তু তারা ঐ সব তুচ্ছ করিয়াও বহু অর্থ ব্যয়ে জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখার আনন্দ উপভোগ করিতে ছাড়িত না।'[৪২ক]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তের কৈশোর কেটেছে ঢাকায়। এ শতকের বিশেষ দশকের জন্মাষ্টমীর মিছিলের একটি বর্ণনা আছে তাঁর আত্মজীবনীতে। দেখা যায়, জন্মাষ্টমীর মিছিলের আকর্ষণ তখনও কমেনি। তাঁর ভাষায়—

'জন্মাষ্টমী মিছিলের খ্যাতি ছিল দূর ব্যাপ্ত। আশেপাশের গ্রাম ভেঙ্গে লোক আসত দু'দিনের এই মিছিল দেখতে— একদিন নবাবপুরের আর অন্যদিনটিতে ইসলামপুরের। মিছিল বেরুতো সন্ধ্যার মুখে—মাতে 'বড় চৌকিগুলিতে আলোর খেলা দেখানো যায় (বিদুৎ নয়, কারবাইডের ল্যাম্প ও পেট্রোম্যাক্স)। হাতিতে চড়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আগে আগে আসেন, তারপরে নিশান আর ঝালর, রূপোর আশাসোটা নানা রকমের সঙ যাতে থাকত বহু সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ এবং বিপক্ষ দল সম্বন্ধে বক্রোক্তি। তারপর 'ছোট চৌকি' (অনেকটা চতুর্দোলের মত) আর রথের মত 'বড় চৌকি'। সবশেষে আবার হাতি যার নাম 'রাজার হাতি'। শহরের সবচেয়ে বড় উৎসব। অফিস-কাছারি স্কুল-কলেজ সব দু'দিনের জন্য ছুটি।'[৪৩]

চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেনও প্রায় একই সময়ের জন্মাষ্টমীর মিছিলের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে ভোলেননি তাঁর আত্মজীবনীতে। অপূর্ব সে বর্ণনা যেন চোখের সামনে এক শিল্পী আঁকছেন, আর তাঁর প্রতিটি টানে আস্তে আস্তে ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে একটি

ছবি। দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও তথ্যের খাতিরে বর্ণনাটি তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না—

'শ্রাবণের একটি রৌদ্রচুম্বিত বিকেলবেলা। যেদিকেই তাকাই না কেন রাস্তা-ঘাটে, ছাদে-কার্নিশে, বারান্দায়-রোয়াকে, দরজায়-জানালায়, গাছ-ল্যাম্পপোস্টে— সর্বত্রই কালো-কালো বিন্দু। এক কথায় কালো বিন্দুর এক মহাসমুদ্র। গোটা ঢাকা শহর এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় আর উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। আজ জন্মাষ্টমীর মিছিল বেরুবে। এমন জাঁকালো এমন বিশালাকার এবং অসাধারণ চমৎকারিত্বপূর্ণ একটি ঘটনা, এই উপমহাদেশে আর কোথাও কি দেখা যায়। যে জাদুকরি হাত জগদবিখ্যাত মসলিন কাপড়ের স্রষ্টা, এই মিছিল সে-হাতেরই এক আশ্চর্য কারিগরির যোগফল যেন। দু-দিন ধরে এই বিন্যাসপূর্ণ, সাত-রঙ মিছিল, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, অতিকায় একটি নকসিকাঁথার মতো চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়। ঠিক যেন একটি ক্যালিডোস্কাপের ভেতর দিয়ে দেখছি। অংশীদাররা হিন্দু হ'লেও আক্ষরিকভাবে এ-মিছিল সর্বজনীন।

অপরাহ্ণের সূর্য পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়েছে। ধূলোর চিকের ভেতর দিয়ে দূরে, কালো পাহাড়ের মতো আবছা একটি পুঞ্জিত ছায়া দেখা যায়। তাই দেখে, কালো বিন্দুর সমুদ্রে উত্তেজনার মস্ত ঢেউ ওঠে। এই পাহাড়টি ভিড় ঠেলে কচ্ছপের চালে এগিয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই আবছা মূর্তিটি জাঁকজমক পোশাকে সজ্জিত একটি বাস্তব হাতিতে রূপান্তরিত হয়। 'আসছে, ঐ আসছে'— সহস্র কণ্ঠের এই আওয়াজ বাবুবাজারের দিক থেকে, আকাশে উঠে, একটি শব্দতরঙ্গের মতো আমাদের দিকে ভেসে আসে। কী উন্মাদনা! কী ঠেলাঠেলি। যতদূর চোখ যায়, শুধু রঙ আর রঙ থাকে সাজানো। আক্ষরিকভাবে রঙের গাঙে যেন জোয়ার আসছে। হাতির পেছনেই কী অপরূপ এক দৃশ্য— গ্যালারির পর গ্যালারি। উচ্চতায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ ফুট। বহুযুক্তগোরুর গাড়ির ওপর বসানো। এ-গাড়িগুলোকে টানছে জোড়া জোড়া বলদ। এই গ্যালারির মাঝখানে একটি মঞ্চ। তার গর্ভগৃহে, খাঁটি সোনা কিংবা রূপোর চৌকি কিংবা সিংহাসন। সেখানে বৈষ্ণব দেবদেবীর মূর্তি। তার সামনে পৌরাণিক কাহিনীর মূকাভিনয় অথবা ভক্তিমূলক নাচ-গান চলে। কখনো বা নিছক খ্যামটা নাচ। কী অসাধারণ এক জমজমাট ব্যাপার। অনেকটা প্রতিমার চালার আকারে, দু-পাশ দিয়ে উঠেছে কাঠ কিংবা বাঁশের কাঠামো। তাতে নানা নক্সার রাংতা আর শোলার অলংকরণ। এই কাঠামোর একের পর-এক, নিশ্চল পুতুলের মতো, নানাভাবের নানা জ্যান্ত মূর্তি, মেয়েদের পোশাকে, জরি, পুঁতি এবং চুমকির কাজে এবং কারবাইডের আলোর মালায়, এবং পোশাকগুলো এমনই ঝলমল করে যে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

গ্যালারির সারি পার হবার পরই, ঢেউয়ের পর ঢেউ-এর মতো, নৃত্যরত সঙ-এর দল আসে। তাদের মুখে কবিগান কীর্তন, বিদ্রূপাত্মক সামাজিক ছড়া, জাতীয়তাবাদী গান। হাতে খঞ্জনি আর করতাল। বাদ্য এবং কণ্ঠসংগীতের কী নিখুঁত ঐক্য। মনে হয় একটিমাত্র কণ্ঠ, একটিমাত্র বাদ্যের ধ্বনি। তারপরেই রাজপুত বীরের বেশভূষায়,

তলোয়ার উঁচিয়ে আসে অশ্বারোহীর দল। তাদের দু'-পাশে সারি সারি রঙের ঝলমল নিশান, অতিকায় মখমলের ছত্র, পাখা, চামর, বর্শা, আরো কত-কী। সঙ্গে আছে ঢাক-ঢোল-নাকারা-শিঙা, এমন-কি ব্যাণ্ডপার্টিও। সামরিক সংগীতের গমগমে শব্দচঞ্চল্যে আকাশ-বাতাস ভ'রে ওঠে। যেন কয়েকশো পাখোয়াজ একই-সঙ্গে' একই বোলে বেজে উঠেছে। তারপর, আরো সঙ, আরো ঘোড়া, আরো হাতি, আরো গ্যালারি— এক অন্তহীন, সচল, সাড়ম্বর, অদৃশ্যপূর্ব প্রদর্শনী।

দু-দিনব্যাপী মিছিলের পর জন্মাষ্টমী উৎসবের আরেকটি অত্যাশ্চর্য আকর্ষণ নবাবপুরের 'বড়ো-চৌকি'। মিছিলের মতো এটিও আরেক অসাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা।

সৌন্দর্যপিপাসু মানুষের সৃজনীশক্তির কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে। যেমনি নক্সার ভাব, তেমনি অলংকরণে, আর তেমনি অনুপাত-জ্ঞান। হিন্দু-মুসলমান নক্সার কি অপূর্ব সমন্বয়। আর রঙের তো রীতিমতো দাঙ্গা লেগেছে। আগাগোড়া রাংতা, রঙীন কাগজ এবং কাপড় দিয়ে মোড়া। তার ওপর সোনা-রূপোর ছড়াছড়ি। নবাবপুরের সাবেকী ছাতা-পড়া বাড়িগুলো এবং রাতের কৃষ্ণবর্ণ আকাশের পটভূমিকায় চৌকিটি নানা রঙের আলোর ঝলকানিতে, এক পরীর রাজ্যের মতো ডগমগিয়ে উঠেছে। চৌকির মাঝামাঝি উচ্চতায় দ্বিগুণ পূর্ণাবয়ব পুতুল খেলার মাধ্যমে, মহাভারত রামায়ণ এবং অন্যান্য পালা রাতের পর রাত চলে। এসব পুতুলের গঠন-গাঠন, আঙ্গিক, রঙ, হাত-পা-মাথা ইত্যাদি নাড়াবার ভঙ্গি— এক কথায় তাবৎ নান্দনিক বিচার এবং সংযম দেখে, অজ্ঞাত, অশ্রুতকীর্তি শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধায়, আপনা-আপনিই মাথা নুয়ে পড়ে।

এই চৌকিতে আজ রাবণবধ পর্ব চলেছে। সে কী ভয়ানক দৃশ্য। যেমনি রাম-লক্ষ্মণের হাত-পা এবং মুখের ক্ষিপ্ত গতি এবং মারাত্মক সব অস্ত্র নিক্ষেপ, তেমনি রাবণ তাঁর বিরাট খড়্গ, দ্রুত চালিয়ে, চারপাশের খণ্ড-খণ্ড করে ফেলে। তার হাতের চকচকে এই অস্ত্রটির থেকে ছটিকাক্ষুব্ধ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বিদ্যুতের আলো-জিহ্বা লকলক করে। সেই আগুনে রাম-লক্ষ্মণ পুড়ে ছাই হয়ে যায় আর-কী। তাই দেখে আমার চোখের পলক থেকে যায়, বুক ধরফড় করে ওঠে। সব মিলে এক অদৃশ্যপূর্ব, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তাই তো, আজ এতকাল পরেও তার ছাপ, আমার মনের, গতকালের ঘটনার মতোই উজ্জ্বল হয়ে আছে। এতটুকুও ম্লান হয় নি।'[৪৪]

জন্মাষ্টমীর মিছিল কবে লুপ্ত হয়েছিলো, নির্দিষ্টভাবে সে সময় জানা যায় নি। তবে, খুব সম্ভব এ শতকের তৃতীয় দশকে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের যখন অবনতি হতে থাকে তখন লুপ্ত হয়েছিল এটি। কারণ, এর ফলে ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের অনেকেই ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন যারা ছিলেন মূলত এর পৃষ্ঠপোষক। এ ছাড়া, এ পরিপ্রেক্ষিতে মিছিলের ওপর ধর্মান্ধ মুসলমানদের হামলাও এর কারণ। পরিতোষ সেনের লেখায় এর খানিকটা ইঙ্গিত আছে—

'একবার [সময় উল্লেখ করেন নি; তৃতীয় দশক হবে] এই মিছিল, আমাদের পাড়ার মসজিদের সামনে দিয়ে যাবার সময় শত শত মুসলমান লাঠিসোঁটা, ইট পাটকেল, হাতে নিয়ে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার

লোক দ্রুতগামী গাড়ির তলায় চাপা পড়ার ভয়ে মুরগী ছানা যেমন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে— ঠিক তেমনি করে পালাতে থাকে। বে-পাড়ার অনেক হিন্দুই জখম হ'ল। বলাবাহুল্য এই দাঙ্গা লাগাবার প্রস্তুতি আগে থেকেই করা হয়েছিলো, সরকারী প্ররোচনায়।'[৪৫]

ঢাকায় জন্মাষ্টমী মিছিল বন্ধ হয়ে যাবার পর বাংলাদেশে আর কোন অঞ্চলে জন্মাষ্টমী তেমনভাবে পালিত হয় না, হলেও তা হয় ব্যক্তিগত পর্যায়ে।

হোলি ও ঝুলন

'ঢাকা মূলতঃ একটি বৈষ্ণব শহর', লিখেছিলেন হৃদয়নাথ মজুমদার। শহরের হিন্দু মহল্লার প্রায় প্রতিটি সচ্ছল ঘরে ছিল রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। শহরের আদি বাসিন্দারা হলেন শাঁখারী ও বসাকরা। তারা মনেপ্রাণে ছিলেন বৈষ্ণব, বিশেষ করে শাঁখারী বাজার বিকেল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত মুখরিত থাকতো খোল করতালের শব্দে। কালী ও দুর্গারও ভক্ত ছিলেন অনেকে। এ অদ্ভুত অবস্থা বোধ হয় বিদ্যমান ছিল একমাত্র ঢাকা শহরেই।[৪৬]

এ পরিপ্রেক্ষিতে হোলি ও ঝুলন হয়ে উঠেছিলো ঢাকায় বড় ধরনের উৎসব।

হোলি ছিল এমন একটি উৎসব যাতে হিন্দু-মুসলমান সমবেতভাবে সমান উৎসাহে যোগ দিতেন। প্রতি বছর দোলযাত্রার সময় রচিত হতো হোলির গান, তবে বাংলায় নয়, উর্দুতে। এক বছর ভিখন ঠাকুরের বাজারে হোলির আসর বসলে পরের বছর তা বসতো উর্দু বাজারে লালবাবুর বাড়ির সামনের ময়দানে। আসরটি হতো অনেকটা কবি গানের মতো। দল থাকতো দু'টি— একটি রাজা বাবুর অপরটি উর্দু বাজারের বাবুর। আসরের মহড়া শুরু হতো হোলির দু'সপ্তাহ আগে থেকে। আসরের প্রশ্ন উত্তর সবই হতো উর্দুতে। আসলে ঢাকার হাটে বাজারের ভাষা ছিল ভাঙ্গা উর্দু ও বাংলার মিশ্রণ।[৪৭]

দোলযাত্রার সময় আবির বা ফাগ মাখানো নিয়ে এক হুলস্থূল কাণ্ড হতো, যার বর্ণনা খানিকটা পাই আমরা দীনেশচন্দ্র সেনের আত্মজীবনীতে। লিখেছেন তিনি—

'আমরা ফাগ লইয়া যে কত লোকের চক্ষে মারিয়াছি তাহার অবধি নাই। একবার পুলিশের কতকগুলি লোকের উপর ফাগ লইয়া অত্যাচার করাতে তাহারা আমাদের ভয় দেখাইয়াছিল। তাহাতে আমাদের লোকের হাতে তাহারা ভয়ানক মার খাইয়াছিল, কিন্তু নালিশ করিতে সাহস পায় নাই...সেখালে দোলের ফাগ খাইয়া একটা রীতি ছিল এই রীতির বিরুদ্ধে কেহ কিছু করিতে চাহিত না এবং এতৎ সম্বন্ধে বিপক্ষতা করিলে সমাজে নিন্দিত হইতে হইত। দোলের সময় মনে পড়ে আমরা বাহির খণ্ডের সুবৃহৎ হল ঘরটার ২০/৩০টি ছেলে সকালে শুইয়া আছি, চাকরেরা নেকড়া ও জলের ঘটি লইয়া প্রত্যেকের চক্ষু খুলিয়া দিতেছে। কারণ পূর্বদিন ও পূর্বরাত্রে এত ফাগ আমাদের চোখে পড়িত যে, পরদিন চোখের দুটি পাতা একেবারে আটকাইয়া যাইত। ভৃত্যদের সাহায্যে চক্ষু না

খুলিলে চোখ বুজিয়া থাকিত।'[৪৮]

হোলি ছাড়া আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হতো ঝুলন ও বনবিহার। ঝুলনের সময় শহরের ঠাকুর বাড়িগুলিতে তিনদিন ধরে চলতো নাচ, গান, যাত্রা, কীর্তন ও সেতারের আসর। তাঁতী বাজারের বাবু, রাজা বাবু, লালমোহন সাহা ও এক্রামপুরের ঠাকুর বাড়িগুলিতে এগুলির সঙ্গে থাকতো বাঈ, খেমটা, এবং যাত্রা। শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার উৎসব জমতো লালমোহন সাহার বাড়ির কাছে মৈশুণ্ডিতে।

ঝুলন যাত্রায় দেখা যায় বাবু কালচারের ছাপ। তাই দেখি এ শতকের প্রথম দিকেই এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা যাচ্ছে। নীচে এ বিষয়ে সংবাদপত্র থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। উদ্ধৃতি দীর্ঘ কিন্তু তৎকালীন ঝুলন যাত্রা সম্পর্কে তথ্যবহুল এই একটি রচনাই পাওয়া গেছে।

ঢাকায় ঝুলন যাত্রা (প্রাপ্ত)

বৈষ্ণব প্রধান ঢাকা নগরীতে বৈষ্ণব শাস্ত্রানুমোদিত পর্ব্বসমূহ অত্যধিক আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে, পাঠকবর্গকে তাহা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি পর্ব্বাহে ঢাকায় যে মিছিলের ঘটা হইয়া থাকে, বঙ্গবাসীর তাহা অবিদিত নাই। ঝুলনোৎসবের মিছিলের কোন রূপ ঘটা না থাকিলেও নৃত্য গীতের বিশেষ আয়োজন হইয়া থাকে। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই পবিত্র পর্ব্বোপলক্ষে শহরবাসীর নিকট বারবিলাসিনীর অশ্লীলতাসূচক হাবভাবপূর্ণ নৃত্যগীতই অধিকতর সমাদৃত হইয়া থাকে। পবিত্র ঝুলন মন্দির প্রাঙ্গণে ভগবান রাধা-গোবিন্দজীর মূর্তি সমক্ষে, কুলটা কলঙ্কিনীর কুটিলকটাক্ষ পরিপূর্ণ লাস্য-লীলা যে কিরূপ ধর্ম্ম ও সমাজানুমোদিত তাহা নাগরিক সমাজ কর্তৃপক্ষই বলিতে পারেন। এ সকল নৃত্যগীত উপলক্ষে সুদীর্ঘ ৪/৫ দিবস কাল সহরময় যে সোরগোল বাঁধিয়া যায় ও যে সকল প্রেতলীলার অভিনয় হইয়া থাকে, স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। নৃত্যগীতাদি দর্শনচ্ছলে পাশব প্রকৃতি পাষণ্ডকুল দল বাঁধিয়া প্রকাশ্য রাস্তার উপর বা ঝুলনবাড়ির দ্বারে দাঁড়াইয়া যেসকল অশ্লীল আমোদের অনুষ্ঠানের ও নানা প্রকারে অঘটন ঘটাইয়া থাকে, তাহা সহরবাসী নৃত্যগীত প্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট আমোদজনক বলিয়া বিবেচিত হইলেও, সাধারণের চক্ষে নিতান্তই দোষাবহ বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যে সকল হৃদয়বান ব্যক্তি ঝুলন উপলক্ষে ২/১ দিন সহরে বাহির হইয়াছিল, তাঁহারা ঐ কয় রাত্রির জন্য স্থানটিকে 'প্রেতপুরী' বা 'মগের মুলুক' ব্যতীত অন্য কোনও আখ্যায়িকা প্রদান করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। সুসভ্য ইংরেজরাজের সুশাসনের কথা এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে নিয়তই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শাসন মাহাত্ম্যে বর্ত্তমান যুগে বাঘ মহিষে এক ঘাটের জল খাইতে বাধ্য হইলেও ঝুলনের পঞ্চ রাত্রি দুর্ব্বৃত্ত দলের দুর্দ্দমনীয় অমানুষিক অত্যাচার উপেক্ষিত হইতেছে, এতদপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমরা বিগত ঝুলনের কাণ্ড কাহিনীর

কয়েকটা উদাহরণ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করি। ভরসা করি, ঢাকার বর্ত্তমান সহৃদয় ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় আমাদের কথায় কর্ণপাত পূর্ব্বক ভবিষ্যতে পাপ প্রবাহ যাহাতে বন্ধ হইতে পারে, তদনুরূপে ব্যবস্থা করিয়া সভ্য সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন ঃ—

'দোলায়ং দোলগোরিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনম।
রথে চ বামনং দৃষ্ট্যা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥'

এই মহাকাব্য স্মরণ করিয়া সহরবাসী অনেক ভদ্র পরিবারের কুলবালাগণ ঝুলনের সময় দলে দলে বিগ্রহ মানসে সহরের নানা স্থানের ঝুলনমন্দিরে গমনাগমন করিয়া থাকেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, ঐ সকল কুলঙ্গনাগণের সহিত কোনও পুরুষ রক্ষক থাকেন না, ইহা সহরের এক প্রকার চিরন্তন প্রথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীলোকগণের এরূপে নির্ভীকচিত্তে দেবালয়ে গমন অতীত সুশাসনের পরিচায়ক নহে কি? বলিতে লজ্জা হয়, বর্ত্তমানকালে সহরের পুলিশপ্রহরীর অভাব না থাকিলেও, বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্যকল্পে কোনও পাহারাওয়ালা প্রভুকে অগ্রসর হইতে দেখা যায় না।

যাহারা ঝুলনের কয় দিন রাত্রিকালে ২/১ বার দুই একখানি ঝুলন বাড়ির নিকট দিয়া গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই হয়ত, অনেক কুল ললনার লাঞ্ছনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। দানব-চরিত্র নিশাচরদলের উৎপীড়নে লাঞ্ছিতা দুই চারিটী কুল মহিলার আর্ত্তনাদও তাহাদের কর্ণকুহর প্রবেশ করিয়া থাকিবে। কিন্তু কুলবালার অবমাননার কথা চাপিয়া রাখা কর্ত্তব্যবোধেই, হয়ত অনেকে তাহা প্রকাশ করিতে অসম্মত হইবেন। যাহাতে কুলললনাকুল দুর্বৃত্ত দস্যুদিগের পাপ স্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে ঠাকুর দর্শনে গমন করিতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য স্থানীয় শান্তিরক্ষক কর্ত্তৃপক্ষ কোন সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন না কি?

ঝুলনের কয় রাত্রি সহরের মদের দোকানগুলি সমস্ত রাত্রিই অবারিতদ্বার থাকে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সহরের সদর রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া সুরাপায়ীদিগকে গভীর নিশীথে সুরা পান করিতেও দেখিয়াছি, আরও দেখিয়াছি, এবং বিবিধ কুকার্যানুষ্ঠানক্ষেত্রে অদূরে রক্তবসনমণ্ডিত পুলিশ প্রভু সার্দ্ধত্রি হস্তাধিক বংশদণ্ড হস্তে লইয়া অচল অটলভাবে শান্তি রক্ষা করিতেছেন। পুলিশ রক্ষক প্রভুদের শান্তিরক্ষা প্রণালীর কখন কোন সন্ধান লইয়া থাকেন কি? মাতালগণের সমক্ষে কুলবালাকুলের চলাফেরা যে কিরূপ বিড়ম্বনা-জনক তাহা হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রই সহজে অনুমান করিতে পারিবেন। অনেক সময় অনেক নিরীহ ভদ্রলোককেও মাতালের হাতে পড়িয়া লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে দেখা গিয়াছে। আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের অনুকম্পায় কিয়দ্দিন পূর্ব্বে রাত্রি ৯ ঘটিকার পরই সহরের মদের দোকানগুলি রুদ্ধদ্বার

হইত; কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, কি জানি কোন মন্ত্রবলে মদ্যবিক্রেতার এত অল্প কাল মধ্যেই ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের সে আদেশ উপেক্ষায় উড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে।

ঝুলনের নৃত্যগীত উপলক্ষে দুই চারিটী ঝুলন বাড়িতে দর্শকবৃন্দের মধ্যে যে হস্তাহস্তি, ধস্তাধস্তি বা রক্তারক্তি না হইয়া থাকে এমত নহে। বিশেষ যে বাড়িতে গায়িকা বা নর্ত্তকী বারবনিতা ষোড়শী ও রূপসী, সে সকল বাড়িতে ধস্তাধস্তি অভিনয়ের প্রসার প্রতিপত্তি বেশি। বিগত বুধবার ও বৃহস্পতিবার রজনীতে মৈশুণ্ডীর কোন কোন ঝুলন বাড়িতে নাকি এ অভিনয়ের এক প্রকার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

যথাযথ পরম বৈষ্ণবগণ বারবনিতাকুলের নৃত্যাপলক্ষে অকাতরে অর্থব্যয় করিতে পারেন, যে সমাজের পবিত্র হরিমন্দিরে বসিয়া একান্ত মনে বারবিলাসিনীর পদপ্রল্লবোত্থিত ঘুঙুরধ্বনি শ্রবণে কর্ণকুহর পবিত্র করিতে কুণ্ঠিত নহেন, এ হেন দেশ ও সমাজের অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকগণ যে সব নৃত্যদর্শন লালসায়, পালে পালে দল বাঁধিয়া নৈশ ভ্রমণে বাহির হইবে তাহাতে অবাক হওয়া কি আছে? আমরা ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে ঝুলনের কয় দিন ৮/১০ বর্ষীয় শিশু ও নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ-লালসায় নৈশ ভ্রমণে বাহির হইয়া নির্ভয়ে প্রকাশ্যে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া পান চুরুটের বাপান্ত করিতেছে। দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা যুবক ও বালকগণের ঈদৃশ অধঃপতন দর্শন করিয়া কোন হৃদয়বান ব্যক্তি অবিচলিতে থাকিতে সমর্থ হইবেন? সময়ান্তরে এ বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা রইল।

এ সহরের ঝুলনানুষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বারবনিতাগণের নৃত্যগীত বন্ধ করিয়া দিবেন এমন আশা আমরা করিতে পারি না। কারণ এ কথা বলিতে গেলে আমাদের একটি কথা মনে পড়িয়া যায়। আমাদের একজন গ্রাম্য বন্ধু একদিন হাস্যোচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে 'ঢাকার শহরে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষেও এক জোড়া খেমটা নাচের বন্দোবস্ত হয়'— সুতরাং এরূপ স্থলে আমাদের ক্ষীন-কণ্ঠোত্থিত করুণ ধ্বনি ঝুলন কর্তৃপক্ষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে; এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। যাঁহারা ঝুলন ব্যাপারের অনুষ্ঠান উপলক্ষে নৃত্যাদির আয়োজন করিয়া থাকেন, তাহারা একটু মনোযোগ করিলেই বীভৎস ব্যাপারাদি সহজেই পরিত্যাগ করিতে পারেন। এ দেশে রামায়ণ সঙ্কীর্ত্তন, যাত্রা, কবি ও ঢপ বা পাঁচালীর অসম্ভব নাই, এবং সে সকল গানের অধিকাংশেই কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। পবিত্র ঝুলনবাসরে, পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়া দেশের সমাজের মঙ্গল সাধনে যত্নবান হওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে কি? আর যদি কোন ব্যক্তি একান্তই পবিত্র রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রকাশক ঝুলন পর্ব্বহে বারবিলাসিনীগণের প্রেমসঙ্গীত শ্রবণ ভিন্ন পরিতৃপ্ত না ইহতে পারেন, তবে তাঁহাকে আমরা এই অনুরোধ করি যে, তিনি যেন তাঁহার অনুষ্ঠিত নৃত্যগীত শ্রবণার্থ পরিমিত সংখ্যক নিমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধব লইয়া, সদর দ্বার রুদ্ধ করতঃ মানব জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়া লন! তাহা হইলেও এ সকল পাপলীলার অনেকটা অবসান হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। আর যদি একান্তই সদর দরজা খোলা রাখিতে হয়, তবে তিনি যেন বহু

সংখ্যক পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অপর কোনও ব্যক্তিকে বাড়িতে প্রবেশ করিতে না দেন। কিন্তু এ অবস্থায় বাড়ির ফটকদ্বার বন্ধ করাই আমরা শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি।'[৫০]

উপরে তিনটি উৎসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ও ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হোলির একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত সবগুলি উৎসব ধর্মীয় উৎসব। ধর্মীয় বিধান এ গুলির কারণ। আতোয়ার রহমান লিখেছেন এ প্রসঙ্গে—'লৌকিক ধর্মের সাথে অভিজাত ধর্মের বিরোধ মানবেতিহাসের এক পুরনো দীর্ঘ কাহিনী। অভিজাত ধর্ম চেয়েছে টিকে থাকতে। এই বিরোধ ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের ক্ষেত্রেও। সত্যি, বিরোধে অধিকংশ ক্ষেত্রেই পরাজয় ঘটে লৌকিক উৎসবের। কিন্তু এটা লৌকিক ধর্মের সাথে তার আচার অনুষ্ঠান দমনে ব্যর্থকাম অভিজাত ধর্মের আপোষের নামান্তর।'[৫১]

কৃষিভিত্তিক সমাজলৌকিক উপাদানের উৎস। বাংলাদেশের সমাজ কৃষিভিত্তিক। এই কিছুদিন আগেও গ্রাম ও শহরের তেমন কোন পার্থক্য ছিল না ফলে, উপরোক্ত উৎসবগুলি ঢাকা শহরে জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হলেও লৌকিক উপাদান যথেষ্ট খর্ব করে ফেলেছিলো ধর্মীয় অনুশাসন। বহিরাগত শাসক সম্প্রদায় যে ভাবে ঈদ বা মুহররম উৎসবের [বিশেষ করে মিছিল] শুরু করেছিলেন সে রূপ আর থাকেনি। এ দুটি উৎসবের মিছিলের কথা ধরা যাক। মিছিলের প্রচলন করা হয়েছিলো উচ্চবর্গের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার জন্যে। উনিশ শতকে জন্মাষ্টমীর মিছিলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত উচ্চবর্গ। কিন্তু পরে এ মিছিল ব্যবহৃত হয়েছে উচ্চবর্গের আচরণকে ব্যঙ্গ করার হাতিয়ার হিসেবে। অর্থাৎ, বাংলাদেশে উপরোক্ত কোন উৎসবই আক্ষরিক অর্থে ধর্মীয় উৎসব থাকে নি। কৃষিজীবী মানুষের লোকায়ত বিশ্বাস, স্থানীয় উপাদান এগুলিকে পরিণত করেছিলো এক ধরনের সামাজিক উৎসবেও। যে কারণে, এসব উৎসবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের যোগদানে তেমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নি।

এখন, উপরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে উৎসব চারটি পর্যালোচনা করা যাক।

ইসলাম প্রচারের শুরুতে অর্থাৎ আদিতে বাঙালী মুসলমানরা কিভাবে ঈদ পালন করতো, তা জানা যায়নি। তবে, বলা যেতে পারে আদিতে প্রচারকরা উদ্‌যাপিত ঈদের আদিরূপই হয়ত তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সে রূপ গেছে হারিয়ে। 'কখনো ধর্ম নেতারা মূল অনুষ্ঠানের সাথে যোগ করেছেন নতুন অনুষ্ঠান, কখনো শাসক শ্রেণীর নির্দেশে যুক্ত বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম, কখনো বা লৌকিক ধর্মের প্রভাব এসেছে লৌকিক আচার নিয়ে।'[৫২]

ফারায়েজী আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনসমূহে পালটে দিতে পেরেছিলো বাংলাদেশের মুসলমানদের মন-মানসিকতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও লৌকিক স্থানীয় উপাদানগুলি বিভিন্ন সময় যুক্ত হয়েছে ঈদের সঙ্গে [অনেক সময় ধনাঢ্যদের পৃষ্ঠপোষকতায়]। ঈদে যে লৌকিক উপাদানগুলি যুক্ত হয়েছে, তার অনেকগুলি এসেছে

হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও লোকাচার থেকে। এবং হিন্দু ধর্মীয় উৎসব মূলত কৃষিকেন্দ্রিক। দু'একটির উদাহরণ দেওয়া যাক। ঈদের চাঁদ দেখে সালাম দেওয়া এটা কি এসেছে সে সময় থেকে, যখন প্রাকৃতিক শক্তিতে অর্চনা করতো মানুষ? ঈদের রাতে ঢোল বাজিয়ে গান বাজনা[৫২ক] [মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবে এর কোন স্থান নেই], কদমবুসি করা, মেলা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়, যা পূর্বে আলোচনা করা গেছে।

অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় [বা শহুরে] সংস্কৃতিও প্রভাব ফেলেছে এ উৎসবে। ত্রিশ-চল্লিশ দশকে ঢাকায় ঈদের দিনে 'খটক' নাচ হয়েছে। আশরাফ-উজ-জামান লিখেছিলেন, রমনার মাঠে তা অনুষ্ঠিত হতো। সম্প্রতি আবদুস সাত্তার জানিয়েছেন, না শুধু রমনার মাঠেই নয়, আরমানিটোলা মাঠ বা অন্যান্য মাঠেও তা হতো। মনে হয়, ঢাকা শহরে তখন বেশ আধিপত্য ছিল কাবুলিঅলা মহাজন বা ফেরিঅলাদের। আবদুস সাত্তার আরো উল্লেখ করেছেন—'ঈদের দিন বর্ষাকালে দেখেছি নৌকা বাইচ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের অনুকূল হাওয়ায় দেখেছি শিশু কিশোরদের ঘুড়ি উড়ানো। চৈত্র সংক্রান্তিতে ঢাকার ঘুড়ি উড়ানো উৎসব ছিল বিখ্যাত, রমনার মাঠে ঘোড়ার রেস...মহল্লায় মহল্লায় হিজরা নাচ।'[৫৩] রেস ও হিজরা নাচ ছিল ঢাকার বাবু কালচারের অঙ্গ, যা যুক্ত হয়েছিলো ঈদ উৎসবের সঙ্গে।

এ শতকের শুরু থেকে, যখন রাজনৈতিকভাবে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিলো, তখন থেকেই গুরুত্ব পেয়েছিলো ঈদ। তবে, খানিকটা জাঁকজমকের সঙ্গে তা পালন করা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল শহুরে বিত্তবানদের মধ্যে। বাংলাদেশে দু'টো ঈদ জাতীয় ধর্মোৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হবার পর, যখন থেকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে ঈদ এবং এখনও যা অব্যাহত ও প্রবল। ইসলাম সম্পর্কে আগের অজ্ঞতাও তেমন নেই মুসলমানদের ভেতর, ফলে স্বাভাবিকভাবেই, মুসলমানপ্রধান দেশে ঈদ নিজের স্থান নিয়েছে।

ঈদ-উল-ফিতর প্রধানত একদিনের উৎসব এবং সীমাবদ্ধ বিশেষ খাবার ও নতুন কাপড় চোপড় তৈরীর মধ্যে, ঈদ-উল-আজহা তিন দিনের, এবং তা সীমাবদ্ধ খাবার, বিশেষ করে কোরবানির মাংস খাওয়ার মধ্যে। এর মাংসও আগের মতো জমিয়ে রাখা হয়। শহরাঞ্চলের বিত্তবানরা এখন প্রায়ই কোরবানীর মাংস ব্যবহার করেন 'কোল্ড বীফ' তৈরি করতে। গ্রাম বা শহরের মধ্যবিত্তরা যতদিন পারেন জ্বাল দিয়ে রাখেন মাংস, অনেক ক্ষেত্রে প্রিয়জনের জন্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দুটো ঈদ পালনের মধ্যে আছে বিত্তের সম্পর্কে। স্বাভাবিকভাবেই শহরে, মফস্বলে ও গ্রামাঞ্চলে যারা বিত্তবান তাদের ঈদ আর সাধারণ মানুষের ঈদে পার্থক্য থাকবেই।

বাংলাদেশের ধনাঢ্যরা এখন ঈদ-উল-ফিতর পালন করেন নতুন জামাকাপড় ক্রয়, উপহার বিতরণ এবং বিশেষ খাবারের আয়োজন করে। নব্য পুঁজিপতিদের অনেকে আবার ঈদ উপলক্ষে বাজার করতে এখন চলে যান ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর বা হংকং।

সাধারণ চাকরিজীবীদের অধিকাংশের ঈদ মানে কয়েক দিনের জন্যে ঘরে ফেরা, পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হওয়া সন্তান বা স্ত্রীর জন্যে ফুটপাত বা হকার্স মার্কেট থেকে কাপড় কিনে নেওয়া আর ঈদের দিন একটু উন্নতমানের খাবারের আয়োজন করা।

যে বিত্তের কথা বললাম, তার সঙ্গে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ ঈদ-উল-আজহার। কারণ, এ ঈদে কোরবানীর জন্যে গরু বা ছাগল লাগবেই।

পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে মধ্যবিত্তের পক্ষে গরু— নিদেনপক্ষে একটি খাসী কোরবানী দেওয়া সম্ভব ছিল। কারণ, তা পঞ্চাশ থেকে একশো টাকার মধ্যে পাওয়া যেতো। গ্রামে, অনেকে পোষা খাসী বা গরু কোরবানি দিতেন। কিন্তু, স্বাধীনতার পর বিত্তবান ও বিত্তহীনদের তফাৎ চোখে লাগার মতো প্রকট হয়ে উঠেছে। কোরবানি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে সামাজিক মর্যাদাসূচক প্রতীক হিসেবে।

গ্রামে এখন কোরবানি সীমাবদ্ধ মাঝারি চাষীর মধ্যে। শহরের পেশাজীবীদের অধিকাংশই গরু ভাগে দেওয়ার পক্ষপাতী। তাও এখন অনেকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বিত্তবান যাঁরা, তাঁরা ভাগে নয়, খাসীও নয়, গরুই কোরবানি দেবেন; অনেক ক্ষেত্রে খাসী এবং গরু দুটোই। এবং সেটা খোদাকে ভালোবেসে নয়, ধর্মের কথা ভেবে নয়, বরং প্রতিবেশীদের দেখানো যে, আমি এতো টাকার গরু কিনে কোরবানি দিচ্ছি।

কোরবানির আগেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় বসবে গরুর হাট। হৃষ্ট-পুষ্ট দামী গরুর গলায় ঝোলানো হয় কাগজের মালা। বিত্তবান সে গরু কেনেন। বিত্তবানের ভৃত্য বা অনুচর কাগজের মালা ঝোলানো সে গরু নিয়ে আসে। পথচারীরা জিজ্ঞেস করেন, 'কত'? মনিবের গর্বে গর্বিত পরিচালক দাম বলে। কিছু দিন আগের ঘটনা। পত্রিকার সংবাদ জানা গেলো, এক ব্যবসায়ী একটি গরু কিনেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকায়। কোরানে যে ভালবেসে উৎসর্গের কথা বলা হয়েছে, তা এখানে অনুপস্থিত। বলা যেতে পারে, বাংলাদেশে এখন আর তার আবেদন নেই। ধর্ম ব্যবহৃত প্রতিপত্তি ও অর্থ প্রদর্শনের হাতিয়ার, প্রতীক রূপে। ধর্মভিত্তিক দলসমূহ এবং নেতৃবৃন্দ ইসলাম সম্পর্কে আমাদের প্রতিদিন এত নসিহত করেন, কিন্তু এই অপচয়, এই অর্থ প্রদর্শনের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ আগেও যেমন বঞ্চিত ছিলেন ঈদের আনন্দ থেকে, এখনও বঞ্চিত আছেন তেমনি। মুঘল আমলে দেখি, রইসরা ঈদের দিন ছুঁড়ে দিচ্ছেন রেজগি আর সাধারণ মানুষ তা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। এখনও তার হেরফের হয়নি। বরং বঞ্চনা আরো বেড়েছে। সম্প্রতি সৌদি আরবের কোরবানির মাংস নেওয়ার জন্য যে হুটোপুটি, লাইন— তা আমাদের দেশের কোন দিকটা তুলে ধরে?

রমজান যে খুশির ঈদ আনে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। কারণ, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জন্যে সারা বছরই প্রায় রমজান। নজরুল যেমন লিখেছিলেন 'জীবনে যাদের হররোজ রোজা...।' ঈদ-উল-ফিতর সাধারণ মানুষের জন্যে

ভাল খাওয়া নয়, নতুন কাপড় চোপড়ও নয়। তাদের ঈদ জামাতে গিয়ে শুধু নামাজ পড়া। এবং ঈদ-উল-আজহাও তাই। জামাত থেকে ফিরে এসে বিত্তবানদের দেওয়া মাংসের জন্যে অপেক্ষা করা। উৎসব সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে তখনই, যখন বিত্তবণ্টনে আসে সামঞ্জস্য। তা না হলে এ ধরনের ধর্মীয় উৎসবেরও মূল আবেদন হ্রাস পায়, ধর্ম পালন হয় না, ধর্ম ব্যবহৃত হয় শুধু আত্মপ্রদর্শনের হাতিয়ারে। এভাবে মানুষের মন থেকে এই ধর্মীয় উৎসবের মূল তাৎপর্য মুছে গেছে।

মুহররমের সূত্রপাত মেসোপটেমিয়ায়, ছড়িয়ে পড়েছিলো তা পরে ইরান, লেবানন, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। সূত্রপাতের সময়ে এর আচার অনুষ্ঠানে ছাপ ফেলেছিলো এ্যাডোনিস তামুজের উৎসব, বিভিন্ন লোক ও কাল্ট বিশ্বাস। ফন গ্রুন বাউস লিখেছেন—

> The violent death of that god on the approach of summer, symbolozing the decline of Nature's productive force under the searing rays of merciless sun, was followed by a mourning of seven days after which the body was washed, annointed and shrouded to be carried abroad in procession and finally interred. The fact that the Hosain festival didnot originate in Persia, but in Mosopotemia where as we know the first tenth of Muharram procession with solemn wailings and lamentations was held in 962, localizes it in the region where in vanous disguises the Adinis was to show sporadic vitality more then two centuries later.'[৫৪]

বাংলাদেশে বহিরাগত শাসক ও শিয়া প্রবর্তিত মুহররমের আদি রূপ কি ছিল, তা জানিনা। কারণ, সে সম্পর্কে তথ্য প্রায় নেই। কিন্তু উনিশ শতকের মুহররম পালনের যে বর্ণনা পাই বা অতি সাম্প্রতিক কালের বর্ণনা থেকেও এটা স্পষ্ট যে, যে রূপেই মুহররম এতদঞ্চলে প্রচলিত হয়ে থাকুক না কেন, সে রূপ আর থাকেনি। মধ্যপ্রাচ্যে কাল্ট, বিশ্বাস, মুহররমের আচার-অনুষ্ঠান, প্রভাবিত করেছে, তেমনি বাংলাদেশে লোকায়ত আচারবিধি, বিশ্বাস মুহররমের আদি রূপ বদলে দিয়েছে আত্মীকরণের মাধ্যমে।

আগেই উল্লেখ করেছি, শুদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস দেখলে, সুন্নী মুসলমানের পক্ষে মুহররমে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এর কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান পৌত্তলিকতার সামিল। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের কথা দূরে থাকুক, মৌলবাদীদেরও এ উৎসবে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে দেখিনি। খুব সম্ভব, এ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যেহেতু হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এর দৌহিত্রদের নাম জড়িত সেহেতু সুন্নীরাও ভাবপ্রবণ হয়ে থাকেন [যদিও শুদ্ধ ইসলামে এ ধরনের ভাবপ্রবণতার অবকাশ আছে কিনা জানি না]। গত দেড়শো দু'শো বছর ধরে মুহররম পালিত হয়ে আসছে জাঁকজমকের সঙ্গে। এ সময়ে ইসলাম শুদ্ধিকরণের আন্দোলন বাংলাদেশে কম হয়নি। কিন্তু মুহররমের আচার-অনুষ্ঠানের তেমন কেউ বিরোধিতা করেছেন বলে শুনিনি। এর কারণ কি? তা পরে উল্লেখ করছি।

মুসলমানদের কথা না হয় বাদ দিলাম। হিন্দু বা অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন কেন

যোগ দেন এই অনুষ্ঠানে এবং পালন করেন এর অনেক আচার-বিধি? গত শতকে জেমস ওয়াইজ লিখে গেছেন, হিন্দু জমিদাররা যেমন মুহররম পালনে অর্থ সাহায্য করে থাকেন, মুসলমান জমিদাররাও তেমনি অর্থ সাহায্য করেন দুর্গা পূজোয়।'[৫৫] আসলে, তৃণমূল পর্যায়ে ধর্ম নিয়ে বাঙালী কখনো, অন্তত ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তেমন মাথা ঘামায় নি। ধর্মীয় উৎসব আক্ষরিক অর্থে ধর্মীয় উৎসব ছিল না, ছিল এক ধরনের 'আনন্দোৎসব' বা মিলনোৎসব। যে কারণে, দুর্গা পূজোয় মুসলমানদের ভীড় কম হত না। তবে, হিন্দু নিম্নবর্ণের নর-নারীর নিকটও এর জনপ্রিয়তার কারণ, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এ্যানিমিজম বা সর্বপ্রাণবাদ এবং ফেটিসিজম বা জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা এদের বিশ্বাস ও সংস্কারের অন্তর্গত। বস্তুত মুহররম অনুষ্ঠানে এগুলোই ধীরে ধীরে যুক্ত হয়। লোকজ ও স্থানীয় আচার যুক্ত হওয়ায় সকল শ্রেণীর হিন্দু নর-নারীর এতে অংশগ্রহণ করতে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তাই বাধা আসে নি।'[৫৬]

বাংলাদেশের সুন্নী মুসলমানরাও তো ধর্মান্তরিত। এদের চেতনায় পূর্বপুরুষদের সেই পূর্ব সংস্কার প্রবাহিত হচ্ছে না, এমন কথা বলা যাবে না। এ কারণেই, মুহররমের অনেক পৌত্তলিক আচার-আচরণ মেনে নেয়া হয়েছে। এবং এখনও সেই চেতনা বহমান। যে কারণে বাংলাদেশের শিক্ষিত এমন কি বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরা এমন অনেক কিছুতে বিশ্বাস করেন, যা যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়, [যেমন, কোরবানির মাংস, মুহররমে খেলে পুণ্য হয়। এ কারণে অনেকে মুহররম পর্যন্ত কোরবানির মাংস জমিয়ে রাখেন]।

স্থানীয় বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়ে, অনেক অঞ্চলে মুহররম অনুষ্ঠানের কিছু আচার, বিধিতে হয়ত পরিবর্তন এসেছে, উৎসবের মূল কাঠামো মোটামুটি একই আছে, যেমন— দশদিনের অনুষ্ঠান, ইমামবাড়াকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান, রোজা রাখা, মার্সিয়া বা জারী গাওয়া, তাজিয়া তাবুত নির্মাণ ও বিসর্জন, মিছিলে 'দুলদুল', মানত, মিছিল ও মেলা।

পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম, প্রচলিত আচার-বিধি কিভাবে বাংলাদেশের মুহররমকে প্রভাবিত করেছে, তা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে, গত শতকে জেমস ওয়াইজ খানিকটা আলোকপাত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, মুহররম পালনের দশ দিনের প্রস্তুতির সঙ্গে মিল আছে দুর্গা পূজোর প্রস্তুতির। তাজিয়া তাবুত-নির্মাণের সঙ্গে মিল আছে রথ-নির্মাণ এবং টেনে নেওয়ার। বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে ওয়াইজ ঢাকার একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। আগে, ওয়াইজের মতে, জনৈক নীলবাহার, বিবি ফাতেমার সম্মানে একটি সেনোটাফ নির্মাণ করেছিলেন। এবং কয়েক জেনারেশন ধরে বৎ হায়দরী নামে একটি কাগজের তাজিয়া রাখা হতো মুহররমের সময়। আশুরার তারিখে সবচেয়ে বৃদ্ধ এবং সম্মানিত ব্যক্তিটি সেখানে রাত্রি যাপন করতেন। এক পরী তাঁকে জানাতো, কখন তাজিয়াটি সরাতে হবে। ঐ নির্দেশিত সময়ে তাজিয়াটি বের করে একটি প্ল্যাটফর্মে বা 'গদী নীল বাহারে' রাখা হতো এবং ভক্তরা তখন হুড়োহুড়ি করতো তাজিয়াটি বহন করার জন্যে। একবার চলা শুরু হলে বিসর্জন না দেওয়া পর্যন্ত তাজিয়াটি কোথাও নামানো যেতো না।[৫৭]

মানত করা বা গ্রাম-বাংলায় দেবতায় থানে ভোগ দেওয়া প্রাচীন এক বিশ্বাস। আমরা যে সব অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছি, তার সব কটিতেই দেখা যাচ্ছে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই মানত করছেন। ঢাকাতে নুসরাত জঙ্গ-এর কবরে শিরনী দিয়ে মানত করা হতো।

জুলজানার পা ধোওয়ানোর ব্যাপারটি ধরা যাক— 'লক্ষ্য পূরণের আশায় মুহররম মাসের আশুরাতে তাজিয়া মিছিল চলাকালে মহিলারা ঘোড়া, জুলজানার সামনের পা দুটি একপাত্র মধু দিয়ে ধুয়ে দেন এবং জুলজানাকে হালুয়া জাতীয় কিছু খাবার দিয়ে পা ধোয়ানোর পর মানতকারী মহিলা নিজের মাথার চুল দিয়ে সে ঘোড়ার পা মুছে দেন।' পা ধোওয়ানোর পর যে দুধটুকু থাকে, তা বাসায় নিয়ে 'বন্ধ্যা নারীর সন্তান ধারণ ও কঠিন রোগ ব্যাধিতে এ দুধ পান করান।'[৫৮]

মুহররম অনুষ্ঠানের সূচনায় ডংকা বাজানো এবং দুর্গা পূজোর সূচনায় ঢাকে কাঠি দেওয়ারও তেমন কোন অমিল নেই। মোমবাতি দিয়ে ইমামবাড়া সাজানোর মূলে হয়ত আছে দেওয়ালি উৎসব। শুধু তাই নয়, হিন্দুদিগের চৈত্রোৎসব নিকটবর্তী হইলে অনেক সামান্য লোক যেমন ভজন শিক্ষা করিয়া থাকে, অত্রত্য [ঢাকার] মুসলমানরাও তেমন মুহররমের সময় নিকটবর্তী হইলে 'ইয়া হোসেন' বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে অভ্যাস করে।' মুহররমের দিন শুধু শিয়ারা নয়, দেখা যাচ্ছে হিন্দুরাও অনেকে উপবাস করতেন। ঢাকার কায়েতটুলীর হিন্দুদের উপবাসের কথা নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। কায়েতটুলীতে এক সময় বসবাস করতেন মুঘল দরবারে কর্মরত করণিকরা। তাঁদের ওপর-অলারা ছিলেন হয়ত শিয়া তা থেকেও উপবাসের ব্যাপারটি আসতে পারে।

ঢাকার মুহররমের প্রধান আকর্ষণ ছিল মিছিল, যার শুরু খুব সম্ভব নায়েব-নাযিমদের সময় থেকে। নায়েব-নাযিমরা কেন মিছিল শুরু করেছিলেন? তাঁরা ছিলেন শিয়া। সে ধর্মবোধ নিশ্চয় কাজ করেছিলো তাঁদের মধ্যে। এ ধরনের মিছিল ঈদের সময় বের হতো দিল্লীতে মুঘল সম্রাটদের আমলে। নিজেদের জাঁকজমক, প্রভাব প্রতিপত্তি, আধিপত্য দেখাবার অন্যতম মাধ্যমও ছিল এই মিছিল। কালক্রমে এ মিছিলে যুক্ত হয়েছিলো স্থানীয় উপাদান। ফলে, ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলের মত এটিও এক ধরনের সর্বজনীন রূপ পেয়েছিলো। সেই কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন বিনা দ্বিধায় অংশ নিতেন মুহররম মিছিল বা অনুষ্ঠানে।

ঢাকার মিছিলের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ভিস্তিদের যোগদান। ভিস্তিরা ছিলেন এক সময় ঢাকার নগর জীবনের অতি আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান। পানির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক, কারবালার সম্পর্কও পানির সঙ্গে। তাই সুন্নী হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবেই এসেছেন তাঁরা মিছিলে।

মুহররম অনুষ্ঠানের একটি প্রধান উপাদান মর্সিয়া বা ভাটিয়ালী জারী গাওয়া। এই গান গাওয়ার একটি কারণ—'লোকসমাজ সঙ্গীতপ্রিয়। কি হিন্দু কি মুসলিম এর ভেতর দিয়েই তাদের সংস্কৃতি-পিপাসা নিবারণ করে। মুহররম উপলক্ষে মার্সিয়া ও জারী গান তাই সাধারণ মানুষকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে।'[৫৯] তাছাড়া ভাটিয়ালী

সুরে জারী গান একেবারে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। আর তেমনি মেলাও, যা এখনও মুহররম অনুষ্ঠানের একটি প্রধান আকর্ষণ।

এবার ধরা যাক জন্মাষ্টমী মিছিলের কথা। আদিতে মিছিল ছিল একান্তভাবে ধর্মীয়। কালক্রমে, এই ধর্মীয় গণ্ডী বেশ খানিকটা ভেঙ্গে পরেছিলো। এবং এ কারণে, যে মিছিল ঢাকার প্রধান উৎসব, সে মিছিল, পরিতোষ সেনের ভাষায়, 'সক্রিয় অংশীদাররা হিন্দু হলেও আক্ষরিকভাবে এ মিছিল [ছিল] সর্বজনীন।' এ কথা স্বীকার করেছেন পরিতোষ সেনের সমসাময়িক কামরুদ্দীন আহমদও। লিখেছেন তিনি, 'জন্মাষ্টমীর মিছিল যেমন হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ সকলেরই কাছেই প্রিয় ছিল মহরমের মিছিল তেমনটি ছিল না।'[৬০]

কোনও উৎসব সর্বজনীন রূপ পায় তখন যখন এর ধর্মীয় রূপটি ক্ষীণ হয়ে যায়। আদিতে, হিন্দু, ধর্মের উপাদানগুলি মিছিলে প্রধান হলেও কালক্রমে ঢাকার নানাবিধ সামাজিক ও লোকায়ত উপাদান দখল করে নিয়েছিলো মিছিলের একটি প্রধান অংশ। যে কারণে, এ মিছিল সৃষ্টি করতো উত্তেজনার আগ্রহের। এ জন্য এ মিছিল পেয়েছিলো এক সর্বজনীন রূপ।

· ১৮৬৪ ও ১৮৭২-এর বর্ণনা থেকে দেখা যায়, দু'টি মিছিলে, এক পক্ষ অন্য পক্ষের নেতৃস্থানীয়দের দিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে। বিশেষ ঘটনার বর্ণনাও স্থান পাচ্ছে তাতে। এবং এ ধারা অব্যাহত ছিল এ শতকের প্রথমার্ধেও। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো বাবু কালচারের উপাদানসমূহ। যেমন, অশ্লীল গান, নাচ বা খেমটা। বলে রাখা ভালো যে, উনিশ শতকে ঢাকার খ্যাতি ছিল গান বাজনা, বাঈজী ও বারাঙ্গনার জন্য। ফলে, এ কালচারের ছাপ মিছিলে খানিকটা পড়া ছিল স্বাভাবিক। কারণ, মিছিলের নেপথ্যের আয়োজকরা ছিলেন নবাবপুর ও ইসলামপুরের ধনাঢ্য বণিকরা, যাঁরা ছিলেন বাবু বালচারের পৃষ্ঠপোষক।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং এ শতকের প্রথমার্ধে দেখা যাচ্ছে, লাঠিসোটা হাতে লাঠিয়ালরাও জড়িত হচ্ছে মিছিলে। ঢাকায় সে সময় বেশ কিছু আখড়া ছিল, সেখানে নিয়মিত চর্চা হতো কুস্তি ও লাঠিখেলার। এদের অনেকের উপাধি ছিল ডনগীর। মিছিলে ডনগীররা বা আখড়ার সদস্যরা নিজেদের জাহির করার জন্যে থাকবে না, এটা অস্বাভাবিক। অবশ্য, এ উপাদান মুহররম ও ঈদ মিছিলের প্রভাবও হতে পারে। মুহররম ও ঈদ মিছিলে নায়েব-নাযিমরা নেতৃত্ব দিতেন এক সময়।

কামরুদ্দীন আহমদ জানিয়েছেন, 'জন্মাষ্টমীর মিছিলে হাতির উপর হাওদায় উঠতেন হিন্দু নেতৃবৃন্দ।'[৬১] বিশ শতকে যে স্থান নিয়েছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। এবং হাতির পিঠে তাঁর নেতৃত্ব একদিকে যেমন মিছিলের গুরুত্ব, অন্যদিকে তেমন সর্বজনীনতা প্রমাণ করে।

মিছিল আগে বেরুতো দিনে। পেট্রোম্যাক্স ও কারবাইড চালু হওয়ার পর মিছিলের সময় চলে গেলো বিকেল বা সন্ধ্যায়, যাতে বাতির খেলা দেখানো যায়। ঝলমলে নিশান, কড়া নাকাড়া শিঙা— এ সব উপাদান এসেছে ঈদ ও মুহররমের মিছিল

থেকে।

পরিতোষ সেনের বিবরণ থেকে জানা যায়, মিছিল শেষের আকর্ষণ ছিল নবাবপুরের 'বড়ো চৌকি'। তাঁর ভাষায় সেখানে ছিল 'হিন্দু-মুসলমানী নক্সার কী অপূর্ব সমন্বয়।' আর যে সব পালা অভিনীত হতো সে চৌকিতে, তার ভিত্তি ছিলো লোকায়ত।

ঝুলন উৎসব লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো খুব সম্ভব বাবু কালচারের পৃষ্ঠপোষকদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে। ঝুলন ও হোলি সম্পর্কিত যে বর্ণনাগুলি উদ্ধৃত করেছি এগুলি প্রধানত উনিশ শতকের। এ সময় এ দুটি উৎসব পালিত হতো সমারোহের সঙ্গে। এ শতকের শুরু থেকেই, এ দুটি উৎসব জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। ঝুলনের কথা তো উল্লেখ করেছি, আর হোলির অবলুপ্তির কারণ খুব সম্ভব সাম্প্রদায়িক ইন্ধন ও নগর জীবনের বিকাশ।

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বাহারউদ্দিন, '*ইসলামী পার্বণের সামাজিক নৃতত্ত্ব*', দেশ, ৫৫/৫৫, কলকাতা, ১৯৮৭।
২. *ঐ*।
৩. *ঐ*।
৪. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, London, 1985, P. 36
৫. উদ্ধৃত, এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, পৃ: ৩০৮।
৬. *ঐ*।
৭. Jadunath Sarkar, *Bengal Nawabs*, Calcutta, 1952, p. 8
৮. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা* [আ. ম. ম. শরফুদ্দীন অনূদিত] ঢাকা, ১৯৮৫, ২০১।
৯. আশরাফ-উজ-জামান, '*থিয়েটার যুগের ঢাকা*', ঈদ সংখ্যা বিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ: ২০৯।
১০. আবদুস সাত্তার, '*ঢাকার ঈদ*', বিক্রম, ১/২৫, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ: ২১।
১১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *হাকিম হাবিবুর রহমান*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ: ২১-২২।
১২. আবুয্ যোহা নূর আহমদ, *উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, ঢাকা,* ১৯৮১, পৃ: ৬৯।
১৩. *ঐ*, পৃ: ৭০-৭১।
১৪. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ: ১২২।
১৫. বাহার উদ্দিন, *প্রবন্ধ*, পৃ: ৫০-৫১।

১৬. *ঐ*।

১৭. *ঐ*।

১৮. S. M. Taifoor, *Glimpses of Old Dhaka*, Dhaka, 1984 (2nd edition), pp. 195-197

১৯. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ২২।

২০. James Wise, *op cit*. p. 9

২১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন,

A. H. Dani, *Dacca · A Record of its Changing Fortunes,* Dacca, 1957

২২. Azimushan, *Dacca : History and Romance in Place Names,* Dacca, 1967, p. 34

২৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *দানীর গ্রন্থ,* দ্বিতীয় সংস্করণ।

২৪. জেমস টেলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা* [মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত] ঢাকা, ১৯৭৮।

২৫. দেখুন তাইফুরের *গ্রন্থ,* পৃ: ১২৫।

২৬. *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়,* কলকাতা, ১৮৫০।

২৭. *ঢাকা প্রকাশ,* ঢাকা, ১৮৬৪।

২৮. দেখুন, দানীর *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

২৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, শামসুর রাহমান, *স্মৃতির শহর,* চট্টগ্রাম, ১৩৮৬, পৃ. ৩৪-৪৩।

৩০. K. M. Azam, *The Panchayat System of Dacca*, Dacca, pp. 27-28.

৩১. *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন :* ৪৯, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৯০।

৩২. দেখুন, ভবতোষ দত্ত, *আট দশক,* কলকাতা, ১৯৮৮।

৩৩. নগেন্দ্রনাথ বসু, *বিশ্বকোষ,* ষষ্ঠ ভাগ, কলকাতা, ১৩০২, পৃ. ৬৩৫-৩৬।

৩৪. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, *'জন্মাষ্টমী',* ভারত কোষ, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা (প্রকাশকাল উল্লিখিত হয় নি), পৃ. ৪৫০।

৩৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ভুবনমোহন বসাক, *জন্মাষ্টমীর মিছিলের ঢাকা ইতিহাস,* ঢাকা, ১৩১৭।

৩৬. যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস,* কলকাতা, ১৩১৯, পৃ. ৩৭৬।

৩৭. *ঐ*।

৩৮. *ঐ*, পৃ. ৩৭৬-৭৭।

৩৯. দেখুন, ভুবনমোহনের উপরোক্ত *পুস্তিকা*।

৪০. *ঢাকার ইতিহাস,* পৃ. ৩৭৮।

৪১. *ঢাকা প্রকাশ,* ১৮৬৪।

৪২. *ঐ*, ১৮৭২।

৪২ক. মনোদা দেবী, *'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী',* এক্ষণ, ১৫/৩-৪ সংখ্যা, কলকাতা, বর্ষা ১৩৮৯, পৃ. ১১৫।

৪৩. ভবতোষ দত্ত, *আট দশক,* কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮।

৪৪. পরিতোষ সেন, *জিন্দাবাহার,* কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৬৬-৬৮।

৪৫. *ঐ*।

৪৬. মুনতাসীর মামুন, *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর,* ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৭-৪০।

৪৭. *ঐ*।

৪৮. দীনেশচন্দ্র সেন, *ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য,* কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৮৫-৮৬।

৪৯. *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর,* পৃ. ৩৮-৪০।

৫০. *ঢাকা প্রকাশ,* ১৯০৫।

৫১. আতোয়ার রহমান, *উৎসব,* ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৯০।

৫২. *ঐ*, পৃ. ৪৫।

৫২ক. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবুল মনসুর আহমেদ, *আত্মচরিত ঢাকা*।

৫৩. আবদুস সাত্তার, 'ঢাকার ঈদ', *বিক্রম,* ১/৩৫, ১৯৮৮, পৃ. ২১।

৫৪. উদ্ধৃত, মোমেন চৌধুরী, *'মুহররম পর্বে লৌকিক ধারা', বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন ৪৯,* পৃ. ১০০-১০১।

৫৫. জেমস ওয়াইজ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯।

৫৬. মোমেন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১২৩।

৫৭. জেমন ওয়াইজ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯।

৫৮. *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন : ৪৯,* পৃ. ৮৭।

৫৯. *ঐ*, পৃ. ১২৩।

৬০. কামরুদ্দিন আহমদ, *বাংলায় মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশের পথ,* প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১২৮২ [বাংলা সন], পৃ. ৩৯।

৬১. *ঐ*।

পুরানো ঢাকার ঘরবাড়ি

গল্পটি আমার এক মার্কিন প্রবাসী বন্ধুর মুখে শোনা। একবার, গাড়ি করে তার এক মার্কিনী বান্ধবীর সঙ্গে বেরিয়েছিলো সে ভ্রমণে; হাইওয়েতে গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি থামালো তার বান্ধবী। বললো, 'চল, তোমাকে সুন্দর এক ঐতিহাসিক জিনিষ দেখাবো।' কৌতূহলী বন্ধু নামলো গাড়ি থেকে। বান্ধবী হাইওয়ে ছেড়ে খানিকটা হেঁটে এসে দাঁড়ালো প্রাচীন এক বৃক্ষের সামনে। বলল, 'জানো, ১৭৭৬ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই এলাকায় লড়াই হয়েছিলো। আমাদের কয়েকজন বীর যোদ্ধা এ বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিলেন। এই গাছটা গুলিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো।' বৃক্ষের শরীরে মমতাভরে হাত বুলোচ্ছিলো বান্ধবী, আবেগে গলা বুজে আসছিলো তার। ভারী অবাক হয়েছিলো আমার বন্ধুটি। চারপাশে তাকিয়ে সে দেখেছিলো আশেপাশের জায়গাটি পরিচ্ছন্ন, বসার দু'একটা বেঞ্চও আছে আর বৃক্ষের পাশে আছে একটি ফলক, যেখানে দুশো বছর আগের সে ঘটনার কথা লেখা।

বন্ধুটি আমাকে বলেছিলো তার ভারী মায়া হয়েছিলো মেয়েটির জন্য। অনাথের মত সে ইতিহাস খুঁজে বেড়াচ্ছে, নিজেকে জানার চেষ্টা করছে। 'তা বেচারীর আর দোষ কি। তাদের জাতির ইতিহাসতো মাত্র দুশো বছরের পুরানো। আর প্রাচীন আমলের কথা বাদদিই আমাদের এই আধুনিক ঢাকার বয়সই তো চারশো। তাও রাজধানী ছিল সে সময়। একথা বলার সময় গর্বের খানিকটা ছোঁয়া ছিল তার স্বরে। কিন্তু এ শহরের ইতিহাস জানা বা মমতাভরে তার নিদর্শন সংরক্ষণে তার আগ্রহ কতটুকু বা কি করতে পারে সে— বিষয়ে কোন সদুত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

ইউরোপে, বিশেষ করে জার্মানীতে এখন পুরানো শহরের বিশেষ বিশেষ এলাকা সংরক্ষণের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পূর্ব ইউরোপে-যার প্রতি পশ্চিম ইউরোপের তাচ্ছিল্যের শেষ নেই, সেখানেও অর্থের প্রাচুর্য না থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের ব্যাপক সংস্কার চলছে এবং পশ্চিমা পত্রিকাগুলিতে ফলাও করে সে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন রকমের প্রচার মাধ্যম, স্থানীয় পৌরসভা সাধারণ মানুষের মনে 'স্মৃতি সংরক্ষণের' প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করছে, জনমত সংহত করে তুলছে।

সম্প্রতি পূর্ব ইউরোপের একটি শহরে কর্তৃপক্ষ শহরের একটি বিশেষ এলাকাকে সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এলাকাটি গড়ে উঠেছিলো ছ'সাতশো বছর আগে। এলাকার বাড়িঘরগুলি পাথরের তৈরি এবং নির্মিত হয়েছিলো এক বিশেষ স্থাপত্য রীতিকে অনুসরণ করে। সংরক্ষণের আগে শহরের সবচেয়ে নোংরা ও ঘিঞ্জি এলাকা বলে পরিচিত এই এলাকাটিতে বাস করতেন শ্রমিকরা। সংস্কারের অভাবে বাড়িগুলি ছিল প্রায় ধ্বংসের পথে। স্থানীয় পৌরসভা তখন চাঁদা তুলে সম্পূর্ণ এলাকাটিকে সংরক্ষণের জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পুরো এলাকার বিশেষ স্থাপত্যিক রীতির বাড়িঘর, গলি, সবকিছু অটুট রেখে, আধুনিক গার্হস্থ্য সুবিধাদি দিয়ে সংরক্ষিত হলো এলাকাটি। এবং শ্রমিকরাই আবার সেখানে থাকার অনুমতি পেলেন এ শর্তে যে, বাড়িগুলির কোন ক্ষতি না করে তাঁরা বসবাস করবেন। এভাবে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হচ্ছে, বাসস্থান সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে না, বরং এলাকাটি একটি বিশেষ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। পৌর কর্পোরেশন আরো লাভবান হচ্ছে তাতে।

ইংল্যান্ডে তো পুরানো প্রাসাদের মালিকদেরই প্রতি বছর কিছু অনুদান দেওয়া হয় নিজ প্রাসাদ সংরক্ষণের জন্য। বিনিময়ে পর্যটকদের জন্য সে প্রাসাদ উন্মুক্ত রাখতে হয়। জার্মানীতে সাত আটশো থেকে হাজার বছরের পুরানো প্রতিটি দুর্গ প্রাসাদই সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অনেক প্রাসাদ দুর্গ এত সুন্দরভাবে সংরক্ষিত যে, মনে হবে, রূপকথার রাজ্যেই বুঝি চলে এলাম। এ ছাড়া পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যের বেশ কিছু দেশে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেসব বাড়িতে বসবাস করতেন সেগুলি সংরক্ষণ করা হচ্ছে, নিদেন পক্ষে তাঁদের স্মৃতিতে একটি ফলক লাগানো রয়েছে। উদ্দেশ্য, কোন জেনারেশনই যেন নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য বিস্মৃত না হয়, যেন অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ অক্ষুণ্ন থাকে। নিজেকে যেন শেকড়হীন মনে না হয়। যেন গর্ব করার কিছু থাকে। এর সঙ্গে একটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যও থাকে— পর্যটক আকর্ষণ।

আজকের এই পুরানো ঢাকা শহরতো অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। মুঘল রাজধানী, ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিদের পদচারণা, তাঁদের নির্মিত মসজিদ, মন্দির অট্টালিকা— কত কিছুই তো ছিল এখানে, আছেও। কিন্তু আমরা ক'জন জানি শহরের ইতিহাস? ক'জন জানি যে, এ শহরের গর্ব করার মত অনেক কিছু ছিল? ক'জন দেখতে গেছি ইতিহাসখ্যাত একটি অট্টালিকা, ক'জন জানি যে স্বদেশী আন্দোলনের মূল সংগঠন অনুশীলন সমিতি গড়ে উঠেছিলো ওয়ারীর ৫১ [তৎকালীন] নং বাড়িতে। ক'জন জানি যে, যে ব্রাহ্ম আন্দোলন পূর্ববঙ্গে সৃষ্টি করেছিলো আলোড়নের, তা প্রথম ১৮৪৬ সালে স্থাপিত হয়েছিলো শাঁখারি বাজারের পূর্ব সীমায়, রাস্তার উত্তর দিকের একটি বাড়িতে? আজ যদি এসব পুরানো বাড়িতে এসব উল্লেখ করে একটি ফলক লাগানো থাকতো তা'হলে আজকের জেনারেশনের একজন তা পড়ে আগ্রহান্বিত হতো নিজের ঐতিহ্য সম্পর্কে, সবেতন হতো ইতিহাস সম্পর্কে।

যদি সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনা নেওয়া হতো তা'হলে ঢাকা পরিণত হতো পৃথিবীর

সুন্দর এক শহরে। একটি আধুনিক সুন্দর শহরের সব বৈশিষ্ট্যই ছিল ঢাকা শহরের। এর সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো নগরীর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী। অন্যান্য শহর, এ ধরনের সম্পদ পেলে যত্নের সঙ্গে তা সংরক্ষণ করে। যেমন, লণ্ডনের টেমস বা প্যারিসের সেইন নদী। বুড়ীগঙ্গার এক দিক, যে তীরে গড়ে উঠেছে শহর, এ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত কোন না কোনভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছিলো। গত ২৫/৩০ বছরে তার অবনতি ঘটেছে। বুড়ীগঙ্গায় সেতু হলে অপর তীরও একইভাবে ধ্বংস হবে। কিন্তু এখনও সময় আছে বাকল্যাণ্ড বাঁধ ও অপর তীর সংরক্ষণ করার। কর্তৃপক্ষকে তা নিয়ে ভাবতে হবে, কারণ, শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সঙ্গে এটি জড়িত।

আধুনিক সব শহরে নিসর্গায়ন বা 'ল্যাণ্ড স্কেপিং-এর দিকে জোর দেওয়া হয়। আমাদের সরকারী স্থপতিরা এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন কিনা জানি না। ১৯১৭ সালে, তৎকালীন সরকার প্যাট্রিক গ্যাডেসকে নিয়োগ করেছিলেন এ কাজে। গ্যাসে একটি পরিকল্পনাও পেশ করেছিলেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। ১৯৫৬ সালে ডিআইটি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলো যে পরিকল্পনায় নদীর দু'তীরের কোন স্থান ছিল না।

কিন্তু শহরের এই বাড়ির জঙ্গলে দু'একটি বাড়ি সংস্কার করলে আশে-পাশের জায়গাটুকু কত নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উল্টোদিকের চামেরী হাউস। এর সামনের রাস্তার বোগেনভিলিয়াটি বর্বরের মত না কাটলে এ জায়গাটুকু ঢাকার একটি বিউটি স্পষ্ট হয়ে উঠতো। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য হাইকোর্টের পাশে মজা ডোবা ভরাট ও বাংলা একাডেমীর পুরানো ভবন সংস্কার।

ঢাকার একটি পুরানো এলাকা শাঁখারী বাজারের কথা ধরা যাক। মুঘল আমল থেকেই এলাকাটি বিখ্যাত এবং ঢাকা শহরে একমাত্র শাঁখারীরাই বোধ হয় তাদের চারশো বছরের পুরানো পেশা বংশানুক্রমে একই এলাকায় থেকে চালিয়ে যাচ্ছেন। আধুনিক গার্হস্থ্য সুবিধা দিয়ে এবং খানিকটা সংস্কার করে, শাঁখারী বাজারকে যদি সংরক্ষণ করা যায় তা হলে তা অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে। শাঁখার তৈরি জিনিসপত্রেরও বিক্রি বাড়বে। এ ধরনের আরো এলাকা, স্থাপত্যিক নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঢাকা শহরে, যা সংরক্ষণ করলে শুধু ঐতিহ্যের সংরক্ষণই হয় না পর্যটকও আকর্ষণ করে। বিদেশী অতিথি এলে আমাদের জাতীয় যাদুঘর ছাড়া দেখাবার কিছু নেই। তখন অনেক কিছু থাকবে। দৃঢ় হবে নতুন ও পুরানো ঢাকার সংযোগ।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হয়েছে এ প্রবন্ধ। আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্কৃতির একটি ক্ষুদ্র অংশ পুরানো ঢাকার পুরানো ঘরবাড়ি নিয়েই এ আলোচনা। ঢাকাকে বেছে নেয়ার কারণ, ঢাকা এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শহর এবং রাজধানী। পুরানো ঢাকা নিয়ে আলোচনার কারণ, পুরানো ঢাকা তখন যেমন, এখনও তেমন শহরের প্রাণকেন্দ্র। পুরানো ঢাকার পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে বুড়ীগঙ্গা আর ঐতিহাসিক সব নিদর্শন সেখানেই। আর পুরানো ঘর বাড়ি শুধু বিশেষ একটি সময়ের বা বিশেষ কোন ব্যক্তিরই স্মৃতি বহন করে না, এর মাধ্যমে সূত্র পাই আমরা এক সময়ের সামাজিক ইতিহাসের, স্থাপত্যিক রীতির। বিস্তারিত আলোচনা এখানে অসম্ভব বলে সীমিত

পরিসরেই আলোচনা করবো। প্রথমে তুলে ধরবো একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা। পুরানো ঘর বাড়ির বিবরণ এবং তা কতটুকু সম্পর্কিত আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের সঙ্গে বা আদৌ কি কোন বাড়ি সংরক্ষণের যোগ্য? বা কি হবে সংরক্ষণ করে? এ সবই নগর পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা হবে। পুরানো ঘর বাড়ি বলতে এখানে আবাস গৃহই বুঝিয়েছি। আলোচনার ধর্মীয় স্থাপত্যকে [প্রাসঙ্গিক না হলে] বাদ দিয়েছি। তবে, আলোচনা কালে, পুরানো ঢাকার বাইরের কিছু ঘর বাড়িও এসে যাবে, তা বলাই বাহুল্য।

২

ঢাকা শহর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো ১৬১০ সালে মুঘল রাজধানী স্থাপনের পর। প্রশাসন, ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে ছিল এই সমৃদ্ধি। মুঘল আমলে লোকসংখ্যার সঠিক হিসেব অবশ্য পাওয়া যায়নি। তবে ১৭০০ সালে টেলরের এক হিসেব থেকে জানা যায়, লোক সংখ্যা ছিল নয় লক্ষ।[১] মুঘলরা ঢাকায় লোকজনদের বসতি স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের জন্যে দান করেছিলেন লাখেরাজ সম্পত্তি।[২] বস্তুত, বলা যেতে পারে, লাখেরাজ জমির ওপরেই গড়ে উঠেছিলো ঢাকা শহর। এবং এ জমির জন্যে কোন কর দিতে হতো না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এটিও ছিল একটি কারণ।

মুঘল আমলে ঢাকা শহর প্রায় বিস্তৃত ছিল সদরঘাট থেকে মিরপুর পর্যন্ত। তবে, অধিকাংশ বসতি ছিল নদীর তীর জুড়ে পুরানো ঢাকায়। ফুলবাড়িয়া ছাড়িয়ে মিরপুর পর্যন্ত কিছু কিছু অংশে বসতি থাকলেও অধিকাংশ এলাকা জুড়েই ছিল বাগান, জলাজঙ্গল আর ক্যানাল। বিদেশী পর্যটকদের লেখায় আমরা সে আমলের ঢাকার সমৃদ্ধির বিভিন্ন বিবরণ পাই তবে, আমাদের মনে রাখতে হবে, সে সমৃদ্ধি ছিল গুটিকয় লোকের — মুঘল অমাত্য, বিদেশী ব্যবসায়ী, প্রশাসনের সঙ্গে জড়িয়ে স্থানীয় ও বিদেশী সহযোগীর। সাধারণ মানুষের অবস্থা, আজকের সাধারণ মানুষের তুলনায় খুব ভালো ছিল, তেমন মনে করার কোন কারণ নেই।

মুঘল আমলে, উচ্চবর্গের অন্তর্গত ছিলেন-অমাত্য, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাবৃন্দ, জমিদার প্রমুখ। সুবাদারের সঙ্গে যেমন তাঁদের মর্যাদাগত পার্থক্য ছিল, তেমনি তাঁরাও নিম্নবর্গের সঙ্গে পছন্দ করতেন পার্থক্য রাখতে। এ কারণে, বিভিন্ন বর্গের আবাসিক এলাকাসমূহও গড়ে উঠেছিলো বিভিন্ন এলাকায়।

মুঘল আমলে, সুবাদারদের অনেকে বসবাস করতেন পুরানো কেল্লার [বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগার চত্বরে] যা এখন নিশ্চিহ্ন। এবং সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই দুর্গ বা প্রাসাদ। সুবাদারের জন্যে একটি প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিলো পোস্তায়। তা এখন নেই। তবে এখনও টিকে আছে লালবাগ দুর্গ, বড় কাটরা এবং ছোট কাটরা। বড় কাটরায় একসময় বাস করেছেন নায়েব নাযিম। ঢাকার এ দু'টি স্থাপত্যকর্ম ছিল খানিকটা জাঁকালো। কারণ, এগুলি নির্মিত হয়েছিলো মুঘল প্রশাসকের প্রত্যক্ষ

তত্ত্বাবধানে।

মুঘল আমলেও, বুড়ীগঙ্গার তীর ছিল সবার আকর্ষণ। অমাত্য বা সুবাদার সেখানেই নির্মাণ করতে চাইতেন তাঁর বাসগৃহ। করেছিলেনও অনেকে। কর্মকর্তারা বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন বখশীবাজার, আজিমপুর বা নওয়াবপুরে।[৩] গরীব এলাকা এবং অভিজাত এলাকার মাঝামাঝি যেমন দু'শ্রেণীর পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন ধনীরা, যাঁদের ঠিক তেমন পদমর্যাদা ছিল না। এ এলাকাগুলি ছিল-- বেচারাম দেউড়ি, আগা সাদেক ও আলী নকি দেউড়ি প্রভতি।[৪] মুঘল অভিজাতরা শহর সীমানার বাইরে গড়ে তুলেছিলেন বাগান, বাগান বাড়ি। যেমন, বাগ চাঁদ খান, বাগ হোসেনউদ্দিন, আরামবাগ, বাগ ই-বাদশাহী প্রভৃতি।

মুঘল আমলে উচ্চবর্গের সদস্যরা কি ধরনের আবাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন, তা এখন জানার উপায় নেই। তবে ধরে নিতে পারি, স্থানীয় কারিগরদের সহায়তায় নির্মিত হয়েছিলো কিছু ইটের বাড়ি, যেগুলির তেমন কোন স্থাপত্যিক সৌন্দর্য ছিল না। তাইফুর উল্লেখ করেছেন, রমনা এলাকার [বাগ-ই-বাদশাহী] মুঘল আমলে প্রতিষ্ঠিত মহল্লা শুজাতপুর ও মহল্লা চিশতিয়ার তিনি ইটের তৈরি বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন।[৫] কিন্তু সেগুলির গড়ন সম্পর্কে তিনি কিছুই উল্লেখ করেননি।

ইউরোপীয় বণিকরাও প্রায় একই সময়ে এসেছিলেন ঢাকায়। প্রথম দিকে, মূল শহর ছাড়িয়ে দূরে তেজগাঁয় [বর্তমান খামার বাড়ি এলাকা] তাদের কুঠি ও আবাসগৃহ তৈরি করেছিলেন। পরে অবশ্য তারা চলে এসেছিলেন মূল শহরে।

মুঘল আমলে 'রইস আদমিদের' বাড়িঘর কেমন ছিল, তার বিবরণ আমরা বড় একটা পাই না। তবে, একটি সূত্র অনুযায়ী তারা প্রধানত বাংলো ধাঁচের বাড়িতে বসবাস করতেন, যা নির্মিত হতো বাঁশ এবং খড় দিয়ে। এসব বাড়িঘর সাধারণত টিকতো বছর পনেরোর মতো।[৬] ইসলাম খাঁ থাকতেন তাঁর বিলাসবহুল বজরা 'চাঁদনী'তে [চাঁদনী ঘাট নামের উৎস সেখান থেকেই]।[৭] মুঘল আমলে স্থানীভাবে অর্থাৎ ইট দিয়ে প্রধানত তৈরি হয়েছিলো, দুর্গ, মসজিদ এবং কাটরা। শায়েস্তা খানের আমলেই এসব নির্মিত হতে থাকে। এর আগে বা পরে যে কিছু নির্মিত হয়নি, তা নয়, তবে শায়েস্তা খানের সময় স্থাপত্যের— বিশেষ করে মসজিদ নির্মাণের বিশেষ একটি রীতি ছিল। এখানে বলে রাখা ভালো, হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্য রীতির সূত্র ধরেই অগ্রগতি হয়েছিলো মুসলমান স্থাপত্য রীতির।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের জলবায়ুই সাধারণ মানুষের বাড়িঘর ও তাঁর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছে। বাংলাদেশের স্থাপত্যকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে-- লোকায়ত এবং ধর্মীয়। লোকায়ত স্থাপত্যের অন্তর্গত সাধারণ মানুষ-- বিশেষ করে গ্রামের মানুষের বাড়িঘর এবং ধর্মীয় স্থাপত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের উপাসনাগার। জলবায়ুর কারণেই বাংলাদেশে জাঁকালো বা বৃহৎ কিছু নির্মিত হয়নি [দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে]। তা সম্ভবও ছিল না। কারণ, এ ধরনের জলবায়ুতে প্রতিরোধক উপাদানের অভাব। সাধারণ মানুষের বাড়ি তৈরির উপাদান [বিশেষ করে গ্রামের] খুবই সামান্য—

খড়, বাঁশ, বেত, ছন বা কাঠ হাতের কাছেই যা পাওয়া যায়, উনিশ শতকে ঢাকারও সাধারণ মানুষ বসতবাড়ি নির্মাণের জন্যে এ সব উপাদানই ব্যবহার করতেন।[৮]

গ্রামের ঘরবাড়ির আরেকটি বৈশিষ্ট্য জানালার অভাব। প্রচণ্ড বর্ষা থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই বোধহয়, জানালা না রাখা। তবে, যেহেতু ঘরের দেয়াল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৈরি বাঁশের বেড়া দিয়ে, সে জন্যে বায়ু চলাচলে অসুবিধা হয় না, বা জানালার অভাব মিটে যায় আর খড়ের চাল ঢালু হওয়াতে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে যায় নিচে। বাড়িঘর তৈরির এই রীতি বা বৈশিষ্ট্য স্থাপত্যে বাংলা ঘর নামে পরিচিত এবং এর প্রভাব দেখা যায় সুদূর দিল্লীর দুর্গেও। অন্যদিকে, ঢাকা শহরেও একশো দেড়শো বছর আগে দেশীয়দের তৈরি ইটের বাড়িগুলিতেও দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানালা, আলোর অভাব। এর কারণ, দেশীয়রা যাঁরা এক অর্থে ছিলেন গ্রামেরই বাসিন্দা— গ্রামীণ স্থাপত্য রীতি মন থেকে তারা মুছে ফেলতে পারেননি।[৯]

মুসলমানরা এ দেশে পদার্পণ করে স্থাপত্যে কারিগরী ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন এনেছিলেন। প্রাক-মুসলিম যুগে গাঁথুনির প্রধান উপাদান ছিল কাদা। মুসলমানরা এর পরিবর্তে চুন সুরকি এবং ভিতরে যেন পানি ঢুকতে না পারে সে জন্যে চুনের পলেস্তরা ব্যবহার করেছিলেন। হয়ত এই কারিগরী উন্নতির জন্যে এখনও সে যুগের কিছু নিদর্শন টিকে আছে। তুর্কী আফগানরা এদেশে আসার পর চালু করেছিলেন খিলান, গম্বুজ এবং মিনার। কিন্তু ইটের তৈরি মসজিদ নির্মাণে তাদের নির্ভর করতে হয়েছিলো দেশীয় কারিগরদের ওপর। ফলে, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের মতে, 'মুসলিম স্থপতিদের আঙ্গিকে হিন্দু বৌদ্ধ জ্যামিতির স্বপ্ন মদির হয়ে উঠেছে। ফল হয়েছে অনন্য, একেবারে দেশজ, অথচ গম্ভীর, বিষণ্ণ।'[১০]

মুঘল আমলে যেহেতু ধর্মীয় স্থাপত্যে জোর দেওয়া হয়েছিলো বেশি তাই স্থাপত্য বিষয়ক এ প্রসঙ্গ আনতে হলো। এখানে এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, এখানকার কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের পৃথিবী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল না তেমন, সমৃদ্ধও ছিলেন না তারা। শাসনের কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থান এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা লোককে করে তুলেছিলো নিঃসঙ্গ যা অভিঘাত হেনেছে তার কল্পনায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মুসলমান বা ইংরেজ আমলে তৈরি মসজিদসমূহে ইসলামের গতিময়তা বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কোন ছাপ নেই, যা আছে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে নির্মিত মসজিদে, বা উপরোক্ত কারণেই হয়ত এখানকার স্থপতিরা সাহসী বা কল্পনা প্রবণ হতে পারেননি। মুঘল বা ইংরেজ আমলের দেশীয়দের তৈরি বাড়িঘরের ক্ষেত্রে এ সূত্র প্রযোজ্য।

মুঘল অমত্যরা যে সব এলাকা গড়ে তুলেছিলেন, যেমন, আজিমপুর, বখশীবাজার, নওয়াবপুর, প্রভৃতি -- সেসব জায়গায়, আগেই উল্লেখ করেছি, হয়তো বাঁশ খড়ের বাড়ি তৈরি করতেন [ইটের তৈরি দু'একটি বাড়িঘরও হয়ত ছিল]। তবে, অষ্টাদশ শতকে নিশ্চয় তারা ইটের তৈরি কিছু আবাস গৃহ নির্মাণ [বিভিন্ন দেউড়ির ধ্বংসাবশেষ] করেছিলেন। এমনও হতে পারে, এসব এলাকায়ও ঐ সময় ইটের তৈরি কিছু ঘর বাড়ি নির্মিত হয়েছিলো। তবে, ধরে নিতে পারি, এসব বাড়ি ঘরের তেমন কোন

স্থাপত্যিক সৌন্দর্য ছিল না। শুধু একটি ক্ষেত্রে নিশ্চিত হয়ে বলা যায় যে, সাধারণ মানুষেরা পড়ো পড়ো খড়ো কুটিরেই বসবাস করতেন।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়েছিলো ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে। সে থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত ঢাকা শহরের ইতিহাস ক্ষয়ের ইতিহাস। ব্যবসা বাণিজ্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিলো, শহরের পরিধি হ্রাস পেয়েছিলো, হ্রাস পেয়েছিলো লোকসংখ্যাও। ঢাকা শহর পরিণত হয়েছিলো অস্বাস্থ্যকর নোংরা একটি শহরে। ১৮৪০ সালে জেমস টেলর লিখেছিলেন যে অংশটি নিয়ে শহরটি গঠিত, তা কেবল নদীর তীরেই সীমাবদ্ধ এবং তার বরাবর শহরের রাস্তাঘাট বাজার গলিপথ ইত্যাদি দৈর্ঘ্যে চার মাইল এবং প্রস্থে প্রায় $১^১/_২$ মাইল বিস্তৃত।[১১]

কিন্তু এ সময় থেকেই দেখি, অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়া থেকে শহরে ইটের তৈরি ঘরবাড়ি নির্মিত হচ্ছে। এগুলির নির্মাতারা ছিলেন দেশী ও অবাঙ্গালী জমিদার, বিদেশী বণিক, মুঘল শাসকবর্গের কিছু অনুচরদের পরিবারবর্গ, উঠতি হিন্দু পেশাজীবী শ্রেণী প্রভৃতি। এসব ছাড়া অবশ্য শহরের অধিকাংশ বাড়িঘর ছিল খড়ের। আঠারো শতকের শেষে বা উনিশ শতকের শুরুতেও ঢাকায় ছিল 'ঘরবাড়ির মহল'। এর অর্থ, যে স্থানে খড়, বাঁশ, নলখাগড়া প্রভৃতি বাড়ি তৈরির জিনিসপত্র পাওয়া যেতো। তবে, ব্যবসায় মাঝে মাঝে খানিকটা মন্দা দেখা দিলে, গোপনে কোন এক কুটিরে লাগিয়ে দেয়া হতো আগুন। ব্যস, মহল্লার পর মহল্লা সাফ হয়ে যেতো। লোকে আবার ভিড় জমাতো ঘরকাচি মহলে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকায় কিছু আবাসিক এলাকাও গড়ে উঠতে থাকে। যেমন, গেণ্ডারিয়া, উয়ারি, স্বামীবাগ প্রভৃতি। নতুন মধ্যবিত্ত পেশাজীবীরা সেখানে নির্মাণ করেছিলেন তাঁদের বাসগৃহ, আর নদীরতীর দখল করে ছিলেন 'অভিজাত' ধনীরা। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করবো।

উনিশ শতকের শুরুতে, মুঘল আমলের যে সব স্মৃতিসৌধ তখনও টিকে ছিল ঢাকায় সেগুলি অবহেলা অযত্নে ছিল প্রায় ধ্বংসের পথে। এ প্রসঙ্গে ১৮২৪ সালে বিশপ হেবার তাঁর ভ্রমণপঞ্জীতে লিখেছিলেন

'পুরানো ঢাকা কলকাতার চিৎপুরের মত বাজে। কিন্তু আশেপাশে আছে কিছু সুন্দর ধ্বংসাবশেষ। সেগুলিকে ঘিরে আছে আবার ছোট ছোট নোংরা কুটির। ইটের তৈরি একটি দুর্গ নজরে পড়লো যা ব্যবহৃত হতো প্রাসাদ হিসেবে। এর স্থাপত্য মনে করিয়ে দেয় মস্কোর ক্রেমলীনের কথা। গ্রীকদের বাড়িগুলি আধুনিক এবং ভূতপূর্ব নওয়াব ভালবাসতেন এ এলাকায় থাকতে। অবশ্য, নদী এ ধরনের বেশ কিছু বাড়ি গিলে নিয়েছে।

ঢাকার তিন-চতুর্থাংশ বাসিন্দাই মুসলমান এবং তাদের প্রত্যেকের বাড়ির সদরে আরবী বা ফার্সী ভাষায় লেখা ফলক আছে। প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িই জীর্ণ। আর বাড়িগুলি শহরের বাইরে হওয়ায় জঙ্গলে ঢাকা। ফলে সেখানকার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর।'[১৩] হেবারকে ঢাকায় কালেকটার মিঃ মাষ্টার জানিয়েছিলেন, ঢাকার

লোকসংখ্যা ছিল তখন ৩০০,০০০ এবং বাড়ি বা কুটিরের সংখ্যা ছিল নব্বই হাজারের ওপর।

ঢাকার বাড়িঘর সম্পর্কে একটি বিশদ ও প্রয়োজনীয় উপাত্ত পাই আমরা ১৮৩২ সালের একটি রিপোর্টে। এটি তৈরি করেছিলেন ঢাকার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ হেনরী ওয়ালটার।[১৪] ওয়ালটারের আগে বা পরে ও ধরনের আর কোন রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিলো কিনা জানি না। এখানে ওয়ালটারের প্রয়োজনীয় কিছু উপাত্ত তুলে ধরা হলো।

ওয়ালটারের মতে, তখন ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৬৬৬৬৭। এর মধ্যে মুসলমান, হিন্দু ও অন্যান্যের [অর্থাৎ আর্মেনী, ইংরেজ প্রভৃতি] সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৫,২৩৮, ৩১,৪২৯ এবং ৩২২ জন। ঢাকার ধর্মীয় অট্টালিকার সংখ্যা ছিল

মসজিদ ঃ ১৫৩
মকবেরা ঃ ১০৯
সঙ্গত (শিখদের) ঃ ১০
আখড়া (হিন্দুদের) ঃ ৫২
মন্দির ঃ ৫৫
গীর্জা ঃ ৪
সরাইখানা ঃ ৩

এদের অধিকাংশই ছিল তখন ধ্বংসের পথে।

ঢাকায় তখন থানার সংখ্যা ছিল দশটি আর মহল্লা ১৭৮টি। ১৭৮টি মহল্লায় বাড়ির সংখ্যা ছিল ১৬২৭৯টি। এ মধ্যে বসত বাড়ির সংখ্যা ছিল ১৬২৫৭টি। বসতবাড়ির মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের কয়টি বাড়ি ছিল তার সংখ্যা—

মুসলমান ঃ ৮৮২৫
হিন্দু ঃ ৭৩২৭
আর্মেনী ঃ ৪২
পর্তুগীজ ঃ ৪১
গ্রীক ঃ ২১
ফরাসী ঃ ১

ঢাকা শহরে ঐ সময় ইটের তৈরি বাড়ির সংখ্যা ছিল ৩১৬৪টি। আর খড়ের কুটির ১৭৯৬৩টি। মোট ২১১২৭টি। নীচের সারণীতে দেখুন কোন মহল্লায় কয়টি বাড়ি ছিল—

মহল্লা	ইটের তৈরি	খড়ের তৈরি	মোট
ইসলামপুর	৬০৪	২৫১৩	৩১১৭
গার্ডকিল্লা	১২২৫	২১১০	৩৩৩৫
ঢাকেশ্বরী	১১২	৬৯৪	৮০৬
সুলতানগঞ্জ	১৮	১৯২৭	১৯৪৫
সুজাতপুর	৫৩	৫৪১	৫৯৮
পূরব দরওয়াজা	১৯২	১৬৭৪	১৮৬৬
আমলীগোলা	২৫১	৪০২৮	৪২৭৯
নওয়াবপুর	২১২	১৫৫৮	১৭৭০
নারিন্দা	২৩৮	১৭৫৯	১৯৮৭
শরাফতগঞ্জ	২৫৯	১১৬৯	১৪২৮

এর মধ্যে হিন্দু বাড়ি বেশি ছিল আমলীগোলা এবং ইসলামপুর, ১২৩৯টি করে। সবচেয়ে কম ছিল সুজাতপুরে, ২৮৬টি। মুসলমানদের বাড়ি বেশি ছিল গার্ডস কিল্লায় (৩১টি মহল্লা) ১৬৬৩টি। কম ছিল সুলতানগঞ্জে (১২টি মহল্লা)— ৪৮০টি। আর্মেনীদের বাড়ি বেশি ছিল ইসলামপুরে (২০টি মহল্লা)— ২১টি। কম ছিল পূরব দরওয়াজায় (১৯টি মহল্লা)— ২২টি। পর্তুগীজদেরও অধিকাংশ বাস করতেন ইসলামপুরে। সেখানে তাদের বাড়ির সংখ্যা ছিল ১৯টি আর নওয়াবপুর (১৭টি মহল্লা) ও শরাফতগঞ্জে (১৬টি মহল্লায় ছিল ১টি করে। গ্রীক ও ইংরেজদের বাড়ির সংখ্যা বেশি ছিল গার্ড কিল্লা ও ইসলামপুরে। সংখ্যা ১২ ও ৮। এছাড়া ইসলামপুরে গ্রীকদের ৩টি, শরাফতগঞ্জ ও গার্ড কিল্লায় ইংরেজদের ছিল ৭ ও ১টি বাড়ি।

একতলা, দোতলা, ও তিনতলা— এই তিন রকমের ইটের তৈরি বাড়ি ছিল ঢাকা শহরে। এদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২৫৩, ১৯১০ ও ১০৪টি। প্রাচীর ঘেরা বাগানশুদ্ধ বাড়ির সংখ্যা ছিল ১৫৩টি। এই তিন রকমের বাড়ি ইসলামপুরে ছিল বেশি। অর্থাৎ ঐ আমলে ইসলামপুর ছিল বর্ধিষ্ণু ও অভিজাত এলাকা। তবে, আমরা ধরে নিতে পারি, বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত এই বাড়িগুলি ছিল সাদামাটা। এগুলোর অধিকাংশের স্থাপত্যিক কোন সৌন্দর্য বা গুরুত্ব ছিল না।

ঢাকা শহরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ বুড়ীগঙ্গার তীর দখল করেছিলেন শহরের অভিজাতরা। অর্থাৎ নদীর ধার ঘেঁষে ছিল জমিদার প্ল্যান্টার ও অভিজাতদের বাড়ি। এবং এগুলির এক ধরনের স্থাপত্যিক ঐক্য ছিল। ঢাকা শহরে সুদৃশ্য বাড়ি বলতে এগুলিকেই বোঝাতো। জেমস টেলর লিখেছেন, ১৮৪০ সালে নদী তীরের এ অট্টালিকা শোভিত ঢাকা নগরীকে তখন 'ভেনিসের ন্যায় জলোত্থিত নগরী বলে প্রতীয়মান হতো।'[১৫]

কিন্তু দূর থেকে যাই মনে হোক না কেন, ঐ সময় ওগুলিতে ভাঙ্গন ধরেছিলো। যখন দর্শক ঐ মনোহর দৃশ্য দেখতে আসতেন তখন দেখলেন নদীর ধার ঘেঁষে

ধ্বংসোন্মুখ অনেক অট্টালিকা। অনেকগুলির ভিত গেছে ধসে, অনেকগুলি নদীতে পড়ো পড়ো। টেলর এ আমলের শহরের ঘর বাড়ির বর্ণনা দিয়েছিলেন এ ভাবে

'অধিকাংশ দেশীর শহরগুলির মত এ শহরটি ইস্টক নির্মিত দালান কোঠার পাশাপাশি কুঁড়েঘর, সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তা ও গলিপথ ইত্যাদি নিয়ে অনিয়মিতভাবে গড়ে উঠেছে।'

তিনি আরো লিখেছেন, বাংলার অন্যান্য শহরের দালান কোঠার ন্যায় এগুলোর স্থাপত্য রীতি অনেকট একই রকম। সড়ক মুখো বাড়িঘরগুলি সাধারণত খুব অপ্রশস্ত এবং এক থেকে চারতলা পর্যন্ত উঁচু। ওয়ালটারের উপাত্তে চারতলা বাড়ির উল্লেখ নেই। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ১৮৪০-এর দিকেই শহরের কিছু বাড়িঘর উঠেছিলো চারতলা পর্যন্ত।

ইউরোপীয়দের [এবং অবাংগালী জমিদারদের] বাড়িগুলি আগেই বলেছি, ছিল নদীর ধার ঘেঁষে, বড়সড়, সুন্দরভাবে তৈরী। এসব বাড়ির ছাদে ছিল আবার বাগান। তবে, টেলর লিখেছেন, 'শহরের আর্মেনীয় ও গ্রীক বসতি এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় বড় ইটের তৈরি ঘরবাড়ি আছে, কিন্তু এ সবের অধিকাংশ যাচ্ছে ধ্বংস হয়ে।' জমির দাম সবচেয়ে বেশি ছিল শাঁখারী বাজার ও তাঁতী বাজারে।'[১৬]

উনিশ শতকে ষাটের দশকে ঢাকার কমিশনার বাকল্যান্ডের সময় ঢাকায় আবার জোর দেওয়া হয়েছিলো বাড়িঘর নির্মাণের দিকে বিশেষ করে সরকারী ভবনসমূহ। এ কারণে বাকল্যান্ড যখন চলে যান ঢাকা ছেড়ে তখন ঢাকাবাসীর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছিলো তাঁকে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পূর্ববঙ্গে হিন্দু পেশাজীবী/মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হতে থাকে। শহরের বিভিন্ন বাড়ি পুরানো মালিকদের হাত থেকে বদল হয়ে যায় বা নতুন পেশাজীবীরা নিজেরাই দালান তুলতে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮৮৮ সালের সংবাদপত্রের এক খবরে জানা যায়, নবাবগঞ্জ, চাঁদনি ঘাট, চকবাজার প্রভৃতি স্থানে তো বটেই, শহরের মধ্য ভাগেও অধিকাংশ ছিল খড়ের ঘর। দৃশ্যটি নিশ্চয় খুব মনোহর ছিল না, কিন্তু এই দৃশ্য আবার প্রমাণ করে শহরে মধ্যশ্রেণীর প্রসার এবং দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র।

অবশ্য মধ্যশ্রেণীর চাকরিজীবীরাও যে খুব অনায়াসে বাড়ি তুলতে পারতেন, তা নয়। বর্তমানে সৎ চাকরিজীবীর মত তাঁকেও নির্ভর করতে হতো ঋণের ওপর। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯০ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট—

'উয়ারী নামে কতকটা ভূমির উপরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়াতে তাহাতে লোক বসাইবার জন্য প্রচুর যত্ন ও অর্থব্যয় হইয়াছে। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তথায় অনেকগুলি সড়ক গভর্নমেণ্টের অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে। ঢাকায় যাহাদের বসত বাড়ি নাই সেই সব ভদ্রলোকদিগের প্রার্থনা অগ্রগণ্য করিয়া বিঘাপ্রতি বার্ষিক আধ বিঘা করিয়া পত্তন করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে তথায় কেহ কেহ বাড়ি করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেও অর্থাভাবে অনেকেই কিছু করিতে পারে নাই, ইহা জানিতে পারিয়া ম্যাজিস্ট্রেট

সাহেব যে সকল রাজকর্মচারীকে ঐ রূপ অসমর্থ দেখিয়াছেন, তাহাদিগকে ছয় মাসের বেতন অগ্রিম দিয়া তাহা হারহারিতে দেড় বৎসর কাটিয়া লওয়া সুস্থির করতঃ উপরিতন গভর্নমেণ্টের অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়াছেন।'[১৭]

বিঘা প্রতি বাৎসরিক ছয় টাকা দেয় করে সরকার এ জমি শুধু সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করেন। শর্ত ছিল, তিন বছরের মধ্যে পাকা দালান তুলতে হবে। পাঁচ বছর পর দেখা গেল, উয়ারি রূপান্তরিত হয়েছে মধ্যশ্রেণীর কর্মচারীদের আবাসিক এলাকায়।

আশি থেকে নব্বই দশকের মধ্যে, বর্তমান ধানমণ্ডি, গুলশানের মতো ভদ্রলোক অর্থাৎ মধ্যশ্রেণীর জন্যে কিছু আবাসিক এলাকা - যেমন, উয়ারী, গেণ্ডারিয়া, টিকাটুলি, স্বামীবাগ প্রভৃতি গড়ে উঠেছিলো। ঐ সময় এ এলাকা গুলি ছিল মূল শহরের অন্তর্গত, আরো পরে, এ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে একই ভাবে গড়ে উঠেছিলো পুরানো পল্টন।

নতুন গড়ে ওঠা এসব আবাসিক এলাকার ঘরবাড়ি ছিলো পুরানো এলাকার ঘরবাড়ি থেকে ভিন্ন। এসব এলাকার বাড়িগুলি দেখলে বোঝা যায়, পরিবর্তন হয়েছে মধ্যশ্রেণীর রুচির। গ্রামের সঙ্গে তার বন্ধন হয়েছে খানিকটা শিথিল। কিন্তু গ্রামের স্মৃতি বা নষ্টালজিয়ার রেখা মিলিয়ে যায়নি তখনও। স্থপতি রবিউল হুসাইন এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে আমাকে যা বলেছিলেন, তা তাৎপর্য্যপূর্ণ। তাঁর মতে, গ্রামে যেমন দখিন দুয়ারী ঘর, উঠোন, রান্নাঘর সব আলাদা আলাদা হয়েও একটি ইউনিটের মতো, এসব এলাকার বাড়িগুলিও এমনি।

উয়ারি, টিকাটুলি বা পরবর্তীকালের পুরানো পল্টনের বাড়িগুলি জাঁকালো নয়, কিন্তু ঘরোয়া, পরিচ্ছন্ন, প্রাচীর ঘেরা, ফুল ও ফলের বাগানে পূর্ণ, ঘরগুলি বড়সড় এবং তেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। এ তৎকালীন পেশাজীবী/মধ্যজীবীর রুচির পরিবর্তনেরই লক্ষণ।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত ১৯২২ সালের এসব এলাকা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে চিত্রটি আরো স্পষ্ট হবে। লিখেছেন তিনি---

'ওয়ারি ঠিক শহরতলি নয়, কিন্তু শহরের মধ্যে হয়েও একটি ভিন্ন রকমের উপান্তিক না হলেও প্রান্তিক। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন, রাস্তায় লোক বেশি নেই, যারা আছে তারাও পোশাকে পরিচ্ছদে মার্জিত। বাড়িগুলি সুন্দর— একতলাই বেশি, কয়েকটি মাত্র দোতলা তার প্রত্যেক বাড়িতে অনেকটা খোলা জমি। ...এখানে রমনার অভারতীয় উদ্যান নগরীর স্বাচ্ছন্দ্য নেই, পুরানা পল্টনের নবীনতা নেই, টিকাটুলির গ্রাম ছোঁওয়া ভাব নেই, নবাবপুরের ঘিঞ্জি বসতিও নেই। সবই একটু সংযত সবই বাহুল্যবিহীন।

এখানে যাঁরা থাকতেন তাঁরা মধ্যবিত্ত। দু'একজন জমিদার ছাড়া খুব বড় লোক প্রায় কেহই নন। চরম দারিদ্র্যও এখানে দেখা যেত না। প্রধানতঃ থাকতেন কয়েকজন আদি বাসিন্দা, যাঁরা পনের কুড়ি বছর আগে প্রায় বিনামূল্যে এখানে জমি নিয়েছিলেন। এঁরা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী— ডেপুটি, মুনসেফ, জেলা জজ। এঁরা

সকালে বাজারে যেতেন এবং গৃহভৃত্যের হাতের থলে, ঝুড়ি ভরতি বাজার করে আসতেন, আর বিকেলে পল্টনের মাঠে বেড়াতে যেতেন।’[১৮]

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় ঢাকা আবার প্রাদেশিক রাজধানী হলে নজর দেওয়া হয়েছিলো শহরের ক্রমোন্নয়নের দিকে। ১৯০৬ সালের ঢাকা সম্পর্কে লিখেছিলেন হৃদয়নাথ মজুমদার

‘বন্যজন্তুর আবাসস্থল ঢাকেশ্বরী মন্দিরের আশেপাশের জলাজঙ্গল কেটে সাফ করা হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে অট্টালিকা। শহর বাড়ছে উত্তরে, তৈরি হচ্ছে সেখানে গভর্ণমেণ্ট হাউস, সেক্রেটারিয়েট আর ইউনিভার্সিটি, রমনার বনভূমিতে বড়লোকেরা যত পারছে জমি কিনছে, বাড়ি বানাচ্ছে।’

বঙ্গভঙ্গ রদের পর ঐ ঝোঁক কমে গিয়েছিলো। ভবিষ্যৎবাণী করে লিখেছিলেন হৃদয়নাথ মজুমদার-

‘কিন্তু একসময় আসবে যখন রমনাই হয়ে উঠবে ঢাকা শহরের সমস্ত অফিস আদালতের কেন্দ্র। তখন চক, নলগোলা, বাবু বাজার, ইসলামপুর এবং বাংলা বাজারের মতো পুরানো অঞ্চলগুলি হারিয়ে ফেলবে জৌলুস। আর উত্তরে গড়ে উঠবে ক্যান্টনমেণ্ট।’[১৯]

এ ভবিষ্যৎবাণী যে সত্য হবে, হৃদয়নাথ তা নিজেও ভেবেছিলেন কিনা সন্দেহ।

৩

আগের অধ্যায়ে ঢাকায় ঘরবাড়ি সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। হয়তো তা খুব স্পষ্ট নয়। তবে এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই পুরানো ঘরবাড়ির ওপর খুব ব্যাপক না হলেও একটি জরিপ করা হয়েছে। এ জরিপ ও পর্যবেক্ষণে দেখেছি, অধিকাংশ ইটের তৈরি বাড়ি নির্মিত হয়েছিলো [অনুমান করে বলছি] উনিশ শতকের শেষার্ধে [শেষ দশকে] এবং বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে। এগুলি আবার বারবার মালিকানা বদলের ফলে সংস্কার করা হয়েছে। ফলে খুব কম সংখ্যক বাড়িরই আদি রূপ বর্তমান। এসব ঘরবাড়ির তেমন কোন স্থাপত্যিক সৌন্দর্যও নেই। ঘরের পাশে ঘর, তার ওপরে ঘর এভাবেই নির্মিত হয়েছিলো এগুলি। তবে এসব বাড়িও খুব দ্রুত ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে এবং নির্মিত হচ্ছে ‘মাল্টিস্টোরিড’ বাড়ি। গত দু’বছরের এ পরিবর্তন এতো দ্রুত হচ্ছে যে, তাল রাখা যাচ্ছে না। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, সে সব ঘরবাড়ি ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে এবং সেখানে যে সব ‘দালান’ নির্মিত হচ্ছে, তার কোন সৌন্দর্য বা পরিকল্পনা নেই। জায়গা নষ্ট করা হচ্ছে। এখন ঢাকা শহরে জায়গার যা অভাব, তাতে অপরিকল্পিতভাবে কোন কিছু করে জায়গা নষ্ট করা অপরাধ।

তবে এই বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে উনিশ শতকের শেষার্ধে তৈরি কয়েকটি বাড়ি এখনও টিকে আছে। এসব বাড়ি ঐতিহাসিক, এবং স্থাপত্য সৌন্দর্যের কারণে সেসব রক্ষা করা যেতে পারে [এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বাড়ি আছে, যেগুলি আবাসিক

কারণে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে না]। তবে আমরা নিছক সংরক্ষণের পক্ষপাতী নয়। এগুলি ব্যবহৃত হবে এবং একই সঙ্গে সংরক্ষিত হবে। এ ধরনের কয়েকটি বাড়ির কথা নীচে উল্লেখ করা হলো

সূত্রাপুরে বর্তমানে সিভিল ডিফেন্স দফতর যেখানে, সে বাড়িটি ছিল ঢাকার এক সময়ের নামী নাগরিক রেবতী মোহন দাসের। বেশ জাঁকালো কিন্তু সুন্দর বাড়ি। এটি এখনও প্রায় অক্ষত। খানিকটা সংস্কার করে এটি সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং সিভিল ডিফেন্স দফতরের অধীনেই তা থাকতে পারে।

লোহারপুল থেকে ওয়াল্টার রোডে নামার সময় ঠিক পুলের মুখোমুখি বসন্ত বাবুর বাড়ি। রায়বাহাদুর প্যারিমোহন দাসের জ্ঞাতি ছিলেন তিনি। ব্যবসা করতেন, জমিদারীও ছিল। এখন এই বিশাল বাড়িটিতে বসবাস করছেন তার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। বাড়িটি এমন কিছু নয় কিন্তু লোহার পুলের নীচের রাস্তার সৌন্দর্য রক্ষার জন্য এটি অবিকৃত রাখা দরকার। বাড়ির সামনে বেশ কিছু ঝুপড়ি বানানো হয়েছে। বাড়ির মালিকদের কাছে অনুরোধ এসব জঞ্জাল পরিষ্কার করে সংস্কার করে বাড়িটিকে রক্ষা করুন।

৪৫ বি, কে, দাশ রোডে সুন্দর একটি বাড়ি আছে। স্থানীয় লোকদের মতে, এ শতকের ত্রিশ দশকে বাড়িটি তৈরি করেছিলেন কাঠের ব্যবসায়ী প্রসন্নকুমার দাশের পুত্র অক্ষয়কুমার দাশ। ১৯৪৭ সালে তাঁরা ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন। এর বর্তমান মালিক ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলাম। ঢাকার কোন বাড়ির সঙ্গে এটি মেলে না। অনেকটা স্পেনীয় প্রভাব আছে বাড়ির বারান্দা নির্মাণে। বাড়িটির মূল ফটকের ওপর প্যাসিও, চারপাশে অলিন্দ তারপর অন্দর মহল। এটি সুন্দরভাবে সংস্কার করে রক্ষার জন্য একই আবেদন রইল বাড়ির বর্তমান মালিকের কাছে।

টিপু সুলতান রোডে আছে দুটি চমৎকার কারুকাজ করা বাড়ি। গ্র্যাজুয়েট স্কুলের পাশে বাড়িটির [মদনমোহন বসাকের?] নীচে বিরাট মন্দির, ওপরে থাকার জায়গা। সম্প্রতি মন্দিরের চারপাশে বাইরের দিকে যন্ত্রপাতির দোকান খোলা হয়েছে। এসব দোকান উঠিয়ে মন্দিরটি সংস্কার করে রক্ষা করা হোক। বাড়ির মালিক থাকলে তাঁকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে।

দৈনিক বাংলার তৎকালীন [দৈনিক পাকিস্তান] অফিসটিও [৫০] টিপু সুলতান রোড। সুন্দর বাড়ি। এটির মালিকানা সম্পর্কে তথ্য পাইনি। যদি এজমালি হয়ে থাকে, তবে কর্পোরেশনের উচিত ক্ষতিপূরণ দিয়ে এটি অধিগ্রহণ, সংস্কার করে একটি পাঠাগার স্থাপন করা। এতে বাড়িটিও রক্ষা পাবে, এলাকাবাসীও উপকৃত হবেন।

পোগজ স্কুলে বাড়িটি একশো বছরের পুরানো। করিন্থিয়ান থামের ওপর দাঁড়ানো বাড়িটির অন্য এক মাধুর্য আছে। তাছাড়া এটি ঢাকার একটি ঐতিহাসিক পুরানো স্কুল। এ স্কুল প্রাঙ্গণে ভাষণ দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ, রমাবাঈ প্রমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত শেষ জীবনে এই স্কুল প্রাঙ্গণেই ঢাকার ওপর রচিত তাঁর কবিতাটি পড়েছিলেন।

এটি সংস্কার করা উচিত। স্কুল কমিটি এটি সংস্কার [পুনঃনির্মাণের জন্য যদি একটি ফাণ্ড করেন, তাহলে নিশ্চয় অনেকেই এগিয়ে আসবেন। পোগজ স্কুলের প্রচুর ছাত্র এখন প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা, স্থানীয় জনগণ ও পৌর কর্পোরেশন এগিয়ে এলে এ কাজটি খুব দুরূহ হবে বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, উনিশ শতকের ঢাকার প্রথমার্ধে জনহিতকর যেসব কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিলো, তাতে ঢাকাবাসীদের দান উল্লেখযোগ্য। লোহারপুল, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, মিটফোর্ড এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চ 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিলো ঢাকার ধনাঢ্য ও সাধারণ মানুষের চাঁদায়।

কলেজিয়েট স্কুলের আরেকটি সুন্দর অট্টালিকা ছিল। এই ঐতিহাসিক অট্টালিকাটি সম্পর্কে কোন ভাবনা-চিন্তা না করেই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, যা অনেকের কাছে মনে হতে পারে বর্বরতার সামিল। আমরা আশা করবো, সরকারের তরফ থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে যেন যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করা হয়।

ইমামগঞ্জে [অথবা এর কাছে] আছে ভাওয়াল রাজদের একটি বাড়ি। বাংলো প্যাটার্নের টালি দেওয়া। এ বাড়িটি এখনও প্রায় অটুট, যদিও টালি অনেক দিকে ভেঙ্গে গেছে। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে সেখানে। এ বাড়িটি সংরক্ষণ করে যদি চার দিকে কিছু গাছপালা লাগানো যায়, তাহলে সেই ঘিঞ্জি এলাকার রূপ অনেকটা খুলে যাবে। স্কুলটিও যেমন আছে তেমন থাকতে পারে।

এছাড়াও ঢাকায় হয়ত সংরক্ষণযোগ্য আরো কিছু ঘরবাড়ি থাকতে পারে [বিশেষ করে বাংলাবাজারে], যা আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। পাঠকদের কাছে এ বিষয়ে কোন তথ্য থাকলে আমাকে জানালে উপকৃত হবো।

আমাদের মূল জরিপটি করা হয়েছে বাকল্যান্ড বাঁধ এবং তার পাশে নির্মিত অট্টালিকাসমূহের ওপর। কারণ, পরিবেশ দূষিতকরণ রোধ, ঢাকাবাসীদের বিনোদনের উপায় বৃদ্ধি, পর্যটক আর্কষণ ও স্থাপত্যিক কারণে বাঁধের পাশের কিছু অট্টালিকা সংরক্ষণ, নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি— এ সব কিছু এখনও করা যেতে পারে এই বাঁধটিকে সংস্কার করলে।

জরিপের ভিত্তি ছিল 'প্যানোরামা অব ঢাকা' নামে একটি লিথোগ্রাফ। এতে নদীতীর বরাবর পাগলা থেকে লালবাগ পর্যন্ত ৪২টি ভবনের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। এক অনামা শিল্পী এঁকেছিলেন এটি এবং ১৮৪০ সালে তা প্রকাশিত হয়েছিলো লণ্ডনের ১১৪, নিউ বণ্ড স্ট্রিট থেকে। প্রকাশক ছিলেন মেসার্স ডিকিনসন।

লিথোগ্রাফটি দেখলেই বোঝা যায় শিল্পীর দীর্ঘদিন লেগেছিলো এটি করতে। নদীর তীর বরাবর বাড়িগুলির ছবি তিনি এঁকেছেন বটে কিন্তু পার্সপেকটিভ ঠিক নেই। তাতে মনে হচ্ছে, আলাদা ভাবে প্রতিটি বাড়ির ছবি এঁকে তিনি সেঁটে দিয়েছিলেন পাশাপাশি।

মুঘল আমলে যেমন, বৃটিশ আমলেও তেমনি বুড়ীগঙ্গার তীর ছিল সবচেয়ে অভিজাত এলাকা। বৃটিশ আমলে পুরো নদীতীরটি ভাগ করে নিয়েছিলেন ধনীরা। বাড়িগুলি তখন নির্মিত হয়েছিলো একেবারে নদীর তীর ঘেঁষে। বাকল্যাণ্ড বাঁধ তখন

নির্মিত হয়নি। বাকল্যাণ্ড বাঁধ নির্মিত হওয়ার পর অবশ্য বাড়ির মালিকরা সবসময় তা রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিলেন। কারণ, তাঁরা চাননি, বাঁধটিতে [বা রাস্তাটিতে] কেউ এসে ভাগ বসাক যা তাঁদের আধিপত্য বা বাড়ির সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারে। প্রতিটি বাড়ির চারদিকে ছিল বেশ জমি, যা নিশ্চয় ভরে থাকতো ফুলে ফলে।

উনিশ শতকে তো বটেই, বিশ শতকের ত্রিশ চল্লিশ দশক পর্যন্ত বাকল্যাণ্ড বাঁধ ছিল ঢাকাবাসীদের অবসর কাটানোর একটি প্রধান কেন্দ্র। মধ্যশ্রেণীর প্রভাবশালী নাগরিকের প্রত্যহ বাকল্যাণ্ড বাঁধ ভ্রমণ ছিল একটি অকশ্য করণীয় কর্তব্য। সুতরাং প্রথমে বাকল্যাণ্ড বাঁধ সম্পর্কে কিছু বলে নেয়া ভালো।

১৮৬৪ সালে ঢাকার কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন সি, টি, বাকল্যাণ্ড। পাঁচ বছর ছিলেন তিনি ঢাকায়। তাঁর আমলে সরকারী উদ্যোগে বাড়িঘর নির্মাণ, পূর্ত কাজে বেশ জোর দেওয়া হয়েছিলো।

খুব সম্ভব, নদী তীর বরাবর একটি বাঁধ মুঘল আমল থেকেই ছিল। কিন্তু, তার ওপর ভ্রমণের জন্যে পাকা রাস্তা তৈরি করার পরিকল্পনা বোধ হয় বাকল্যাণ্ডের। তাঁর উদ্যোগেই নির্মিত হয়েছিলো 'বকলণ্ডস রোড' বা বাঁধ যার বিস্তৃতি ছিল ফরাশগঞ্জ থেকে বাবুবাজার পর্যন্ত প্রায় এক মাইল।

এ রাস্তা নির্মাণের খরচ বাকল্যাণ্ড প্রাথমিক ভাবে আদায় করেছিলেন ঢাকার ধনীদের কাজ থেকে। কমিশনারের অনুরোধই ছিল নির্দেশ এবং তা অগ্রাহ্য করার সাহস কেউ দেখাননি। একটি সংবাদে জানা যায়, আবদুল গণি, কালী নারায়ণ রায়, জগন্নাথ রায় চৌধুরী ও মোহিনী মোহন দাসের কাছ থেকে বাকল্যাণ্ড পঁয়ষট্টি হাজার টাকা সংগ্রহ করে শুরু করেছিলেন রাস্তার কাজ। কিন্তু নির্মাণের কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। পরবর্তী কমিশনার সিমসনের সময় শেষ হয়েছিলো রাস্তা নির্মাণের কাজ। কিন্তু সিমসন অর্থ সংকটে পড়েছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার একটি পত্রিকা লিখেছিলো- 'তাঁহাদিগের নদী তীরস্থ প্রাসাদাবলী নির্বিঘ্ন হইয়াছে এবং বাটীর সম্মুখবর্তী অনেকগুলি স্থানও অধিকারে আসিয়াছে। অন্যে না দিলেও তাঁহাদিগের এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া চাঁদা দেওয়া কর্তব্য, তাঁহারা টাকা দিতে অসমর্থও নন।'[২০]

বাকল্যাণ্ড বাঁধ সংরক্ষণের ভার ছিল পৌরসভার ওপর এবং সে সময় পৌরসভাও যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে তা সংরক্ষণ করতো। পৌরসভা রাস্তার পাশে পাশে বেঞ্চি পর্যন্ত বসিয়েছিলো।

১৯২৭ সালে সরকার [ঢাকার কালেক্টর] বাঁধটিকে সরকারী সম্পত্তি হিসেবে দাবী করেন। এ নিয়ে ঢাকাবাসী বা পৌরসভার সঙ্গে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের যথেষ্ট তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের কাছে হার শিকার করতে হয়েছিলো আমলাদের।

১৯৬০ সালে, আয়ুব খানের নির্দেশে বাকল্যাণ্ড বাঁধের স্বত্ব জনগণ থেকে কেড়ে নিয়ে দেওয়া হয়েছিলো অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থাকে। এবং তাদের বদৌলতে যে বাঁধ ছিল ঢাকাবাসীর গর্ব ও আমাদের বস্তু, তা রূপান্তরিত হয়েছিলো এক কদর্য স্থানে।

সম্প্রতি সরকার বাকল্যাণ্ড বাঁধ পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। জরিপে আমরা দেখেছি, অননুমোদিত দোকানপাট উঠিয়ে বাঁধটি যদি পরিচ্ছন্ন ও এর পাশে উনিশ শতকে নির্মিত কিছু ঘর বাড়ি সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে স্থানটি পুরানো ঢাকার এক আকর্ষণীয় এলাকায় পরিণত হবে।

সেই আজানা শিল্পীর কথায় ফিরে আসি। নৌকা থেকে তিনি নদী তীরের [বাকল্যাণ্ড বাঁধসহ] ৪২টি দ্রষ্টব্য স্থান [গৃহ] এঁকেছিলেন। আমি এখানে শুধু নদীতীরের ভবন [ও মালিকদের] গুলির নাম ক্রমানুসারে উল্লেখ করছি।

ভাওয়াল জমিদারীর প্রাক্তন ম্যানেজার এফ, ম্যাককেমেরুনের বাংলো, ঢাকা সুগার কোম্পানী ওয়ার্কস [বর্তমান মিল ব্যারাক] ও ম্যানেজারের বাস ভবন জমিদার আরাতুনের বাড়ি, জীবন বাবুর বাড়ি, ঢাকা কালেক্টরেট, প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীন জে, রেইলি ও বেঙ্গল, আর্টিলারির লেফটেন্যান্ট এবং ঢাকার পোস্টমাস্টার হাঙ্গারফোর্ডের ভবন, সেশন জজ কুকের ভবন জমিদার এ হ্যালো, সুপারিনটেণ্ডেন্ট সার্জন ডঃ ল্যাম্ব, নীলকর ও জমিদার ই, কে, হিউমের বাড়ি, ঢাকা বিলিয়ার্ড রুম, রেভিনিউ কমিশনার কে, ডানবার, মেসার্স ওয়াইজ এণ্ড গ্লাস, ব্যাপটিস্ট মিশনারী রেভারেণ্ড ল্যাম্বের বাড়ি, রেভারেণ্ড শেফার্ড, মীর্জা গোলাম পীর, খাজা আলিমউল্লাহ, আমিরউদ্দিন দারোগা, আর্মেনী মান্‌কের বাড়ি, আমির উদ্দিন দারোগার স্মৃতিসৌধ, হিন্দু মঠ, নবাব প্রাসাদে যাবার ফটক, পোগজ ও মীর্জা গোলাম পীরের বাড়ি, গোলামপীরের মসজিদ, রেভারেণ্ড লিওনার্দ ও নানকু মিঞার বাড়ি, বড় কাটরা, কমিসারিয়েট অফিসার ক্যাপ্টেন সোয়াটম্যানের বাড়ি, বড় কাটরা, মীর্জা আনু আলী এবং মোহাম্মদ আলীর বাড়ি, নাজির নাট্টু সিংহের মঠ, লালবাগের ধ্বংসাবশেষ, জগৎ শেঠের ব্যাংকের ঢাকা শাখা।

উপরোক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন জমিদার। বাকিরা সহকারী কর্মচারী। এর মধ্যে মাত্র দু'জন ছিলেন বাঙ্গালী জীবনকৃষ্ণ রায় [জমিদার] ও নানকু মিঞা [পরিচয় জানা যায়নি। নাম দেখে অনুমান করছি] পরে অবশ্য অনেক বাড়ি হাত বদল হয়েছে। খুব সম্ভব অধিকাংশ বাড়ি নির্মিত হয়েছিলো উনিশ শতকের প্রথমার্ধে।

উল্লিখিত বাড়িগুলির মধ্যে এক ধরনের স্থাপত্যিক ঐক্য আছে। বাড়িগুলি ইটের তৈরি, ব্যবহৃত হয়েছে আর্চ। বড় বারান্দা, উঁচু ছাদ, পুরু দেওয়াল। স্থাপতি ও কবি রবিউল হুসাইনের মতে, 'গ্রেকোরোমান, ইন্দোসারাসনিক এবং ইংলিশ কান্ট্রিসাইডের বাড়ির স্টাইল সব একীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক মিশ্ররীতির।

এর কিছু সামাজিক কারণও আছে বৈকি। ঐ আমলের অধিকাংশ ঘরবাড়িতে করিন্থিয়ান পিলার বা গ্রেকোরোমান রীতি প্রভাব ফেলেছে। যাঁরা অর্থশালী ছিলেন, তাঁরা জাঁকজমক এবং নিজেদের দাপট দেখানোর জন্যে এ স্টাইল পছন্দ করতেন। অধিকাংশ পুরানো জমিদার বাড়িতে একটি লক্ষণীয়। দেশীয় আবহাওয়া এবং এ দেশে থাকার কারণে তাঁরা খানিকটা ইন্দো-সারাসনিক ভাব নিয়েছেন। আর সব শেষে নস্টালজিয়া। বিশেষ করে ইংরেজরা লালন করেছেন সবসময় তাঁদের সুদূর মাতৃভূমির, কান্ট্রিসাইডের স্মৃতি। নিজেদের অজানতে সে ধরনের কিছু প্রভাব

ফেলেছিলো এই স্থাপত্যে।

এখন দেখা যাক ১৮৪০-এর আগে নির্মিত এসব ঘরবাড়ির ক'টি এখনও টিকে আছে এবং কি অবস্থায়।

জরিপ শুরু করেছিলাম আর্মেনী জমিদার আরাতুনের বাড়ি দিয়ে [ফরাশগঞ্জে], যা আমাদের কাছে এখন পরিচিত রূপলাল হাউস নামে।

উনিশ শতকের ঢাকায়, নবাব আবদুল গণির আহসান মঞ্জিল এর সঙ্গে জাঁকজমকের দিক থেকে পাল্লা দিতে পারতো আরেকটি অট্টালিকা রূপলাল দাসের রূপলাল হাউস।

ঢাকায় রূপলাল দাসের পরিবার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মথুরানাথ। বাট্টার ব্যবসা দিয়ে তিনি জীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর ছিল দুই পুত্র স্বরূপচন্দ্র ও মধুসূদন। তাঁরাই প্রথম জমিদারী কিনেছিলেন। স্বরূপচন্দ্রের ছিল তিন ছেলে-সনাতন, রূপলাল ও রঘুনাথ। তিনভাই পৃথক হয়ে যাওয়ার পর ফরাশগঞ্জে রূপলাল ও রঘুনাথ করেছিলেন নিজেদের বাড়ি।

এই দু'ভাই যে বাড়িটি কিনেছিলেন, তা ছিল আর্মেনী জমিদার আরাতুনের বাড়ি। রূপলাল রঘুনাথ বাড়িটি কলকাতার বিখ্যাত মার্টিন কোম্পানীকে দিয়ে পুনর্নির্মাণ করে সাজিয়েছিলেন। বাড়িটির একাংশে থাকতেন রঘুনাথ, যা পরিচিত ছিল রঘুবাবুর বাড়ি নামে। এ অংশটি এখন ব্যক্তি মালিকানায়। রূপলালের অংশটি ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। এটি পরিচিত ছিল রূপলাল হাউস নামে। বিশাল বিশাল করিন্থিয়ান পিলার সমেত এতো বড় বাড়ি ঢাকা শহরে আর চোখে পড়ে নি।

লর্ড ডাফরিন ১৮৮৮ সালে একবার ঢাকা সফরে এসেছিলেন। ঢাকায় ইংরেজরা ঠিক করেছিলেন, গভর্ণর জেনারেলের সম্মানে তাঁরা একটি বল নাচের আয়োজন করবেন। কিন্তু বল নাচের জন্যে বড় হল ঘর বা সুদৃশ্য ভবন পাওয়া যায় কোথায়? এ নিয়ে ইংরেজরা বৈঠকে বসেছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আহসান মঞ্জিল ও রূপলাল হাউস।[২৩]

বাড়িটি এখনও অটুট। চারদিকে নোংরা হলুদ মরিচের আড়ত, পচা তরকারি, জঞ্জালে ঘেরা বাড়িটি একটু সংস্কার করে রাখলে তা পরিগণিত হবে ঢাকার সেরা বাড়িতে। এবং এখানে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে পৌর আর্কাইভ ও ঢাকা শহর বিষয়ক গবেষণা সংস্থা, যেখানে থাকবে ঢাকা শহর বিষয়ক পাঠাগার, নথিপত্র, আর বাকল্যাণ্ড বাঁধের দিকটি উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

রূপলাল হাউসের পাশেই ছিল জীবন বাবুর বাড়ি, একেবারে নদীর ধার ঘেঁষে। বিভিন্ন ধরনের উচ্চতা ব্যবহার করে এর স্থাপত্যে বেশ সুন্দর একটা ভাব আনা হয়েছিলো। জীবনকৃষ্ণ রায়ের বংশ ছিল পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন ও সম্মানিত বংশ। তাঁর পূর্বপুরুষ নীল ও অন্যান্য ব্যবসা করতেন এবং সেই সূত্রে ঢাকায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। জীবনকৃষ্ণের পিতা জগন্নাথ রায় প্রথম জমিদারী কিনেছিলেন। তিনি রাজমহল থেকে কালো পাথর আনিয়ে বুড়ীগঙ্গার তীরে একটি স্নানঘাট করিয়ে দিয়েছিলেন। একটি মাত্র পাথর থেকে নির্মিত হয়েছিলো এটি। ঘাটের সঙ্গে তিনি

স্থাপন করেছিলেন দেবমন্দির এবং তার সদর দরজাও তৈরি করিয়েছিলেন রাজমহলের কালো পাথরে। এই কারুকার্যময় দরজা ও ঘাট দেখতে পূর্ববঙ্গ ও আসামের গভর্ণর স্যার চার্লস বেলীও একবার এসেছিলেন।[২৪]

জগন্নাথের জ্যেষ্ঠপুত্র জীবনকৃষ্ণ এই জায়গায়ই তাঁর বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন বলে অনুমান করছি। তাঁর আমলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশীল জমিদার। নওয়াব নুসরত জঙ্গ ও শামসউদ্দৌলার দরবারে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি ছিল। জীবনকৃষ্ণ ছিলেন নিঃসন্তান, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই ও ভাইপোরা তাঁর বাড়ি ও জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে দেখি, এই মন্দির সংলগ্ন নাট মন্দির ছিল ঢাকার বিখ্যাত, এখানে হতো কীর্তনের আসর, যাত্রা ও থিয়েটার।

বর্তমানে এ সবের কোন চিহ্ন নেই। কালো পাথরে নকশা করা সদর দরজাটা আছে; কিন্তু সেটা কারো চোখে পড়ে কিনা সন্দেহ। স্নানঘাট, বাড়ি নিশ্চিহ্ন। একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে বটে। কিন্তু দুদিন যেয়ে আমরা তাতে ঢুকতে পারিনি। কারণ, তা ছিল বন্ধ। জানা গেছে, এ মন্দিরে জগন্নাথ রায় অতি প্রাচীন দুটি শক্তি ও বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করেছিলেন।

তারপর ছিল ঢাকা কালেকটরেট। আগে যা পরিচিত ছিল করোনেশন পার্ক নামে, তার ঠিক পিছনের অট্টালিকাই এটি। বোঝা যায়, সত্তর-এর পর এর কিছু পরিবর্ধন/সংস্কার হয়েছে। বর্তমানে এখানে থাকেন একজন সেনা অফিসার। স্বাভাবিক কারণেই আমরা বাড়ির কাছাকাছি যেতে পারিনি। কিন্তু দূর থেকে মনে হলো, বাড়িটি ভালোভাবেই রাখা হয়েছে এবং এ যত্ন অব্যাহত থাকলেই আমরা আনন্দিত হবো।

এরপর ছিল প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিন জে. রেইলি এবং ঢাকার পোস্টমাস্টার লেঃ হাঙ্গারফোর্ডের বাড়ি। রেইলির বাড়িটি ছিল ছোট। এখন আর তা নেই। হাঙ্গারফোর্ডের বাড়িটি ছিল বেশ বড়সড়। ১৯১৬ সালে এখানে স্থাপিত হয়েছিলো একটি স্কুল— উকিল ইনিসটিটিউশন। স্কুলটি এখনও বর্তমান।

তারপর ছিল সেশন জজ জন কুক এবং জমিদার এ, হ্যালোর বাড়ি। দুটি বাড়িই ছিল দোতলা, বড়। কুকের বাড়িটি ভেঙ্গে মার্কেট করা হয়েছে। আর হ্যালোর বাড়ি বর্তমানে ঢাকা ফায়ার ব্রিগেডের দফতর। বাড়িটি জীর্ণ এবং এর কোন স্থাপত্যিক সৌন্দর্য নেই। ফায়ার ব্রিগেড বাড়িটি ব্যবহার না করলে, এটি ভেঙ্গে এখানে সুন্দর একটি পার্ক করা যেতে পারে।

হ্যালোর বাড়িটির পাশে ছিল সুপারিনটেনডেন্ট সার্জন ডা: ল্যাম্ব ও জমিদার নীলকর ই. কে. হিউমের বাড়ি। হিউমের বাড়ির পাশে ছিল "বিলিয়ার্ডরুম" [বা ক্লাব]। বিলিয়ার্ড রুম ও ডাঃ ল্যাম্বের বাড়িটি ছিল একতলা। হিউমের বাড়িটি ছিল বিশাল, দোতলা। এখন এগুলির কোনটিরই চিহ্ন নেই।

বিলিয়ার্ড রুমের ঠিক পাশেই ছিল রেভিনিউ কমিশনার জে, ডানবার এবং তার পিছনে ছিল কমিশনারের সহকারী ডব্লু, এইচ, জেমসের বাড়ি। ডানবারের বাড়িটি ছিল তিনতলা, বিশাল। এ বাড়ি নেই। তবে অনুমান করছি, পাকিস্তান হবার পর এ

বাড়িটি ছিল গোয়েন্দা সদর দফতর। জেমসের বাড়ির ওপর নির্মিত হয়েছে মুন সিনেমা।

এর পরের বাড়িটি নীলকর ওয়াইজ এবং গ্লাসের। তার পরের বাড়ি ছিল রেভারেণ্ডস রবিনসনের। এবং তারপর আরো দুটি ছিল নীলকর ওয়াইজ ও গ্লাসের। ওয়াইজের একটি ছাড়া আর কোন বাড়ি এখন নেই। গ্লাস ছিলেন ঢাকার আদি নীলকরদের একজন। ওয়াইজ এসেছিলেন তারপর। এমনও হতে পারে বিত্ত ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ওয়াইজ পরে গ্লাসের বাড়ি দুটি কিনে নিয়েছেন। ওয়াইজের বাড়িটিতে ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বুলবুল ললিতকলা একাডেমী। বাড়িটি সংরক্ষিত হচ্ছে। তবে এর চারপাশের বিশাল চত্বর রুক্ষ। এখানে ফুলফলের গাছ লাগিয়ে জায়গাটিকে সবুজ করা দরকার। ওয়াইজের বাড়ির সামনের দোকানগুলির নাকি আইনগত কোন ভিত্তি নেই। এগুলি সরিয়ে ফেললে বাকল্যাণ্ড বাঁধের এ অংশটুকু মুক্ত হবে প্রতিবন্ধকতা থেকে। এ বাড়ির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ দোতলায় ওঠার অপূর্ব কারুকাজ করা কাঠের সিঁড়ি। শুনেছি, ওয়াইজ নাকি মুন্সীগঞ্জ থেকে সিঁড়িটি এনেছিলেন। এটির অতীব যত্নের প্রয়োজন। বাড়ির সদর দরজাটিও ছিল একই ধরনের কারুকাজ করা কাঠের। কিন্তু সেটি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে ওয়াইজের বাড়ির পেছনে ভূমি প্রশাসন অফিসের স্টোররুমের দরজা হিসেবে। এই ছোট বাড়িটি এক সময় ছিল নবাববাড়ির ম্যানেজারের। তিনি তখন ওয়াইজের বাড়িতে থাকতেন। তিনিই বোধহয় ওয়াইজের বাড়ি থেকে এটি নিয়ে এসে এখানে লাগিয়েছিলেন। এডোওয়ার্ড হাউস নামে পরিচিত এই বাড়ির স্টোররুম থেকে দরজাটি খুলে পূর্বের জায়গায় নিয়ে আসা উচিত। অথবা জাতীয় যাদুঘরে এর স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এর পরের বাড়িটি ছিল দোতলা, রেভারেণ্ড শেফার্ডের। তার থেকে একটু দূরে ছিল জমিদার মীর্জা। গোলাম পীরের লাল ইটের পুরু দেওয়ালের একতলা বাড়ি। এটি ভেঙ্গে নির্মিত হয়েছে মার্কেট। তবে সেখানে একটি দেওয়ালের ভগ্নাংশ এখনও আছে।

তারপরের বাড়িটি ছিল জমিদার খাজা আলীমুল্লাহ্ বা আলী মিয়ার। যা আমাদের কাছে এখন পরিচিত নবাববাড়ি হিসেবে।

আজকের আহসান মঞ্জিল দেখে কল্পনা করা যাবে না, তিন পুরুষ ধরে ঢাকায় তো বটেই; পূর্ববঙ্গেও প্রভাব বিস্তার করেছিলো এই মঞ্জিল। ঢাকা শহরে পূর্ববঙ্গের প্রধান জমিদার ও ইংরেজ সৃষ্ট নবাব পরিবারের আভিজাত্য, বৈভব ও প্রভাবের প্রতীক ছিল এই অট্টালিকা। নতুন নবাবদের আদিপুরুষ, ঢাকার জমিদার আলী মিয়া বা খাজা আলীমউল্লাহ – ১৮৩৫ সালে প্রবাসী কুঠিয়ালদের কাছ থেকে বুড়ীগঙ্গার তীরে অবস্থিত তাঁদের কয়েকটি কুঠি বাড়ি কিনেছিলেন [দানীর মতে ১৮৩৮ সালে] বাড়িগুলো ছিল ফরিদপুরের জালালদির জমিদার শেখ এনায়েতুল্লাহর। এনায়েতুল্লাহর ছেলে শেখ মুতীউল্লাহ এই রংমহল বিক্রি করে দিয়েছিলেন ফরাসীদের কাছে। ফরাসীদের কাছে থেকে এগুলো কিনে, রংমহলটি সংস্কার করে আলীমউল্লাহ বসবাস শুরু করেছিলেন।[২৫] ঐ সময় বাড়িটিতে বোধহয় একটি ঘড়ি বসানো ছিল, যা কখনও ঠিক

সময় দিতো না। তৎকালীন একটি ছড়ায় এর প্রমাণ পাওয়া যায় -

আলী মিয়ার ঘড়ি
নীলাম্বর সেনের বড়ী
গোকুল মুন্সীর গোঁফে তাও
গল্প যদি শুনতে চাও
তবে মৃত্যুঞ্জয় মুন্সীর কাছে যাও।[২৬]

যাহোক, ১৮৭২ সালে নবাব আবদুল গণি বাড়িটিকে প্রায় পুনর্নির্মাণ করে নাম দিয়েছিলেন নিজের ছেলের নামে - আহসান মঞ্জিল। অবশ্য ঢাকাবাসীর কাছে নবাব বাড়ি নামটিই বেশী জনপ্রিয়। এর দক্ষিণ দিকে [নদী বরাবর] বারান্দা ও সিঁড়ি এবং উত্তর দিকের প্রধান ফটক ও নহবত-খানা তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, সে সময় বাড়িটিতে কোন গম্বুজ ছিল না।

১৮৮৮ সালে, ঢাকার প্রবল টর্নেডোতে বাড়িটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। তখন আবার এটিকে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছিলো। গম্বুজও নির্মিত হয়েছিলো তখন।

আহসান মঞ্জিলের ওপর তলার পূর্বদিকে ছিল বৈঠকখানা, লাইব্রেরী ও অতিথিদের জন্যে তিনটি ঘর। পশ্চিম দিকে ছিল বল নাচের ঘর, নবাবদের শোবার ঘর। নীচের তলায়ও ছিল সমসংখ্যক ঘর তবে পূর্বদিকে আরো ছিল খাবার ঘর, পশ্চিমে বিখ্যাত দরবার হল।[২৭]

বিশ শতকের গোড়ার দিকে নবাব বাড়ির অভ্যন্তরের সুন্দর বর্ণনা পাই পরিতোষ সেনের আত্মজৈবনিক লেখায়---

'সেখানে পৌঁছাতেই দেখি চারদিকে নোকর-চাকর, বন্দুকধারী সেপাই সামন্ত, ঘোড়ার আস্তাবল, ত্রিপলের হুড় দেয়া ফোর্ড গাড়ি, আরো কত লোকজন। তাদের মধ্যে একজন আমাদের দোতলায় অন্দরমহলে নিয়ে আসে। মস্ত মস্ত খিলান থামওয়ালা ঘর, নানারকম ফুল-লতা -পাতার নক্সায় ঘেরা। দরজার ওপর রেশমী পাড় দেওয়া খুব সরু চিকের পর্দা।...

রুহিতনের আকারের, রঙবেরঙের কাঁচ বসানো দরজা আর জানালা। তার ভেতর দিয়ে রামধনুর মোলায়েম আলোয় সমস্ত ঘরটি উদভাসিত। সেই রঙে রঞ্জিত মস্ত ঝাড় লণ্ঠনটির স্ফটিকগুলো নানাবর্ণের তারার মতো ঝিকমিক করে।'[২৮]

কিছু দিন আগেও আহসান মঞ্জিল ছিল দোকানপাটে ঘেরা নোংরা এক বস্তি। সম্প্রতি সরকার এটি অধিগ্রহণ করে এর ভার ন্যস্ত করেছেন জাতীয় যাদুঘরের ওপর। আমাদের প্রস্তাব, আহসান মঞ্জিল ও তার আশে-পাশের এলাকা নিয়ে একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হোক। এই প্রকল্পে আহসান মঞ্জিল সংস্কার, বাগান, রেস্তোরাঁ, নবাবদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করা হোক। পুরো পরিবেশ এমন করা হোক, যাতে তা একই সঙ্গে অবসর বিনোদন ও পর্যটক আকর্ষণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এর সঙ্গে দিল্লীর রেডফোর্টের মত একটি 'লাইট এণ্ড সাউণ্ড শো'র ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে বর্ণিত হবে ঢাকা শহরের ইতিহাস। সম্পূর্ণ প্রকল্প সম্পন্ন হলে

দর্শনার্থীদের কাছ থেকে প্রবেশ মূল্য গ্রহণ করা যেতে পারে যা দিয়ে খানিকটা হলেও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের সাশ্রয় হবে।

খাজা আলীমউল্লাহর বাড়ি থেকে একটু দূরে [বাদামতলির কাছে] পাশাপাশি দু'টি বাড়ি ছিল ঢাকার আরেকজন প্রখ্যাত জমিদার আমিরউদ্দিন দারোগা ও আর্মেনিয়ান মানুকের। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে দারোগা হিসেবে চাকরি করে আমিরউদ্দিন প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিলেন এবং তা দিয়ে ত্রিপুরা ও অন্যান্য জায়গায় জমিদারি কিনেছিলেন। তার বাড়িটি ছিল ছোট, একতলা। মানুকের বাসায় এক সময় থাকতেন নওয়াব বাড়ির দেওয়ান। তাঁর বাড়িটি ছিল বিশাল। এখন এ দু'টির কোন চিহ্নই নেই। মানুকের বাড়ির পাশে আছে একটি ছোট মসজিদ যা তৈরি করেছিলেন আমিরউদ্দিন। এর সঙ্গেই তাঁর কবর। বর্তমানে মসজিদটি অটুট আছে। তবে তা পরিচিত ঘাট [বাংলা বাজার ঘাট] মসজিদ নামে। আমিরউদ্দিনের নাম এখন বিস্তৃত।

এরপর বেশ কিছু দূরে ছিল একটি হিন্দু মঠ ও পুরানো নবাবের [শায়েস্তা খাঁ] প্রাসাদে যাবার ফটক।

তারপর নলগোলার কাছে ছিল ঢাকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও জমিদার পোগজ, জমিদার মীর্জা গোলাম পীরের বাড়ি ও মসজিদ। পোগজ ছিলেন আর্মেনিয়ান এবং তাঁর আমলের ঢাকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। আজকের পোগজ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনিই। তাঁর বাড়িটি এখন নেই। নেই মীর্জা গোলাম পীরের বাড়িও। সেখানে এখন বিসিকের গুদাম। তবে গোলাম পীরের সুন্দর ছোট মসজিদটি এখনও প্রায় অবিকৃত। তবে চার দিকে জঞ্জাল, মসজিদের কোন পরিবেশই নেই। এটিকে সংস্কার করে সংরক্ষণ করা উচিত। মসজিদটি বর্তমানে পরিচিত নলগোলা শাহী মসজিদ হিসেবে।

গোলাম পীরের মসজিদের পাশেই ছিল রেভারেণ্ড লিওনার্দের বাড়ি। এর বেশ খানিকটা দূরে ছিল নানকু মিঞার সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি। নানকু মিঞার বাড়ির বেশ খানিকটা দূরে ছোট কাটরা। এখন প্রথম দুটি নেই আর ছোট কাটরা প্রায় ধ্বংসের পথে।

বড় কাটরার কাছেই, পূবে, নদীর তার ঘেঁষে নির্মাণ করা হয়েছিলো ছোট কাটরা। এখন নদী গেছে দূরে সরে আর ছোট কাটরাকে ঘিরে ধরেছে গলি-উপগলি।

সুবাদার হয়ে ঢাকায় আসার পর, শায়েস্তা খাঁ শুরু করিয়েছিলেন ছোট কাটরার নির্মাণ কাজ [দানীর মতে ১৬৬৩/৬৪; আওলাদ হাসানের মতে ১৬৬৩; আবার যতীন্দ্রনাথ তায়েশের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, শায়েস্তা খাঁ ঢাকায় এসে পৌছেছিলেন ১৬৬৪ সালের ডিসেম্বরে], যতীন্দ্রনাথের মতে ছোট কাটরার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিলো ১৬৭১ সালে।

বড় কাটরার পরিকল্পনার সঙ্গে তেমন কোন অমিল নেই এর, তবে বড় কাটরার তুলনায় ছোট কাটরা অপেক্ষাকৃত ছোট। এ কারণেই বোধহয় অমন নামকরণ। ইংরেজ আমলে অবশ্য ছোট কাটরায় বেশ কিছু সংযোজন করা হয়েছিলো সরাইখানা বা হয়ত কোন প্রশাসনিক কাজে। কোম্পানী আমলে ১৮১৬ সালে মিশনারী লিওনার্দ ছোট কাটরায় খুলেছিলেন ঢাকার প্রথম ইংরেজি স্কুল এবং ১৮৫৭ সালে এখানে প্রতিষ্ঠা

করা হয়েছিলো প্রথম নরমাল স্কুল।

ছোট কাটরার পাশে বিবি চম্পার স্মৃতি সৌধটি দোকানপাট এমনভাবে ঘিরে আছে যে, আর কিছু দিনের মধ্যে সেখানেও যাওয়া যাবে না।

ছোট কাটরা থেকে খানিকটা দূরে ছিল কমিসারিয়েট অফিসার ক্যাপটেন সোয়াটম্যানের দোতলা। তার লাগোয়া বড় কাটরা।

কয়েক বছর আগে একদিন পড়ন্ত বিকেলে গিয়েছিলাম বড় কাটরায়। কাটরার ছাদে উঠে ঢাকা শহর দেখার জন্যে। ছাদে উঠে দেখলাম খানিক দূরে বুড়ীগঙ্গা এঁকে বেঁকে চলে গেছে জাফরাবাদের দিকে, পড়ন্ত সূর্যের আলো তার বুকে, আর চারদিকে ছড়িয়ে শহর। সবচেয়ে বড় কথা, দৃষ্টি মেলে দেওয়া যায় বহু দূর। কয়েকদিন আগে, আবার গিয়েছিলাম সেখানে। প্রবেশ পথ সংকুচিত হয়ে গেছে, কাটরার ঠিক সামনে একাংশে উঠেছে একটি মার্কেট, চারদিকে জঞ্জাল। এভাবে ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে শহর, এর চাপে পুরানো সব কিছু [যা এখনও রক্ষা করা যেতে পারে], বিশেষ করে মুঘল আমলের স্থাপত্যি নিদর্শন গুলি হারিয়ে যাচ্ছে। বড় কাটরা যখন নির্মিত হয়েছিলো, বুড়ীগঙ্গা তখন বয়ে যেতো এর দক্ষিণ ফটক ছুঁয়ে। সে পরিবেশ মনে রাখলে দেখা যাবে, বড় কাটরা ছিল ঢাকা শহরের অন্যতম মনোরম অট্টালিকা। ১৮২৩-এর দিকেও ডয়েলি লিখেছিলেন, ঢাকা শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত বড় কাটরা জাঁকালো, সুন্দর এবং বিশাল এক অট্টালিকা।[২৯]

বলা হয়ে থাকে, শাহ সুজা ঢাকায় নিজের জন্যে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন একটি প্রাসাদ। প্রাসাদ গড়ার ভার দিয়েছিলেন প্রধান স্থপতি আবুল কাসেমকে। প্রাসাদ নির্মিত হওয়ার পর দেখা গেলো, তা পছন্দ হয়নি শাহ সুজার। তখন তিনি তা দান করে দিয়েছিলেন আবুল কাসেমকে।

তবে ১৬৪৪ সালের একটি শিলালেখ দেখে মনে হয়, আবুল কাসেম ক্লান্ত পথিকদের জন্যে সরাইখানা হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন অট্টালিকাটি। এর রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্যে তৈরি করে দিয়েছিলেন আরো বাইশটি দোকান।

রেনেলের মানচিত্র থেকে কাটরার মূল পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মাঝখানে প্রাঙ্গণ, চারদিক তা ঘেরা ছিল ঘর দিয়ে। মূল প্রবেশদ্বার ছিল উত্তর ও দক্ষিণে। দক্ষিণের অংশটি নদীর দিকে, দু'শো তেইশ ফুট লম্বা। এ অংশের মাঝামাঝি ছিল তিনতলা উঁচু ফটক। তার দু'পাশে দোতলা, ঘরের সারি। একেবারে দু'প্রান্তে আটকোনা দুটি বুরুজ। চুন সুরকি দিয়ে মজবুত করে নির্মিত হয়েছিলো অট্টালিকাটি। আরেকটি শিলালিপিতে বড় কাটরা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল-- স্বর্গের সৌন্দর্য ম্লান এর কাছে। স্বর্গের সুখের স্বাদ পাওয়া যায় এখানেই।[৩০]

মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পরই খুবই সম্ভব বড় কাটরা অবহেলার শিকার হতে থাকে। তবে ১৭৬৫ সালে নিমতলি কুঠি নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকার নায়েব নাযিমরা বসবাস করতেন এখানে। তারপর থেকেই বোধ হয় অযত্নে পড়ে থাকতো বড় কাটরা। ১৮২৭ সালে লিখেছেন ও' ডয়েলি, বড় কাটরা তখনও ছিল

সুন্দর। বর্ষাকালে এর রূপ খুলে যেতো। তখন এর ছাদে দাঁড়ালে দেখা যেতো চারদিক পানির নীচে, শুধু উঁচু জায়গাগুলি দ্বীপের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। লিখেছেন তিনি এ সময় কাটরায় বসবাস করতেন গরীব দেশীয়রা।[৩১]

১৮১৬ সালে ও' ডয়েলি অঙ্কিত বড় কাটরার উত্তর দিকের ফটকটি দেখে মনে হয়, তখনই তা ছিল ধ্বংসের পথে। কিন্তু এখন পুরো বড় কাটরা ধ্বংসের পথে। এর চারদিকে নির্মিত হচ্ছে মার্কেট। আমরা মনে করি, এখনও বড় কাটরায় যেটুকু সম্ভব [বিশেষ করে মূল ফটক, প্রাচীরের একাংশ] রক্ষা করা উচিত। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এখনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

বড় কাটরার পাশে ছিল দুটি বাড়ি— মৌলবী হুসেনউল্লাহ এবং মীর্জা আনু আলী ও মোহাম্মদ আলীর বাসভবন। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, বড় কাটরার পাশের বাড়িটি ছিল এক সময় জনৈক আলেকজান্ডারের। অনেক দিন তা খালি পড়েছিলো। ১৯৪৭ সালে দাঙ্গার সময় এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো ইসলামিয়া হাই স্কুল। বছর তিন-চারেক আগে বাড়িটি ভেঙ্গে মার্কেট ওঠানো হয়েছে। বড় কাটরার সামনের ও আশে-পাশের অংশটুকু মীর্জা আনু ও মোহাম্মদ আলীর অধিকারে। হয়ত তাঁরা ছিলেন পুরনো নবাবদের বংশধর। এখন অবশ্য বাড়ি দু'টির কোন চিহ্ন নেই।

এরপর অনামা শিল্পী এঁকেছিলেন সুন্দর এক স্মৃতিসৌধের ছবি। এটি নির্মিত হয়েছিলো নাজির নাটু সিং ও তাঁর মায়ের দেহাবশেষের ওপর। মঠটি ছিল বর্তমান ওয়াটার ওয়ার্কসের পাশে। স্থানীয় লোকজন এটিকে চিনতেন নাজিরের মার মঠ বলে। এখন তা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত।

তারপর লালবাগ কেল্লা। বর্তমানে কেল্লাটি সংস্কার করে সৃদৃশ্য করা হয়েছে। এর ফলে পুরো জায়গাটি বদলে গেছে। লালবাগ কেল্লা এখন ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

সবশেষে আমলীগোলার কাছে ছিল সাদামাটা একটি বাড়ি। ব্যাঙ্কার জগৎশেঠের ব্যাঙ্কের ঢাকা শাখা। এখন এর কোন চিহ্ন নেই।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এখনও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেতন হলে, ঢাকার বেশ কিছু সুন্দর পুরানো ঘরবাড়ি সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বিশেষ করে বাকল্যাণ্ড বাঁধকে এখনও জঞ্জাল ও ভীড়মুক্ত যদি সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে এলাকাটি পরিণত হবে শহরের মনোরম একটি স্থানে, পরিবেশ দূষণ রোধ করা যাবে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ঘিঞ্জি এলাকায় হঠাৎ হঠাৎ খানিকটা জায়গা নিয়ে পরিচ্ছন্ন সংরক্ষিত বাড়ি চোখকে আনন্দ দেয়। পর্যটকের ভীড়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা হয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস। লালবাগ দুর্গ এর একটি উদাহরণ। তবে এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, এগুলি কখনই কার্যকর হবে না, যদি না ঢাকাবাসী-বিশেষ করে পুরানো ঢাকাবাসী এ জন্য দাবী না তোলেন, সোচ্চার হয়ে না ওঠেন।

তথ্যনির্দেশ

১. F. Karim Khan and Nazrul Islam, *'High class residential areas in Dacca city,'* The Oriental Geographer, vol. III. No. I. 1964, p. 4. এ প্রবন্ধে তাঁরা অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের ঢাকার জনসংখ্যা উল্লেখ করেছেন, নীচে তা উদ্ধৃত করা হলো—

বৎসর	ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা	উৎস
১৭০০	৯০০,০০০	জেমস টেলর
১৮০০	২০০,০০০	ঐ
১৮১৪	২০০,০০০	ও ডয়েলি
১৮২৪	৩০০,০০০	বিশপ হেবার
১৮৩৮	৬৮,৩৩৮	ঐ
১৮৬৭	৫১,৬৩৫	রেনেল
১৮৭২	৬৯,২১২	সেন্সাস অফ পাকিস্তান, ১৯৫১
১৮৮১	৮০,৩৫৮	ঐ
১৮৯১	৮৩,৩৫৮	ঐ
১৯০১	১০৪,৩৮৫	ঐ
১৯১১	১২৫,৭৩৩	ঐ
১৯২১	১৩৭,৯০৮	ঐ
১৯৩১	১৬১,৯২২	ঐ
১৯৪১	২৩৯,৭২৮	ঐ
১৯৫১	৩৩৫,৯২৮	ঐ
১৯৬১	৫৫০,১৪৩	সেন্সাস অফ পাকিস্তান ১৯৬১

২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন

F. D. Ascoli, *Final Report on the Survey and Settlement Operation in the Dacca District,* Calcutta, 1917.

৩. মুঘল আমলে শহরের বিভিন্ন অঞ্চল গড়ে ওঠার কারণ ও নামকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন

Abdul Karim, *Dacca, The Mughal Capital,* Dacca, 1964.

৪. খান ও ইসলামের *প্রাগুক্ত প্রবন্ধ,* পৃ: ৯

৫. Syed Muhammed Taifoor, *Glimpses of old Dhaka,* Dacca, 1984. p. 261-262.

৬. খান ও ইসলামের *প্রাগুক্ত প্রবন্ধ* পৃ: ১১।

৭. Greenfell Rudduck, 'Towns and Villages of Pakistan' Karachi, 1961, p. 76, cited in *The Oriental Geographer,* -. 12.

৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ,* ঢাকা, ১৯৮৬।

৯. *ঐ*।

১০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *বাংলাদেশের লোকশিল্প,* ঢাকা,

১৯৮২।

১১. জেমস টেলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা* [মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত], ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ: ৫৯।

১২. সিরাজুল ইসলাম, *'ডে সাহেবের ঢাকা'*, বিচিত্রা, ১৮, ৪, ১৯৭৫।

১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন—Reginald Heber, *A Narrative of a Journey through the Upper Provines of India, From Calcutta to Bombay, 1820-25 (with notes upon Ceylon)*, London 1824.

১৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Henry Walters, *'Census of the City of Dacca'*. Asiatick Researches, 1837. (reprint) London, pp.536-558.

১৫. টেলরের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

১৬. *ঐ*।

১৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮৯৪।

১৮. ভবতোষ দত্ত, *আটদশক*, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ: ৩৮-৩৯। এ প্রসঙ্গে ১৯১৭ সালে প্যাট্রিক গ্যাডেস লিখেছিলেন—

'This excellent suburb at once proves the demand for houses of the bungalow type and the possibility of planning them in Dacca. In this prosperous and desired, and also extend its survay throughout the north east quarter. This is partly filling up with wealthy houses, partly with houses of the oid village type,' P. Geddes, *Report on Town Planning*—Dacca, Calcutta, 1917, p.6.

এখানে পুরানো আমলের একটি বাড়ি তৈরির খরচ দেওয়া যেতে পারে। দীননাথ সেন, ১৮৬৬ সালে গেণ্ডারিয়ায় তাঁর বাড়ি তৈরি করার সময় জমি উঁচু করার জন্য মাঝারি আকারের দু'টি পুকুর কাটিয়েছিলেন, যার জন্য খরচ পড়েছিলো আড়াই হাজার টাকা। ওস্তাগার তুলেছিলো দালান। মজুরি ছিল তখন—

রাজ—	।৯.
কুলি—	।.
ভিস্তি—	।.
ছোকরা	[সহকারী] ৯/১০
সর্দাব রাজ	।।.
ঘরামী	।/৫
রংওয়ালা	।/৫

দেখুন, আদিনাথ সেন, *দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ: ২৩৫-২৩৬।

১৯. মুনতাসীর মামুন, *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ: ১৭।

২০. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮৬৯।

২১. সত্যেন সেন, *'সদরঘাটের বাকল্যাণ্ড বাঁধ'*, *শহরের ইতিকথা*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ: ১৩২-১৩৬।

২২. *ঐ*

২৩. *ঢাকা প্রকাশ,* ১৮৮৮।

২৪. শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী, *বাংলার পারিবারিক ইতিহাস,* ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা দ্বিতীয় সং; সন উল্লিখিত হয় নি], পৃ: ৯২।

২৫. কাজী মোতাহার হোসেন, *নওয়াব স্যার সলিমউল্লাহ,* ঢাকা, ১৯৮০, পৃ: ৯।

২৬. আদিনাথ সেনের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ,* পৃ: ১৪।

২৭. *ঢাকা প্রকাশ,* ১৮৮৫।

২৮. পরিতোষ সেন, *জিন্দাবাহার,* কলকাতা, ১৩৮৬, পৃ: ৬০।

২৯. Charies O, D'oyly, *Antiquities of Dacca,* London 1824, p 10.

৩০. Ahmad Hasan Dani, *Dacca,* Dacca, 1959, pp 105-107.

৩১. ডয়েলির *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ: ১০।

শব্দসূচি

কর্নেল
ডেভিডসন
যখন
ঢাকায়

মুনতাসীর মামুন



কর্নেল ডেভিডসন যখন ঢাকায়

মুনতাসীর মামুন

কর্নেল ডেভিডসন যখন ঢাকায়

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের লেঃ কর্নেল ছিলেন সি জে সি ডেভিডসন। ১৭৯৩ সালে তাঁর জন্ম কলকাতায়। 'ইউরোপ শপ' নামে তাঁর বাবার একটি দোকান ছিল কলকাতায়। আদিসকম্বে ১৮১০-১১ পর্যন্ত তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন প্রকৌশলী হিসেবে এবং সেনাবাহিনীতে ইঞ্জিনিয়ার ক্যাডেট শিপ লাভ করেছিলেন ১৮১২ সালে। ডেভিডসন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন ১৮৪১ সালে এবং ফিরে গিয়েছিলেন লন্ডন। সেখানেই তিনি পরলোক গমন করেছিলেন ১৮৫২ সালে।

সংক্ষেপে এই হলো কর্নেল ডেভিডসনের জীবনী। কিন্তু, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে এরকম হাজার হাজার কর্মচারী ছিলেন। সুতরাং ডেভিডসনকে বেছে নেয়ার কারণ কি? কারণ একটাই। ১৮৪০ সালে ডেভিডসন এসেছিলেন ঢাকায়। সে সময়ের ঢাকার একটি বিবরণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে। সে বিবরণের কারণেই আমাদের কাছে ডেভিডসন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারী থেকে আলাদা।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, ডেভিডসন এমন কি লিখে গেছেন যা জেমস টেইলরের বিবরণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ? জেমস টেইলরের প্রসঙ্গ আসছে এ কারণে যে ১৮৪০ সালেই প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ--'স্কেচ অফ দি টপোগ্রাফী অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস অফ ঢাকা'। এ বইটি এখনও ঢাকার ওপর প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত যদিও বইটি ঢাকা জেলার ওপর, শহরের ওপর নয়। তবে ঐ সময়ের শহরের কিছু বিবরণও লিপিবদ্ধ করে গেছেন টেইলর। তবে, ডেভিডসন তাঁর বিবরণে শহর সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য রেখে গেছেন যা টেইলর বা সমসাময়িক অন্য কোন বিবরণে নেই। এ কারণেই ডেভিডসনের বিবরণটি কৌতূহলোদ্দীপক এবং বাংলাভাষী, ঢাকা চর্চায় আগ্রহী পাঠকদের জন্যে প্রয়োজনীয়।

খুব সম্ভব বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের ষষ্ঠ এলাহাবাদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে ১৮৩৯ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ডেভিডসন। এবং দেশে ফেরার আগে, সম্পূর্ণ লটবহর নিয়ে তিনি ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন। এটি অনুমান, কারণ ডেভিডসন সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাই নি বা তাঁর রচিত মূল বইটি দেখাও সম্ভব হয়নি। জানা যায়, ৫ ডিসেম্বর ১৮৩৯ সালে তিনি বেরিয়েছিলেন ভ্রমণে। এ জন্য এক হাজার মণ ওজনের দুটো নৌকা ভাড়া করেছিলেন। একটি নৌকোয় ছিল তাঁর কেবিন বা থাকার জায়গা।

ঐ নৌকোয় ছিল আবার তাঁর আসবাবপত্র ভরা ৫৬টি বড় বড় বাক্স। অন্যটিতে ছিল তাঁর তিনটি ঘোড়া।

এলাহাবাদের যমুনা থেকে নোঙ্গর তুলেছিলেন ডেভিডসন ১৮৩৯ সালের পাঁচ-ই ডিসেম্বর। দিনাজপুর পৌঁছলেন ১৯ ডিসেম্বর, ২৭ ডিসেম্বর মুঙ্গের। রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়ায় পৌঁছলেন ১৮৪০ সালের জানুয়ারী। ৬ জানুয়ারী সূর্যাস্তে তাঁর নৌকো পড়লো পদ্মায়। চোখে পড়ছিলো তখন সব নীলকুঠি। ৯ তারিখ দেখেছিলেন তিনি নৌকোর লম্বা বহর, চাটগাঁ থেকে সেপাই নিয়ে যাচ্ছে বেনারস। ১১ জানুয়ারী ডেভিডসন পৌঁছেছিলেন মানিকগঞ্জের এক জনবহুল গ্রামে। এখানে পাশের গ্রামের নীলকুঠি থেকে পেয়েছিলেন খবরের কাগজ। ১৩ জানুয়ারী ১৮৪০ সালে পৌঁছেছিলেন তিনি ঢাকায়।

ভারতের একাংশ ভ্রমণের পর ডেভিডসন চলে গিয়েছিলেন লণ্ডন। সেখান থেকে ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর ভ্রমণ কাহিনী 'ডায়েরী অফ ট্রাভেলস অ্যাণ্ড এডভেঞ্চারস ইন আপার ইণ্ডিয়া।'

সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইতিহাস বিষয়ক সাময়িকী 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট'-এ, সেই ভ্রমণ বিবরণের ঢাকা অংশটুকু 'ঢাকা ইন এইটিন ফোর্টি' শিরোনামে উদ্ধৃত করা হয়েছিলো। কর্নেল ডেভিডসনের সেই বিবরণ অবলম্বনে রচিত হয়েছে বর্তমান নিবন্ধটি।

এ প্রসঙ্গে জেমস টেইলরের কথা উল্লেখ্য। বাকল্যান্ড ভারতে ইংরেজ সিভিলিয়ান ও ভারতীয়দের যে জীবনী অভিধান রচনা করেছেন তাতে টেইলরের নাম নেই। তাতে বোঝা যায়, কোম্পানির চাকুরেদের মধ্যে তার তেমন নাম ডাক ছিল না। কিন্তু পূর্ববঙ্গ বা ঢাকা নিয়ে গবেষণা করতে গেলে টেইলরের নাম চলে আসবেই। অথচ তাঁর আমলের ডাকসাইটে চাকুরেদের নাম আজ কেউ জানে না, জানার প্রয়োজনও নেই। টেইলরকে আমরা স্মরণ করি তাঁর 'টপোগ্রাফী অ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিকস অফ ঢাকা'র জন্য যা আগেই উল্লেখ করেছি।

গত শতকের ত্রিশের দশকে সিভিল সার্জন হিসেবে ঢাকায় এসেছিলেন টেইলর। শহরটিকে তিনি জানার চেষ্টা করেছেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা।

ত্রিশের দশকের শেষের দিকে ফোর্ট উইলিয়ামের মেডিকেল বোর্ড বিভিন্ন জেলার মেডিকেল অফিসারদের নিজ নিজ জেলা সম্পর্কিত বিবরণ ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। সে অনুযায়ী ঢাকার ওপর তথ্য সংগ্রহ করে ১৮৩৯ সালে টেইলর প্রেরণ করেন, পাণ্ডুলিপি পুস্তকাকারে যা প্রকাশিত হয় পরের বছর। ঢাকা জেলা সংক্রান্ত প্রামাণ্য পুস্তক হিসেবে এ গ্রন্থটি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত।

টেইলরের মূল বইটি এখন অতি দুস্প্রাপ্য। কোন এক গ্রন্থাগারে বইটি একবার দেখেছিলাম কিন্তু ব্যবহারের সুযোগ হয় নি। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমী বইটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে। অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। কিন্তু

অনুবাদটি আড়ষ্ট, অনেক জায়গায় অনুবাদ সঠিক হয় নি, মূল শব্দের অর্থ বদলে গেছে। তা সত্ত্বেও বইটি ব্যবহার করতে হয়েছে মূল বইয়ের অভাবে।

ডেভিডসনের বিবরণটি হুবহু অনুবাদ করিনি। ভাবানুবাদ করা হয়েছে। ঐ বিবরণের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে টেইলরের বিবরণ। প্রয়োজনে সংযোজন করেছি সমসাময়িক অন্য তথ্য। এ বিবরণের উদ্দেশ্য সমসাময়িক ঢাকার একটি চিত্র তুলে ধরা।

১

১৮৪০ সালের ১৩ জানুয়ারী, দূর থেকে আবছাভাবে ডেভিডসনের চোখে পড়লো ঢাকা। চারদিকে ঘন কুয়াশা। এর মধ্যে যে জিনিসটি নজরে এলো তা হলো শহরের বিপরীতে, নদীর পশ্চিম দিকে 'উঁচু ও স্থায়ী' এক দোতলা বাড়ি। ঢাকার নবাব আগে শিকার কুঠি হিসেবে এটিকে ব্যবহার করতেন। শহরটি বুড়িগঙ্গার পূর্ব তীরে, লম্বায় হবে প্রায় দু'মাইল। তিন চার মাইল দূর থেকে বা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলেও ভারী সুন্দর দেখায় শহরটিকে। বাড়িগুলি থামওয়ালা, সাদা, জ্বলজ্বল করছে। এগুলির জাঁকালো ভাব দেখে বিস্মিত হবেন যে কোন পর্যটক। পরে অবশ্য কাছে থেকে এর ক্ষয় দেখে হবেন হতাশ। শহরের সীমারেখায় নৌকো ঢোকার পর ডেভিডসনের নজরে এলো অনেকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকা যেগুলির কিছু কিছু অংশ পড়ে গেছে নদীতে। নদীকে বেঁধে রাখার সব ধরনের প্রচেষ্টাই ব্যর্থ।

টেইলরের বর্ণনাও প্রায় একই রকম। লিখেছেন তিনি, ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গা যেখানে মিলেছে, তার প্রায় মাইল আটেক ওপরে, বুড়ীগঙ্গার উত্তরে অবস্থিত ঢাকা। নদীটি সেখানে গভীর ও উপযোগী বড় বড় নৌকা চলাচলের। বর্ষাকালে নদী ভরে যায় এবং বড় বড় মিনার ও অট্টালিকা শোভিত ঢাকা নগরীকে মনে হয় ভেনিসের মতো। ঢাকার পূবে শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্ন ভূমি মুসলমান গোরস্থান, পরিত্যক্ত উদ্যান, মন্দির মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘরের সমাকীর্ণ জঙ্গলাবৃত এক ভূ-ভাগ। যে অংশটি নিয়ে ঢাকা শহর গঠিত তা কেবল সীমাবদ্ধ নদীতীরেই এবং তীর বরাবর শহরটির দৈর্ঘ্য চার ও প্রস্থে ১$^{১}/_{৪}$ মাইল।[১]

শহরের কাছাকাছি, ডেভিডসনের নৌকো পেরিয়ে গেলো লম্বা একটি ডিঙ্গি। সিলেটের চমৎকার কমলা লেবুতে ভর্তি। তিনি জানিয়েছেন, ঢাকায় কমলা পাওয়া যায় প্রচুর এবং তা খুব শস্তাও। এক পয়সায় চারটি, বা দুই শিলিংয়ে ১৫৬টি। কিন্তু জানুয়ারী মাসটি শস্তার সময় নয়। বোম্বাই থাকার সময় ডেভিডসন আওরঙ্গাবাদ, জোহানা এবং আগ্রায় কমলা বাগানে গিয়ে কমলা খেয়েছেন কিন্তু তার তুলনায় সিলেটের বনের বুনো কমলা স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়।

ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য প্রচুর কাঠ ফেলে রাখা হয়েছে নদী তীরে। বাজারে সব ধরনের ভারতীয় কাঠ মজুদ। ডেভিডসন লিখেছেন, পরে শহরে ঘুরে তাঁর মনে হয়েছে,

শহরে কাঠের যা মজুদ তা আরো দশ বছরের চাহিদা মেটাতে পারবে। ঢাকা থেকে কলকাতায় কাঠ যায় কিনা সে সম্পর্কে ডেভিডসন কিছু জানাতে পারেন নি তবে তাঁর মনে হয়েছে, ঢাকা শহর ও আশেপাশে নতুন কোন বাড়ি নির্মিত হচ্ছে না; নৌকো হয়ত কিছু তৈরি হয়।

ডেভিডসন যে নৌকো নির্মাণের কথা বলেছেন তার বিবরণ আমরা পাই পর্যটক তাভেরনিয়রের লেখায়। ডেভিডসন ঢাকায় পা দেওয়ার প্রায় দু'শো বছর আগে এসেছিলেন তিনি ঢাকায়। পাগলা পুলের কাছে দেখেছিলেন নৌকো নির্মাতাদের বসতি, তাঁরা ছিলেন ছুতোর মিস্ত্রি। বড় বড় নৌকো বা সব ধরনের জলযান নির্মাণ করতেন তারা।[২] অষ্টাদশ শতকেও, অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল ততদিন পর্যন্ত নৌকো নির্মাণ এক ধরনের 'শিল্প'ই ছিল বলা চলে। ডেভিডসন যখন ঢাকায় এলেন, মনে হচ্ছে তখন এ শিল্পের শেষ অবস্থান। কারণ, তখন ঢাকা এক বিপর্যস্ত নগরী।

আর ডেভিডসন বর্ণিত কাঠের ডিপোগুলি কোথায় ছিল তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায় হৃদয়নাথ মজুমদার নামে এক উকিলের স্মৃতিচারণায়। লিখেছেন তিনি, ফরাশগঞ্জ অনেকদিন থেকে শাল ও সেগুন কাঠের ডিপো হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রেবতী মোহন, দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের আলাদা আলাদা গুদাম ছিল ফরাশগঞ্জে। নওয়াবগঞ্জের চরেও ছিল এ ধরনের কাঠের ডিপো।[৩] খুব সম্ভব এ বর্ণনা উনিশ শতকের শেষার্ধের। এখনও ফরাশগঞ্জে আছে কাঠের কয়েকটি ডিপো।

দু'জন ষ্টাফ অফিসার তাদের বাসাটা ছেড়ে দিয়েছিলেন ডেভিডসনের ব্যবহারের জন্যে। তাঁদের একজন গেছেন মনিপুর থেকে সিলেট পর্যন্ত অরণ্য জরিপ করতে। আরেক জন গেছেন অনারেবল কোম্পানীর জন্যে চাটগাঁর আশেপাশে হাতি ধরতে। ডেভিডসনের এই বাড়ির পিছে একটি বিশাল গথিক ফটক যা আগে ছিল চমৎকার এক সরাইখানার প্রবেশপথ। মূল ইমারতটি তখন ধ্বংসের পথে। তবে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলে পুরো শহর এবং শহরতলির খানিকটা অংশ চমৎকার চোখে পড়ে। ইমারতটির উপরে ও নীচে অনেক ঘর। আশেপাশে মুসলমানদের তৈরি সৌধসমূহের ধ্বংসাবশেষ যা চার্লস ও'ডয়েলীর চমৎকার ড্রইং এ ধরা আছে। ডেভিডসনের মনে হয়েছে, ঢাকা অনেকটা লখনৌর মতো। লখনৌর রেসিডেন্সীর ছাদ থেকে পুরনো লখনৌকে যেমন *দেখায়, ঐ ইমারতের ছাদ থেকেও ঢাকা-কে তেমন দেখায়।*

যে ইমারতের কথা উল্লেখ করেছেন ডেভিডসন তা ছিল শাহসুজার আমলে ১৬৪৪ সালে নির্মিত বড় কাটরা। ঢাকার এক সময়ের ম্যাজিষ্ট্রেট ও'ডয়েলী যিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিত্রকরও লিখেছিলেন ১৮২৩ সালে, ঢাকা শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত বড় কাটরা জাঁকালো, সুন্দর এবং বিশাল এক অট্টালিকা।[৪] রেনেলের মানচিত্র থেকে কাটরার মূল পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মাঝখানে প্রাঙ্গণ, চারদিকে তা ঘেরা ছিল ঘর দিয়ে। মূল প্রবেশদ্বার ছিল উত্তর ও দক্ষিণে। দক্ষিণের অংশটি নদীর দিকে, দুশো তেইশ ফুট লম্বা। এ অংশের মাঝামাঝি ছিল তিনতলা উঁচু ফটক। তার

পাশে দোতলা, ঘরের সারি। একেবারে দু'প্রান্তে আটকোণা দুটি বুরুজ। বড় কাটরার একটি শিলা-লিপিতে লেখা ছিল স্বর্গের সৌন্দর্য ম্লান এর কাছে। স্বর্গের সুখের স্বাদ পাওয়া যায় এখানেই।[৫]

মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পরই খুব সম্ভব বড় কাটরা অবহেলার শিকার হতে থাকে। তবে ১৭৬৫ সালে নিমতলি কুঠি নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকার নায়েব নাজিমরা বসবাস করতেন এখানে। তারপর থেকেই বোধহয় অযত্নে পড়ে থাকতো বড় কাটরা। ১৮২৭ সালে লিখেছিলেন ও'ডয়েলী, বড় কাটরা তখনও ছিল সুন্দর। বর্ষাকালে এর রূপ খুলে যেতো। এ সময় বড় কাটরায় বসবাস করতেন গরীবরা।[৬] ডেভিডসন যখন ঢাকায় তখন মনে হয়, বড় কাটরা অটুট থাকলেও এর উত্তর দিকের ফটক গিয়েছিলো প্রায় ধ্বংস হয়ে।

ছাদ থেকে ঢাকা শহর দেখার যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন ডেভিডসন তা অতিরঞ্জিত নয়। বছর পাঁচেক আগে, একদিন পড়ন্ত বিকেলে গিয়েছিলাম বড় কাটরায়। কাটরার ছাদে উঠে ঢাকা শহর দেখার জন্যে। ছাদে উঠে দেখলাম, খানিক দূরে বুড়িগঙ্গা এঁকেবেঁকে চলে গেছে জাফরাবাদের দিকে, পড়ন্ত সূর্যের আলো তার বুকে, আর চারদিকে ছড়িয়ে শহর। সবচেয়ে বড় কথা, দৃষ্টি মেলে দেওয়া যায় বহুদূর। কয়েকদিন আগে, আবার গিয়েছিলাম সেখানে। প্রবেশপথ সংকুচিত হয়ে গেছে, কাটরার ঠিক সামনে একাংশে উঠেছে একটি মার্কেট, চারদিকে জঞ্জাল। বড় কাটরা যখন নির্মিত হয়েছিলো, বুড়িগঙ্গা তখন বয়ে যেতো এর দক্ষিণ ফটক ছুঁয়ে। সে পরিবেশ মনে রাখলে দেখা যাবে, বড় কাটরা ছিল ঢাকা শহরের অন্যতম মনোরম অট্টালিকা।

বড় কাটরার পাশে বাড়িটি যেটিতে ডেভিডসন উঠেছিলেন, সেটি খুব সম্ভব নির্ধারিত ছিল সামরিক অফিসারদের জন্যে। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানা গেছে, এটি ছিল জনৈক আলেকজাণ্ডারের। ১৯৪৭ সালে দাঙ্গার সময় এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো ইসলামিয়া হাই স্কুল। সম্প্রতি সে বাড়ি ভেঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে মার্কেট।

ডেভিডসন তারপর লিখেছেন চকবাজার সম্পর্কে,— কাছেই চক, খুব সম্ভব দুশো গজের একটি চত্বর, নীচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। চারপাশে একটি প্রশস্ত রাস্তা। চত্বরে ঢোকার জন্যে আছে অসংখ্য প্রবেশপথ। মাঝখানে একটি ফ্ল্যাগষ্টাফ, তার পাশে একটি উঁচু বাঁধানো বেদীতে রাখা আছে একটি কামান। ডেভিডসনকে অনেকে জানিয়েছিলেন, নদীর পাশ থেকে কামানটিকে সরাতে অনেকে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন, পরে ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়াল্টার্স-এর ইউরোপীয় প্রযুক্তির ফলে নদীর পাশ থেকে কামানটিকে সরানো সম্ভব হয়েছে।

টেইলর আর ডেভিডসন চকবাজারের যে বর্ণনা রেখে গেছেন তাতে কোন পার্থক্য নেই। এখানে শুধু উল্লেখ করা যেতে পারে, যে কামানটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা হলো বিবি মরিয়ম। এটি ছিল সোয়ারীঘাটে। ১৮২৮ সালে ওয়াল্টার্স কামানটিকে

চকবাজারের স্থাপন করেছিলেন হয়ত এ ভেবে যে, চক হলো ঢাকার কেন্দ্র। এর ওজন ৬৪, ৮১৪ পাউণ্ড। আরো জানা যায়, হিন্দুরা তেল সিঁদুর দিয়ে পূজো করতেন কামানটিকে।

ডেভিডসন লিখেছেন, চকবাজার ঢাকার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। অসংখ্য ছোটখাটো দোকান, বিক্রেতা এখানে বিক্রি করে টুপি, সুতী বস্ত্র ও নানা বর্ণের ছিট কাপড়, লোহার জিনিসপত্র, বড়শী, যাঁতা, আয়না, শীতলপাটি, ভ্রমণকারীদের জন্যে বেতের পেঁটরা বা বাক্স, নানা রংয়ের ও ধরনের জুতো, নারকেলী হুঁকো ইত্যাদি। চক থেকে দক্ষিণে গেছে একটি রাস্তা যেখানে সামরিক বাহিনীর লোকজন ও সিভিলিয়ানরা থাকেন।

সেনানিবাসের কথাও উল্লেখ করেছেন ডেভিডসন, যা তাঁর মতে, 'খুব সবুজ এবং সুন্দর কিন্তু রেজিমেণ্টের সব অফিসারের মধ্যে একজন বা দু'জন থাকেন সেনানিবাসের ভেতরে। বাকীরা জ্বরে ভুগে বা জ্বরের ভয়ে থাকেন শহরে। এ কারণে, অফিসারদের অনুমতি নেওয়া হয়েছে শহরে থাকার। সেনানিবাসের ঠিক পাশে আছে বেশ বড় এক জলাভূমি যা মারাত্মক ম্যালেরিয়ার উৎস। সেনানিবাসের ভেতরে আছে কয়েকটি পুকুর, যেগুলির বেলায়ও একই রকম বিশেষণ প্রযোজ্য। বর্ষায়, সেনানিবাসের দক্ষিণে জমে ওঠে পানি, শীতের সময় যা শুকোয় ধীরে ধীরে।

ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ড'স তেজগাঁও বেগুনবাড়ী থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পলটনে স্থানান্তর করেছিলেন সেনানিবাস। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য সিপাহী অফিসার সবাই আক্রান্ত হতে থাকে। অফিসাররা তখন সেনানিবাসে বসবাস করতে অস্বীকার করে। ফলে, কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় অফিসারদের শহরে বসবাস করার অনুমতি দিতে। ঢাকা সেনানিবাসে তখন বদলি হওয়াকে মনে করা হতো শাস্তি হিসাবে। জি, ও, ট্রেভিলিয়ানের একটি উপন্যাসে দেখা যায় নায়ক মার্সডেন, তার প্রেমিকা ফ্যানীকে বলছে— তুমি এক পাক্কা পরী। তোমার জন্য জান দিয়ে দেবো। তোমার জন্যে ঢাকার ইস্ট ইণ্ডিয়া রেজিমেণ্টে বিনা বেতনে কাজ করবো।[৭]

ডেভিডসন ঢাকায় আসার বারো বছর পর ১৮৫২ সালে কলকাতার একটি পত্রিকা লিখেছিলো ঐ সময়ের পলটন সম্পর্কে—

'ঢাকা নগরের পার্শ্বে বহুকাল ব্যাপিয়া রাজকীয় এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্য দলের যে আবাসস্থল নির্দ্ধার্য্য ছিল সম্প্রতি সেনাপতিরা তৎসীমা বিস্তার করা করণাভি প্রায় দ্বারা নগরীয় উত্তর দিগস্থ বহু সংখ্যক প্রজাগণের গৃহাদি ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই ছাউনির উত্তর ভাগে যে বিপুল বিস্তারিত অরণ্য আছে বোধকরি তাহা পরিষ্কার করিলে এমন দুই তিনশত সৈন্য শিবির স্থাপিত হইতে পারে কিন্তু উক্ত কর্মে নিবিষ্ট অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাহা না করিয়া যে এই দুঃসহ বর্ষাকালে উপায়হীন দীন প্রজাসমূহকে উৎপাত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। ঐ অধ্যক্ষ মহাশয়গণ বলেন যে নগরের লোকদের দ্বারা নির্গত মলীনত্ব ও ষড়িত স্থান সকলের দুর্গন্ধ দ্বারা পলটনের সিপাহিরা সর্বদা পীড়িত হয়, এই হেতুক ঐ লোকদের গৃহাদি ভগ্নপূর্বক

স্থানান্তরিত করণের আবশ্যক হইয়াছে, ফলতঃ তদর্থে এই নগর একেবারে উৎখাত করিলে ঐ কথার পোষকতা হয়।'[৮]

ডেভিডসন এরপর জানিয়েছেন ঢাকার ঘরবাড়ি সম্পর্কে। তাঁর মতে, মসলিন যখন ঢাকাকে বিখ্যাত করে তুলেছে তখন প্রধানত ইউরোপীয় বাসগৃহগুলি নির্মিত হয়েছিলো। বাড়ীগুলি বড়সড়। দোতলা, কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের ভাড়া মাসিক ষাট থেকে একশো পঁয়ত্রিশের মধ্যে। এসব বাড়ীর মধ্যে অধিকাংশ বাড়ীর সঙ্গে আছে ছোটখাটো সুন্দর বাগান। আর যে বাড়ীগুলি নদী তীরে সেগুলি সবচেয়ে সুন্দর এবং এসবের চাহিদাও সবচেয়ে বেশি।

টেইলর লিখেছেন, এসব বাড়ীর ছাদেও ছিল বাগান।[৯]

একদিন ডেভিডসন চাইলেন ঢাকার নবাবকে সালাম জানাতে। ঢাকার নবাব বলতে ডেভিডসন বুঝিয়েছেন, ঢাকার শেষ নায়েব নাযিম গাজীউদ্দিন হায়দারকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যান নি। কারণ তাঁর ভাষায় - 'আমাকে একজন ভারী বুদ্ধিমান লোক জানালেন, নবাব এখন খুবই দরিদ্র, দেখা করে কোন লাভ নেই। তিনি একজন অশিক্ষিত তরুণ ঃ তবে তাঁর বয়সী ও বংশের তরুণদের থেকে খারাপ নয়। ইংরেজি তিনি একেবারে জানেন না। তিনি এতো উচ্ছৃঙ্খল এবং চিন্তাহীন যে তাঁর আয় এখন পাঁচ হাজার থেকে দুশোতে দাঁড়িয়েছে যার অর্থ বছরের ছয় হাজার পাউণ্ড থেকে দুশো চল্লিশ পাউণ্ড। কারণ, তাঁর আয় তিনি বন্ধক রেখেছেন। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা যে বাড়ীতে বসবাস করতেন তিনিও সেখানে বসবাস করেন, তবে খুব খারাপ ভাবে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, পুরনো ধরনের শিরস্ত্রান পরে কয়েকজন ঘোড়সওয়ারসহ ঘোড়ায় চড়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন...'

গাজীউদ্দিনের পিতা ছিলেন কামারউদদৌলা। পিতার মৃত্যুর পর তরুণ নাজিম উদদৌলা কমর উল মুলক নওয়াব সৈয়দ গাজী উদ্দিন খান বাহাদুর ফিরোজ জঙ্গ স্বীকৃত হলেন নায়েব নাজিম পরিবারের কর্তা হিসেবে। তাঁর ভাতা ধার্য করা হয়েছিলো মাসিক সাড়ে চার হাজার সিক্কা টাকা। এই নতুন নবাবের দারোগা ছিলেন তাঁর নানা মীর জীবন। তাঁর প্ররোচনায় গাজীউদ্দিন লেখাপড়া ছেড়ে দেন। নবাব একমাত্র সমীহ করতেন তাঁর শিক্ষক মীর গোলাম আলীকে। মীর জীবনের প্ররোচনায় তাঁকেও বরখাস্ত করা হয়। এরপর নবাব তাঁর নানার পরামর্শে শুরু করেন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন। এমন কোন নেশা ছিল না যাতে তাঁর আসক্তি ছিল না। বিশেষ ভাবে আসক্ত ছিলেন তিনি রমণীদের প্রতি। এবং তাঁর হারেমে নিত্য নিয়ত নতুন রমণী আমদানী ও পুরোনোদের দেওয়া হতো খারিজ করে। এ ছাড়া ভালোবাসতেন তিনি ঘুড়ি ওড়াতে, মোষ এবং মোরগের লড়াই দেখতে, বুলবুলি, কুকুর ও বেড়ালের বিয়ে দিতে এবং ইউরোপীয় মহিলাদের মতো পোশাক পরতে। এ কারণে, ঢাকাবাসীরা তাঁকে ডাকতেন পাগলা নবাব বলে। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্যে সরকারী ভাতায় তাঁর কুলোতো না। ফলে, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিতে লাগলেন তিনি মহাজনদের কাছে। তার দাদী ও কোম্পানি সরকারও গাজীউদ্দিনকে কয়েকবার শোধরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

১৮৪৩ সালে অত্যধিক ব্যভিচারের কারণে খুব অল্প বয়সেই নবাব গাজীউদ্দিন পরলোক গমন করেন। তাঁকে সমাহিত করা হয় হুসেনি দালানে। এবং তার মৃত্যুর সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যায় ঢাকার নায়েব নাযিম বংশ।[১০]

২

একদিন সকালে ডেভিডসন ঘুরে বেড়াবার সময় দেখেন, এক জায়গায় বেশ কিছু পালকি দাঁড় করানো। যদিও সেদিন সপ্তাহান্ত নয়, জানলেন তিনি, কাছের আর্মেনি গীর্জায় চলছে উপাসনা এবং সে কারণে এ জমায়েত। চৌদ্দ ফুট প্রশস্ত এক বারান্দা দিয়ে ডেভিডসন ঢুকলেন গীর্জায়। দালানের ভেতর মেঝে বিভক্ত তিন ভাগে; রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি বেদী; মাঝ খানের অংশে আছে দু'টি ফোল্ডিং দরজা; তৃতীয় ভাগটি বেষ্টনী দিয়ে আলাদা করা যাতে শুধু বসেছিলো মহিলা ও শিশুরা। এর উপরে আছে আবার একটি গ্যালারী। দেয়াল থেকে চার ফুট দূরে অর্ধবৃত্তাকার বেদী, মনে হয় তা কাঠের তৈরি এবং দশফুটের মতো উঁচু। সিঁড়ি আছে উপরে ওঠার। সিঁড়িতে তিন ফুট করে লম্বা চব্বিশটি মোমবাতি আর চকচকে ধাতুর কিছু ক্রশ। রোদালো সকাল, তবুও মোমবাতিগুলি সব জ্বলছিলো।

বেদীর সামনে, বাঁ দিকে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন পাদ্রী, বয়স পঞ্চাশের মতো, চোখে চশমা, মাথা ঠিক সোজা দুই ইঞ্চির মতো বৃত্তাকারে কামানো। তাঁর অন্তর্বাস জমকালো রূপালী গোলাপের নকশায় অলংকৃত; বাইরের পোষাকটি কিংখাবের যার নীচের দিকের বর্ডারের চার ইঞ্চি সাধুসন্ত ও দেবদূতদের এমব্রয়ডারীতে ভরা। ছোট একটি পড়ার ডেস্কের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে, পবিত্র জলের একটি বড় আধারও রাখা আছে সামনে। তাঁর পড়ার সময় মাঝে মাঝে চার পাঁচজন তরুণ বলছে 'আমেন, আমেন'। পরনে তাদের দারুচিনি রংয়ের সিল্কের আলখাল্লা। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে উৎসাহের সঙ্গে বাজানো হচ্ছে গীর্জার ঘণ্টা।

পাদ্রীর উপাসনা শেষ হলে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সামনে নিয়ে আসা হলো। বড়রা বাইরের রূপোলীক্রশে চুমো খেয়ে যেতে লাগলো। পাদ্রীর সহকারী বিভিন্ন রকম পাত্র যার মধ্যে সাধারণ বিয়ার বোতল থেকে রূপার কাপও ছিল, সব ভরে দিতে লাগলেন পবিত্র জলে।

অনুষ্ঠান শেষে ডেভিডসন বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় বিভিন্ন আর্মেনি খৃস্টানের স্মরণে লাগানো হয়েছে স্মৃতিফলক। আগে এ শহরে, লিখেছেন ডেভিডসন, বেশ কিছু আর্মেনি ছিলেন এবং এখনও তারা ধনী ও প্রভাবশালী সম্প্রদায়।

গীর্জার পনেরো ফুটের মধ্যে, আলাদা দাঁড়িয়ে একটি স্থূল বর্গাকার টাওয়ার, চূড়োয় আছে চারটি শঙ্খিল মিনার। চারদেয়ালের মাঝে, মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে দেয়ালে লাগানো একটি মার্বেল ফলক। আর্মেনি ও ইংরেজি ভাষায় তাতে লেখা যার মূল কথা মিঃ সার্কিস ঈশ্বরকে উৎসর্গ করছেন এই চমৎকার জাঁকালো

মিনার।

ডেভিডসন পরে জানতে পেরেছিলেন, তিনি যা দেখেছেন গীর্জায়, সেটি আর্মেনিদের ক্রিসমাস পালনের অনুষ্ঠান।

ডেভিডসনের এ বর্ণনায় একটি বিষয় লক্ষণীয়। ঢাকায় তখনও উচ্চবর্গ ব্যাপক না হলেও বেশ ব্যবহার করতেন পালকি। টেইলর জানিয়েছেন, ১৮৪০-এর ঢাকা জেলায় চাকার প্রচলন হয়নি। তবে, বিশপ হেবারের বিবরণে জানতে পারি ১৮২৩ সালে ঢাকায় একটি হলেও ঘোড়াটানা গাড়ি ছিল যা ব্যবহার করতেন নায়েব নাযিম শামসউদদৌলা এবং তা আমদানী করা হয়েছিলো কলকাতা থেকে।[১১] পরে ১৮৫৬ সালের দিকে, আর্মেনি সিরকো প্রচলন করে ছিলেন ঠিকাগাড়ির।

আর্মেনিরা ঢাকায় এসেছিলেন কবে জানা যায় নি। তবে, ধরে নিতে পারি মুঘল আমলে ভাগ্য বদলাতে দেশ বিদেশ থেকে যখন অনেকে এসেছিলেন ঢাকায়, আর্মেনিরাও এসেছিলেন তখন। তেজগাঁও পর্তুগীজ গীর্জায় কবর আছে কয়েকজন আর্মেনিয়ানের যাঁদের মৃত্যু হয়েছিলো ১৭১৪ থেকে ১৭৯৫ সালের মধ্যে।[১২] সুতরাং ধরে নিতে পারি সপ্তদশ শতকেই আর্মেনিরা দু'একজন করে আসতে থাকেন ঢাকায় এবং বসবাস শুরু করেন এ অঞ্চলে।

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অতি ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা শহরে ছিলেন আর্মেনিরা প্রভাবশালী। কারণ, তাদের ছিল বিত্ত। ঢাকার আর্মেনিদের অনেকের ছিল জমিদারী। এ ছাড়া, লবণের ঠিকাদারী, ধান ও পাট ও কাপড়ের ব্যবসায় ছিল তাঁদের কর্তৃত্ব। ঢাকা শহরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে, সভাসমিতিতেও আর্মেনিরা যুক্ত করেছিলেন নিজেদের। বর্তমান আর্মেনিটোলায় থিতু হয়ে বসার পর আর্মেনিরা এখানেই নির্মাণ করেছিলেন তাদের গীর্জা। বর্তমানে যে গীর্জাটি আর্মেনিটালায় নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে ডেভিডসন তাতেই গিয়েছিলেন। এটি নির্মিত হয়েছিলো ১৭৮১ সালে। এর আগে, এখানে ছিল গোরস্থান। গীর্জা নির্মাণের জন্য গোরস্থানের আশেপাশে যে বিস্তৃত জমি তা দান করেছিলেন আগা মিনাস ক্যাটচিক। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, জানিয়েছেন ফার্মিঙ্গার, গীর্জাটি নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন চারজন-মাইকেল সার্কিস, অকেটোভাট সেতুর জিভর্গ, আগা এমনিয়াজ এবং মার্কার পোগেজ।[১৩]

১৮৩৮ সালে, জানিয়েছেন টেইলর, ঢাকা শহরে বসবাস করতেন মাত্র চল্লিশটি আর্মেনীয় পরিবার।[১৪]

৩

বাড়ি ফেরার পথে ডেভিডসনের চোখে পড়লো প্রাচীর ঘেরা একটি বিল্ডিং যার চূড়োর অলংকার দেখে তাঁর মনে হলো, এটি বোধহয় কোন রোমান ক্যাথলিক ভজনালয়। ডেভিডসন ঢুকলেন ভেতরে, দেখলেন না, এ কোন ক্যাথলিক ভজনালয় নয়; এটি কালীমার মন্দির। দরজার সামনে গিলোটিনের মতো কাঠের একটি যন্ত্র যেখানে

ছাগল ছানা উৎসর্গ করা হয়। ছাগল ছানার মাথাটি পুরোহিতের প্রাপ্য। ডেভিডসন খোঁজ নিয়ে জানলেন, কালো ছাগল ছানার চাহিদা প্রচণ্ড যার ফলে অন্য রংয়ের ছাগল ছানা থেকে কালো রংয়ের ছাগল ছানার দাম কয়েকগুণ বেশী। ঢাকা শহরে মন্দির আছে পঞ্চাশটির মতো। এবং সবখানে এ রংয়ের ছাগল ছানার চাহিদা। মনে হয়, এখানে ডেভিডসন খানিকটা ভুল করেছেন। শহরে সব মন্দির কালী মন্দির ছিল কিনা এবং সব খানে ছাগল বলি হতো কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

একদিন বিকেলে বেড়ানোর সময় কর্নেল ডেভিডসন দেখলেন 'ফিনিক্স পার্ক'। ঢাকার একসময়ের জজ মাস্টারের বসত বাড়ীর নামে 'ফিনিক্স পার্ক'। মিঃ গ্লাস তাঁকে জানালেন মাস্টার ঘোড়া প্রজনন করতেন এবং মাস্টারের খামারের অনেক ঘোড়া এখনও বেঁচে আছে। মিঃ গ্লাসের কাছেও আছে মাস্টার খামারের একটি ঘোড়া যার বয়স পঁচিশ এবং এখনও কর্মক্ষম।

ডেভিডসন যে মাস্টারের কথা উল্লেখ করেছেন তার পুরো নাম গিলবার্ট কভেনট্রি মাস্টার। রাইটার হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ১৭৯৭ সালে। ঢাকার জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ১৮১০ থেকে ১৮১৮ এবং কালেক্টর ১৮২১ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত। চেরাপুঞ্জিতে পরলোকগমন করেন তিনি ১৮৩২ সালে। বিশপ হেবারের রোজনামচায় মিঃ মাস্টারের কথা উল্লেখ আছে। হেবার যখন ঢাকায় এসেছিলেন মাস্টার ছিলেন তখন ঢাকার কালেক্টর। আর মিঃ গ্লাস যিনি ডেভিডসনকে মাস্টারের ঘোড়ার কথা বলেছিলেন তিনি ছিলেন ঢাকার একজন নীলকর, থাকতেন বুড়ীগঙ্গার তীরে একটি বাড়ীতে।

ফিনিক্স পার্ক ও তার চমৎকার ফটক পেরিয়ে ডেভিডসন পৌঁছলেন স্টেশনের সদর রাস্তায়। তার মনে হয়েছে, ভালো অবস্থায় এটি নিশ্চয় সুন্দর এক জায়গা। কিছুদূর পর পর সিমেন্টের পিলার দিয়ে পুরো জায়গাটিতে বেষ্টনী দেওয়া হয়েছিলো যা এখন প্রায় ধ্বংসের পথে। ডেভিডসনকে একজন জানিয়েছিলেন এতে খরচ পড়েছিলো একলাখ টাকারও বেশি। এই বেষ্টনীর ভেতর আছে চমৎকার এক রেসকোর্স, এর কাঠের রেলিংয়ে কিছু অংশ ও স্ট্যান্ডটি এখনও টিকে আছে। কারণ, বোধহয় কাঠ এখানে মহার্ঘ নয় এবং নেই উইপোকার উপদ্রব।

স্ট্যান্ডের উত্তর-পশ্চিমে সেই ভদ্রলোক [মসলিন উৎপাদনের তুঙ্গ সময়ের একজন সিভিল সার্ভেন্ট যিনি মাঠটিকে ঘিরে দিয়েছিলেন, তৈরি করেছিলেন একটি কৃত্রিম পাহাড় আর বপন করেছিলেন সুন্দর সব গাছ] সকালে যারা রেসকোর্সে বেড়াতে আসতেন তাদের আপ্যায়ন করতেন চা-কফি দিয়ে। পুরো জায়গাটি নেপাল থেকে আনা দুষ্প্রাপ্য গাছ, যেমন ক্যাসুরিনা, মিমোসা দিয়ে সাজিয়েছিলেন। অদূরে তার বাসগৃহ যা এখন ম্যালেরিয়ার কারণে অবসবাসযোগ্য ও পরিত্যক্ত।

ডেভিডসন উল্লিখিত 'ফিনিক্স পার্কে'র উল্লেখ আর কোথাও পাইনি। এই বাসভবনটি কোথায় ছিল তাও চিহ্নিত করা যায় নি। তবে, ডেভিডসনের বর্ণনা দেখে

মনে হয়, খুব সম্ভব তা রেসকোর্সের আশেপাশেই ছিল।

১৮২৫ সালে জেলের কয়েদীদের দিয়ে রমনার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়েছিলেন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ড'স। তিনমাসের মধ্যে রমনার জঙ্গল পরিষ্কার করে স্থাপন করেছিলেন রেসকোর্স। ডেভিডসন বর্ণিত ঐ ঘরটিও ড'সের এবং তা ছিল গথিক রীতিতে তৈরী। ড'সের টিলাটি এখনও আছে, গথিক রীতির বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ কিছুদিন আগেও ছিল। তখনকার ঢাকার শিক্ষিত লোকজন বাড়ীটির নাম দিয়েছিলেন 'ড'স ফলি' বা ড'সের ভুল নামে।[১৫] কেন এই নামকরণ তা অবশ্য জানা যায় নি। তবে ধরে নিতে পারি, প্রচলিত ধারা উপেক্ষা করে, শহরে ঘর তৈরী না করে, শহরের বাইরে টিলা ও ঘর তৈরীর জন্যই বোধহয় সবাই ভেবেছিলেন লোকটি কি বোকা।

৪

ঢাকা শহরের অবনতির মূল কারণ মসলিন ব্যবসার অবলুপ্তি, লিখেছেন ডেভিডসন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অবশ্য একই মত। তিনি আরো লিখেছেন, তখনও ১৫০ রূপী বা ১৫ পাউন্ড খরচ করলে দশগজ লম্ব উৎকৃষ্ট মানের এক টুকরো মসলিন পাওয়া যেতো। টেইলর জানাচ্ছেন, পাঁচগজ লম্বা এবং নয় সিক্কা বা ১৬০০ গ্রেন ওজনের এক টুকরো উৎকৃষ্ট মানের মসলিনের দাম ছিল ১০০ রূপী।[১৬] এ ক্ষেত্রে টেইলরের হিসাবটিই মেনে নেওয়া ভালো। তবে, ডেভিডসন জানিয়েছেন, এতো দাম হলে চাহিদা কম থাকবে এবং বিক্রি কম হবে।

সূক্ষ্মসূচের কাজ করা সিল্কের শালের কথা উল্লেখ করেছেন ডেভিডসন, যা প্রচুর পরিমাণে বাঁকে করে পাঠানো হতো কলকাতায়। খাঁটি রূপোর তৈরী বিভিন্ন ধরনের কানের দুল, যুক্তিগত দামে কম সময়ে সরবরাহ করা হয়।

আগে, ঢাকার শহরতলিতে হাজার হাজার মসলিন তাঁতী বসবাস করতেন। মসলিন তৈরির ব্যাপারটা এমনই ছিল যে সব সময় সদা সর্তক থাকতে হতো। সূর্যের আলো ও আবহাওয়ার বিভিন্নতার কারণে এদের কাজ করতে হতো গভীর গর্ত করে। মসলিন উৎপাদন যখন বন্ধ হয়ে গেলো তখন তাদের কর্মস্থলগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় রইলো। এখন বৃষ্টি হলেই এগুলি ভরে যায় এবং হয়ে ওঠে বিষাক্ত। কৃষি কাজের অন্বেষণে অধিকাংশ তাঁতী এখন ত্যাগ করেছেন ঢাকা। তাদের পরিত্যক্ত জমি সামান্য দামে পুঁজিপতিদের [ধনাঢ্যদের] অনুরোধ করা হয়েছে কিনে নেওয়ার জন্য। কিন্তু কেউই আগ্রহ দেখায় নি কারণ তাদের মতে, এ পরিত্যক্ত ভূমি চাষাবাদের আওতায় আনতে গেলে যে খরচ পড়বে তাতে পোষাবে না। ফলাফল হচ্ছে, শহরের অধামাইলের মধ্যে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিষাক্ত জঙ্গল অবস্থিত। শুধু তাই না, শহর প্রান্ত দেখলেও বোঝা যায় এ শহরে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে জনসংখ্যা।

ডেভিডসন যে সময়ের মসলিন ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করেছেন প্রায় ঠিক ঐ সময়ের [১৮৩৮] কিছু বিবরণ আমরা পাই টেইলরের গ্রন্থেও। জানিয়েছেন তিনি, ঐ

সময় তাঁতীরা কাজ করতেন শর্তাধীনে। পাইকারের কাজ থেকে গ্রহণ করতেন তারা অগ্রিম। যারা দৈনিক বা মাসিক মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন তাদের গড়পরতা পারিশ্রমিক হলো আড়াই টাকা। এর সঙ্গে খুচরো কাজ করে আরো দশআনা পর্যন্ত উপার্জন করা সম্ভব। দশ থেকে বারো বছরের যে সব বালক শিক্ষানবিসী, দু'বছর কাটানোর পর পায় মাসে চার আনা। সূতাকাটার কাজেও সামান্য উপার্জন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে একজন সূতাকাটিয়ে বছরে দুই সিক্কার বেশী সূতা তৈরী করতে পারে না। এ সূতা বিক্রি করে সে পায় ষোল টাকা বা বত্রিশ শিলিং। দিনে মাত্র এক পেনির মতো উপার্জন। অথচ টেইলর বলছেন এই এক পেনি নাকি কাঁচামালের মূল্যের বারোশত গুণ অপেক্ষাও বেশি।[১৭] একটু অবিশ্বাস্য মনে হয় না কি? তবে, এ হিসাব থেকে বোঝা যায় কেন তাঁতীরা মসলিন উৎপাদনের সঙ্গে আর জড়িত থাকতে চান নি।

ডেভিডসন যে জঙ্গলের কথা লিখেছেন তার উল্লেখ পাই রেভারেন্ড রবিনসনের লেখায়ও। রবিনসন ছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রী। ১৮৩৯ সালে মার্চ মাসে কাটরা থেকে তিনি গিয়েছিলেন তেজগাঁর পর্তুগীজ গীর্জায়। লিখেছেন তিনি— ঢাকার দু'মাইল দূরে একটি গ্রাম— তেজগাঁ। একসময় এটি ছিল বর্ধিষ্ণু গ্রাম, বর্তমানে প্রায় পরিত্যক্ত। ঢাকা থেকে তেজগাঁ যেতে হলে ঘন এক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। একসময় এ জায়গাটুকুতেও ছিল অসংখ্য সুন্দর বাগান। কোনও কোনও জায়গায় এখনও সে সব বাগানের প্রাচীর চোখে পড়ে। এ জঙ্গল দেখতে সুন্দর, কিন্তু বিপদও আছে এতে ওঁৎ পেতে। কারণ, বাঘের দেখা পাওয়া যায় এ জঙ্গলে।[১৮]

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ঢাকার লোকসংখ্যারও কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য এ হিসাবটা আনুমানিক। ১৮২৪ সালে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল ৩০০,০০০, ১৮৩৭ সালে মাত্র ৬৮.৩৩৮।[১৯]

ডেভিডসন নীলকরদের কথাও উল্লেখ করেছেন। শহরে, তাঁর মতে, আছেন বেশ ক'জন 'ধনী ও শ্রদ্ধেয়' নীলকর যারা নীল উৎপাদন ছাড়াও সরকারী জমির স্পেকুলেট করেন যা তারা ভাড়া দেন জমিদার ও রায়তদের। বেশ আগে, এরা কফির চাষও শুরু করেছিলেন এবং তা ভালোও হতো কিন্তু রায়তদের অনাগ্রহের ফলে এখন তা লুপ্ত। এখানকার আবহাওয়া ও মাটি কফির জন্যে উপযোগী। টেইলর জানাচ্ছেন, প্রায় ১০০,০০০ বিঘা জমি নীলচাষের অন্তর্গত এবং বাৎসরিক নীলের উৎপাদন আড়াই হাজার মণ। এর পেছনে পুঁজির পরিমাণ প্রায় তিনলাখ রূপী বা ত্রিশ হাজার পাউন্ড। শহরে আছে ষোলজন নীলকর এবং ব্যবসায়ী।[২০]

ঢাকায় সুপারীর আধিক্যের কথা উল্লেখ করেছেন ডেভিডসন। লিখেছেন তিনি, এর উৎপাদন প্রচুর। শহরের কাছে অনেক ভারতীয় বাড়ী ঢেকে আছে সুপারী গাছে। এর ঋজু 'এলিগ্যান্স' দেখার মতো।

৫

ঢাকার তিনটি উৎপাদকের নাম এখন করা যায় কিন্তু আশ্চর্য যে, তিনটির কোনটিই প্রচলিত পণ্য নয়। এর মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বেহালা, জানিয়েছেন ডেভিডসন। প্রচুর বেহালা তৈরী করা হয় ঢাকায় এবং তা বিক্রি করা হয় খুব শস্তায়। দু' টাকা বা চার শিলিংয়ে কেনা যাবে একটি বেহালা। চারশিলিংয়ে চমৎকার কাঠের তৈরী বেহালা ও ছড়। আশ্চর্য হয়ে গেছেন ডেভিডসন। ঢাকায় যারা আসেন তারা একটি বেহালা সংগ্রহ না করে গেছেন এমন শোনা যায় নি। দিন রাত সবসময় বেহালার শব্দ শোনা যাবেই। বাংগালীরা আসলে প্রচণ্ড গান পাগল [মিউজিক্যাল পিপল]। রাতে ঢাকার রাস্তায় হাঁটার সময় যদি কোন দোকানে উঁকি দেন তা'হলে হয়ত দেখবেন একজন অক্লান্ত কারিগর বেহালা তৈরি করছেন, আরেক জন হয়ত বা বেহালা বা সারেংগী বাজাচ্ছেন। আরো দেখা যাবে দলবেঁধে উঁচুস্বরে অনেকে গান গাইতে গাইতে হেঁটে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয়টি হলো বিভিন্ন আকারের চুড়ি। মহিলা ও শিশুদের জন্যে তৈরী করা হয় এ সব শাঁখার চুড়ি। কলকাতা থেকে প্রতি শ আড়াই আনা করে কিনে আনা হয়। তিনশোর বেশি কারিগর এই কৌতূহলোদ্দীপক উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। কোতোয়ালীর পিছে একটি রাস্তা দখল করে আছে এদের পুরো একটি দল। তাদের বাড়ীগুলি ঢাকার সব চেয়ে পুরনো এবং সুন্দর। বাড়ী গুলি মনে হয় যেনো তাসের তৈরী। সব বাড়ীগুলিই অলংকৃত ডরিক এবং করিনথিয়ান পিলার দ্বারা।

তৃতীয় উৎপাদিত পণ্যটি বাণিজ্যিক দিক থেকে উল্লেখ করার মতো নয়। তবুও ডেভিডসন উল্লেখ করেছেন সেই পণ্যের কথা। সেটি হচ্ছে মূর্তি। এবং তাও হঠাৎ করে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। একদিন সকালে হাঁটার সময় দেখলেন পাথর কাটাইয়ের ঘরের সামনে ভীড়। সবাই ব্যস্ত ঘর থেকে একটি [শিব] লিঙ্গ বের করায়। এটি বিক্রি করা হয়েছে একশো পঁচিশ টাকায়। কালো পাথরে তৈরি চকচকে পালিশ করা, তিনফুট লম্বা ছিল লিঙ্গটি।

আর একদিন শহরতলিতে হাঁটার সময় ডেভিডসনের নজরে পড়লো ছোট এক নদীর ওপর ছিমছাম ঝুলন্ত এক সেতু। ১৮৩০ সালে মিঃ ওয়াল্টার্স যখন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট তখন তিনি জনসাধারণের চাঁদায় নির্মাণ করেছিলেন পুলটি। ডেভিডসন অবাক হয়ে মন্তব্য করেছেন পুলে ইংরেজী ও ফার্সী ভাষায় লেখা আছে, কিন্তু বাংলায় নেই যা এদেশের মাতৃভাষা।

ডেভিডসন ঢাকার বেহালা সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন সে ধরনের তথ্য আর কোথাও পাই নি। তবে এটা ঠিক ঢাকা ছিল সঙ্গীতের পুরনো পীঠস্থান। সে কারণে, ঢাকায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সঙ্গীতজ্ঞ ও বাঈজীরা আসতেন ঢাকায়। এ ধারা আরো প্রবল হয়েছিলো ১৮৫৭ সালের পর। সংক্ষেপে এটুকু বলতে পারি, লখনৌ শহর বিখ্যাত ছিল কণ্ঠ সঙ্গীতের জন্য। আর তবলা ও সেতার বাদনের জন্য ঢাকা ছিল বিখ্যাত। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ঢাকার সেতারবাদকরা সৃষ্টি করেছিলেন এক

নিজস্ব ঘরানার। এ ঐতিহ্যের শুরু মুসলমান শাসকদের সময় থেকে, যখন ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে ওস্তাদরা আসতেন তাদের দরবারে আশ্রয় নিতে। ইংরেজরা বাংলায় আসার পরও একশো বছর ধরে এই ধারা অব্যাহত ছিল।[২১]

ঢাকার শাঁখারীরা সব সময়ই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, দলগত ভাবে বসবাস, তাদের নির্মিত বাড়ীঘর এবং উৎপাদিত শাঁখার তৈরী জিনিসপত্রের জন্যে।

জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, কিংবদন্তী অনুসারে, পূর্ববঙ্গে শাঁখারীরা এসেছিলেন বল্লাল সেনের সঙ্গে, বিক্রমপুরে তাদের সেই স্মৃতি বহন করছিলো একটি বাজার— শাঁখারী বাজার। সপ্তদশ শতকে মুঘলরা ঢাকায় এলে শাঁখারীদের নতুন শহর ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিলো লাখেরাজ জমির প্রলোভন দেখিয়ে। ঢাকায় এসে শাঁখারীরা যে অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিলেন তাই আমাদের কাছে বর্তমানে পরিচিত শাঁখারী বাজার নামে। সেই ১৬৬৬ সালে ট্যাভারনিয়ার যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন তিনি এ অঞ্চলে বসবাস করতে দেখেছিলেন শাঁখারীদের।[২২] সেই থেকে এখনও পেশাদারী একটি গ্রুপ হিসেবে, শাঁখারীরা পুরনো রীতি নীতি প্রায় অক্ষুণ্ন রেখে এখনও ঠিক একই জায়গায় বসবাস করছেন।

শাঁখারীদের বাসগৃহের স্থাপত্য একটু স্বতন্ত্র ধরনের। ওয়াইজ অবশ্য এর একটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, যে লাখেরাজ জমি দেয়া হয়েছিলো শাঁখারীদের তা ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র। সেই আয়তন মেনেই নির্মিত হতো বাসগৃহ। সাধারণত এগুলি ছিল দোতলা। সামনের মূল ফটক হতো ছ'ফিটের মতো। তারপর বিশ ত্রিশ ফুটের মতো লম্বা করিডোর চলে যেতো ভিতরে।[২৩]

টেইলর লিখেছেন, সেখানে বহু চারতলা দালানের সম্মুখ ভাগে মাত্র আট বা দশ ফুটের মতো জায়গা রয়েছে। অপরদিকে পার্শ্ববর্তী দেয়ালসমূহ দরজা জানালাহীন নিশ্ছিদ্র এবং পশ্চাদ দিকে বিশগজ পর্যন্ত প্রসারিত। এসব দালানের কেবলমাত্র শেষ প্রান্তগুলো ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং একতলার উপরে মধ্যবতী স্থান একটি ছোট প্রাঙ্গণের ন্যায় খোলা রাখা হয়। ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত শাঁখারীদের জমির জন্যে কোন খাজনা দিতে হয়নি। কিন্তু ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় শাঁখারীরা তাদের লাখেরাজ জমির সনদপত্র দেখাতে না পারায় তাদের খাজনা দিতে বলা হয়েছিলো। টেইলর আরো জানিয়েছেন, ঐ সময় (১৮০৮) ঢাকা শহরে জমির দাম বেশি ছিল শাঁখারী বাজার ও তাঁতী বাজারে।[২৪]

ওয়াইজ জানিয়েছেন, শাঁখারীদের অধিকাংশ ছিলেন নিরামিষভোজী এবং বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অনুসরণকারী। ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতো তাদের প্রধান উৎসব। সে সময় পাঁচদিন তারা কাজ করতেন না এবং পূজো করতেন অগস্ত্য ঋষির। তাদের মতে, শংখ অসুর নামে এক দানবকে অগস্ত্য মুনি হত্যা করেছিলেন। হত্যার জন্য ব্যবহার করেছিলেন সে ধরনের করাত যে ধরনের করাত দিয়ে শাঁখারীরা শাঁখা কাটেন। শাঁখারী বাজারের বাইরে কোন শাঁখারী বসবাস করলে তাকে করা হতো সমাজচ্যুত। সে কারণেই বোধহয় একই এলাকায় তারা বসবাস করছেন যুগ যুগ ধরে। তিনি

আরো উল্লেখ করেছেন, বড় নোংরাভাবে বাস করতেন শাঁখারীরা। তাই প্রায় মহামারী দেখা দিতো তাদের মধ্যে। পৌরসভা সে কারণে তাদের বাধ্য করতো প্রতিষেধক হিসেবে টিকা নিতে। শাঁখারী মহিলারা ছিলেন পর্দানশীন। শাঁখারীরা খুব অপমানিত বোধ করতেন কেউ যদি তাদের আবদুর রাজ্জাক বা রাজা রাম রায়ের পোলা বলতেন। আবদুর রাজ্জাক ছিলেন একজন জমিদার। দ্বিতীয়জন ছিলেন বাংলার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র। কথিত আছে, তাঁরা নাকি প্রায়ই সুন্দরী শাঁখারী মহিলাদের নিয়ে যেতেন অপহরণ করে এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে কেউ কিছু বলার সাহস পেতো না।[২৫]

ডেভিডসন যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন ঢাকা শহরে শঙ্খ কারিগরের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশো। এ তথ্য জানিয়েছেন টেইলর। তাঁর মতে, শাঁখার অলংকার তৈরীর জন্য তিন ধরনের কারিগর ছিলেন। যারা শাঁখা ভেঙ্গে পৃথক ও পরিষ্কার করতেন তারা চারশো বিশটি শাঁখের জন্য মজুরী পেতেন একটাকা। মাসে এরা তিন থেকে চার টাকা উপার্জন করতেন। শাঁখার করাতিরা একশো শাঁখের জন্য দু' থেকে চার টাকা পর্যন্ত আয় করেন। শাঁখা মসৃণ, খোদাইকারীদের নিয়োগ করা হতো চুক্তির ভিত্তিতে। টেইলর আরো জানিয়েছেন, কলকাতা থেকে ঢাকায় আমদানীকৃত শাঁখের গড়পরতা পরিমাণ ৩০, ০০০০।২৬

ডেভিডসন যে পুলের কথা লিখেছেন তা আমাদের কাছে পরিচিত লোহার পুল নামে। এটি তৈরী করেছিলেন ঢাকার একসময়ের জনপ্রিয় ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াল্টার্স। ১৮২৫ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত ছিলেন তিনি এপদে। ঢাকার সাধারণ মানুষ তাঁকে পছন্দ করতেন এ কারণে যে, শহর উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে তিনি বিভিন্ন কাজে হাত দিয়েছিলেন।

লোহার পুল নির্মাণ করা হয়েছিলো দোলাই খালের ওপর। এখানে পুল না থাকায়, খালের দু'ধারের লোকজনকে নানা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হতো। তা ছাড়া তখনকার উঠতি নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যও একটি পুল প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলো। সরকারী নথিপত্র অনুযায়ী মুঘল আমলে এখানে একটি পুল ছিলো, কোম্পানী আমলে যা গিয়েছিলো ধ্বংস হয়ে।

ওয়াল্টার্স পরিকল্পনা নিলেন দোলাই খালের ওপর পুল তৈরী করার। এর জন্য দরকার টাকার। ঢাকাবাসীর কাছে আবেদন জানালেন তিনি চাঁদার। ঢাকাবাসীরাও এ আহ্বানে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেনি। ১৮২৮ সালে শুরু হয়েছিলো পুল নির্মাণের কাজ। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনা হয়েছিলো ইংল্যান্ড থেকে। উদ্বোধনের দিন প্রথমে একটি হাতি পার করানো হয়েছিলো পুল মজবুত হয়েছে কিনা দেখার জন্যে। বর্তমানে আমরা যে লোহার পুল দিয়ে দোলাই খাল পার হই তা কিন্তু ওয়াল্টার্সের তৈরি আসল পুল নয়, যদিও আদি নামটি রয়ে গেছে। ঢাকাবাসীরা তখন ওয়াল্টার্সকে নিয়ে একটি ছড়া বেঁধেছিলো—

ওয়াল্টার্স সাব নে পুল বানায়া
উসকে নীচে গঞ্জ বসায়া
আওর চক ধারি কামান লাগায়া
গুর গুর চল...[২৭]

৫

লোহার পুল পেরিয়ে কর্নেল ডেভিডসন পৌঁছলেন সুন্দর এক রাস্তায়। নদীর ধার ঘেঁষে পাগল পুল বা বোকার পুলের (ফুলস ব্রীজ) দিকে গেছে রাস্তাটি। রেভারেন্ড শেফার্ডের নির্দেশনায় নির্মিত হয়েছে পুলটি। ডেভিডসন খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন কেন পুলটির নাম বোকা বা পাগলা পুল। তাঁর মতে, যে নদীর ওপর এটি নির্মিত হয়েছিলো তা গতি বদল করে ফেলেছিলো। এ ধরনের চিন্তার অবশ্য কোন যৌক্তিকতা নেই। ডেভিডসন জানিয়েছেন, শহরের এটিই সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা, তবে পূর্বের ঘন জঙ্গল তাঁর মনোঃপুত হয় নি। পুরো রাস্তায় চোখে পড়ে মাঝে মাঝে গরীব কিন্তু ছবির মতো গ্রাম ও নিঃসঙ্গ কুটির।

এই পাগলা পুলের কথা ডেভিডসন ছাড়াও আরো অনেকের স্মৃতি কাহিনীতে উল্লেখিত হয়েছে। ১৬৬৬ সালে ট্যাভারনিয়ার যখন ঢাকায় এসেছিলেন, তখন লিখেছিলেন, ঢাকা থেকে আধক্রোশ ভাটিতে আছে আরেকটি নদী— পাগলা। নদীর ওপর আছে সুন্দর একটি পুল যা তৈরী করেছিলেন মীর জুমলা। আরো লিখেছিলেন তিনি, নদীর দু'পাশে আছে বেশ কিছু টাওয়ার যেখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ডাকাতদের মুণ্ড।[২৭]

ডেভিডসনের কয়েক বছর আগে কলকাতার লর্ড বিশপ হেবার, ১৮২৪ সালে ঢাকায় আসার পর পাগলা পুলের খ্যাতি শুনে গিয়েছিলেন তা দেখতে। কিন্তু তখন তা পরিণত হয়েছিলো প্রায় ধ্বংসস্তূপে।[২৮] এখনও নদীর তীরে পড়ে আছে পুলের একটি অংশ।

একদিন সকালে ডেভিডসন গেলেন গ্রীকদের গীর্জা পরিদর্শনে। গীর্জাটিতে এমন কিছু ছিল না যা উল্লেখ করার মতো। এর চূড়োয় আছে একটি ক্রশ। পাদ্রী একজন ইউরোপীয় গ্রীক, দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম, থাকে গীর্জার আঙ্গিনায় ছোট একটি ঘরে। ডেভিডসনের কেরানী ডেভিডসনকে জানিয়েছিলেন, শহরে এখন গ্রীকদের সংখ্যা কম কারণ তারা বাঁচে না বেশি দিন। তবে ইঙ্গিত দিলেন যে, ভারতীয় রমণী ও গ্রীকদের মধ্যে বিয়ের চল ছিল। পুরোহিতদের দ্রুত মৃত্যুর কারণ যে কেউ-ই বলে দিতে পারবে। কারণ তাদের বাড়ী বন্ধ এক গলির মধ্যে। যার আশেপাশে বিষাক্ত নর্দমা কখনও যা পরিষ্কার করা হয় নি। গীর্জাটি ত্রিশ ফুট লম্বা আর বিশ ফুট চওড়া। ঘরের পুব কোণে মাঝামাঝি দুটি বড় মোম জ্বলছে। মাঝামাঝি টাঙ্গানো ভার্জিন মেরির একটি ছবি; তাকিয়ে আছেন তিনি বিছানায় শুয়ে থাকা যিশুর দিকে, যার বয়স দেখলে

মনে হয় তেরোর মতো। পাশে যোসেফ। এর বাঁ দিকে সাত আট ফুট উঁচু কুমারী মেরি ছবি, দেখলে মনে হয় পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে তার। এ ছাড়া আরো আছে, যিশু, জীবরাইল ও আরো দেবদূতের ছবি, এগুলি আঁকা হয়েছে কাঠ বা তামার ওপর। বাড়ীটি তেলরংয়ে করা মিনিয়েচারের মতো, চমৎকারভাবে বার্নিশ করা। বছর পাঁচেক আগে গ্রীক থেকে এগুলো যোগাড় করা হয়েছে। এ ছাড়াও আছে রাফায়েলের অনুকরণে 'লাষ্ট সাপার' এর একটি ভালো প্রিন্ট। ছবিগুলি নীচে, মেঝেতে আছে একটি পাথর যাতে জনৈক গ্রীক ভদ্রলোকের স্মৃতিতে উৎকীর্ণ করা আছে ইংরেজি ও গ্রীক লিপি।

ডেভিডসন আরো জানিয়েছেন, রেসকোর্সের পাশে আছে গ্রীকদের একটি কবরস্থান। সমাধিগুলো অলংকৃত বা সুন্দর কোনটিই নয় বরং সবগুলি কবরই নোংরা ও অবস্থা খারাপ। এগুলি দেখাশোনার জন্য দারোয়ান থাকা সত্ত্বেও পুরো চত্বরটি গরু বাছুর আর ছাগলে পূর্ণ।

আরেকদিন, ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্কিনারের সঙ্গে হাতিতে চড়ে যাচ্ছিলেন ডেভিডসন। তখন তিনি তাঁকে জানালেন, ঢাকায় আছে একটি হর্টিকালচারাল সোসাইটি এবং সমিতির একটি বাগানও আছে। বাগান বলে তিনি যা দেখালেন তা একটি অপরিচ্ছন্ন মাঠ। বাগানে সেচের ব্যবস্থা করতে গিয়ে চাঁদার টাকা গেছে শেষ হয়ে। বাগানে আছে মরিশাসের কিছু আখ এবং কিছু চারা যা দেখতে 'কটন বুশ' এর মতো। তবে, লিখেছেন ডেভিডসন, স্কিনার না দেখালে এ বাগান তার চোখে পড়তো না।

এ সময় মজার একটি দৃশ্য দেখলেন। কিছু বাঙালী, চুল তাদের অদ্ভুত ভাবে আঁচড়ানো— দূর থেকে মনে হয় যেনো ইউরোপ।

বেশ কয়েকদিন ডেভিডসনের চোখে পড়েছে, মহিলারা মাথায় করে বিরাট বিরাট কচ্ছপ নিয়ে যাচ্ছেন বিক্রি করার জন্যে। এর একেকটির ওজন বিশ থেকে ত্রিশ পাউন্ড। দাম পাঁচ পয়সা বা দুই পেন্সের মতো। জেলেদের এটি খেতে বাধে না এবং নিম্ন বর্ণের লোকেরাই গ্রহণ করে এ ধরনের অপবিত্র খাদ্য। ডেভিডসনের মনে হয়েছে, বোম্বের মতো এখানেও ঝড়ের সময় সামুদ্রিক কচ্ছপ তীরে এসে মাঝে মাঝে আছড়ে পড়ে।

৬

একদিন ঘোড়ায় চড়ে রাস্তায় বেড়াচ্ছেন ডেভিডসন। এমন সময় চোখে পড়লো একজন বৃদ্ধ চীনে, তারপর আরেকজন, এমনি করে প্রায় ডজন খানেক। ডেভিডসন চীনে ভাষায় তাদের সম্বোধন করলে তারা খুব অবাক হয়ে গেলো। থেমে গেলো সবাই, উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আনন্দে আর চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'চীন, চীন!' তাঁরা চা উৎপাদক, যাচ্ছেন আসাম। সেখানে আসাম চা কোম্পানীতে যে সব দেশীয় আছেন

তাঁদের শেখাবেন চা এর উৎপাদন কৌশল। ডেভিডসন তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁদের শ্রমের ফলে শুধু চায়ের দাম কমবে না, ইউরোপে যে চা পান করা হয় তার গুণগত মানও বৃদ্ধি হবে, এমনও হতে পারে এখানে একসময় চা তৈরি হবে এবং সে সব দেশে ভারতীয় চা এর বিরাট বাজার হবে, যে বাজারে এখন একহাজার পাউন্ডের বেশি চা বিক্রি হয় না।

মিঃ ওয়াইজের সঙ্গে কথা বলার সময় ডেভিডসন বেশ কৌতূহলোদ্দীপক একটি তথ্য জানতে পেরেছিলেন। ত্রিপুরাবাসীরা অনেকদিন থেকে চা পান করে। ঐ অঞ্চলে চা গাছ জন্মে। চা এর পাতা তোলার পর তারা তা একটি বাঁশের ফোকরে রাখে। সাত আট দিন পর সেই শুকনো পাতা ফুটানো পানিতে ভিজিয়ে সে পানি পান করে।

তা সত্ত্বেও বলতে হয় চা পাতা আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র। আগে জানলে, ফরাসীরা যখন প্রথম এখানে এসেছিলো তখনই হয়ত ত্রিপুরায় চা উৎপাদন কারখানা গড়ে তুলতো; ইয়াংকীরা এর সাফল্যের জন্য মন দিতো রেলরোড বা স্টীল বোট নির্মাণে। মন্তব্য করেছেন ডেভিডসন, 'এ দেশের উৎপাদনের প্রতি যে অবহেলা ও আলস্য দেখিয়েছে আমাদের দেশ, বিশ্বের কোন দেশ তা দেখায় নি, এ মুহূর্তে ভারতে আছে অনাবিষ্কৃত সম্পদের ভাণ্ডার।'

ঢাকার পিলখানা দেখতে গিয়েছিলেন ডেভিডসন। চাটগাঁ ও তার আশেপাশের অঞ্চল থেকে কুকিরা হাতি ধরে, তারপর এখানে পাঠানো হয় পোষ মানানোর জন্য। ডেভিডসন যখন গেলেন পিলখানা দেখতে তখন সেখানে হাতির সংখ্যা ১২৫; বেশীর ভাগই বাচ্চা, এবং এগুলিকে কাজে লাগানোর জন্যে প্রস্তুত করতে বেশী খরচ হবে। ডেভিডসনের মনে হয়েছে খোলা জায়গায় এভাবে তাদের না রেখে আশেপাশের আম বাগানে রাখলে এদের ভালো হতো কারণ তা হলে সব ধরনের তাপমাত্রার সঙ্গে তারা মানিয়ে নিতো। হাতিগুলোকে স্নান করানোর জন্যে নিয়ে যাওয়া হয় নদীতে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বছর পঁচিশেক পর, পিলখানার হাতিদের চড়াবার জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিলো। এর আগে হাতী চড়াবার জন্য নির্দিষ্ট কোন জায়গা ছিল না। ১৮৬৪ সালে, লেঃ গভর্নর ঢাকায় এলে 'ঢাকা কমিটি'র সদস্যরা জানিয়েছিলেন, হাতিরা শহরে সৃষ্টি করছে 'সিরিয়াস নুইসেন্স' এর। এ পরিপ্রেক্ষিতে খুব সম্ভব বিস্তীর্ণ রমনা এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিলো হাতি চড়াবার জন্য। পিলখানা থেকে রমনায় হাতি নেওয়ার জন্য যে পথটি ব্যবহৃত হতো কালক্রমে তাই পরিচিতি লাভ করেছিলো এলিফ্যান্ট রোড নামে।২৮

১৮৪১ সালের চৌঠা ফেব্রুয়ারি কর্নেল ডেভিডসন রওয়ানা হলেন সুন্দরবনের দিকে। লক্ষ্য কলকাতা। ঢাকা থেকে এ জন্য ভাড়া করেছিলেন তিনি বিরাট এক বজরা এবং 'খুব বড়' দুটি পুলওয়ার। কলকাতায় পৌঁছেছিলেন তিনি একুশে ফেব্রুয়ারি।

ডেভিডসন তাঁর ঢাকা ভ্রমণ শেষে ঢাকা সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেছেন যা দিয়ে শেষ করবো এ নিবন্ধ। লিখেছেন তিনি -

'মূল শহরের প্রান্ত থেকেই জঙ্গলের সীমানা। প্রায় দু'মাইল বিস্তৃত অঞ্চলটি

ছবির মতো। পুরনো মসজিদ, স্মৃতি স্তম্ভে সাজানো যা এ শহরের অতীত গৌরবের সাক্ষী। আগন্তুকরা সকাল বা বিকেলে যখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন তখন, লিখেছেন ডেভিডসন, 'শহরকে ঘিরে আছে যে জঙ্গল তা এড়িয়ে চলবেন বিশেষ করে সূর্যাস্তের সময়। এ বিষয়ে আমি তাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। ঐ সময় জঙ্গল ও শহরের সীমান্ত পেরুবার বা শহরে ঢোকার সময় শরীর হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠে।'

কিন্তু কেন শরীর শিউরে উঠতো? সেটি কি অশরিরী - কোন কারণে, নাকি রাইডার হ্যাগার্ডের নায়ক হিসেবে নিজেকে কল্পনা করে, তা অবশ্য ডেভিডসন উল্লেখ করেন নি।

তথ্যপঞ্জী

১. জেমস টেলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ: ৫৮।

২. তাভেরনিয়ের *ভারত ভ্রমণ*, অনুবাদ সুধাবসু, কলকাতা, ১৯৭৩, ৮৮।

৩. মুনতাসীর মামুন, *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ: ১৩।

৪. Charles O' D'oyly, *Antiquities of Dacca*, London. 1824, P 10.

৫. S. M. Taifoor, *Glimpses of Dhaka*, Dhaka, 1984, PP 105-7.

৬. Charles O 'D'oyly, *Op cit*, P. 10

৭. S. U. Ahmed, Dacca, *Dacca*, 1986, PP 131-132

৪. *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়*, ১৮৫২।

৯. জেমস টেইলর, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৬১।

১০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বর্তমান গ্রন্থের *'নায়েব নাজিম'* শীর্ষক প্রবন্ধ।

১১. Reginald Heber, *A Narrative of a Journey through the upper Provinces of India, from Calcutta to Bombay*, 1820-25, London, 1824.

১২. W. K. Firminger, *'Some Old Graves of Dacca,'* Bengal Past and Present, *V 15*, 1917.

১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, W. K. Firminger, *'Armenian Church of the Holy Resurrection, Dacca'* Bengal Past and Present, V. 13. 1916.

১৪. জেমস টেইলর, *পূর্বোক্ত*, পৃ ঃ ১৯৮।

১৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন 'রমনার স্মৃতি' *স্মৃতিময় ঢাকা, ঢাকা*, ১৯৮৮।

১৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *Report on the Decline of the Dacca Muslin Industry'*, উদ্ধৃত, আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, ঢাকা, ১৯৬৫, এবং টেইলর, পৃঃ ২৫২।

১৭. টেইলর, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২৫২।

১৮. S. U. Ahmed. *op cit*. P. 129.

১৯. ১৭০০ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত ঢাকা শহরের লোকসংখ্যার জন্য দেখুন,

F. Karim Khan and Nazrul Islam, *'High Class Residential Area in Dacca city,'* The Oriental Geographer, Vol III, No. I, 1964, P. I.

২০. টেইলর. *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৯৭-৯৮।

২১. *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর*, পৃঃ ৩৪।

২২. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, London*, 1885.

২৩. *Ibid*

২৪. জেমস টেইলর, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৬০-৬১।

২৫. James Wise, *op cit.*

২৬. জেমস টেইলর, *পূর্বোক্ত* পৃঃ ১৩৩, ২৫৪।

২৭. *তাভেরনিয়েের ভারত ভ্রমণ*, পৃঃ ৮৮।

২৮. হেবারের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*। পৃঃ

২৯. Azimusshan Haider, *History and Romance in Place Names* Dacca, 1967.

নায়েব নাজিম

সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৯৮ সালে তাঁর পৌত্র আজিম উদ্দিনকে নিযুক্ত করেন ঢাকার সুবাদার। আজিমউদ্দিন পরিচিত আজিমউশশান নামেও। ১৭০৭ সালে তাঁর পিতা তৎকালীন সম্রাট শাহ আলম পুত্রকে এই উপাধি দিয়েছিলেন। আজিমউশশান ছিলেন ঢাকার শেষ সুবাদার।

সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পর আজিমউশশান সরাসরি আসেন নি ঢাকায়। বর্ধমানে বছর তিনেক কাটিয়ে তিনি এসেছিলেন ঢাকায়। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হলো। শহরের নেমে তিনি, শহরে চারদিকে গজিয়ে ওঠা জঙ্গল পরিষ্কার করলেন, এদিক সেদিক কিছু নীচু জমি ভরাট করলেন তারপর মন দিলেন নিজের দিকে।[১] অর্থাৎ অবৈধ ব্যবসা শুরু করলেন। এ ব্যবসা পরিচিত ছিল সওদায়ে খাস ও সওয়ায়ে আম নামে। এর অর্থ 'চাটগাঁও ও অন্যান্য বন্দরের বণিকদের জাহাজে যত পণ্যদ্রব্য' আসতো তা 'সুবাদারের তরফ থেকে খরিদ করে নেওয়া হত - এর নাম সওদায়ে খাস। পরে সেই সকল পণ্যদ্রব্য দেশের ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করা হত— তখন একে বলা হত সওদায়ে আম।[২] লাল কাপড় ও হলুদ পাগড়ী পরে তিনি বসতে শুরু করলেন ঢাকার দরকারে। বসন্তে হোলি খেলা হয়ে উঠলো প্রধান উৎসব।[৩] সম্রাট পৌত্রের এই আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। এ সম্পর্কে দু'টি চিঠি পাঠালেন তিনি পৌত্রকে—

১. তোমার মস্তকে জাফরানি রং-এর শিরস্ত্রাণ, কাঁধে লাল কাপড় (অথচ) 'তুমি ছেচল্লিশ বছর বয়স্ক প্রবীণ— তোমার দাড়ি ও গোঁফের জয় হোক।'

২. 'জনসাধারণের উপর অত্যাচারকে সওদায়ে খাস বলার যথাযথতা কি; এবং সওদায়ে খাসের সঙ্গে সওদায়ে আমের সম্পর্ক কি?

যারা ক্রয় করে (তারা) বিক্রি করে,
আমরা ক্রয় করি না, বিক্রিও করি না।'[৪]

আজিম উদ্দিনের লোভ ছিল সীমাহীন। ১৬৯৮ সালে তিনিই সুতানুটি গোবিন্দপুর

কলকাতা ষোল হাজার টাকার বিনিময়ে ইজারা দিয়েছিলেন ইংরেজদের।[৫] লাল বাগের কাছে পোস্তায় ছিল তাঁর প্রাসাদ। সে প্রাসাদ সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। তাইফুর লিখেছেন, প্রাসাদ রক্ষাকারী পাকা বাঁধটি পানির নীচে আগে স্পষ্ট দেখা যেতো।[৬]

যা হোক, সম্রাট আজিমউশশানের কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে তাঁর মসনদ পাঁচশো কমিয়ে দিলেন এবং মীর্জা হাদিকে করতলব খান উপাধি দিয়ে বাংলার দেওয়ান হিসাবে পাঠালেন ঢাকায়। দেওয়ানের কাজের ওপর নাজিমের অর্থাৎ আজিমউশশানের কিছু করার ছিল না। দেওয়ান করতলব খান বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতা দিয়ে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেন। লাভ করলেন সম্রাটের নেক নজর। আজিমউশশান স্বাভাবিকভাবেই তা পছন্দ করেন নি।

নিজের উত্তরোত্তর উন্নতি হলেও করতলব খান সম্রাটের পৌত্রের প্রতি কোন অসম্মানজনক আচরণ করেন নি। বরং নিয়মিত তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতেন নাজিম এবং সম্রাটের পৌত্র হিসেবে। ১৭০২ সালে, একদিন করতলব খান, আজিমউশশানকে সম্মান জানাতে চলেছেন পোস্তা প্রাসাদের দিকে। আজিমউশশান এদিকে দেওয়ানকে হত্যার 'মতলব' করেছিলেন। 'নগদী সৈন্যদের সেনাধ্যক্ষ আবদুল ওয়াহেদ ও তার অধীন সৈন্যদের পুরস্কার ও বেতন বৃদ্ধির লোভ দেখিয়ে শাহজাদা [নাজিম] তাদের হাত করেন। এই নগদী সৈন্যরা পুরাতন চাকর। শক্তি ও সংখ্যার জন্য তাদের আত্মবিশ্বাস এত অধিক ছিল যে, তারা অন্যদের কথা দূরে থাক, ঢাকার নাজিম অথবা দেওয়ানকেও পরোয়া করতো না... বেতন দাবীর অজুহাতে সুযোগ মতে খানকে পথে আক্রমণ ও হত্যা করার জন্য এই নগদী সৈন্যদের প্রলুব্ধ করা হয়।'[৭] নগদী সৈন্যরা ঐ দিন সকালে করতলব খানকে ঘেরাও করে। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় এদের মোকাবেলা করেন এবং নাজিমই এর মূল জানতে পেরে সোজা পোস্তা প্রাসাদে যান। এবং 'সৌজন্যের সর্বপ্রকার সরকারী রীতি ত্যাগ করে প্রতিশোধ গ্রহণের মেজাজে তিনি তাঁর ছোরায় হাত দিয়ে শাহজাদার হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু লাগিয়ে বসে বলেন, "এই হাঙ্গামা আপনার প্ররোচনায় হয়েছে; এই পন্থা ত্যাগ করুন, নতুবা এই মুহূর্তে আমি আপনার জীবন নিয়ে, নিজের জীবন দেব।" শাহাজাদা গত্যন্তর না দেখে ও সম্রাটের ক্রোধের ভয়ে বৃক্ষপত্রের মতো কাঁপতে লাগলেন।[৮] করতলব খান নগদী সৈন্যদের বরখাস্ত করে সব কিছু লিখে জানালেন সম্রাটকে এবং ঠিক করলেন আর ঢাকায় নয়। তিনি দেওয়ানী কার্যালয় স্থানান্তর করলেন মকসুদাবাদ বা মুর্শিদাবাদ।

এদিকে সম্রাট এ খবর পেয়ে আজিমউশশানকে লিখে জানালেন, 'করতলব খান বাদশাহর কর্মচারী; যদি তার ব্যক্তিগত অথবা সম্পত্তির একচুল পরিমাণও ক্ষতি হয়, তা হলে বৎস, আমি তোমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।'[৯] এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন বাংলা ত্যাগ করে বিহার যেতে। আজিমউশশান ঢাকায় ফররুখ শিয়ারকে প্রতিনিধি হিসেবে রেখে ত্যাগ করেন ঢাকা। সেটা ১৭০৩ সাল। ফলে, ঢাকায় নিজাম বা দেওয়ান কেউই রইলেন না। রইলেন শুধু নাজিমের একজন প্রতিনিধি।

আবদুল করিমের মতে, ফররুখ শিয়ার খুব সম্ভব ১৭০৭ পর্যন্ত ছিলেন ঢাকায়

তারপর ১৭১২ পর্যন্ত ছিলেন রাজমহল, এরপর হয়ে ছিলেন সম্রাট। আজিমউশশানের প্রতিনিধি হিসেবে ১৭০৮-৯ সাল পর্যন্ত সরবুলন্দ খান ছিলেন ঢাকায় তাঁর প্রতিনিধি, কিন্তু বাস করতেন তিনি মুর্শিদাবাদে। করতলব খান বা মুর্শিদকুলী খান নিজেই সম্রাটের নাবালক পুত্র ফরকুন্দ শিয়ার জাহাঙ্গীর শাহর পক্ষে নিযুক্ত হলেন উপসুবাদার হিসেবে এবং ফরকুন্দ শিয়ারের মৃত্যুর পর অনুপস্থিত সুবাদার মীর জুমলার হয়ে শাসন করেন। ১৭১৫-১৬ সালে মুর্শিদকুলী খান নিজেই হলেন সুবাদার। মুর্শিদাবাদ হলো রাজধানী। আর ঢাকা থেকে, জানিয়েছেন অধ্যাপক করিম, পূর্বাঞ্চল শাসন করার জন্যে সৃষ্টি করা হলো নায়েব নাজিমের পদ।[১০] এবং তখনও ঢাকার 'নায়েবাত বা শাসনকর্তার পদকে প্রথম শ্রেণীর ও নিজামতের অধীনে সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিয়োগরূপে বিবেচনা করা হতো; কেননা এই এলাকাটি ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রদেশ হিসেবে সবচেয়ে সম্পদশালী, এবং রাজকীয় হিসেবের খাতায় নির্ধারিত খাজনার হার কম হওয়া সত্ত্বেও প্রাদেশিক প্রতিনিধির পৃথক জমা তালিকায় এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ।'[১১]

২.

১৭১৫/১৬ থেকে ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিওয়ানী লাভ করা পর্যন্ত এ পঞ্চাশ বছর নায়েব নাজিমরা পূর্বাঞ্চলে শাসন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় আবার তাঁরা ঢাকায় থাকেন নি, থেকেছেন মুর্শিদাবাদে। তাঁদের হয়ে ঢাকায় থেকে আবার কাজ চালিয়েছেন উপ নায়েব নাজিম। এঁদের সম্পর্কে তথ্যও স্বল্প। ফলে, তাঁদের ক্রমপঞ্জী তৈরি করা দুরূহ।

সমস্যা আরেকটি আছে। বন্দোপাধ্যায় ও করিম নায়েব নাজিম শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ পদটি ঐ আসলে কিভাবে তৈরি হয়েছিলো বা মুঘল আমলে তার ক্ষমতা কি ছিল সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নি। একই ব্যক্তিকে কখনও নায়েব কখনও ফৌজদার, কখনও বা নায়েব নাজিম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ শব্দগুলি কি একই অর্থ বহন করে? আর যদি নায়েব বা নায়েব নাজিম একই অর্থ বহন করে তা' হলে তাঁদের প্রতিনিধিদের কি নামে অভিহিত করা হতো? ওয়াকিল আহমদ ফার্সী ক্রমপঞ্জী থেকে এইসব পদের স্তর বিন্যাস করেছেন। তাতে দেখা যায়, মুর্শিদকুলী নাজিম ও দিওয়ান পদ দু'টিকে একত্রিত করে নবাব নাজিম [বা নাজিম] হিসেবে রাজত্ব করেন। কিন্তু মুঘল প্রশাসনে এ পদ দু'টি ছিল আলাদা। অবশ্য পরে আবার দেওয়ান পদটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। কিন্তু সুবাহ প্রধান নাজিম নামেই অভিহিত হতেন। ঢাকা, পাটনা, কটক ও পূর্ণিয়ায় তাঁর প্রতিনিধিকে বলা হতো নায়েব [নায়েব নাজিম]। এরপর ছিল ফৌজদার 'বা জেলার সামরিক গভর্নরের পদ। তিনি জেলা প্রধান হিসাবে পুলিশ ও ফৌজদারী বিষয় তদারক করেন। তিনি রাজস্ব ও দেওয়ানী বিচারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেন। ... অবশ্য বিচার ক্ষমতা

তাঁর ছিল না।'[১২]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসনভার গ্রহণ করার আগে, ঢাকায় যারা নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের নায়েব ও নায়েব নাজিম নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার জেসারত খানকেও ১৭৬৩ এর আগে পূর্বোক্ত লেখকরা নায়েব নাজিম উল্লেখ করেছেন যদিও জেসারত খা ছিলেন ফৌজদার। মুঘল প্রশাসনে এসব পদগুলি আলাদা আলাদা হলেও এক ধরনের পদ বিন্যাস নিশ্চয় মানা হতো। সে পরিপ্রেক্ষিতে, ফৌজদার ও নায়েব নাজিম পদটি সমান নয়।

তাই বলতে পারি, মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি হিসেবে যাঁর হাতে ছিল প্রত্যক্ষ ক্ষমতা তাঁকেই মানা হতো ঢাকার অধিকর্তা হিসেবে তিনি নায়েব, নায়েব নাজিম বা ফৌজদার যেই হোন না কেন। এবং সে কারণেই একই ব্যক্তিকে একাধিক নামে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে, একথাও বলা যেতে পারে নায়ব কথাটি 'উপ' বা সহকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, ঢাকার পুরোনো পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে দেখি, সর্দারের সহকারীকে নায়েব সর্দার নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা দরকার। মুঘল আমলে, অনেক নায়েব নাজিম ঢাকায় আসেন নি। তাঁদের সহকারীরা ঢাকায় থেকে শাসন চালিয়েছেন। এঁদেরও সেই নায়েব বা নবাব নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, ইস্ট কোম্পানীর সময় নায়েব নাজিম উপাধিটি ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা তাদের ছিল না। এখানে, নায়েব নাজিম উপাধিটি যেহেতু বেশী পরিচিত তাই মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধিদের [পূর্ববঙ্গে বা ঢাকায়] নায়েব নাজিম হিসেবেই উল্লেখ করবো।

ইংরেজরা দিওয়ানী লাভের পর থেকে ইংরেজ সৃষ্ট নায়েব নাজিমরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন ঢাকায়। এরাই ছিলেন ঢাকার আদি নবাব বা এদের পরিচিতি ছিল খানদানী নবাব হিসেবে। এ নিবন্ধ মূলতঃ তাঁদের নিয়েই।

আবদুল করিম 'মিয়ার উল মূতাখখারীন', 'ঢাকা ফ্যাক্টরী রেকর্ডস' এবং অন্যান্য ফার্সী দলিল পত্রের সাহায্যে ১৭৬৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত নায়েব নাজিমদের একটি তালিকা তৈরী করেছেন। এখন পর্যন্ত প্রামাণ্য তালিকা হিসেবে সেটিই স্বীকৃত। তালিকাটি নিম্নরূপ :

১.	খান মুহাম্মদ আলী খান	১৭১৭
২.	ইতিসাম খান	১৭২৩-১৭২৬
৩.	ইতিসাম খানের পুত্র [নাম জানা যায় নি]	১৭২৬-১৭২৭
৪.	মীর্জা লুৎফুল্লাহ	১৭২৮-১৭৩৪
৫.	সরফরাজ খান	১৭৩৪-১৭৩৯
	তাঁর প্রতিনিধি বা নায়েব	
	ক. গালেব আলী খান	১৭৩৪-১৭৩৮
	খ. মুরাদ আলী খান	১৭৩৮-১৭৩৯

৬.	আবদুল ফাত্তাহ খান	১৭৩৯-১৭৪০
৭.	নওয়াজীস মুহাম্মদ খান	১৭৪০-১৭৫৪
	তাঁর প্রতিনিধি	
	ক. হুসেন কুলী খান	১৭৪০-১৭৫৪
	তাঁর প্রতিনিধি	
	হুসেন উদ্দিন খান	১৭৪০-১৭৫৪
	খ. মুরাদ দৌলত	১৭৫৪-১৭৫৫
৮.	জেসারত খান	১৭৫৫-১৭৬২
৯.	মোহাম্মদ আলী	১৭৬২-১৭৬৩
১০.	মুহাম্মদ রেজা খান	১৭৬৩-১৭৬৫।[১৩]

উপরোক্ত নায়েব নাজিম বা উপ-নায়েব নাজিমদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। এদের মধ্যে মীর্জা লুৎফুল্লাহ খানিকটা পরিচিত। তাঁর নাম লুৎফ আলী খান বা মীর্জা লুৎফূল্লাহ। জন্ম তাঁর ইরানের তাবরেজে। তিনি ছিলেন মুর্শীদ কুলী খার প্রিয় কন্যার জামাতা [টেইলরের মতে, দৌহিত্রীর জামাতা]। মুর্শীদ কুলী খান তাঁকে এতো পছন্দ করতেন যে সম্রাটের অনুমতি নিয়ে নিজের উপাধিটি দান করেছিলেন জামাতাকে। সে জন্য মীর্জা লুৎফুল্লাহ দ্বিতীয় মুর্শীদ কুলী খান নামেও পরিচিত।

মীর্জা লুৎফুল্লাহ ঢাকা এসেছিলেন ১৭২৮ সালে। এবং ছিলেন এখানে ১৭৩৪ পর্যন্ত। চকবাজার সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেছিলেন তিনি। কবিতা লিখতেন তিনি 'মাখমুর' নামে।[১৪] মীর্জা লুৎফুল্লাহর সম্মানেই আজাদ খান হুসেইনী রচনা করেছিলেন 'নও বাহার-ই-মুর্শীদ কুলী খান'।

এরপর নায়েব নাজিম পদ লাভ করেন সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের [নবাব ১৭৩৯-৪০] পুত্র সরফরাজ খান। কিন্তু তিনি কখনও আসেন নি ঢাকায়। তিনি ঢাকায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেন, গালিব আলী খানকে।[১৫] তাঁকে সহায়তা করতেন তাঁর শিক্ষক যশোবন্ত রায়। তাঁদের শাসনামলে শান্তি ও সমৃদ্ধ বজায় ছিলো ঢাকায়। বলা হয়ে থাকে, শায়েস্তা খানের সময় টাকায় আট মণ ছিলো চাল বিক্রি হতো। এটি স্মরণীয় করার জন্য শায়েস্তা খান একটি দরোজা তৈরি করে তাতে লিখে রাখেন, আবার যার আমলে ঢাকায় এই দরে চাল বিক্রি হবে তাঁর সময় এই দরজা খোলা যাবে। এখন এই দরোজা কোনটি তা নিয়ে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে, এটি লালবাগ দুর্গের একটি ফটক। আরো এক জায়গায় পড়েছি, এটি ছোট কাটরার ফটক। খুব সম্ভব শেষোক্ত ধারণাটি সঠিক হতে পারে। ১৮৪০ সালে অজানা শিল্পীর আঁকা একটি চিত্রে বুড়ীগঙ্গার কোল ঘেষে ছোট কাটরার একটি ফটক দেখানো হয়েছে। যা হোক, দরজা যেটিই হোক, যশোবন্ত রায় ও গালিব আলী [বা সরফরাজ খানের সময়] সেই শর্ত পূরণ করে দরজা খুলেছিলেন।[১৬] গালিব আলীকে এক সময় সরিয়ে আবার সৈয়দ মুরাদ আলী খানকে, নিযুক্ত করেছিলেন সরফরাজ যার শাসনামল ছিল বিচ্ছৃঙ্খল।[১৭]

১৭৩৯ সালে বাংলার মসনদ লাভ করেন সরফরাজ খান। কিন্তু অচিরেই তাঁকে হটিয়ে মসনদ অধিকার করেন মুর্শীদ কুলী খান এবং ১৭৪০ সালে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা নওয়াজীস মুহম্মদ খানকে নিযুক্ত করেন ঢাকার নায়েব নাজিম। নওয়াজীসও কখনও ঢাকা আসেন নি। তিনিও পূর্বাঞ্চল শাসন করেছেন প্রতিনিধি মারফত।

নওয়াজীস মুহাম্মদ খান, ঢাকায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন হুসেন কুলী খানকে। ১৭৪০ থেকে ১৭৪৪ পর্যন্ত হুসেন কুলী ছিলেন ঢাকায়। এ সময় গোকুল চাঁদ নামে হুসেন কুলীর এক প্রাক্তন কর্মচারী তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, হুসেন কুলীকে বরখাস্ত করান। ঐ সময় ঢাকার ফৌজদার ইয়াসীন খান নায়েব হিসাবে কাজ করেন। হুসেন কুলী মুর্শিদাবাদ ফিরে নওয়াজিস মুহাম্মদ খানের স্ত্রী ঘষেটি বেগমের প্রভাবে আবার স্বীয়পদ ফিরে পান। ঢাকায় ফিরে তিনি দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত গোকুল চাঁদকে বরখাস্ত করে রাজবল্লভকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এ সময় থেকেই উত্থান হয় রাজবল্লভের। ১৭৪৪ সালের শেষের দিকে হুসেন উদ্দিন ঢাকায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ভ্রাতুষ্পুত্র হুসেন উদ্দিন খানকে রেখে চলে যান মুর্শিদাবাদ।[১৮]

এদিকে আলীবর্দী খান ১৭৫২ সালে দৌহিত্র সিরাজউদদৌলাকে বাংলার মসনদের উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করেন। ফরে, নওয়াজিস মুহাম্মদ খান, তাঁর দত্তক পুত্র সিরাজউদদৌলার ভাই আক্রামউদদৌলা এবং পূর্ণিয়ার নায়েব নাজিম সৈয়দ আহমদ সৌলত জঙ্গ ও তাঁর পুত্র শওকত জঙ্গের দাবী অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন আক্রামউদদৌলা, নওয়াজিস মুহাম্মদ ও সৌলত জঙ্গ।

ঢাকার শাসনবার প্রকৃত পক্ষে ছিল ঘষেটি বেগম ও তাঁর বিশ্বস্ত দেওয়ান (অনেকের মতে প্রণয়ী) হোসেন কুলি খানের হাতে। কারণ, নওয়াজিস ছিলেন দুর্বর প্রকৃতির লোক। সিরাজ ঘষেটি বেগমকে পছন্দ করতেন না, সেই সুবাদে হোসেন কুলিকেও। হোসেন কুলির শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধিতে তিনি শংকিত হয়ে ওঠেন এবং প্রকাশ্য দরবারে নবাব আলীবর্দীর নিকট অভিযোগ করেন যে হোসেন কুলি খান তাঁর প্রাণাশের জন্য সর্বদা সচেষ্ট। নবাব আলীবর্দী হোসেন কুলি খানের বিরুদ্ধে কোন প্রকার হঠকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সিরাজকে নিষেধ করেন।[১৯]

এদিকে বাখরগঞ্জের জমিদারও ধনাঢ্য আগা বাকেরের পুত্র আগা সাদেক হুসেনউদ্দিন খানের একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য মুর্শিদাবাদ গমন করেন। কিন্তু হোসেন কুলি তাঁকে বন্দী করেন। তখন সিরাজ ঢাকায় নিজ প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য আগা সাদেককে প্ররোচিত করেন হোসেন উদ্দিনকে হত্যা করতে। আগা সাদেক পালিয়ে আসেন ঢাকায়। আগা বাকেরও তখন ছিলেন ঢাকায়। তারপর একদিন গভীর রাত্রে হত্যা করেন তিনি হোসেন উদ্দিনকে। ঢাকায় সাধু প্রকৃতির লোক হিসেবে হোসেন উদ্দিনের খ্যাতি ছিল। তার হত্যাকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে, হোসেন উদ্দিনের আত্মীয় আলী নকী কিছু অনুচর ও ঢাকা বাসীদের নিয়ে আক্রমণ করেন আগা সাদেকের বাসগৃহ। আগা সাদেক পালিয়ে যান কিন্তু নিহত হন আগা বাকের।[২০] নওয়াবগঞ্জে, নওয়াব

বাগচা বা বাগ ই হোসেন উদ্দিনে তাঁর বাসার কাছে সমাহিত করা হয় হোসেন উদ্দিনকে। কবরটিকে মাজার ব্যবসায়ীরা এখন পরিণত করেছে একটি মাজারে এবং সরু এক গলির মধ্যে দিয়ে পৌঁছতে হয় সেখানে।

প্রায় একই সময়, এপ্রিল ১৭০৪ সালে 'আলীবর্দী খানের গোপন সম্মতি লাভ করে সিরাজ-উদ-দৌলা প্রকাশ্য রাজপথে হোসেন কুলি খানকে হত্যা করেন।'[২১]

অধ্যাপক করিম লিখেছেন, এ সময় মুরাদ দৌলত ঢাকায় নায়েব নাজিমের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। অন্যান্য ঐতিহাসিকরা কিন্তু মুরাদ দৌলতের নাম উল্লেখ করেন নি। তারা উল্লেখ করেছেন রাজবল্লভের কথা। মনে হয় মুরাদ দৌলত নামে মাত্র ছিলেন। সর্বময় কর্তা ছিলেন রাজবল্লভ এবং তিনি প্রিয় ছিলেন ঘষেটি বেগমের। রাজবল্লভ প্রচুর অর্থ তছরূপ করেছিলেন। সিরাজ উদদৌলার তাঁকে পছন্দ না করারই কথা। এদিকে ১৭৫৫ সালে আসল নায়েব নাফজিম নওয়াজিস মুহাম্মদ পরলোকগমন করেন। সিরাজ রাজবল্লভকে তছরূপের অপরাধে বন্দী করেন। এবং 'তার ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য একদল সৈন্যকে রাজবল্লভের বাসভূমি রাজ নগরে পাঠান। সৈন্যদল রাজ নগরে পৌঁছাবার পূর্বেই রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ বা কৃষ্ণাদস সপরিবারে এবং সমস্ত ধনরত্ন সহ পুরীতে তীর্থ যাত্রার নাম করে ১৭৫৬ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে' কলকাতা পৌঁছান।[২২] পলাশীর যুদ্ধের একটি অন্যতম কারণ, কৃষ্ণদাসকে প্রত্যার্পণ করার সিরাজের অনুরোধ সত্ত্বেও ইংরেজ কর্তৃক সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা।

এরপর আসে নায়েব নাজিম জেসারত খাঁর প্রসঙ্গ। তিনি ও তার পরবর্তী নায়েব নাজিমদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। কারণ এরা ছিলেন ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা, অনুপস্থিত নায়েব নাজিম নয়। বাংলা তখন ইংরেজ প্রশাসনের অধীন। ফলে, তাঁদের নথিপত্রেও এদের উল্লেখ আছে। পূর্ববর্তী নায়েব নাজিমদের কেউ কেউ ঢাকায় থাকলেও দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁদের রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে। ঢাকার প্রতি তাদের তেমন কোন আকর্ষণ ছিল না। আমরা তাই এখন বিস্তারিত আলোচনা করবো ঢাকার এই আদি নবাব পরিবার সম্পর্কে।

৩

ঢাকার এই আদি নবাবদের কথা শুরু করতে হয় জেসারত খানকে দিয়ে যিনি ছিলেন এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

অধ্যাপক আবদুল করিম উল্লেখ করেছেন, ডিসেম্বর ১৭৫৫ সালে, নওয়াজিস মুহাম্মদের মৃত্যুর পর আলীবর্দী খান জেসারত খানকে 'fullfledge' নায়েব নাজিম হিসেবে নিযুক্ত করে। সিরাজউদদৌলা মসনদে বসে ঢাকার নায়েব নাজিম হিসেবে পেলেন জেসারত খানকেই।[২৩]

টেইলর লিখেছেন জেসারত খান ছিলেন রাজবল্লভের উত্তরাধিকারী। 'এই ব্যক্তি ও

জেলার সরকারী মোহরার ছিলেন এবং তিনি আলীবর্দী খান, সিরাজউদদৌলা, কাসিম আলী এবং অন্যান্যদের সমগ্র শাসনামল থেকে শুরু করে ১৭৮১ পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।'[২৪]

ওয়াকিল আহমদ উল্লেখ করেছেন, 'জসরত খান প্রথমে ঢাকায় ফৌজদার (১৭৫৪) ও পরে ঢাকার নায়েব নাজিম (১৭৬৫-৭২) হন।' এবং বিভিন্ন নথিপত্রের সাহায্যে ঐ আমলের ফৌজদারদের যে তালিকা তিনি প্রণয়ন করেছেন তাতে দেখা যায় ১৭৫৭ সালেও জেসারত খান ছিলেন ঢাকার ফৌজদার।[২৫] এস, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়ও জেসারত খানকে ফৌজদার বা গভর্ণর হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২৬]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, নওয়াজিস মুহাম্মদের মৃত্যুর পরপরই জেসারত খান নায়েব নাজিম নিযুক্ত হন নি। তিনি ছিলেন ফৌজদার। এবং সে হিসেবেই পূর্বাঞ্চল শাসন করেছিলেন। ঐ ক্রান্তিকালীন সময়ে মুর্শিদাবাদ থেকে বোধহয় আর কাউকে নায়েব নাজিম করে পাঠানো হয় নি। পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে, নবাব হিসেবে সিরাউদদৌলা ঢাকার ইংরেজদের হত্যার জন্য যে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন জেসারত খান কে তা ফৌজদার জেসারত খানকেই পাঠিয়েছিলেন। এমনও হতে পারে পলাশীর যুদ্ধের পর কৃতজ্ঞ ইংরেজদের প্রভাবে তাঁকে উন্নীত করা হয়েছিলো নায়েব নাজিম পদে।

আবদুল করিম, নায়েব নাজিম এবং তাদের প্রতিনিধি হিসেবে যাদের নাম দিয়েছেন, সেখানে একটি নাম নেই। ওয়াকিল আহমদ, তাঁর গ্রন্থে 'ক্যালেণ্ডার অফ পার্সিয়ান করসপনডেন্স' থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামের একটি তালিকা সংকলিত করেছেন। সেখানে একটি নাম পাচ্ছি আগাসালেহ। ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা। লেখা আছে 'ওয়াজ অ্যাপয়নটেড নায়েব (গভর্ণর) অফ ঢাকা বাই দি কোম্পানি ইন ১৭৬৩ অ্যাণ্ড ডিসমিসড বাই এম, আর খান।'[২৭] খুব সম্ভব, ঢাকা জয়ের জন্য লেঃ সুইনটন যখন শহরটি আক্রমণ করেন তখন নেই বিচ্ছৃংখল সময়ে আগা সালেহ ছিলেন নায়েব। ঠিক ঐ মুহূর্তের ঢাকার খানিকটা বর্ণনা দিয়েছেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। লিখেছেন তিনি, ১৭৬৩ সালে, প্রকাশ্যে ইংরেজরা মীরজাফরের বিরোধিতা শুরু করে। ঢাকার শাসনকর্তা মোহাম্মদ আলী বেগ [আধ্যাপক করিম শুধু মোহাম্মদ আলী বলে উল্লেখ করেছেন] ইংরেজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইংরেজরা এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে শহর ছেড়ে চলে যায় লক্ষ্মীপুর এবং তারপর সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসে জয় করে নেয় শহর। মোহাম্মদ আলী এবং তাঁর সমস্ত কর্মচারীকে করা হয় গ্রেফতার। ভেঙ্গে পড়ে শহর প্রশাসন। ইংরেজরা তখন কিছু হিন্দু মুৎসুদ্দীদের নেতৃত্বে গঠনের চেষ্টা করে একটি পুতুল সরকার।[২৮]

মনে হয়, ঐ সময় সেই সরকার প্রধান বা নায়েব ছিলেন আগা সালেহ, কোন হিন্দু মুৎসুদ্দী নয়। ক্ষমতায় ছিলেন তিনি একবছরেরও কম। কারণ, ১৮৬৩ সালেই মীর জাফর রেজা খানকে নিযুক্ত করেছিলেন ঢাকার নায়েব নাজিম হিসেবে এবং তিনি এসে আগা সালেহকে হটিয়ে দেন বা 'বরখাস্ত' করেন।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে অধ্যাপক করিম প্রদত্ত তালিকার খানিকটা সংশোধন করা যেতে পারে। এ সংশোধনী অনুযায়ী মোহাম্মদ আলী ও রেজা খানের মাঝে অর্থাৎ ক্রমিক নম্বর দশে নাম হবে আগা সালেহর।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য অধ্যাপক ইসলাম ইল্লেখ করেছেন, জেসারত খা ফৌজদার ছিলেন ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত। তারপর নিযুক্ত হন মোহাম্মদ আলী। তিনি অবশ্য এ তারিখের উৎস উল্লেখ করেননি। অধ্যাপক করিমের তালিকায় জেসারত খানের কার্যকাল উল্লেখ করা হয়েছে ১৭৫৫ থেকে ১৭৬২ পর্যন্ত। তারপর মোহম্মদ আলী। এ ক্ষেত্রে মনে হয়, অধ্যাপক করিমের তারিখটাই সঠিক।

৪

নায়েব নাজিস হিসেবে জেসারত খান লাভ করলেন জাহাঙ্গীরনগর [ঢাকা], ইসলামাবাদ [চট্টগ্রাম], রওশনাবাদ [ত্রিপুরা/ কুমিল্লা] এবং জালালাবাদ [সিলেট] বা এক কথায় পূর্ববঙ্গের শাসনভার। জেসারত খানের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন তাইফুর

পারস্যের কৌমে জন্মেছিলেন জেসারত এবং নিজেকে তিনি দাবী করতেন হজরত আলীর অধস্তন পুরুষ হিসেবে। এ হিসেবে ঢাকার শিয়া সম্প্রদায়ের তিনি ছিলেন প্রধান।[২৮ক] এর বেশী কিছু জানা যায় নি। তবে, অনুমান করে নিতে পারি ঐ আমলের অনেক ভাগ্যান্বেষীর মতো তিনি এসেছিলেন বাংলায় এবং চাকরি নিয়েছিলেন হয়ত মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে এবং তারপর কর্মকুশলতার কারণে এসেছিলেন উপরে উঠে।

জেসারত খানের নিযুক্তির কিছুদিন পর মারা গেলেন আলীবর্দী খান। নবাব হলেন সিরাজউদ্দৌলা। খুব শীঘ্রই ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ বাধলো নতুন নবাবের। এ প্রসঙ্গে ঢাকার এক সময়ের কালেক্টর ও ডয়েলীর বর্ণনা থেকে কিছু তথ্য নিতে পারি। লিখেছেন তিনি -

কলকাতা 'আক্রমণ ও লুট' করার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে সেনা যোগাড় করার পর, তিনি জেসারত খানকে নির্দেশ পাঠালেন ঢাকার ইংরেজদের হত্যা করার জন্য। তাঁর নির্দেশ ছিল মহিলা ও শিশুদেরও যেন রেহাই দেয়া না হয়। আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোম্পানী ও ইংরেজদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করে মুর্শিদাবাদে রাজা মোহনলালকে পাঠাতে। এ কাজটি নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাপন করতে বলা হয়েছিলো। জেসারত খান বিমূঢ় হয়ে পড়লেন সিরাজের এ নিষ্ঠুর আদেশ পেয়ে। কিন্তু নবাবের আদেশ না মানলে নিজেই ফৌত হয়ে যাবেন। তবুও, জেসারত ঠিক করলেন তিনি ইংরেজদের বাঁচাবেন।

এখন, এর পরের ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে দুটি। একটি দিয়েছেন ঢাকার এক সময়ের ম্যাজিস্ট্রেট ও ডি'অয়লী যিনি ছিলেন নুসরাত খানের [বা জংয়ের]

সমসময়িক। আরেকটির উল্লেখ করেছেন এস সি ব্যানার্জি তাঁর একটি প্রবন্ধে। কিন্তু তিনি কোন সূত্র উল্লেখ করেন নি। তবে খুব সম্ভব যে উৎস হতে পারে রেভিনিউ বা টেরিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্ট প্রসিডিংস। প্রথমে ডি'অয়লি বর্ণনাটি দেওয়া যাক।

সে সময় ঢাকায় ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্ট ছিলেন রিচার্ড বীচার। জেসারত তাঁকে ও তাঁর স্বদেশী সবাইকে একদিন একরাত আটকে রাখলেন দুর্গে। তাঁদের যত্নআত্তি অবশ্য কম করলেন না। জেসারতের পরামর্শে ইংরেজরা স্বীকৃত হলেন সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা না করতে। পরদিন, ইংরেজদের পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে ফিরে যেতে দেওয়া হলো। তবে, জেসারত তাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে পাঠিয়ে দিলেন মুর্শিদাবাদ। একই সঙ্গে নবাবকে তিনি লিখে জানালেন যে, ঢাকার ইংরেজদের হত্যা করা এমন কোন ব্যাপার নয়। আর ঢাকায় তাদের সম্পত্তির পরিমাণ কম; এ ছাড়া তারা শান্ত ও বন্ধুভাবাপন্ন। সুতরাং এতোগুলি লোককে হত্যা করা হলে তা হতো বর্বরতা। এ ছাড়া জেসারতের মনে হয়েছে, হঠাৎ কোন কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে নবাব এ আদেশ দিয়েছেন অর্থাৎ নবাব সত্যি সত্যি ইংরেজদের হত্যা করতে চান না। তবে, জেসারত খান ইংরেজদের কাছ থেকে মুচলেকা আদায় করেছেন যে, তারা নবাবের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কিছু করবেন না।[২৯]

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছেন তিনি—

১৯৫৬ সালের জুন মাসে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করে ঢাকার ফৌজদার বা গভর্ণর [নায়েব নাজিম নয়?] নওয়াব আগা বাকের জেসারত খানকে হুকুম পাঠালেন ইংরেজ কুঠি দখল করে কুঠির কর্মচারীদের গারদে পুরতে। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে তখন ছিলেন কুঠি প্রধান রিচার্ড বীচার, লিউক স্ক্রফটন, টমাস হিগুম্যান, স্যামুয়েল ওয়াল্টার, জন কার্টিয়ার এবং জন জনষ্টোন। সেনাবাহিনীর অধিকর্তা ছিলেন লেঃ জন কাডমোর এবং কোম্পানীর সার্জন ছিলেন নাথানিয়েল উইলসন। মহিলা ছিলেন তিনজন - মিসেস বীচার, মিসেস ওয়ারউইক এবং মিস হার্ডিং। সেনাবাহিনীতে ছিল চারজন সার্জেন্ট, তিনজন কর্পোরাল, উনিশজন ইউরোপীয়ান, চৌত্রিশজন কৃষ্ণ খৃস্টান এবং ষাটজন আধা পর্তগীজ সৈন্য। নবাবের নিদের্শ ইংরেজদের কানে পৌছলে তারা দেখলো, নিজেদের ক্ষুদ্র বল নিয়ে প্রতিরোধ অসম্ভব। তখন তারা ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ এম, কোর্টিনকে সাহায্যের আবেদন জানালো। জেসারত খানের সঙ্গে ফরাসী কুঠিয়ালের সম্পর্ক ভালো ছিল। তিনি তাঁকে অনুরোধ জানালেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিতে এবং ইংরেজরা ফরাসী কুঠিতে আশ্রয় নেবে - এ অনুমতি আদায় করলেন। ইংরেজরা কোন শত্রুতামূলক কাজ করবে না এ ব্যাপারে ফরাসী কুঠিয়াল নিজেই জামিন হলেন। জেসারত খান ঝুঁকি নিয়ে ইংরেজদের ছেড়ে দিলেন তবে তাদের ১৪,০০০,০০টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন।[৩০]

দুটি বর্ণনায় খানিকটা পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ একটি বিবরণে দেখা যায় সিরাজদ্দৌলা জেসারত খানকে ইংরেজদের হত্যার আদেশ দেন নি; দ্বিতীয়ত, তিনি তাদের ঢাকা দুর্গেও আটক রাখেন নি। এখন কোন্ বিবরণটি সত্য তা নিরূপণ করাও

দুরূহ। তবে আমরা বলতে পারি, ইংরেজদের সম্পর্কে সিরাজউদ্দৌলা যে নির্দেশ দিয়েছিলেন জেসারত খান তার খানিকটা পালন করেছিলেন। সম্পূর্ণটি নয়।

সিরাজ এরি মধ্যে দখল করে নিয়েছেন কলকাতা। জেসারত খানের চিঠির উত্তর তখন তিনি দিলেন না বটে কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন। এবং তারপরই ভাগ্য বিপর্যয় হলো সিরাজের।

এর কয়েক বছর পর মীর কাশিম যখন শুনলেন যে, জেসারত ঢাকার ইংরেজদের রক্ষা করেছেন তখন তিনি তাঁকে মুঙ্গের আসার নির্দেশ দেন। জেসারত খান সে নির্দেশ পালন করেন। তখন মীর কাশিম ঢাকায় তাঁর দিওয়ানকে নির্দেশ পাঠালেন ইংরেজদের অবিলম্বে হত্যা করে তাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে। জেসারত খানকে নবাব পদচ্যুত করলেন বটে কিন্তু কোন ক্ষতি করলেন না। যা হোক, ঢাকায় ইংরেজদের হত্যার নির্দেশ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা তা জানতে পেরে রাতের অন্ধকারে ঢাকা ত্যাগ করেন। নবাবের সৈন্যরা পরদিন ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করে লুঠ করে। এর মধ্যে লেঃ সুইনটন নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর থেকে একদল সৈন্য নিয়ে এলেন ঢাকায়। নবাবের সৈন্যরা পালালো মুঙ্গের।[৩১] তায়েশ লিখেছেন, মীর কাশিমের ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে জেসারত খান চলে যান পাটনায়।[৩২] ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ দিওয়ানীর ভার পেলে, জেসারত খান আবার ফিরে পেলেন ঢাকার গদি। নিযুক্ত হলেন নায়েব নাজিম।

৫

১৭০২-৩ সালের মধ্যে আজিমউশশান ও মুর্শিদ কুলী খান ঢাকা ত্যাগ করলে অবশ্যই ঢাকার মর্যাদা হ্রাস পেয়েছিলো। তারপর সরকারী ভাবে ১৭১৫-১৬ সালে রাজধানীর মর্যাদাও হারালো ঢাকা। তবে, প্রশাসনিক কেন্দ্র বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকার ক্ষয় শুরু হয় নি। ১৭০০ সালের এক হিসাবে জানা যায়, ঢাকা ছিল বিশ্বের দ্বাদশ শহর।[৩৩] ১৭০১ সালে, জলদস্যু পিট তার এক বন্ধুকে লিখেছিলো, আমি আশা করি তুমি ঢাকা যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারবে। কোম্পানীর সবগুলি চাকরির মধ্যে ঢাকার পদই সবচেয়ে সুবিধাজনক।[৩৪]

আবদুল করিম লিখেছেন, মুঘল রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর ঢাকা বণিকদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছিলো বিশেষ করে ইউরোপীয় কোম্পানীদের। তাদের রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছিলো তিন চার গুণ। সুতরাং রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর ঢাকার ক্ষয় হয় নি তবে এর বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো।[৩৫]

কথাটা অন্যভাবে বলা যায়। কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধি মানে, দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন, শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি। সুতরাং সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে দেখলে অর্থাৎ কাগজে-কলমে ইউরোপীয় কোম্পানীর বৃদ্ধির হার ঠিকই আছে কিন্তু বাস্তবে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কেউই লাভবান হয় নি। কারণ ডঃ করিম নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন

নিয়াবতের পঞ্চাশ বছরে ঢাকার সীমানা বৃদ্ধি ঘটেনি। কোম্পানী যখন প্রত্যক্ষভাবে শাসন কার্য গ্রহণ করে, এই ক্ষয় তখন আরো দ্রুত লয়ে ঘটতে থাকে।

ঐ সময়টা ছিল ক্রান্তিকাল। বিশেষ করে পলাশী যুদ্ধের পর। রাজনৈতিক অস্থিরতা এর কারণ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখনও নিজেদের সংহত করতে পারেনি। এর সঙ্গে ছিল বন্যা, দুর্ভিক্ষ; গ্রামাঞ্চলে লুটপাট বৃদ্ধি পেয়েছিলো। দেওয়ানী লাভের পর ক্লাইভ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দিওয়ানী প্রশাসনে চাইলেন মুখোশ পরাতে। মনে হয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, অন্যান্য ইউরোপীয়ান কোম্পানীর বিপরীতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মর্যাদার যে বিপ্লবী পরিবর্তন হয়েছে তা গোপন করা।[৩৫] এ ছাড়া হয়ত, মোটামুটি মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গে ইংরেজরা এতো তাড়াতাড়ি তারা শাসন ব্যবস্থার কাঠামোটা বদলাতে চায় নি। কারণ, সুপরিকল্পিতভাবে তারা তখন শোষণ করছে। কৃষক কারিগরদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অসন্তোষ। সুতরাং এ অঞ্চলে যতদিন খুঁটি গেড়ে বসা না যাচ্ছে ততোদিন এমন একজনকে দরকার যে বিশ্বস্ত এবং যাকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে অবাধ লুণ্ঠন চালিয়ে যাওয়া যাবে। এমনকি দিওয়ানী পাওয়ার পরও কয়েক বছর দিওয়ানী প্রশাসনে সরাসরি কোন ইংরেজ নিযুক্ত করা হয় নি। পরবর্তী কালে আমরা লক্ষ্য করি যতই ইংরেজদের ক্ষমতা সংহত হচ্ছে, নায়েব নাজিমরা ততই ক্ষমতা হারাচ্ছেন এবং হাসি ঠাট্টার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তা ছাড়া, নায়েব নাজিমদের অধিকাংশই ছিলেন অকর্মণ্য, বিলাস ব্যসনে মত্ত। শুধুমাত্র একজন মাথা তোলার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু তখনিই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর যখন ইংরেজরা সংহত করে ফেললো তাদের ক্ষমতা তখন লুপ্ত হয়ে গেলো নায়েব নাজিমের পদ। অবশ্য, নবাবের বংশও তখন লোপের পথে।

ইংরেজ আমলে নায়েব নাজিমের অধীনে যে অঞ্চল ছিল তা সীমা হলো এরকম— উত্তরে গানোরা পর্বত, দক্ষিণে সুন্দরবন, পূর্বে ত্রিপুরা পর্বত, পশ্চিমে যশোর। ঢাকার শহরের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিলো দৈর্ঘ্যে চৌদ্দ মাইল, প্রস্থে সাত মাইল। উত্তর সীমা ছিল টঙ্গী জামালপুর, দক্ষিণে বুড়ীগঙ্গা, পুবে ধাপা ফুলতলা এবং পশ্চিমে মিয়াপুর সিদ্দি [Miapur Seddı]।[৩৭]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনভার গ্রহণের পর ঢাক দ্রুত পরিণত হলো নোংরা জঙ্গলময় অস্বাস্থ্যকর একটি শহর। ১৭৮৬ সালে ঢাকার কালেক্টর ম্যাথু ডে, এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন, বাংলা বিহার উড়িয্যার ঢাকার মতো বোধহয় এমন কোন জেলা নেই যা জঙ্গল আর পতিত জমিতে ভরা, জঙ্গল গ্রাস করছে শহর।[৩৮] রেনেলের হিসাব অনুযায়ী ১৭৯৩ সালে শহরের পরিধি ছিল আনুমানিক দৈর্ঘ্য চার ও প্রস্থে আড়াই মাইল। ১৮০১ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ালো তিন ও দেড় মাইলে।[৩৯] অজস্র টুটোফাটা কুঁড়ে, মুঘল আমলের জীর্ণ কিছু অট্টালিকা ও সৌধ, জলা-জঙ্গল, মহামারী— এ ছিল ঢাকা শহর। বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবেও আর ঢাকার আকর্ষণ ছিল না। লোকসংখ্যা হ্রাস পেলো উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। এক সময় যে ঢাকা ছিল উৎপাদন ও রপ্তানী কেন্দ্র এবং যা ছিল তার সমৃদ্ধির মূল কোম্পানী আমলে তা গেলো ধ্বংস হয়ে।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণে এ ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না।

আগেই উল্লেখ করেছি দিওয়ানী লাভের আগে নিযুক্ত নায়েব নাজিমদের ক্ষমতা ছিল। কিন্তু, দিওয়ানীর পর থেকে তার হ্রাস পেতে থাকে, বিশেষ করে রেগুলেটিং অ্যাক্টের পর। ১৭৭৩ সালে পাশ হলো রেগুলেটিং অ্যাকট। পরের বছর ঢাকায় নিযুক্ত করা হলো একটি প্রাদেশিক কাউন্সিল। নিজামত বা ফৌজদারী বিভাগ ছিল নায়েব নাজিমের হাতে। অন্যদিকে ভূমি রাজস্বের কালেকটর নিযুক্ত হয়েছিলেন দিওয়ানী আদালতের সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে। ১৭৮১ সালে নিজামত আদালতের ভারও গ্রহণ করেছিলো কোম্পানী। এবং ডানকানসন ছিলেন এ আদালতের প্রথম জজ।[৪০] এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ্য। মুঘল আমলে শহরের অধিকাংশ প্রশাসনিক কাজকর্ম, যেমন, শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি ও নৈতিক মান রক্ষা প্রভৃতির দায়িত্ব ছিল সরকারের। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে, শহর প্রশাসনের কর্মকর্তা মনোনীত হয়েছিলেন একজন ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট। কোতোয়াল পদ্ধতি তখনও ছিল কিন্তু কোতোয়ালের দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত সীমিত। ১৮১৪ সালে এই পদটি উঠিয়ে দেয়া হয়।[৪১] ফলে, পৌর দায়িত্ব বলতে যা বোঝায় তা কারো ছিল না। এতে শহরের পরিবেশ নায়েব নাজিমদের আমলে দ্রুত খারাপ হতে থাকে।

৬

আবার ফিরে আসি জেসারত খানের প্রসঙ্গে। দানীর মতে, লেঃ সুইনটন ঢাকার ভার গ্রহণ করেছিলেন বা জয় করেছিলেন ১৭৬৪ সালে।[৪২] ইংরেজরা কিন্তু জেসারত খানের কথা মনে রেখেছিলো। ডি'অয়লি জানিয়েছেন, পূর্ববঙ্গের অবস্থা খানিকটা থিতিয়ে এলে কলকাতার কাউন্সিল প্রকাশ্যে জেসারত খানকে ফিরে আসতে অনুরোধ জানালেন ঢাকায়। জেসারত ফিরে এলেন ঢাকায় এবং তাঁর মাসিক ভাতা ধার্য করা হলো ছ'হাজারে। ইংরেজ নথিপত্রে, ওয়ারেন হেস্টিংসের মন্তব্য উদ্ধৃত করে অবশ্য বলা হয়েছে নওয়াব সিরাজউদদৌলার সময় ঢাকার ফ্যাক্টরীর প্রতি যে মহানুভবতা দেখিয়েছেন তার কৃতজ্ঞ প্রতিদান হিসেবে পদটি দেয়া হয়েছিলো জেসারত খানকে।[৪৩]

কার্যত শাসনভার ন্যস্ত ছিল সুইনটনের ওপর যিনি পরিচিত ছিলেন সুলটেন সাহেব নামে।[৪৪] এই সুইনটন পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলেন বৃটেনে এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন নদীয়ার একজন বাঙ্গালী, নাম, শেখ ইতিশামউদ্দিন। আমাদের জানামতে তিনিই প্রথম বাঙ্গালী যিনি ভ্রমণ করেছেন ইউরোপ। তবে ইতিশামউদ্দিন তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে পরে উল্লেখ করেছেন, লণ্ডনে তিনি বেশ কিছু বাঙ্গালীর দেখা পেয়েছিলেন। জেসারত খান থাকতেন চকের মুঘল দুর্গে [বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগার]। সুইনটনের খাতিরে তা ছেড়ে দিয়ে উঠলেন বড় কাটরায়। অবশ্য ১৭৮৪ সালের এক সরকারী চিঠিতে জানতে পারি, ঢাকা কেল্লা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে।[৪৫] বড় কাটরায় থাকার সময় জেসারত

খানের জন্যে নির্মিত হতে থাকে নিমতলিতে এক প্রাসাদ। প্রাসাদ নির্মিত হলে জেসারত খান বড় কাটরা ছেড়ে উঠলেন গিয়ে নিজ প্রাসাদে। সে হতে নিমতলি কুঠি বা নিমতলী প্রাসাদ ঢাকার নায়েব নাজিমদের বাসস্থান হিসেবে পরিচিত।

উনিশ শতকে এই পুরো এলাকাটি পরিচিত ছিল নওয়াবী দালান নামে। প্রাসাদের অর্থ ছিল বিশাল এক চত্বরের বেশ কটি আলাদা আলাদা অট্টালিকা। প্রাসাদের চারপাশে ছিল বাগান আর বিরাট এক দীঘি। দীঘিটি পরিচিত ছিল নওয়াবী দীঘি নামে যার একাংশ এখনও বর্তমান [ফজলুল হক হলের পাশে]। প্রাসাদের দক্ষিণে ছিল ছোট এক মসজিদ। [এখনও আছে], নওয়াবী মসজিদ।[৪৬]

নিমতলী কুঠির বিস্তারিত বর্ণনা পাই বিশপ হেবারের ভ্রমণপঞ্জীতে। ১৮২৪ সালে এসেছিলেন তিনি ঢাকায় এবং নিমতলীতে দেখা করেছিলেন নায়েব নাজিম শামসউদদৌলার সঙ্গে। তখন তাঁর সঙ্গে ছিরেন ঢাকার তৎকালীন কালেকটর মিঃ মাস্টার।

দু'পাশে গাছগাছালি ভর্তি একরাস্তা দিয়ে তাঁরা এসে পৌঁছলেন পুরানো ইটের প্রাচীরে ঘেরা নিমতলী কুঠিতে। এক কোম্পানী সেপাই ছিল তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। এরা কোম্পনীর সেপাই, নবাবকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য এদের রাখা হয়েছে প্রাসাদে। সামনে আরেকটি সুন্দর ফটক, খোলা গ্যালারী সহ, সেখানে বসানো নহবত। এখানে ছিল নবাবের নিজস্ব রক্ষীরা যাদের পরনে ছিল অদ্ভুত পোষাক, রূপোর লাঠি হাতে কিছু মানুষের জটলা যারা তাদের নিয়ে গেল ভেতরের দিকে। বর্গাকার চত্বরের চারপাশে ছিমছাম চুনকাম করা কিছু ইটের বাড়ি। ডানদিকে একসার সিঁড়ি উঠে গেছে সুন্দর এলক হলঘরের দিকে যার স্থাপত্য গথিক ধরনের। ঘরের ভেতর বড় গোলাকার এক টেবিল লাল কাপড়ে ঢাকা, মেহগনি কাঠের চেয়ার, চমৎকার বড় বড় দু'টি কনভেক্স আয়না, সাধারণ দু'টি আয়না। দেয়ালে ঝুলছিলো রাজার, সম্রাট আলেকজাণ্ডার, লর্ড ওয়েলেসলী এবং হেস্টিংসের ছবির প্রিন্ট। আরো ছিল চিনারীর আঁকা নবাব ও তাঁর ভাইয়ের দু'টি সুন্দর প্রতিকৃতি। ঘরের আসবাবপত্র সব রুচিসম্মত এবং অভিজাত, লোক দেখানো জাঁকজমক তাতে ছিল না।[৪৭] ডি'অয়লি নুসরাত জংয়ের আমলে প্রাসাদ সম্পর্কে লিখেছেন, প্রাসাদটি চমৎকার ভাবে প্রাচ্য রীতিতে সাজানো, দরবার হলের দেয়ালে এক ইঞ্চি ফাঁকও ছিলো না। পুরো দেওয়াল ভর্তি ছিল ইংলিশ প্রিন্টে।[৪৮]

জেসারত খানের আমলে একটি প্রধান ঘটনা ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ। তায়েশ জানিয়েছেন, ঐ বছর 'ঢাকার আশেপাশে সর্বপ্রথম লাল পানি ওঠে এবং সারা দেশ পানিতে ডুবে যায়। কথিত আছে যে, শহরে এতো পানি ওঠে যে, প্রতিটি গলিতে ও সড়কে নৌকা চলতো।' বন্যার পর দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। দলে দলে লোক আসতে থাকে শহরে, না খেতে পেয়ে রা যায় অজস্র। 'কথিত আছে যে, গ্রামের লোকেরা মাত্র একসের চাউলের বিনিময়ে নিজেদের ছেলে মেয়ে শহরের লোকদেরকে দিয়ে দিতো। এ ভাবে শহরের লোকেরা অসংখ্য ছেলে মেয়ে কিনে নেয়। যে সব গ্রামের লোক দুর্ভিক্ষের পরে বেঁচে যায়, তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ঢাকায় বর্তমান কুট্টি নামে প্রসিদ্ধ লোকেরা সে সব গ্রামের লোকদের বংশধর। এই

নামকরণের কারণ হলো, দুর্ভিক্ষের পর অনেক গ্রামের লোক এ শহরে এসে বসতি স্থাপন করে এবং ধান কুটে চাউল করার পেশা গ্রহণ করে। এ জন্য শহরের লোকেরা তাদেরকে কুট্টি অর্থাৎ ধান কুটিয়ে নামে ডাকতে থাকে। এর পর থেকে এই সম্প্রদায় কুট্টি নামে পরিচিত হয়।[৪৯]

এ পরিপ্রেক্ষিতে, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম তাঁর এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে 'কুট্টি' নামের উদ্ভব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা উল্লেখ্য এবং যুক্তিযুকক্ত। তাঁর ব্যাখ্যাটির সঙ্গে মিল আছে তায়েশের খানিকটা, তবে তাঁর যুক্তিটি আরো অ্যাকাডেমিক। উল্লেখ করেছেন তিনি, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে রপ্তানী বাণিজ্যে পূর্ববঙ্গের চাল ছিল একটি প্রধান পণ্য। ঢাকা হয়ে ওঠে ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র। চাল রপ্তানীকারকরা সবাই ছিলেন মারোয়ারী। তারা গ্রামাঞ্চল থেকে ধান কিনে এসে জমা করতো ঢাকা শহরে। ধান থেকে চাল তৈরি কাজে নিযুক্ত করা হতো স্থানীয় মজুরদের। এই ধান কুটিয়েদের বলা হতো কুট্টি যে শব্দটির উদ্ভব সংস্কৃত শব্দ 'কুট্টিন' থেকে। মারোয়ারীদের হিন্দুস্তানী এবং স্থানীয়দের অশুদ্ধ বাংলা মিলে ঢাকায় যে উপভাষার সৃষ্টি হলো তা হচ্ছে 'কুট্টি'।[৫০]

জেসারত খানের মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। ব্রাডলীবার্ট, দানীর মতে, তাঁর মৃত্যু সন ১৭৮। এস. সি. ব্যানার্জী রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের প্রসিডিংসের [২৬.২.১৭৭৯; নং ১১] সাহায্যে জেসারত খানের মৃত্যুর তারিখ ঠিক করেছেন ১২ জানুয়ারি ১৭৭৯ সাল। আবদুল করিমের মতও তাই। তবে তাইফুর বা তায়েশ ১৭৮৯ বলে যে মৃত্যুর সন উল্লেখ করেছেন তা একেবারেই সম্ভব নয়।

জেসারত খানকে কবর দেওয়া হয়েছিলো নওয়াবগঞ্জে।[৫১] ঐ আমলের নওয়াবগঞ্জ আর এ আমলের নওয়াবগঞ্জে অনেক তফাৎ। নওয়াবগঞ্জ সে আমলে ছিল অভিজাত এলাকা। কোম্পানী আমলের প্রথম নায়েব নাজিম জেসারত খানের কবর খুঁজে পাওয়া এখন দুরূহ। কিছুদিন আগে, লালবাগ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নাজির হোসেন আমাকে অনেক খুঁজে পেতে একটি কবর দেখিয়ে বলেছিলেন এটি জেসারত খানের কবর। তিনি ঐ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। ফলে, তাঁর পক্ষে হয়ত তা জানা সম্ভব। কবরটির চারপাশে খোলা নোংরা দুর্গন্ধময় নর্দমা, কুটির। বিশ্বাসই হয় না, ঢাকার এক সময়ের প্রথম নাগরিকের কবরের আজ এ অবস্থা।

৭

১৭৭৮ সালের ৩রা জুন জেসারত খান গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিলের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন। চিঠির বিষয়বস্তু হলো— আমার বয়স হয়ে গেছে। আমি এখন পার্থিব সব বিষয় থেকে দূরে থেকে খোদার রাস্তায় ধর্মীয় কর্তব্য সমূহ সমাপন করতে চাই। এবং এ কাজ সম্পন্ন করতে হলে চাই সমাহিত শান্ত চিত্ত এবং এটা সম্ভব একটি বিশেষ ব্যবস্থা নিলে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমি শেষ একটি অনুরোধ

করতে চাই। তা' হলো আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ খানকে জাহাঙ্গীরনগরের নিজামত প্রদান। সৈয়দ মোহাম্মদ বড় হয়েছে, শিক্ষিত হয়েছে কোম্পানীর পুত্র হিসেবে, কার্যক্রম এবং কোম্পানী ও ইংরেজ প্রধানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উষ্ণ এবং সে চায় তাদের পক্ষে কাজ করতে। খোদার ইচ্ছায় আমার থেকে আমার পুত্র আরো কার্যক্রম এবং গত বছর আমার নায়েব হিসেবে সে তার প্রমাণ রেখেছে। সুতরাং জাহাঙ্গীরনগরের নাজিম হিসেবে আমি সে ভাতা ও সুযোগ সুবিধা পাই তাঁকে তাই বরাদ্দ করা হোক। কাউন্সিল থেকে তাকে দেওয়া হোক সনদ এবং খেলাত।[৫২]

গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস পছন্দ করতেন জেসারত খানকে। তিনি লিখলেন, নবাবের চরিত্র অকলংক, লোকজন তাঁকে শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর পুত্র সম্পর্কেও আমার কাছে যে সব রিপোর্ট এসেছে তা ভালো। সুতরাং তাঁকে সনদ না দেওয়ার কোন কারণ নেই। এ পরিপেক্ষিতে ১৭৭৮ সালে নওয়াব জেসারত খানের উত্তরাধিকারী হিসেবে সনদ দেওয়া হলো সৈয়দ মোহাম্মদকে।[৫৩]

সৈয়দ মোহাম্মদ খান হাসমত জং, জেসারত খানের পুত্র ছিলেন না পৌত্র ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ আছে। ব্যানার্জী জেসারত খানের যে চিঠি উদ্ধৃত করেছেন সেখানে সৈয়দ মোহাম্মদকে জেসারত নিজের পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। হেস্টিংসও তাই উল্লেখ করেছেন। আবার ব্যানার্জী ১৮২২ সালে সরকারের পার্সিয়ান সেক্রেটারী, এ স্টালিং এর একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে সৈয়দ মোহাম্মদকে উল্লেখ করা হয়েছে পৌত্র বলে। চিঠিটি এরকম 'জেসারত খান একটি কন্যা সন্তান রেখে যান যার বিয়ে হয়েছিলো মীর মর্তুজার সঙ্গে। তাঁর ছিল তিনটি পুত্র সন্তান সৈয়দ মোহাম্মদ খান হাসমত জং, সৈয়দ আলী খান নুসরাত জং এবং শামসউদৌলা জুলফিকার জং। ইংরেজ সরকার সেই একই ভাবে প্রভাব বিস্তার করে বাংলার নাজিমের কাছ থেকে নিয়োগপত্র আদায় করেন [কারণ] তখনও তাঁর হাতেই ছিল সেই অধিকার।'[৫৪] তায়েশ, তাইফুরও এই মত সমর্থন করে বলেছেন, হাসমত জং জেসারত খানের পৌত্র। তা'হলে জেসারত খান ভুল লিখেছেন? হেস্টিংসও ভুল করেছিলেন? এ বিতর্ক নিরসনে নতুন কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

জেসারত খান পরলোকগমন করেছিলেন ১৭৮১ সালে। তিনি জীবিত থাকতেই নাজিমের পদ পেয়েছিলেন হাসমত জং। গদীতে ছিলেন তিনি সাতবছর। এবং এ সময় উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটে নি। ঢাকার কলেকটর ম্যাথু ডের একটি চিঠিতে জানতে পারি নিঃসন্তান অবস্থায় ১৭৮৫ সালে মুর্শিদাবাদে পরলোক গমন করেন হাসমত জং। হাওয়া বদলাতে সেখানে তিনি গিয়েছিলেন।[৫৫] হাশমত জংকে কবর দেওয়া হয়েছিলো জেসারত খানের পাশে। জেসারত খানের কবরের অবস্থা আগে যা বর্ণনা করেছি, হাসমত জংয়ের কবরের অবস্থাও তাই।

হাসমত জংয়ের মৃত্যুর পর, তাঁর ছোট ভাই নুসরাত জং একইভাবে নায়েব নাজিমের পদের জন্য আবেদন করলেন। এবং একই ভাবে তিনি লাভ করলেন অনুমোদন।

নায়েব নাজিমদের মধ্যে ইন্তেজামউদ্দৌলা নাসিরুল মূলক নওয়াব সৈয়দ আলী খান বাহাদুর নুসরাত জং সবচেয়ে বেশী দিন, সাঁইত্রিশ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন এই পদে। ঢাকা বাসীদেরও প্রিয় ছিলেন তিনি, এবং অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের ঢাকার যোগসূত্র ছিলেন তিনি।

নুসরাত খান যে ঢাকার নওয়াব বা নায়েব নাজিম হয়েছিলেন সে ঢাকার অবস্থা তখন খুব করুণ। রেনেলের হিসাব অনুযায়ী ১৭৯৩ সালে শহরের পরিধি ছিল আনুমানিক দৈর্ঘ্য চার ও প্রস্থে আড়াই মাইল। ১৮১৪ সালের নথিপত্রে জানা যায়, জলাজঙ্গল, বদ্ধ নর্দমা, ভাঙ্গা সাঁকো, কুয়ো সব কিছু তুলে ধরেছিলো ঢাকর ক্ষয়ের চিত্র। শহরের সড়কগুলি ছিল আঁকাবাঁকা অনেক ক্ষেত্রে রাস্তার ওপরই নির্মিত হয়েছিলো কুটির।[৫৬] ১৮২০ সালে, হ্যামিলটন তাঁর 'ইস্ট ইণ্ডিয়া গেজেটে'ও ঢাকার একই রকম চিত্র তুলে ধরেছিলেন।[৫৭]

১৮১৭ সালে প্রভিন্সিয়াল কোর্ট অফ সার্কিট অ্যাণ্ড অ্যাপীলের জজ জন আহ্মটি সরকারকে জানালেন, অবিলম্বে শহরকে পরিচ্ছন্ন এবং শহরের প্রধান দু'টি রাস্তা মেরামত করা দরকার। জঙ্গল রোধ করাও প্রয়োজন, কারণ, ক্রমেই তা শহরকে গ্রাস করছে এবং এমন সময় আসতে পারে যখন ঢাকার অবস্থা হবে গৌড়ের মতো।[৫৮] এ সময়ের ঢাকার এক চমৎকার বিবরণ রেখে গেছেন বিশপ হেবার, যিনি ১৮২৪ সালে কলকাতা থেকে এসেছিলেন ঢাকা।

মিঃ মাস্টারের মতে [কালেকটার], ঢাকা এখন প্রাচীন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ। এর বাণিজ্য যা ছিল তা' থেকে ষাট ভাগ কমে গেছে, আর চমৎকার সব অট্টালিকা, এর প্রতিষ্ঠাতা শাহ জাহাঙ্গীরের দুর্গ, তাঁর তৈরি মসজিদ, প্রাচীন নবাবদের রাজপ্রাসাদসমূহ, ডাচ, ফরাসী ও পর্তুগীজদের ফ্যাক্টরী ও চার্চ এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত, জঙ্গলে গেছে ঢেকে। পুরনো প্রাসাদের জঙ্গলে একবার বাঘ শিকারের সময় মিঃ মাস্টার নিজে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে তাঁর এক বন্ধুর হাতি কুয়োয় পড়ে গিয়েছিলো, সেটি ছিল ঝোপঝাড়ে ঢাকা।

পুরনো ঢাকা কলকাতার চিৎপুরের মতো বাজে, কিন্তু আশেপাশে আছে কিছু সুন্দর ধ্বংসাবশেষ। ধ্বংসাবশেষগুলি ঘিরে আছে ছোট ছোট নোংরা কুটির। ইটের তৈরি দুর্গ নজরে পড়লো যেটি ব্যবহৃত হতো প্রাসাদ হিসেবে। এর স্থাপত্য মনে করিয়ে দেয় মস্কোর ক্রেমলীনের কথা। গ্রীকদের বাড়িগুলি আরো আধুনিক এবং ভূতপূর্ব নবাব এখানে থাকতে ভালোবাসতেন। অবশ্য নদী এই ধরনের বেশ কিছু বাড়ি গ্রাস করে নিয়েছে। মুসলমানদের বাড়িগুলি জীর্ণ, কিন্তু খুব একটা পুরানো নয় এবং প্রায় প্রত্যেক বাড়ির সদরে লেখা আছে আরবী বা ফার্সী ভাষার ফলক। কলকাতার তুলনায় এখানকার ইউরোপীয় বাড়িগুলি ছোটখাটো, জীর্ণ। আর বাড়িগুলি শহরের বাইরে হওয়ায় জঙ্গলে ঢাকা। ফলে, সেখানকার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। যতদূর গেলাম ততদূর তোন ফসলের ক্ষেত নজরে পড়লো না। শুধু এক জায়গায় দেখলাম সামরিক

বাহিনীর জন্যে পরিষ্কার করা হয়েছে কুড়ি একর জমি।[৫৯] আর এছাড়া ছিল মহামারীর প্রকোপ।

এ সময় লোকসংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, ঢাকার গৌরবের ভিত্তি বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছিলো। টেইলর উল্লেখ করেছেন, ১৭৮৭ সালে, কালেটর মিঃ ডে, জেলার ব্যবসা বাণিজ্যের হিসাব করেন এক কোটি টাকা যার মধ্যে ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ ব্যয় হতো ইউরোপে রপ্তানীর জন্যে কাপড় ক্রয়ে। ১৮০৭ সালে ইউরোপীয় বাজারের জন্যে প্রস্তুত পণ্য দ্রব্যের মূল্য ছিল মোট ৮,৬১,৮১৮ টাকা। ১৮১০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৫৬,৯৯৬ টাকায় এবং ১৮১৩ সালে ৩,৩৮,১১৪ টাকায়। ১৮১৭ সালে বাণিজ্যিক প্রতিনিধির পদ বাতিল করা হয় এবং উক্ত সময় থেকে কার্যতঃ ইউরোপে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ হয়ে যায় বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।[৬০]

এ সময়টায় আবার ইংরেজ প্রশাসকরা ঢাকাকে বনজঙ্গল থেকে মুক্ত করার জন্যে স্থাপন করেছিলেন 'কমিটি ফর দি ইমপ্রুভমেণ্ট অফ দি সিটি অফ ঢাকা' যা ছিল বর্তমান পৌর কর্পোরেশনের ভিত্তি। এরাই রমনার জঙ্গল পরিষ্কার করে স্থাপন করেছিলেন রেসকোর্স, দু'একটি রাস্তাঘাটও নির্মাণ করেছিলেন। [৬১] এ সময়ই মিশনারী লিওনার্দ ঢাকায় খুললেন কয়েকটি স্কুল। জিনিসপত্রের বা খাদ্য দ্রব্যের দান ছিল তুলনামূলকভাবে সস্তা, কিন্তু তা ক্রয়ের ক্ষমতাও অনেকের প্রায় ছিল না। শহরে বিশেষ করে শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে চোর ডাকাতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

এ পরিপ্রেক্ষিতে নসুরাত জং হলেন নায়েব নাজিম। ১৭৮৬ সালে তাঁর নিযুক্তির সনদে বলা হলো

পূর্বে ইংরেজ কোম্পানিকে সাহায্য করার কারণে ও তাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের প্রতিদানে জেসারত খান ও হাসমত জংকে সনদ দেওয়া হয়েছে। এখন হাসমত জংয়ের মৃত্যুর পর এ অঞ্চলের নিজামতের ভার দেওয়া হলো নুসরাত জংয়ের প্রতি, যিনি সতর্ক ও সঠিক ভাবে কার্য পরিচালনা করবেন, কোন রকম শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রদানে...আগ্নেয়াস্ত্র যাতে তৈরি করা না হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবেন। বারুদ এবং অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র যাতে কোন রকমেই বিদ্রোহীদের কাছে বিক্রি না করা হয় তা দেখবেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে যে সব জমি আছে তার রাজস্ব সংগ্রহ করে নিয়মিত সরকারে জমা দেবেন। সঠিক ভাউচার ছাড়া কিছু খরচ করবেন না। রায়তদের সুখী ও সন্তুষ্ট রাখবেন; লক্ষ্য রাখবেন যাতে জমি পতিত না থাকে এবং কৃষি উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, তাঁকে আরো জানানো হলো এই নিযুক্তি কার্যকর হবে 'অনারেবল দি কোর্ট অফ ডিরেক্টরস' অনুমোদন করলে।[৬২]

সনদে দেখা যাচ্ছে, এমন কিছু নেই যা নুসরত জংকে করতে বলা হয় নি। কিন্তু তা ছিল কাগজ কলমেই। যতই দিন যাচ্ছিলো, নায়েব সাজিম ক্ষমতা বা কিছু করার অধিকার ততই হ্রাস পাচ্ছিলো। একটি উদাহরণ দিলে তা পরিষ্কার হবে।

১৮১৩ সালে, বিচারক এলিয়টের সঙ্গে নায়েব নাজিমের নতুন এক পুলিশ আইন

নিয়ে বিরোধ হলে, কোম্পানী সরকার জানিয়েছেন, কার্যকরী সমস্ত ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে ন্যস্ত, নবাবের হাতে নয়। এবং নবাব ও বিচারকের মধ্যে যদি কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তবে কোম্পানী বিচারককে সমর্থন করবে।[৬৩]

নুসরত জংকে প্রদত্ত সনদে তখনকার অবস্থা খানিকটা আঁচ করা যায়। বোঝা যাচ্ছে কোম্পানীম তার ক্ষমতা তখনও পুরোপুরি সংহত করতে পারে নি, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। তারা বুঝেছিলো, তাদের সুপরিকল্পিত শোষণে কৃষক কারিগররা বিক্ষুব্ধ এবং তারা যে কোন সময় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন। সুতরাং নবাব যেনো এ ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। এবং এ কারণেই অস্ত্র তৈরি প্রতিরোধের কথা মনে করিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাঁকে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছিলো বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহীদের দমন করা ও মুসলমান আইন অনুসারে বিচার করা। যদিও এ ব্যাপারে নায়েব নাজিমের কোন ক্ষমতা ছিল না। উল্লেখ্য যে, অর্থ খরচের ব্যাপারেও নওয়াবের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ।

তবে মনে হয়, তখন পর্যন্ত ঢাকার ইংরেজরা নায়েব নাজিমকে সম্মান করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর কবর দেয়ার সময় কোম্পানীর তরফ থেকে তোপ দেগে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে সম্মান দেখানো হয়। কোম্পানীর এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়ে ছিলো --

Nabab Nusserut Jung -- of irreproachable manners, most desirous being respected and seems to consider his being on a good footing with the English as essential to his being respected,'[৬৪]

ঢাকার এক সময়ের কালেকটর চার্লস ডি'অয়লি লিখেছেন স্থানীয় প্রশাসনের সম্পূর্ণ ভার এখন কোম্পানীর হাতে, নায়েব নাজিমের এখন তাতে কোন হাত নেই। বর্তমান নওয়াব নুসরাত জং, জেসারত খানের বংশধর। বয়স তাঁর ষাট, মৃদু স্বভাবের, তাঁর ব্যবহার এবং মহৎ হৃদয়ের জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয়। সুকুমার কলার প্রতি তাঁর আছে আগ্রহ। ... কোন অনুষ্ঠানে যখন তিনি যান, তখন তিনি পরিবেষ্টিত থাকেন অসংখ্য ঘোড়সওয়ার ও অনুচরবৃন্দ দ্বারা।[৬৫]

১৮০১ সালের পূর্বোল্লিখিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে নুসরাত জংয়ের ভৃত্য সংখ্যা ছিল প্রায় চারশো। এবং যখন তিনি বাইরে যান তখন তাঁর সঙ্গে থাকে সাধারণত ছ'জন ঘোড়সওয়ার, ছ'জন বর্শাধারী পাইক ও প্রায় চল্লিশজন নিরস্ত্র অনুচর।[৬৬]

তায়েশ, তাইফুর, সবাই নুসরাত জংয়ের সুকুমার বৃত্তি ও মহৎ হৃদয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তাইফুর জানিয়েছেন, ঈদ ও মুহররমের ওপর দীর্ঘ প্রামাণ্য জলরংটি [যা এখন রক্ষিত জাতীয় জাদুঘরে] তাঁর আমলেই আঁকা হয়েছিলো। তিনি অনেক শিল্প সামগ্রীও সংগ্রহ করেছিলেন।

তায়েশ লিখেছেন -- 'ধনী দরিদ্র সকলের সাথে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে কথাবার্তা বলতেন। বিত্তহীনদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর আরবী ও ফার্সী হাতের লেখা ছিল অতি উৎকৃষ্ট। অনুশীলনের উদ্দেশ্যে প্রায়ই নিজের হাতে ছাত্রদেরকে লিখে দিতেন। সব সময় তসবীহ, তিলাওয়াত ও অজিফা পাঠে রত থাকতেন। তিনি ইমামীয়া

মাজহাবের অনুসারী হলেও মগবাজারের গদীনসীন পীর মরহুম হযরত শাহ্ মুহাম্মদীর অত্যন্ত ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন।'[৬৮]

এ সব কারণে ক্ষমতাহীন হয়েও নুসরাত জং প্রিয় ছিলেন ঢাকা বাসীর। এর প্রমাণ তাঁর জানাজায় অজস্র লোকের অংশগ্রহণ যা পরে উল্লেখ করা হবে।

নুসরাত জংয়ের অন্যতম কীর্তি, যে কারণে তিনি আজও স্মরিত, তা হলো তাঁর লেখা বাংলার অসমাপ্ত ইতিহাস। পাণ্ডুলিপিটির নাম 'তারিখ-ই-নুসরাত জঙ্গী।'[৬৯] এ পাণ্ডুলিপিতে সমসাময়িক ঢাকা সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে। 'তারিখ-ই-নুসরাত জঙ্গী' থেকে জানতে পারি, ঢাকার অধিকাংশ বড় জমিদার ছিলেন তখনও মুসলমান এবং অর্থ-সামর্থ্য তাঁদের কম ছিল না।

তাইফুর নুসরাত জংয়ের একটি গ্রীষ্মকালীন আবাসের কথা উল্লেখ করেছেন যার কথা আর কেউ উল্লেখ করেন নি। এটি ছিল বুড়ীগঙ্গার তীরে। তাঁর যৌবনে, তাইফুর দেখেছেন সেই বাড়িটিতে থাকতেন হুসেনী দালানের দারোগা সৈয়দ মোহাম্মদ আলী। এর চত্বরেই ছিল জয়দেবপুরের রাজার ঢাকা নিবাস।[৭০] হতে পারে ভাওয়াল বা জয়দেবপুরের রাজা পরে এটি কিনে নিয়েছিলেন। ভাওয়াল রাজের নিবাসটি ছিল ইমামগঞ্জে অবস্থিত। এখানে উল্লেখ্য যে, ইমামগঞ্জের মালিক ছিলেন এই নায়েব নাজিমরা। ১৭৯৬ সালের বোর্ড অফ রেভিনিউকে লেখা ঢাকার কালেকটরের চিঠিতে জানা যায়— 'এই গঞ্জের মালিক ঢাকার নওয়াবরা। নওয়াব নুসরাত জং ঘোষণা করেছেন গঞ্জ থেকে যা আয় তা তিনি ব্যয় করবেন ধর্মীয় উৎসবে।'[৭১]

নওয়াব নুসরাত জং পরলোক গমন করেন ১৮২২ সালে। তাঁর মৃত্যুতে 'সমাচার দর্পণ' লিখেছিলো -

'মরণ ॥ ১৮২২ সালের ৫ জুলাই তারিখে মোকাম ঢাকার বড় নবাব নসরৎ জঙ্গ বাহাদুরের উদরাময় সঞ্চার হইয়াছিল এবং ২২ জুলাই প্রাতঃকালে সাত ঘণ্টার সময়ে তিনি ঐ রোগে লোকন্তরগত হইয়াছেন। ঐ তারিখে বৈকাল বেলা তাঁহার কবর হইয়াছে তাঁহার কবর দেওনের কালে ন্যূনাতিরেক লক্ষ লোক সঙ্গে গিয়াছিল এবং কোম্পানি সম্পর্কীয় ইংলণ্ডীর সাহেব লোকেরা আপনাদের সৈন্য লইয়া গিয়াছিলেন ও আর ২ সাহেব লোকেরাও ঐ সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং ঐ নবাব সাহেবের সম্ভ্রমার্থে কোম্পানির সিপাহীরা তাঁহার কবরের নিকটে তিনবার ফা এর করিল। তাহার বয়ক্রম পূর্ণ ঊনষাটি বৎসর হইয়াছিল... ।'[৭২]

৯

নুসরাত জং ছিলেন নিঃসন্তান। সুতরাং নায়েব নাজিমের উত্তরাধিকার হলেন তাঁর ছোট ভাই শামসউদদৌলা। কিন্তু ইংরেজরা তাকে নায়েব নাজিমের পদ দিতে চায় নি বা তাদের তা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে শামসউদদৌলারও এ ব্যাপারে আগ্রহ ছিল না। পুরো বিষয়টি পরে বিস্তারিত বলছি।

নুসরাত জং ভালোবাসতেন ছোট ভাইকে। তিনি তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন নাজিম মুবারকউদ্দোলার মেয়ে বদরুননিসা বেগমের সঙ্গে। বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো। মুর্শিদাবাদের নিজামত থেকে শামসউদদৌলা একহাজার আর বদরুননিসাকে পাঁচশো টাকা ভাতা দেওয়া হতো। মনে হয়, শামসউদদৌলা বিয়ের পর মুর্শিদাবাদেই কাটাতেন। এবং এ সময়ই তিনি ইংরেজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন। এ বিষয়ে বিস্তারিত একটি বিবরণ আছে বেঙ্গল হোম মিসসেলিনিয়াস-এ। অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ পুরো দলিলটি প্রথম বারের মতো উদ্ধৃত করেছেন তাঁর গ্রন্থে। এখানে সে বিবরণ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দিচ্ছি -

১৭৯৬ ঃ ৫ মার্চ তরুণ নবাব নাসির উল মুলকের [মুর্শিদাবাদের; মুবারকউদ্দৌলার পুত্র] বিদ্রোহী মনোভাব সম্পর্কে অভিযোগ করছে সরকার। এ পরিপ্রেক্ষিতে তারা অভিযুক্ত করছে নবাবের দুষ্ট উপদেষ্টা নবাব নুসরাত জংয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শামসউদদৌলাকে। এ ধরনের বিশৃংখলা মোচনে সরকার শামসউদদৌলাকে নির্দেশ প্রদান করেন ঢাকা চলে যাওয়ার।

১৭৯৬ ঃ ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা না ফিরে শামসউদদৌলা থেকে যান মুর্শিদাবাদে এবং নিজামতের বিভিন্ন ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেন। তিনি ঢাকা না ফিরলে তাঁর ভাতা আটক ও বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়।

১৭৯৯ ঃ আগস্ট ১৬ অযোধ্যার নবাব আসফউদদৌলার পুত্র বলে দাবীদার ওয়াজির আলীর রক্তাক্ত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শামসউদদৌলা। ওয়াজির আলীর বাসা তল্লাশীর সময় একটি আর্জি পাওয়া যায় যা পারস্যের অধিপতিকে লিখেছেন শামসউদদৌলা। তিনি জামান শাহ-কে অনুরোধ জানিয়েছেন কোম্পানির অঞ্চলসমূহ আক্রমণ করতে। এবং ষড়যন্ত্র যাতে সফল হয় তার জন্যে ঠিক করে ছিলেন মাসকট থেকে কিছু আরব আনবেন এবং বাংলার জমিদারদের নিয়ে জোট বেঁধে বিদ্রোহ করবেন।

স্ট্রথার নামে চিনসুরায় বসবাসরত এক ফরাসীর সঙ্গেও শামসউদদৌলা যোগাযোগ রেখেছিলেন। সেই ব্যক্তিটি এখন পরলোকে। সুতরাং ঠিক কি উদ্দেশ্যে শামসউদদৌলা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তা জানা যায় নি।

শামসউদদৌলার চিঠিটি পারস্যে পৌছানোর জন্যে দেওয়া হয়েছিলো শেখ আলীকে। কিন্তু অর্থের অভাবে তিনি যাত্রা করতে না পেরে চাকরি নেন বেনারসে ওয়াজির আলীর অধীনে। এসব কারণেই চিঠি পাওয়া গেছে ওয়াজির আলীর বাসভবনে।

শামসউদদৌলার সঙ্গে মাসকটে যে যোগাযোগ হয়েছিলো তা থেকে জানা যায়, বেশ কিছু আরব শেখ কলকাতা বন্দরে এসেছিলেন ১৭৯৬ সালের শেষে এবং ১৭৯৭ সালে। জাহাজে তাদের সঙ্গে ছিল সশস্ত্র ব্যক্তি ও সামরিক রসদ। জাহাজের কাপ্তানের ওপর নির্দেশ ছিল শামসউদদৌলার আদেশ মান্য করার। কিন্তু তারা কোন কিছু না করে আবার ফিরে গিয়েছিলো মাসকটে :

বিহারের জমিদারদের ক্ষেপিয়ে তোলারও পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে

তাঁর অনুচররা যে কোন কারণেই হোক কার্যকর কোন ভূমিকা গ্রহণ করে নি। কিন্তু শামসউদদৌলাকে তারা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তারা কাজ করছেন। তবে, সরকার এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে নবাব [মুর্শিদাবাদের] শামসউদদৌলার এ সমস্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

যা হোক, সব মিলিয়ে শামসউদদৌলা ভালোভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে এবং তাঁর প্রধান সহচর মির্জা জ্ঞান তপিসকে গ্রেফতার করে বিশেষ আদালতের সামনে হাজির করা হয়।

১৮০২, ফেব্রুয়ারি ২৭ - আইন অনুসারে নবাব শামসউদদৌলা ও মির্জা জ্ঞান তপিসকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। [শামসউদদৌলাকে অন্তরীণ রাখা হয় কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে]।

১৮০৬, সেপ্টেম্বর ৬ — নবাব নুসরাত জং সরকারকে বারবার অনুরোধে জানিয়েছেন তাঁর ভ্রাতাকে মুক্তি দিতে। নুসরাত জংয়ের শ্রদ্ধেয় চরিত্র, এবং তাঁকে অনুগ্রহ করার সরকারের ইচ্ছা, শামসউদ্দৌলার অনুশোচনায় সরকারের বিশ্বাস - সব মিলিয়ে সরকার শামসউদদৌলাকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শর্ত ছিল

প্রথম : নুসরাত জং জামিন হবেন তাঁর ভাইয়ের।

দ্বিতীয় : শামসউদদৌলা ঢাকায় বসবাস করবেন এবং অনুমতি ছাড়া স্থান ত্যাগ করবেন না।

তৃতীয় : তাঁর ভাতা এক হাজার থেকে কমিয়ে করা হলো সাড়ে সাতশো এবং তা দেওয়া হবে ঢাকা থেকে।

চতুর্থ : তাঁর যোগাযোগ সীমিত থাকবে তাঁর পরিবারের মধ্যে।

পঞ্চম : কোন জায়গায় তাঁর পক্ষে তিনি কোন দূত বা উকিল নিযুক্ত করতে পারবেন না। যে কোন আবেদন তিনি করতে চান না কেন তা করতে হবে ঢাকা বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

কর্তৃপক্ষ প্রথমে চেয়েছিলেন শামসউদদৌলাকে গ্রেফতারকৃত অবস্থায়ই ঢাকায় এনে মুক্তি দেবেন। নুসরাত জংয়ের অনুরোধে ঠিক হয় কলকাতাতেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। সে অনুসারে নুসরাত জং কিছু সশস্ত্র অনুচর প্রেরণ করেন কলকাতায় শামসউদদৌলাকে নিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এতে অসন্তুষ্ট হন। নুসরাত জংয়ের সশস্ত্র প্রতিনিধিদের ফেরত পাঠানো হয় এবং আটকে রাখা হয় শামসউদদৌলাকে। তারপর একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে শামসউদদৌলার ঢাকা ফিরে আসার বন্দোবস্ত করা হয়। সে থেকে শামসউদদৌলা সঠিক আচরণ করছেন। সরকার তাঁর পুরনো ভাতা এক হাজার টাকা আবার ফিরিয়ে দেন।[৭৩]

ইংরেজ নথিপত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে শামসউদদৌলা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা ভেবেছিলেন এবং এক ধরনের প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। কিন্তু সাংগঠনিক

কারণে তা ব্যর্থ হয়েছিলো। এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা গণঅসন্তোষও যে দেখা দিয়েছিলো তা ইংরেজ নথিতেই স্বীকার করা হয়েছে —

'...The apprehension of Shums ul Dowla and his adherents' added to the uncertainity of the extent of conspiracy, gave rise to support of general disaffection and occasioned no inconsiderable alarm throughout the country'.[৭৪]

ঢাকায় ফিরে, শামসউদদৌলা শান্ত নাগরিকের মতো দিন কাটিয়েছেন। এরি মধ্যে মারা গেলেন নুসরাত জং। নিয়াবতের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। প্রশ্নগুলি ছিল—

প্রথম : ঢাকার নায়েব নাজিম পদটি কি থাকবে এবং তা স্বীকৃতি দেওয়া হবে?
দ্বিতীয় : ঢাকার পরিবারের কাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে প্রধান হিসেবে?
তৃতীয় : তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কত ভাতা দেওয়া হবে?
চতুর্থ : ঢাকা নিজামত পেনসন বা টংকাদার জংয়ের সনদের কথা রোজিনাহ্ এর বিষয়গুলি কি হবে?
পঞ্চম : নওয়ারা মহলের কি হবে?

তারপর সরকার নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়েছেন। মূল কথা হলো, ঢাকার নিজামতের কোন দরকার নেই। নুসরাত জংয়ের সনদের কথা উল্লেখ করে বলা হলো—

'Most, if not all., of the said functions must have been nominal and quite inapplicable to the state of things existing even in 1785, but in present day it would be farcical to talk of an office having such duties annexed,'[৭৫]

এ ছাড়া নবাব শামসউদদৌলা নুসরাত জংয়ের মতো নায়েব নাজিম পদটি চান নি। তিনি শুধু পরিবারের কর্তা হিসেবে স্বীকৃতি ও পেনসন চেয়েছিলেন। সরকার সব ভেবে চিন্তে ১৮২২ সালে নায়েব নাজিমের পদ অবলুপ্ত করে আমীরুল মূলক নওয়াব শামসউদদৌলা সৈয়দ আহমদ আলী খান বাহাদুর জুলফিকার জংকে ঢাকার নবাব পরিবারের কর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। নতুন নওয়াবের ভাতা মঞ্জুর করা হয় সাড়ে চার হাজার টাকা যা দেওয়া হবে ঢাক তোষাখানা থেকে। এ ছাড়া মুর্শিদাবাদের নিজামত থেকে ভাতা পাবেন এক হাজার ও তাঁর স্ত্রী পাঁচশো টাকা। নায়েব নাজিমের পদ বিলুপ্ত হলেও, পূর্বতন নায়েব নাজিমকে যেভাবে সম্বোধন করা হতো, তাঁকেও সেভাবে সম্বোধন করা হবে।[৭৬] নবাবের অন্যান্য জমি-জমা জায়গীরও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

তায়েশ লিখেছেন, 'নিজের ব্যর্থতা ও ভাতা সংকোচনের দরুন [তিনি] সব সময় চিন্তিত ও মনক্ষুণ্ন থাকতেন; লোকজনের সঙ্গে খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ করতেন না। সরকার থেকে তিনি ভাতা পেতেন তার সবটুকুই তিনি দিয়ে দিতেন তাঁর সরকারের

'দারোগা নুন্‌কু মিঞা বা মীর্জা মোহাম্মদ আলীর হাতে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন নুন্‌কু মিঞা।' এবং ঐ সামান্য টাকা দিয়েই 'সরকারের সব ব্যয় সুচারুভাবে সম্পন্ন করতেন এবং অধীনস্থ লোকদের বেতন দিয়ে দিতেন।'[৭৭]

শামসউদদৌলা যখন পরিবারের কর্তা তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো বিশপ হেবারের। এবং হেবার নবাবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ রেখে গেছেন।

হেবার লিখেছেন, একদিন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এমন সময় হঠাৎ দেখলেন, নবাবের গাড়ি তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে গেলো, পুরানো একটি ল্যাণ্ডো, চারটি ঘোড়া তা টানছে। কয়েকজন রক্ষীও যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে, পরনে তাদের লাল পোষাক, মাথায় উঁচু টুপী যা দেখতে অত্যন্ত বাজে। আফসোস করে লিখেছেন হেবার— প্রাচ্যদেশীয় কোন যুবরাজ যখন মাটিতে লোটানো পোষাক পরেন, মাথায় দেন পাগড়ী তখন তাকে খুবই সুন্দর দেখায়। কিন্তু যখন কোন যুবরাজ ওরকম জীর্ণ পোষাক পরেন এবং এরকম ভাবে চলাফেরা করেন তখন খুব দুঃখ লাগে।

জুলাই পাঁচ তারিখে [১৮২৪] নওয়াব শামসউদদৌলার ইংরেজ সচিব মিঃ লি দেখা করলেন হেবারের সঙ্গে, অভিনন্দন জানালেন তাঁর ঢাকা আগমনকে। নবাব কবে হেবারের সঙ্গে দেখা করতে পারেন সে তারিখও ঠিক করে নিলেন। ঢাকার কালেক্টর মাস্টার জানালেন হেবারকে যে, শামসউদদৌলার আছে সজীব ও কৌতূহলী মন এবং ঠিক মতো পরিচালিত হলে নিজেকে তিনি চিহ্নিত করতে পারতেন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে। কলকাতায় বন্দী থাকার সময় নবাব ইংরাজি শিখেছেন এবং নিজেকে শেক্সপীয়রের একজন সমালোচক হিসেবে ভাবেন। কিন্তু এখন তিনি বৃদ্ধ, অশক্ত; অর্থ যোগাতে পারলে বাঈজীর নাচ দেখেন, আফিমেও আসক্ত। এ বয়সে ধর্মকর্ম নিয়ে অনেকে মাথা ঘামালেও শামসউদদৌলার সে বিষয়ে কোন উৎসাহ নেই।

জুলাই ছয় তারিখ সকালে কথামতো, নবাব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এলেন হেবারের সঙ্গে। নবাব বয়স্ক এবং সুদর্শন! গায়ের রং ফরসা, দেখে মনে হয় বিজয়ী মুসলমানদের উত্তরের রক্ত এ বংশধররা যত্নের সঙ্গে রক্ষা করছেন। বিশেষ করে তাঁর হাত প্রায় ইউরোপীয়দের মতো শাদা। বেশ কিছুক্ষণ তিনি ছিলেন হেবারের সাথে এবং পুরো সময়টা বসে বসে হুঁকো টেনেছেন এবং প্রায় অনর্গল ভাবে ইংরেজিতে কথা বলেছেন, মাঝে মাঝে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ইংরেজি ইতিহাস বই থেকে। মনে হলো, স্পেনে যে যুদ্ধ হয়ে গেলো সে সম্পর্কেও তিনি বেশ খবরাখবর রাখেন। নবাবের ছেলের বয়স তিরিশ, রং কালো এবং মনে হলো পড়াশোনা তেমন করেন নি। ইংরেজিতে তিনি কথাবার্তা বলতে পারেন না। নবাব হেবারকে জানালেন যে, তার অনুচররা ঢাকা থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি সুন্দর বন্য হাতী ধরার চেষ্টায় আছে। বন্য হাতী সাধারণত এতো কাছে আসে না। হেবারকে তিনি ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়ার সময় বললেন যাতে হাতীতে চড়ে যান এবং সতর্ক থাকেন, কারণ মাঝে মাঝে সেখানে দেখা দেয় বাঘ আর সাপতো অজস্র। ঢাকায় হেবারের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জানতে চাইলেন তিনি; বিশেষ ভাবে বললেন ঢাকার গ্রীক

পুরোহিতের কথা। নবাবের মতো গ্রীক পুরোহিত পড়াশোনা জানা চমৎকার লোক এবং হেবারের সঙ্গে তিনি তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে চান। হেবার ঢাকার পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন যে, তা খুব পুরনো নয় এবং শহরটি সেদিন মাত্র মুসলমানরা স্থাপন করেছে। নবাবের পরনে ছিল শাদা সাধারণ মসলিনের কাপড়, পাগড়ীর সাথে সোনার একটি টাসেল বাঁধা। তাঁর ছেলের পাগড়ীর রং লালচে বেগুনী, তাতে জরীর কাজ করা এবং কিছু দামী পাথরও বসানো আছে তাতে। দু'জনের আঙ্গুলেই দামী হীরের আংটি। নবাবকে সব সময় হেবার 'হিজ হাইনেস' হলে সম্বোধন করলেন কারণ মিঃ মাস্টার তাঁকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন ঐ ভাবে সম্বোধন না করলে নবাব অসন্তুষ্ট হবেন। সবশেষে পান ও গোলাপের আতর দিয়ে অতিথিদের সম্মান জানালেন হেবার। নবাব তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হোয়াট হ্যাজ ইয়োর লর্ডশিপ লানর্ড আওয়ার কাস্টমস?' তারপর তাঁরা উঠে দাড়ালেন, মিঃ মাস্টার সম্মান করে হাত ধরে নবাবকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে সাহায্য করলেন। সিঁড়ির দু'পাশে দাঁড়িয়ে রূপোর লাঠি হাতে অনুচররা এবং গাড়ির চারপাশে ঘোড়সওয়ার। গাড়িটি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, কারণ প্যানেলে আগের মালিকের চিহ্ন খোদাই করা। কোম্পানির সিপাহীরা 'প্রেজেণ্ট আর্মস' করে তাঁকে সম্মান জানালো আর নবাবের অনুচাররা নবাব ও নবাবের বংশের প্রসংশা করে নান শ্লোগান দিতে লাগলো।

আট তারিখ বিকেলে মিঃ মাস্টারের সঙ্গে হেবার হেলেন নবাবের সঙ্গে নিমতলি কুঠিতে দেখা করতে যায় বর্ণনা আগে দিয়েছি। হেবারের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, নবাব, তাঁর পুত্র, ইংরেজ সচিব ও সেই গ্রীক পুরোহিত। বেশ খানিকক্ষণ তাঁদের আলাপ আলোচনা হলো।

বিশে জুলাই নবাবের কাজ থেকে বিদায় নিতে গেলেন হেবার। এ কয়দিন নবাব হেবারের জন্যে পাঠিয়েছেন নানারকম খাবার ও ফলমূল। নবাবেরর বদান্যতার বিনিময়ে হেবার নবাবকে উপহার দিলেন একটি হিন্দুস্তানী প্রার্থনা বই। বিদায় নেওয়ার আগে নবাব বললেন হেবারকে, 'আমি আপনাকে দামী কোন উপহার দেবো না। আমি দেবো এখানকার তুচ্ছ জিনিস যা হয়ত ইউরোপে হবে কৌতূহলের বস্তু। এই মসলিনটুকু আমি উপহার দিচ্ছি আপনার স্ত্রীকে।' এ ছাড়াও নবাব নিজের চমৎকার হাতীর দাঁতের খোদাই করা ওয়াকিং ষ্টিকটি দিলেন হেবারকে।[৭৮]

তাইফুরের মতে, নবাবের ন্যাণ্ডোটি যেটিকে হেবার বলেছেন, 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' ছিল ঢাকার প্রথম [হয়ত] চারচাকা বিশিষ্ট বাহন। ১৭৯০ সালে ঢাকার কালেকটর ডগলাস উল্লেখ করেছিলেন, ঐ সময় ঢাকায় আগত এক সৈনিক কয়েকদিন একটি ছ্যাকড়া গাড়ি চালিয়ে ছিলেন। ঢাকা ত্যাগের সময় তিনি তা আবার নিয়ে গেছিলেন। খুব সম্ভব ল্যাণ্ডোটি নবাব কিনেছিলেন কলকাতায়।[৭৯]

১৮৩১ সালের নভেম্বরে শামসউদদৌলা পরলোক গমন করেন। তাঁর কবর দেয়া হয় হুসেনী দালানে।

নুসরাত জংয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেলো ঢাকার নায়েব নাজিম পদ। শামসউদদৌলা পেলেন পরিবারের প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি এবং সে কারণে ভাতা। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৩১ সালে পরিবারের প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি পান তাঁর পুত্র কমরউদদৌলা শামস উল মূলক সৈয়দ জামাল উদ্দীন খান বাহাদুর মনসুর জঙ্গ বা কমরউদদৌলা। তিনি প্রথমে বিয়ে করেছিলেন নুসরাত জংয়ের মেয়ে কুদসিয়া বেগমকে। তাঁর দারোগা নিযুক্ত হন আস্তাবলের প্রাক্তণ কর্মকর্তা মীর জীবন। কমরউদদৌলা মীর জীবনের মেয়ে হায়াৎ নিসা বেগম [তায়েশের মতে, হোসাইনী বেগম] কেও বিয়ে করেন। শ্বশুর মীর জীবন এমন সব ব্যবস্থা করতে লাগলেন যাতে কমরউদদৌলা সমস্ত অর্থ উড়িয়ে দিতে পারেন। দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন কমরউদদৌলা। ব্যস্ত থাকতেন বাঈজী ও আনুষঙ্গিক আমোদ ফুর্তিতে। ফলে মহাজন থেকে ঋণ নেওয়াও শুরু করলেন। ১৮৩৪ সালে প্রথমে কুদসিয়া বেগম এবং তারপর কমরউদদৌলাও পরলোকগমন করেন।[৮০]

হায়াৎ উন নিসার গর্ভে কমরউদদৌলার এক পুত্র ছিল গাজীউদ্দিন মাহমুদ। তরুণ এই নাজিমউদদৌলা কমর উল মুলক নওয়াব সৈয়দ গাজীউদ্দিন খান বাহাদুর জঙ্গ স্বীকৃত হলেন পরিবারের প্রধান হিসেবে। তাঁর ভাতা ধার্য করা হয় মাসিক সাড়ে চার হাজার সিক্কা টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর পিতাকে যখন পরিবারের প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তখনই ঠিক করা হয়, পরিবার প্রতিপালনের জন্যে তাঁকে সাড়ে চার হাজার টাকা দেওয়া হবে। আরো বলা হয়েছিলো, তাঁর পিতা ও নবাবের পত্নীকে মুর্শিদাবাদ কোষাগার থেকে এক হাজার ও পাঁচশো টাকা দেয়াও বিবেচনা করা হবে। কিন্তু পরে শেষোক্ত ভাতা আর সরকার দেন নি।[৮১] ফলে, গাজীউদ্দিন মাহমুদকে সাড়ে চার হাজারেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

নতুন নবাবের দারোগা ছিলেন তাঁর নানা মীর জীবন। তাঁর প্ররোচনায় নবাব লেখাপড়া ছেড়ে দেন এবং তাঁর শিক্ষক মীর গোলাম আলী যাকে নবাব সমীহ করতেন তাঁকেও বরখাস্ত করা হয়।

এরপর নবাব তাঁর নানার পরামর্শে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন শুরু করেন। এমন কোন নেশা ছিল না যাতে তাঁর আসক্তি ছিল না। বিশেষভাবে আসক্ত ছিলেন রমণীদের প্রতি। এবং তাঁর হারেমে নিত্যনিয়ত নতুন রমণী আমদানী ও পুরনোদের খারিজ করে দেওয়া হতো। এ ছাড়া তিনি ভালোবাসতেন ঘুড়ি ওড়াতে, মোষ এবং মোরগের লড়াই দেখতে, বুলবুলি, কুকুর ও বিড়ালের বিয়ে দিতে এবং ইউরোপীয় মহিলাদের মতো পোষাক পরতে। এ কারণে ঢাকাবাসীরা তাঁকে ডাকতেন পাগলা নওয়াব বলে। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জনে সরকারী ভাতায় তাঁর কুলোতো না। ফলে তিনি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিতে লাগলেন মহাজনদে কাছে। এই সময় 'ইতর লোকেরা সচ্ছল হয়ে ওঠে এবং সরকারের অধীনস্থ কর্মচারীদের অবস্থা অত্যন্ত বিড়ম্বনাপূর্ণ ও করুণ হয়ে পড়ে।'[৮২]

গাজীউদ্দিনের দাদী এই খবর পেয়ে ঢাকা আসেন এবং তাঁর নাতিকে শোধরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সরকারকে লেখেন যাতে নবাবকে শোধরাবার জন্য কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করেন। মৌলবী আবদুল আলীম নামে তাঁর এক বিশ্বস্ত লোককে তিনি দারোগা নিযুক্ত করেন। কোম্পানীও 'in consequence of the Nawabs embarrassed condition incapacity to conduct his affairs' এর কারণে এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন।[৮৩] কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই নবাব তাঁকে বরখাস্ত করেন। এরপর সরকারও হাল ছেড়ে দেন।

গাজীউদ্দিনের মৃত্যুর বছর তিনেক আগে 'বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স'-এর কর্নেল ডেভিডসন ঢাকা ভ্রমণে এসেছিলেন। ঢাকায় এসে তাঁর ইচ্ছে ছিল নবাবের সঙ্গে দেখা করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা। কিন্তু, তাঁর ভাষায় -- 'আমাকে একজন ভারী বুদ্ধিমান লোক জানালেন, নবাব এখন খুবই দরিদ্র, দেখা করে কোন লাভ নেই। তিনি একজন অশিক্ষিত তরুণ : তবে তাঁর বয়সী ও বংশের তরুণদের থেকে খারাপ নয় -- ইংরেজি তিনি একদম জানেন না। তিনি এতো উচ্ছৃঙ্খল এবং চিন্তাহীন যে, তাঁর আয় এখন পাঁচ হাজার থেকে দুশোতে দাঁড়িয়েছে, যার অর্থ বছরে ছয় হাজার পাউণ্ড থেকে দুশো চল্লিশ পাউণ্ড। কারণ তাঁর আয় তিনি বন্ধক রেখেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা যে বাড়িতে বসবাস করতেন, তিনিও সেখানে বসবাস করেন তবে খুব খারাপ ভাবে। মাঝে মাঝে দেখা যায় পুরনো ধরনের শিরস্ত্রান পরে, কয়েকজন ঘোড়সওয়ার সহ ঘোড়ায় চড়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন... ।'[৮৪]

১৮৪৩ সালে অত্যধিক ব্যভিচারের কারণে খুব অল্প বয়সেই নবাব গাজীউদ্দিন পরলোক গমন করেন। তাঁকে সমাহিত করা হয় তাঁর পিতার মতো হুসেনী দালানে এবং তখন ইংরেজ সৈন্যরা তোপ দেখে সম্মান দেখিয়েছিলো তাঁকে।

গাজীউদ্দিন ছিলেন নিঃসন্তান। এ অবস্থায় তাঁর মা হায়াৎ উন নিসা জানান যে, গাজীউদ্দিনের এক স্ত্রী আমীর উন নেসা বেগম চারমাসের অন্তঃস্বত্ত্বা। ঢাকার রেভিনিউ কমিশনার নিজে গিয়ে নবাব বাড়িতে তদন্ত করে এসে রিপোর্ট দিলেন যে, এর কোন সত্যতা নেই, কারণ নবাব প্রায়ই রমণী বদলাতেন, বিয়ের কোন প্রশ্নই আসে না সেখানে। শুধু তাই নয়, আমীর উন নেসা নবাবের হারেমে পর্যন্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন হায়াৎ উন নেসার একজন দাসী মাত্র।

সুতরাং ১৮৪৩ সালেই ঢাকার নবাব পরিবার লোপ পেলো। সরকার নবাবের ওপর নির্ভরশীল ও নবাব বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু ভাতার বন্দোবস্ত করলেন --

নবাবের ওপর নির্ভরশীলদের জন্য	৮৫৯-১০-৬
তিন টাকা হারে নবাব বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে ছয়জন রক্ষীর মাসিক বেতন	১৮-০-০
নবাবের কবর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	১৬-৮-০
পেনসন ইত্যাদি তত্ত্বাবধানের জন্য	৩০-০-০
	৯২৪-২-৬[৮৫]

নায়েব নাজিম পরিবারের ইতিহাসের এখানেই ইতি।

দিওয়ানী লাভের পরই কোম্পানী ঢাকার নায়েব নাজিমের পদটি বিলুপ্ত করে দিতে পারতো। কিন্তু, ক্রান্তিকালীন সময় এবং ক্ষমতা সংহত করার পূর্ব পর্যন্ত তারা পদটি অক্ষুণ্ন রেখেছিলো যদিও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল কোম্পানীর হাতে। নায়েব নাজিমকে সামনে রেখে তারা চেয়েছিলো তাদের কাজ করতে। তারপর নায়েব নাজিম পদ লুপ্ত হলো এবং তখনও এই নবাব পরিবারকে সরকারী স্বীকৃতি না দিলেও চলতো। কিন্তু, তাতে হয়ত পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের গর্বে আঘাত লাগতো। হয়ত এ কারণেই কোম্পানী অক্ষুণ্ন রেখেছিলো নবাবদের ভাতা এবং সরকারী ভাবে তাঁদের প্রতি প্রদর্শন করেছে যথাযথ সম্মান।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন, ঢাকার সমাজে নায়েব নাজিম পরিবারের স্থান কখনও উচ্চে ছিল না। কারণ, ইংরেজদের সঙ্গে তাদের অধস্তন সম্পর্ক এবং তাদের দারিদ্র্য। এ প্রসঙ্গে নওয়াব নুসরাত জংয়ের সময়ের ঢাকার কালেক্টরের একটি চিঠির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। কালেক্টর জানিয়েছিলেন নুসরাত জং জানিয়েছেন, তাঁর বাই শামসউদদৌলা ভৃত্যদের বেতন দিতে পারছেন না এবং নুসরাত জংয়ের কাছেও তেমন টাকা নেই যা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন ভাইকে।[৮৬]

এটা স্বাভাবিক যে, ঢাকার ক্ষয়িষ্ণু আদি মুঘল আমলের পরিবারগুলি সম্মানিত ছিল, যদিও তারা ছিল না তেমন সম্পদশালী। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল সামান্য। সাধারণ ঢাকাবাসী বা পূর্ববঙ্গবাসীদের কাছে নায়েব নাজিম পরিবার সম্মানিত ছিল না তেমন, একথা বোধহয় ঠিক নয়। কারণ জেসারত খান, কোম্পানী আমলের আগে ঢাকার ফৌজদার ছিলেন এবং সে হিসেবে তার ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি কম ছিল না। সেই জেসারত খান নায়েব নাজিম পদে যে ভাবেই অভিষিক্ত হন না কেন সাধারণের চোখে তিনি ক্ষমতা বান। ঢাকার শিয়া সম্প্রদায়ের মুরুব্বী ছিলেন এ পরিবার। এবং ঢাকার পুরনো অধিকাংশ পরিবার ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। হুসেনী দালানের ব্যয় নির্বাহ ও আলোকসজ্জার জন্য সরকার তাদের আড়াই হাজার সিক্কা টাকা দিতেন।[৮৬ক] ঈদ ও মুহররমের মিছিলে নেতৃত্ব দিতেন তাঁরাই। এবং এ মিছিল শুরু হতো নিমতলী কুঠি বা প্রাসাদ থেকেই।

নবাব গাজীউদ্দিনের মৃত্যুর পর পাওনা আদায়ের জন্য তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি নীলামে তোলা হয়। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত নওয়াবদের হাওদাটি কিনে নেন ঢাকার বসাক পরিবার। পরবর্তীকালে জন্মাষ্টমীর মিছিলের সময় হাতির হাওদা হিসাবে ব্যবহৃত হতো এটি। নবাবের পারিবারিক অলংকারসমূহ কিনে নেন ঢাকার ধনাঢ্য পরিবাররা। বলা হয়ে থাকে, 'দরিয়া ই নূর' নামক বিখ্যাত হীরক খণ্ডটি কিনেছিলেন ঢাকার দ্বিতীয় নবাব পরিবার বা 'কাগুজে নবাব' পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা খাজা আলিমুল্লাহ।[৮৭]

নবাব গাজিউদ্দিনের মৃত্যুর কিছুদিন পর কোম্পানী নিমতলী কুঠির ভার তুলে নিয়েছিলো নিজেদের হাতে। আওলাদ হাসান লিখেছেন, কোম্পানি এরপর নিমতলীর

অট্টালিকাসমূহে তোলে নিলামে। অধিকাংশ ক্রেতাই ভেঙ্গে ফেলে দালানগুলি। বাকী ছিল 'বরদারী' [যেখানে স্থাপিত হয়েছিলো ঢাকা জাদুঘর]। এই অংশটি কিনেছিলেন জনৈক মৌলভী মঈনুদ্দিন। তিনি করতেন পনিরের ব্যবসা তাই ঢাকা বাসীর কাছে পরিচিত ছিলেন তিনি মৌলভী পনির নামে। মৌলভী পনির তাঁর অংশ বিক্রি করে দিলেনন গোপীকৃষ্ণ সেনের কাছে. তিনি আবার তা বিক্রি করে দেন জনৈক ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের কাছে, তিনি আবার বিক্রি করে দেন রূপলাল দাসের কাছে এবং তারপর সরকারই আবার খাস করে নিলেন নিমতলী।[৮৮]

উনিশ শতকের শেষের দিকে ঢাকার ব্রাহ্মরা এখানে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের আবাসিক পল্লী - 'বিধান পল্লী।' অনেক দিন তা টিকে ছিলো এখানে। বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ লিখেছেন এ সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীতে—

'১৮০৯ শতকের আষাঢ় মাসে নিমতলীর নূতন বিধান পল্লী স্থাপনের উদ্যোগ হয়। আর্মানী টোলায় মাত্র শ্রী যুক্ত গোপীবাবু, দুর্গাদাস বাবু, বঙ্গবাবু ও কৈলাশ বাবুর গৃহ ছিল। আর কাহারও বাড়ি হয় নাই। গোপীবাবু তাহার বাড়ি বিক্রি করিলেন। তৎসঙ্গে উপাচার্য্য [বঙ্গ চন্দ্র রায়] মহাশয়ের বাড়ি গৃহ বিক্রি করা হইল। তখন প্রচারক পরিবার বৃদ্ধি পাইয়াছে, সকলেরই গৃহের প্রয়োজন। ৭০০০ টাকা দিয়া পুরাতন নবাব বাড়ি গোপীবাবুর নামে ক্রীত হয়। এবং সবাইকে প্লট ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।'[৮৯]

আজ ঢাকার সেই নবাবদের স্মৃতি ধরে আছে নিমতলী প্রাসাদের সেই পশ্চিম দিকের ফটফটি যার প্রশংসা করেছিলেন বিশপ হেবার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে অবস্থিত, বিদ্বৎসভা এশিয়াটিকে সোসাইটির অধিকারকৃত ফটকটি রক্ষার ব্যাপারে এ দুই বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগেরও কোন আগ্রহ নেই। এভাবে আঠারো শতকের একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন এক সময় বিলীন হয়ে যাবে।

তথ্যপঞ্জী

১. Syed Muhammed Taifoor, *Glimpses of old Dhaka*, Dhaka, 1984,p. 174.

২. গোলাপ হোসেন সলীম, *বাংলার ইতিহাস*, [রিয়াজ উস সালাতিনের অনুবাদ; অনুবাদক : আকবর উদ্দিন] ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ: ১৯১।

৩. Syed Muhammed Taifoor, *op cit*, p. 175.

৪. গোলাপ হোসেন সলীম, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ১৯১।

৫. *ঐ*, [টীকা], পৃ: ৫১৫।

৬. Syed Muhammed Taifoor, *op cit*, pp. 178-179.

৭. গোলাম হোসেন সলীম, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ১৯৩।

৮. *ঐ*, পৃ : ১৯৪।

৯. *ঐ*, পৃ: ১৯৫।

১০. Abdul Karin, Dacca : *The Mughal Capital, Dacca,* 1964, pp 17-18.

১১. জেমস্ টেলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা* ['টপোগ্রাফি অফ ঢাকা'র অনুবাদ; অনুবাদক : মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান], ঢাকা, ১৯.৭৮; উদ্ধৃত হয়েছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিষয়াদির উপর পঞ্চম রিপোর্টের পরিশিষ্ট থেকে। পৃ: ৫৫।

১২. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ: ২৮-২৯।

১৩. Abdul Karim, *op cit*, pp. 18-25.

১৪. Syed Muhammed Taifoor, *op cit*, pp. 185, 190.

১৫. জেমস্ টেলর, *পূর্বোক্ত*, পৃ :৫৬।

১৬. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা*, [আ. মঁ. ম. শরফুদ্দীন অনূদিত], ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ: ৭৫-৭৬ এবং জেমস টেলর, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৫৬।

১৭. জেমস্ টেলর, *ঐ*।

১৮. Abdul Karim, op cit. 22-24.

১৯. মৃণাল চক্রবর্তী, *সিরাজউদদৌলা*, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ: ৮২-৮৩।

২০. Syed Muhammed Taifoor, *op cit*, p. 211.এবং জেমস্ টেলর, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৭।

২১. মৃণাল চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৫৭-৫৮।

২২. ঐ।

২৩. Abdul Karim, *op cit*. pp. 24-25.

২৪. জেমস্ টেলর, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৫৭-৫৮।

২৫. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত* পৃ: ১৮, ৩৩।

২৬. S C. Banerjee, *'Naib-Nazims of Dacca'* Bengal Past and Present, Vol LIX, 1940, p, 18.

২৭. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ১৬৮।

২৮. Sirajul Islam, *'Social Life of Dhaka city* : 1763-1800'; অপ্রকাশিত প্রবন্ধ।

২৮ক. Muhammed Taifoor, *op cit*. p. 228.

২৯. Charles D' Oyly, *Anitiquities of Dacca*, London, 1830, pp. 16-18.

৩০. S. C. Banerjee, *op cit*, p.18.

৩১. Charles D' Oyly, *op cit*, pp. 16-18.

৩২. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ১২০।

৩৩. আসাদুল হকের অপ্রকাশিত *এম, এ, থিসিস*।

৩৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন, ব্রাডলি বার্ট, *প্রাচ্যের রহস্য নগরী*, [রহীম উদ্দিন সিদ্দিকী অনূদিত] ঢাকা।

৩৫. Abdul Karim, *op cit*, p.41.

৩৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে Mazharul Huq, *The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal*, 1648-1784, Dacca, 1864.

৩৭. S. C. Banerjee, *op cit*, p. 17.

৩৮. Sirajul Islam, *District Records-Dacca*, Dacca, 1985, p. 227.

৩৯. J. Melvill, Magistrate, City of Dacca, 9 and 21 Dec. 1801 to Marquis Wellesly, *Papers relating to East India Affairs*.

৪০. Ahmad Hasan Dani, *Dacca*, Dacca, 1956, p. 55.

৪১. Salahuddin Ahmed, 'Policing in Dacca', Azimusshan Haider (ed). *A City and its Civic Body. Dacca*, Dacca, 1966, pp. 83-85.

৪২. Ahmad Hasan Dani, *op cit*, p. 53.

৪৩. Revenue Dept. proceedings 16. 6. 1778. No. 2, quoted in S. C Bannerji, *op cit*, p. 18.

৪৪. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৯১।

৪৫. Sirajul Islam, *op cit*, p. 87.

৪৬. Sayid Aulad Hasan, *Notes on the Antiquities of Dacca*, Dacca, 1912, p. 17; Syed Muhammad Taifoor, op cit, p. 233.

৪৭. Reginald Heber, *Marrative of a Journey through the Upper Procinces of India*, London, 1828, p, 148-49.

৪৮. Charles D' Oyly, *op cit*, p. 18.

৪৯. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৯২-৯৩।

৫০. সিরাজুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত* প্রবন্ধ।

৫১. Syed Muhammed Taifoor, *op, cit* p. 234.

৫২. Revenue Dept. Proceedings. 16. 6. 1778, No. 2, quoted in S. C Bannerji *op, cit*, p. 19. —

As I am now it very advanced age, I am desirous of relinquishing all worldly concerns and the devoting the remainder of my days to the service of God in the performance of religious duties; but as this cannot be effected without a composed and settled mind, to your favour I look to place me in such a situation that I may with peace of mind devote my self to God. I, Therefore, now make my last request— It is that my eldest son Sayid Mohomed Khan, who has been brought up and educated as a child of the Company and English chiefs and earnestly desirous of being employed on their service, which by the blessing of God he will execute much better than I can having last year given proof of it in his last years skilful management of the Nizamat Business as my Naib, may be appointed to succeed me in the Nizamat of Jeehangirnagore with the same stipend and Kissala which I enjoy that a sunud and khelat may be granted to him by the Council for this office.'

৫৩. *Ibid*, No, 3.

৫৪. Territorial Dept. Proceedings, 12. 9. 1822. No, 7. *Ibid*, p. 20.

৫৫. Sirajul Islam, *op cit*, p. 156.

৫৬. F. D. Ascoli, *Final Report for the Survey and Settlement Operations in the District of Dacca,* 1910-17, Calcutta 1917.

৫৭. Hamilton, *East India Gazetteer*, London, 1820.

৫৮. S. U. Ahmad, *Dacca*, London, 1886.

৫৯. Reginald Heber, *op cit*, p. 145.

৬০. জেমস্ টেলর, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ১৪৩।

৬১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, S. U. Ahmad, Dacca, London, p. 198 এবং মুনতাসীর মামুন, *'সেকালের ঢাকা,'* সুন্দরম, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৩৯।

৬২. Revenue Dept. Proceedings, 10, 3. 1786. No. 3. S. C. Banerjee, *op cit* pp. 21-22.

"To the Chowdries, Zeminders, Conoongoes, Rayots, Husbandmen and all the Natives and Inhabitants of Chuckla Jehangeernaggur, in the Province of Bengal, be it known.

In consideration of the claims of the late Jussarut Khan, who in former times assisted and befriended the Dependants of the Hor'ible the English Company. Then office of Naib Nazim of the aforesaid Chuckla has been granted in the room of Syed Mahummaud Khan Hushmut Jung, Deceased, to the Noble and illustrious Syed Ally Khan Bahadur, Nussrut Jung, Nussru-ul-Moolk, Intizam-u-Dowlah, that he may duly and Properly discharge the busines of the Nizamut of that place, and not the smallest particle of vigilance and circumspection neglected or and one. - He is to exert his utmost Endeavours for the punishment of the seditions and rebellious, for the protection of the subject and the prayer of revenue for the Decision of all complaints according to the Books of the law and for preventing the Manufacture of fire arms. He is strictly to prohibit the sale of lead, powder, and other articles of war to such as are turbulent and seditious. He is to collect the Revenue of the lands under his superintendence and pay regularly what is due to Government according to the fixed instatments. He is ot make no disbursement without a proper voucher. He is to keep the Ryotts Happy and satisfied, under his good Management, and so exert himself that lands capable of cultivation increase, more and more, he is to refrain from exacting any of the prohibited Abwabs or Taxes. He is at the stated times, as usual, to take the list, muster-roll and Register of the persons who compose his Ressala or company, and of the Boatmen and others attached to the Bheatee Nowara under his charge and conduct every part of the business as asual and when any person dies or absconds. He is to report the nomination to the vacancy to the Huzzoor,'

৬৩. *Ibid.* pp. 22-23.

৬৪. J. Melvill, Magistrate, City of Dacca, 9 and 21 December 1801 to Marquis Wellesley. *Papers Relatings to East India Affairs.*

৬৫. Charles D' Oyly, *op cit*, p. 18.

৬৬. *Papers Relating to East India Affairs.*

৬৭. Syed Muhammed Taifoor . *op cit* p. 236.

৬৮. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ১২২।

৬৯. Harinath De. (ed). Tarikh-i-Nusrat Jangi. *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal.* Vol. No. 6. Calcurtta.

৭০. Syed Muhammad Taifoor. *op cit* p. 237.

৭১. Azimusshan Haider, Dacca : *History and Romance in Place Names,* Dacca, 1967.

৭২. সমাচার দর্পণ, ৩ আগস্ট, ১৮২২, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, কলকাতা, ১৩৭৭, পৃ: ২০৬।

৭৩. A Short Account of the Conspirator Shumsud Dowla, brother law of the Nabab Nassur ul Mulk. উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পরিশিষ্ট : ৮, পৃ: ১৮৬-১৯৬।

৭৪. *ঐ*. পৃ: ১৮৮।

৭৫. Territorial Dept. Proceedings, 12. 9. 1821, No. 7. S. C. Banerjee, *op cit,* pp. 24-25.

৭৬. *Ibid*, 12-9-1822. No 8 p. 26.

৭৭. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ১২৩।

৭৮. Reginald Heber. *op cit*, pp. 134-147, 154.

৭৯. Syed Muhammad Taifoor, *op cit*. p. 240.

৮০. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ২৪০।

৮১. *Dacca Records*, Miscellaneous Letters Received from Different offices : Jun-Dec. 1831. National Archives. Dhaka.

৮২. Syed Muhammad Taifoor, op cit, pp., 241-243. এবং মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ১২৫-১২৬।

৮৩. *India . Political Dept. Bengal Miscellaneous,* Oct. 31-1840, India and Bangal Despatches [India office library].

৮৪. C. J. C. Davidson, *'Dacca in 1840'* Bengal Past and Present, vol No, 19, p. 59.

৮৫. Pol-Dept. Proceedings. 30. 10. 1843, No 12, quoted on S. C. Banerjee, op cit, p. 29.

৮৬. সিরাজুল ইসলামের *পূর্বোক্ত* প্রবন্ধ।-

৮৬ক. *Dacca Records,* January-December 1831, [National Archives. Dhaka].

৮৭. Syed Muhammad Taifoor, op cit, p. 243.

৮৮. Syed Aulad Hasan, *op cit.*

৮৯. বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, *আমার জীবন কথা,* কলকাতা, ১৯২৩।

লালবাগ দুর্গ

কোন কোন শহরের একটি প্রতীক থাকে যার উল্লেখ করলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সে শহর। যেমন, আইফেল টাওয়ার বললে প্যারিস বা বিগবেন বললে লণ্ডন। লালবাগও তেমনি একটি প্রতীক যার কথা বললে মনে পড়ে ঢাকা শহর। অন্তত এখনও। মুঘল আমল থেকে এ পর্যন্ত, যে সব পর্যটক এসেছেন দূর দূরান্ত থেকে, তারা একবার হলেও দেখতে গেছেন লালবাগ। অঞ্চল নয়, লালবাগের দুর্গ, যদিও দুর্গের মূল নাম তা' নয়। কিন্তু সে দুর্গ আজ ঐ এলাকার নামেই পরিচিত।

১৬৬৮ সালের ২৯ জুলাই, মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবে তৃতীয় পুত্র মুহাম্মদ আযম শাহ বাংলার সুবাদার হিসাবে এসে পৌঁছলেন শহর ঢাকায়। আওরঙ্গজেবের প্রিয় এই পুত্র ছিলেন দাম্ভিক, মগজহীন। ঐ সময়ে প্রচলিত এক গল্প অনুযায়ী, বাংলার সুবাদারী তিনি ভিক্ষে চেয়েছিলেন সম্রাটের কাছে এ কারণে যে, তিনি এক রাজার পুত্র এবং আরেক রাজার পুত্র [তাঁর চাচা শাহ সুজা] ছিলেন এর সুবাদার।[১] ঢাকায় ছিলেন তিনি এক বছর এবং সে এক বছরও অনুল্লেখযোগ্য। আমরাও হয়তো তাঁকে মনে রাখতাম না, যদি না তিনি জড়িয়ে পড়তেন লালবাগ দুর্গের সঙ্গে। শাহজাদা আযম সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বিবরণ আছে অহম ভাষায় লেখা বাদশাহী বুরুঞ্জীতে। এর একটি হলো তাঁর আগের সুবাদার শায়েস্তা খানের বাস ভবন ধ্বংস করা এবং তাঁকে 'আমার প্রজা' হিসেবে উল্লেখ করা।[২]

ঢাকায় থাকাকালীন যুবরাজ আযম বুড়ীগঙ্গার তীরে একটি দুর্গ নির্মাণ শুরু করলেন। নাম রাখলেন এর সম্রাট আওরঙ্গজেবের নামে— 'কিলা আওরঙ্গাবাদ'। কিন্তু কাগজপত্রেই কিছু দিন উল্লিখিত হয়েছে এই নাম। সবাই জানতো এক লালবাগ দুর্গ নামেই। লালবাগ এলাকাটিরও পত্তন হয়েছে মুঘল আমলে, খুব সম্ভব, ঢাকা রাজধানী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। নাম দেখে মনে হয়, লালবাগ অঞ্চলে ছিল বিস্তৃত ফুলের বাগান।

দুর্গ সাধারণত নির্মিত হতো আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। তবে লালবাগ দুর্গের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল খানিকটা ভিন্ন। আসলে যুবরাজ আযম চেয়েছিলেন, বুড়ীগঙ্গার তীরে একটি মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করতে এবং সে প্রাসাদ রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রাচীর বেষ্টিত একটি দুর্গ।

যুবরাজ আযম দুর্গটি নির্মাণ শুরু করলেও অচিরেই তাঁকে ঢাকা ত্যাগ করতে হয়েছিলো সম্রাটের আদেশে। তাঁর পরিবর্তে ১৬৭৯ সালে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার সুবাদার হয়ে রাজধানী ঢাকায় এলেন শায়েস্তা খান।

সম্রাট আওরঙ্গজেব 'কিলা আওরঙ্গাবাদের' স্বত্ব দান করেছিলেন শায়েস্তা খানকে। যুবরাজ আযমও তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন কেল্লার কাজটি সমাপ্ত করতে। কিন্তু শায়েস্তা খান ব্যক্তিগতভাবে এর মালিত হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতি তেমন কোন আকর্ষণ বোধ করেন নি। সুতরাং দুর্গের কাজ তিনি আর শেষ করেন নি। এর কারণ, জনশ্রুতি অনুযায়ী, তাঁর কন্যা ইরান দুখত বা বিবি পরীর মৃত্যু। বিবি পরীর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল যুবরাজ আযমের সঙ্গে। কিন্তু দুর্গ নির্মাণ কালেই তিনি পরলোকগমন করেন। শায়েস্তা খান নাকি সে জন্য ভেবেছিলেন দুর্গটি অপয়া। দুর্গের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন নি বটে শায়েস্তা খান তবে নির্মাণ করেছিলেন বিবি পরীর কবরের ওপর অপূর্ব এক স্মৃতিসৌধ।

লালবাগ যখন নির্মিত হয়েছিলো তখন বুড়িগঙ্গা বয়ে যেতো এর পাশ দিয়ে। কয়েকটি প্রবেশদ্বার ছাড়া, দুর্গের চৌহদ্দির মধ্যে ছিল শায়েস্তা খানের কন্যার কবর, একটি মসজিদ ও হামামখানা।

দুর্গটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় দু'হাজার ফুট এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় আটশো ফুট চওড়া। বুড়ীগঙ্গা বয়ে যেতো এর দক্ষিণ দিক দিয়ে। এখন নদী সরে গেছে। আর দুর্গও নদীর মাঝখানের জায়গায় গড়ে উঠেছে ঘিঞ্জি বাসাবাড়ি।

দক্ষিণ দেয়ালের পূর্ব দিক হলো লালবাগের দক্ষিণ সদর ফটক। মুঘল ফটকের সব বৈশিষ্ট্যই আছে এতে। ফটকটি জাঁকালো, দেখার মতো, ত্রি-তল এ ফটকের দক্ষিণাংশে আছে মিনার তবে, ওপরের তলাগুলি অসমাপ্ত। এ ছাড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব-উত্তর দিকেও ছিল দুর্গের ফটক। দক্ষিণ পশ্চিমের ফটকটি গ্রাস করে নিয়েছে বুড়ীগঙ্গা। দুর্গের প্রাচীর নির্মিত হয়েছিলো লাল শুরকি ও পাতলা ইট দিয়ে।

দুর্গের ভেতরে পরীবিবির স্মৃতিসৌধ বরাবর আছে দোতলা একটি ইমারত। এটি হামামখানা নামে পরিচিত। কারণ, এ ইমারতের নীচে ছিল হামামখানা। দোতলায় হয়ত থাকতেন সুবাদার এবং সেখান থেকে দর্শন দিতেন দর্শনার্থীদের। এর পাশে আছে ছোট একটি দীঘি; খুব সম্ভব হামামখানার পানির প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই কাটা হয়েছিলো এটি।

হামামখানার প্রায় পৌনে তিনশো ফুট পশ্চিমে বিবি পরীর সমাধিসৌধ। এটি নির্মাণের জন্যে শায়েস্তা খান রাজমহল থেকে এনেছিলেন ব্যাসাল্ট, চুনার থেকে বেলে পাথর, জয়পুর থেকে শাদা মার্বেল। সমাধিসৌধে ঢোকার জন্যে আছে চারটি দরোজা। তার মধ্যে তিনটি মার্বেল পাথরের ঝালরে আবৃত। দক্ষিণেরটি অলংকৃত চন্দন কাঠ দিয়ে। এ সমাধিসৌধটি ন'টি অংশে বিভক্ত। ঠিক মাঝখানেরটিতে সমাহিত পরীবিবি। এর পাশে আরো দু'টি কবরে শায়িত আছেন শায়েস্তা খানের কথিত এক

কন্যা শামসাদ বেগম ও পৌত্র খুদাবন্দ খান বা মীর্জা বাঙ্গালী। এই সৌধের চারকোণে চারটি অলংকৃত মিনার। ছাদের গম্বুজ আলাদাভাবে তৈরি করে বসানো হয়েছে। তামা দিয়ে গম্বুজটি ঢাকা। আগে এতে সোনালী রংয়ের কাজ ছিল, রোদের আলোয় যা ঝলমল করতো। বাংলাদেশে গ্লেজড টাইলস্ শাদা মার্বেল এবং কারো ব্যাসাল্টে তৈরি এই একটি নিদর্শনই বর্তমান।

পরীবিবির সমাধি সৌধের একশো সত্তর ফুট পশ্চিমে আছে ছোট একটি মসজিদ। পাঁচটি দরজা আছে মসজিদে, পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণে দুটি। এর মধ্যে আবার পূর্বের মাঝের দরজাটি বড়। ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে তিনটি মেহরাব। এখানেও মাঝের মেহরাবটি বড়।[৩]

দ্বিতীয় দফায় (১৬৭৯-৮৮) সুবাদার থাকাকালীন শায়েস্তা খান লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে হামামখানায় বসবাস করতেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ হেজেস। শায়েস্তা খানের কাছে বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার জন্যে হেজেস কিছু আর্জি পেশ করেছিলেন যার কোনটিই সুবাদার মঞ্জুর করেন নি।

আগেই উল্লেখ করেছি আওরঙ্গজেব কেল্লাটি দান করেছিলেন শায়েস্তা খানকে। শায়েস্তা খান ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এর মালিকানা লাভ করেছিলেন তাঁর উত্তরাধিকাররা। কিন্তু, শায়েস্তা খান ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর উত্তরাধিকাররা কি ভাবে ঢাকা থেকে গেলেন সে সম্পর্কে কেউ আলোকপাত করেন নি।

এ জট নিরসন করতে গেলে জনশ্রুতির ওপর খানিকটা নির্ভর করতে হবে, বাকীটা অনুমান। জনশ্রুতি অনুযায়ী, শায়েস্তা থান যখন ঢাকায় ছিলেন তখন একজন উপপত্নী ছিলেন তাঁর যার নাম ছিল বিবি চম্পা [নামটি বাঙ্গালী নাম-ই মনে হয়। মতান্তরে বিবি চম্পা ছিলেন শায়েস্তা খাঁর কন্যা] বিবি চম্পার কবরের ওপর শায়েস্তা খান একটি স্মৃতি-সৌধও নির্মাণ [ছোট কাটরার কাছে] করিয়েছিলেন। বিবি চম্পার গর্ভে জন্মেছিলেন এক পুত্র যার নাম রাখা হয়েছিলো খুদাবন্দ খাঁ বা মীর্জা বাঙ্গালী খাঁ। এই বাঙ্গালী খাঁ নামটি শুনে মনে হয়, বিবি চম্পা নামের মহিলা স্থানীয় কোন রূপবতী ছিলেন, শায়েস্তা খান ছিলেন যার প্রতি আসক্ত। এবং তাঁর পুত্রের নাম ও আত্মীয়রাই নিজেদের পরবর্তী কালে দাবী করেছেন নিজেদের শায়েস্তা খাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে। এঁদের কেউ কেউ বাস করতেন ছোট কাটরায়।

শায়েস্তা খান চলে যাওয়ার পর থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কেল্লার মালিকানা কার কাছে ছিল বা কি উদ্দেশ্যে তা ব্যবহৃত হতো সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে, অনুমান করে নিতে পারি, শায়েস্তা খানের ঢাকার ত্যাগের পর, রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হয়ত মুঘল সৈন্যরা ব্যবহার করতো এই কেল্লা এবং তারপর তা পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। আশেপাশে হয়ত দু' একটি কুঁড়ে ছিল, কেল্লার ভিতরেও হয়ত ভবঘুরে বা কুঁড়ে ঘরে থাকতেন কেউ। মসজিদটি হয়ত ব্যবহৃত হত মাঝে মাঝে। এ ধরনের পরিবেশের একটি বিবরণ পাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সময় লালবাগের প্রাচীর, ভেতরের ইমারতসমূহ জীর্ণ হয়ে

ভেঙ্গে পড়ছিলো, হামামের পাশে পুকুরটি হয়ে উঠেছিলো দুর্গন্ধময়। আশেপাশের এলাকা গ্রাস করছিলো জঙ্গল যেখানে অসুস্থতা ও মৃত্যুহার ছিল অত্যন্ত বেশী।[৪]

১৮৪২ সালে, ঢাকা শহর উন্নয়নের জন্য গঠিত 'ঢাকা কমিটি' [পৌর সভার পূর্বসূরী] ঠিক করেছিলো, শহরের একটি বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে লালবাগ দুর্গের উন্নয়ন করবে। শরিফউদ্দিন জানিয়েছেন, ১৮৪২ সালে কমিটি দুর্গের উন্নয়নের প্রস্তাব গ্রহণ করে কাজ শুরু করে এবং তা শেষ হয় ১৮৪৭ সালের ভেতরে।[৫] এখানে একটু ফাঁক আছে। আসলে কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণের পর দুর্গটি নিজ অধিকারে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। দুর্গের মালিক ছিলেন তখন তিনজন— মজহর আলী খাঁ, সালেহা খানম ও রওশন আলী খাঁ। সালেহা খানম ছোট কাটরারও মালিক ছিলেন। দুর্গের মালিকরা কমিটিকে বৎসরে ষাট টাকার বিনিময়ে দুর্গ ব্যবহার অনুমতি দেয়। এ পরিপেক্ষিতে, ১৮৪৪ সালে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। একপক্ষে ছিলেন মালিকরা। অন্যদিকে, কমিটির পক্ষে ছিলেন— কুক, কলনিক, কুফর, পাদ্রী শেফার্ড, ওয়াইজ, কুল, ডাক্তার টেইলর, বেলী, ক্যা: সোয়াট ম্যান, রর্বাট, আরাতুন,ম আলীমুল্লাহ, মির্জা গোলাম পীর, ব্রজমোহন রায়, রাজ মহন রায়, নন্দলাল দত্ত, ব্রজরতন দাস ও মিত্রজিত সিং। খুব সম্ভব এরা সবাই ছিলেন কমিটির সদস্য। এই দলিল থেকে আরো জানা যায় যে, পাদ্রী শেফার্ড [খুব সম্ভব] এর আগে নীলামে দুর্গের হামামটি কিনেছিলেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, হামামটি কি ভাবে নীলাম উঠলো? কারণ, তখনও দুর্গের 'মালিক' রা বর্তমান। মনে হয়, দুর্গের তৎকালীন মালিকদের কাছ থেকে হয়ত পাদ্রী সাহেব হামামটি ইজারা নিয়েছিলেন। এখানে দলিলটি দুষ্প্রাপ্য বিধায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হলো। এ ছাড়াও, এ দলিল থেকে তৎকালীন লালবাগের সীমানা সম্পর্কেও জানা যাবে।

'শ্রীমজহর আলী খাঁ ও মেছের্ম্মত ছালেহ খানম বেন্তে রওশেন আলী খাঁ স্থানে লিখীতং শ্রীমেস্তর ডানবার সাহেব ও মেস্তর কুক শাহেব ও মেস্তর কলনিক সাহেব ও মেস্তর কুফর সাহেব ও মেস্তর পাদরি ছেপট সাহেব ও মেস্তর ওয়াইষ সাহেব ও মেস্তর কুল সাহেব ও মেস্তর ডাক্তর টেলর সাহেব ও মেস্তর বেলী সাহেব ও মেস্তর কাপ্তান ছোওাটমেল সাহেব ও মেস্তর কাপ্তান উইষ্টন সাহেব ও মেস্তর রাবট ডৌসট সাহেব ও মেস্তর আরাত্তন সাহেব ও খাজে আলী মূল্যা ও মৃজাস গোলাম পীর ও ব্রজমোহন রায় ও রাজমোহন রায় ও মুনশী নন্দলাল দত্ত ও ব্রজরতন দাস ও মিত্রজিত সাংহ বাবু হাকীমান কোমেটী সহর ঢাকা কস্য কবুলীয়ত পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আপনাদিগের মুরেস নওয়াব সায়েস্তা খাঁর ওয়াকক মোতালক সহর ঢাকার লালবাগ মহল্যা মধ্যগত চাকলার অর্থাৎ বিবি পরির মকবেরার ও মছজিদের চৌতরফি চৌদেত্তার মধ্যস্থিত ভূমি জাহার চৌহুদ্দি এই লালবাগের হাতার জমির ও বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তরের কেল্লায় পোক্তা দেওয়ারের লাগ উত্তর ময় দেত্তার ও বর সরকের লাগ দক্ষিণ ও বুড়িগঙ্গার ও হাতার জমির লাগপুবের পোক্তা দেওয়ারের লাগ পূর্বময় দেত্তার ও আওরঙ্গাবাদের হামাম জাহা পাদরি সাহেব নীলামে খরিদ করিয়াছেন তাহার ও ঐ আওরঙ্গাবাদের

জমির মিত্তিকার নিচে জে উত্তর দক্ষীণ বির্ঘাকার পোক্তা নেও আছে তাহার লাগ পশ্চীম ময় ঐ নেও ঐ চত্তসীমা বচ্ছিন্ন দরোবস্ত ভূমি ও তনমধ্যগত কেল্বা ও হোজরা ও পোক্তা মোকানাত ইত্যাদি জে তোলীয়তের হকিয়তে আপনারদ্বীগের দখলে আছে তাহার মধ্যে বিবি পরির মকবেরা ও মছজিদ সেত্তার বাকি সমস্ত ভূমি ও তনমধ্যগত কেল্যা ও হোজরা ইত্যাদি পোক্তা মোকানাত আমরা আপন সে ইচ্ছা পূর্বক মং ৬০ টাকা কম্পানী বার্সীক জমাতে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সনের প্রথমাবধি হামেসগীর নিমির্ত্তক মোকরবি পাট্টা লইলাম অতএব একরার করিতেছি ও লিখীয়া দিতেছি জে আমরা ও আমারদ্বিগের স্থলাভিসিক্ত কোমেটি সাহেবানরা উপরের লিখীত চৌহুদ্দি মধ্যেগত দরোবস্ত ভূমি ও কেল্বা ও হোজরা ইত্যাদি মোকানাতে দখীলকার থাকিয়া আপনমরজী মোর্তাবেক ঐ সমস্ত জমিতে কাটীয়া ভরিয়া ব্যস্তম বাগোয়াত বানাইয়া ঐ সমস্ত ভূমি ও তনমধ্যগত খাল ও পোক্তা মোকানাতের উৎপর্ণ ভোগ করিব ও করিবেন এবং ঐ ভূমিতে অন্য ২ জে জে কর্ম্ম করা আবীশ্যক হয় তাহা করিব ও করিবেন তাহাতে আপনার ও আপনারদ্বিগের ওরিসানেরস কোন আপত্তি নাই এবং থাকিবে না ও উপরিউক্ত জমার উপর আপনার ও আপনাদ্বিগের ওরিসানরা কিছুমাত্র জমা বেশি লইবেন না ও লইবেক না আর আমরা আমারদ্বিগের স্থলাভিসিক্ত সাহেবেরা ঐ জমীতে জে জে পাথর ও ইট আছে তাহা ঐ মছজিদ ও মোকবেরার কর্ম্ম অথবা ঐ জমিতে অন ২ জে জে মোকানাত আছে ও প্রস্তুত হয় তাহাতে বিনা অন্য স্থানের অন্য কোন কর্ম্ম খরচ করিতে ও কাহার স্থানে বিক্রয় করিতে পারিব না আর ঐ বিবি পরির মোকবেরা ও মছজিদ আপনারা জাতায়ত করিতে ও আপনাদিগের দিন মতে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে আমরা ও আমার দ্বিগের লোক বাধাজনক হইতে পারিব না ও পারিবেক না ও আমরা ও আমারদ্বিগের স্থলাভিসিক্ত সাহেবান ঐ মছজিদ ও মোকবেরা তশ্য রোয়াক ও পোক্তা কখনহ সিকস্ত করিতে পারিব না আর উপরের লিখীত মোকরবি জমা নীচের লিখতি কিস্তিবন্দী মতে মাহাবমাহা কিস্তিব কিস্তি জিলে ঢাকার শ্রীযতি কেলেকটর সাহেব বাহাদ্বরের দ্বারায় আপনাদ্বিগকে আপনাদীগের ওয়ারিসানকে দিব ও দিবেন আর জদি আমরা ও আমারদ্বিগের স্থলাভিসিক্ত সাহেবানরা উপরের লিখীত সরর্ত ও কিস্তিবন্দী মতে ঐ জমা আপনাদ্বীগকে ও আপনাদিগের ওয়ারিসানকে না দেই ও না দেত্রন তবে আপনারা ও আপনাগিগের ওয়ারিসান ঐ সমস্ত জমি ও তনমধ্যগত দরবস্ত মোকানাত ইত্যাদি আপন দখলে নিয়া তাহার বন্দোবস্ত ইত্যাদি করিয়া তশ্য উপশ্বত্য ভোগী হইবেন তাহাতে আমরা ও আমারদ্বিগের স্থলাভিসীক্ত সাহেবান কোন দাবি কি আপত্তি করিতে পারিব না ও পারিবেন না আর জে পর্য্যন্ত আমরা ও আমারদ্বিগের স্থলাভিসিক্ত সাহেবান পূর্বোক্ত জমা কিস্তিবন্দীমতে আদায় করি ও করে সে পর্যন্ত আপনারা ও আপনারদ্বিগের ওয়ারিশানরা ঐ সমস্ত জমি তন্মধ্যগত মোকানাত ইত্যাদিতে কোনরূপ দখল ও হস্তক্ষেপণ করিতে পারিব না এতদার্থে কবুলীযত লিখীয়া দিলাম ইতি সন ১৮৪৪ তাং ২৬ নভেম্বর মোতাবেক সন ১২৫১ তাং ১২ অগ্রহায়ণ

কাতকিস্তিবন্দী	ইসাদী
৩১ মার্চ্চ ১৫	শ্রীসীবচন্দ্র ঘোষ সাং
৩০ জুন ১৫	বিক্রমপুর রারিখাল হাং শহর ঢাকা
৩০ সেপ্টেম্বর ১৫	শ্রীরামচরণ ধর সাং ঢাকা
৩১ ডিসেম্বর ১৫	শ্রীগুরু প্রসাদ নাহা সাং হাল
৬০	ঢাকা বৈলখানা
সং সাইট টাকা মাত্র	শ্রীকাসিনাথ চৌধুরি হাং সাং ঢাকা

অদ্য শ্রীরামচরণ কেরাণী তাতিবাজার থাং কোতালী শ্রীগুরুপ্রসাদ নাহা সাং সেখরনগর থাং শ্রীনগর জিলা ঢাকা সাক্ষীগণের সনাক্ত ও মোকাবিলা সয় দস্তাবিজ দেহেন্দা এই দস্তাবিজের আপন দস্তখত ও লিখীত সরর্তস্বীকার করিলেক অতএব হুকুম হইল যে দস্তাবিজ রেজেষ্টরি করা জায় ২১ জানুয়ারি সন ১৮৪৫ সন।

মরকুমা শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

নকল মোহরের'[৬]

যতীন্দ্রমোহনের বিবরণ থেকে জানা যায়, এ শতকের প্রথম দিকেও, পূর্বোক্ত মজহার খান প্রমুখের উত্তরাধিকারী রমজান খান ষাট টাকা পেতেন।[৭]

কমিটি ১৮৪৪ সালে দুর্গের লীজ নেওয়ার পর উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছিলো। এ জন্যে সরকার বিশেষ মঞ্জুরী প্রদান করেছিলো। দুর্গের প্রাচীর ও ইমারত মেরামতের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছিলো সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের। দুর্গের অভ্যন্তরে যারা বসবাস করছিলেন কুঁড়েঘর বেধে তাদের সরিয়ে দেওয়া হলো উপযুক্তম ক্ষতিপূরণ দিয়ে। একটি বাগানও করা হলো। এ উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন স্কিনার, পাদ্রী শেফার্ড ও ডাঃ টেইলর। শরিফউদ্দিন যে উল্লেখ করেছেন পাঁচ বছরে এ কাজটি সমাপন করা হয়েছিলো তা ঠিক নয়।[৮] ১৮৪৪ থেকে ৪৭ এই তিন বছরে সমাপন করা হয়েছিলো উন্নয়ন কাজ।

১৮৫৩ সালে পুরানা পল্টন থেকে সেনানিবাস স্থানান্তর করা হলো লালবাগ দুর্গে।[৯] কারণ পুরানা পল্টন পরিণত হয়েছিলো অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে। তারপর ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সেনানিবাস ছিলো এখানে।

কিন্তু শুধু ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবেই নয়, লালবাগকে সাধারণ মানুষ স্মরণ করে অন্য কারণেও। কারণ, লালবাগ হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীকও। এখানেই ১৮৫৭ ও ১৯৪৮ সালে ঘটেছিলো দু'টি রক্তাপ্লুত ঘটনা। এখন লালবাগকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনা দু'টি আলোচনা করবো। প্রথম— ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ।

১৮৫৭ সালের আলোচনা সীমিত রাখবো লালবাগ দুর্গে সংঘটিত ঘটনাবলীর ওপর। ঐ সময় ভারত জুড়ে ইংরেজ বিরোধী অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার ইংরেজবাসী ও সরকার হয়ে উঠেছিলো আতংকিত। ঢাকার 'কালা সিপাহী' বা দেশী সিপাহীরা যে অভ্যুত্থানের কথা জানতো না এমন নয়, অনুমান করে নিতে পারি, তারা

এ সম্পর্কে ছিল ওয়াকিফহাল। কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট কোন কর্মধারা তাদের ছিল না অন্যদিকে লালবাগ দুর্গে অবস্থানরত দেশী সিপাহীরা যে কোন মুহূর্তে বিদ্রোহ করতে পারে এ আশংকা করে কলকাতা থেকে আনা হয়েছিলো কিছু ইংরেজ নৌ সেনা, যাদের প্রধান ছিলেন লেঃ লুইস। এ ছাড়া ইংরেজদের পক্ষে কাজ করার জন্য বাঙ্গালী ও ইংরেজদের নিয়ে তৈরী হয়েছিলো একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও। ফলে স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা উত্তেজনা বিরাজ করছিলো দু'পক্ষেই।

২১ নভেম্বর ১৮৫৭ সালে, চাটগাঁর দেশী, সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিলো। গোয়েন্দা সূত্রে সে খবর ঢাকায় পৌছুলে লেঃ লুইস সামরিক ও বেসামরিক লোকদের এক বৈঠকে ডেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ঢাকার দেশী সিপাহীদের নিরস্ত করা হবে।[১০]

২২ নভেম্বর, সকাল পাঁচটায় স্বেচ্ছাসেবকদের জড়ো হতে বলা হয়েছিলো। ঠিক সময়ে কমিশনার, জজ, কিছু সিভিলিয়ান এবং বিশ ত্রিশজন স্বেচ্ছাসেবক জড়ো হয়েছিলেন, ভোরের আলো ফোটেনি তখনও।[১১]

প্রথমে নৌ-সেনা ও স্বেচ্ছাসেবকরা নিরস্ত্র করেছিলো তোষাখানার প্রহরীদের। পাহারায় ছিল জনাপনেরো প্রহরী। যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলো তারা এবং তা জানিয়েছিলোও। প্রহরীরা বলেছিলো এ সবের কোন দরকার ছিল না। অফিসাররা নির্দেশ দিলেই তারা আত্মসমর্পণ করতেন।১২

এরপর তারা পৌছুলো লালবাগ। লেঃ লুইস জানিয়েছেন, সিপাহীরা ছিল প্রস্তুত। লালবাগের ইমারতগুলিতে, ইবং উঁচুমতো জায়গায় তাদের ব্যারাকগুলিতে তারা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন।[১৩] একজন স্বেচ্ছাসেবক যিনি লালবাগে গিয়েছিলেন নৌ-সেনাদের সঙ্গে জানিয়েছেন, ইংরেজদের সঙ্গে ছিল দু'টি কামান, সৈন্যেরা সজ্জিত ছিল এনফিল্ড রাইফেলে। দেশী সিপাহীরাও তাদের দু'টি নয় পাউন্ডের কামান নিয়ে ছিল প্রস্তুত। প্রথমে ইংরেজ পক্ষের অফিসার, দুর্গের ভিতর দেশী সিপাহীদের আত্মসমর্পণ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সিপাহীরা একঝাঁক গুলি করে উত্তর দিয়েছিলেন। ফলে, দু'পক্ষে প্রবল গুলি বিনিময় শুরু হলো। এক পর্যায়ে সিপাহীরা কামান দু'টি বিবি পরীর সমাধির কাছ থেকে কাছেই উঁচু মত জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ইংরেজ পক্ষের মিডশিপম্যান আর্থার মেয়ো কুড়িজন সেনা নিয়ে সরাসরি আক্রমণ করেছিলো উঁচু জায়গায় থেকে কামানে গোলাবর্ষণরত সিপাহীদের। তারপর তারা আবার নীচে এসে ব্যারাকের সিপাহীদের আক্রমণ করেছিলো। প্রায় একঘণ্টার যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিলো সিপাহীরা। তাদের পক্ষে মৃতের সংখ্যা ছিল ৪১। বন্দী হয়েছিলেন তিন, তার মধ্যে দু'জন ছিলেন আহত। লুইস জানিয়েছেন, গুরুতরভাবে আহত সিপাহীর সংখ্যা ছিল আট। পালিয়ে নদী পেরুতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিলো আরো তিনজনের। ইংরেজ পক্ষে নিহত হয়েছিলেন তিনজন আহত ষোলজন, এর মধ্যে একজন অবশ্য পরে মারা গিয়েছিলেন। আহতদের মধ্যে ঢাকার সিভিল সার্জন ডাঃ গ্রীনও ছিলেন।[১৪]

কিন্তু হৃদয়নাথ মজুমদার নামে একজন বাঙ্গালী উকিলের বিবরণ ইংরেজ ব্রেনাও বা

অন্যান্যদের থেকে ভিন্ন। এখানে উল্লেখ্য যে, হৃদয়নাথ এ বিবরণ শুনেছিলেন ছোটবেলায় ঢাকাবাসীদের কাছ থেকে [উনিশ শতকের শেষার্ধে]। এবং সত্য বোধহয় লুকিয়ে আছে এই দু'য়ের মাঝে।

হৃদয়নাথ লিখেছেন, ব্যাটালিয়ানের কাপ্তান একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সুবাদারকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পেনসন নিয়ে তাদের চাকরি থেকে অবসর দিলে তারা রাজী আছে কিনা। সুবাদার তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য চেয়েছিলেন সময়।[১৫]

কিন্তু ঐ রাতেই ইংরেজরা আক্রমণ করেছিলো দুর্গ। সিপাহীরা এ ধরনের কোন আক্রমণ আশা করে নি। নিরুদ্বেগে ঘুমিয়েছিলো তারা। গুলিবর্ষণের শব্দে বিমূঢ় হয়ে গেলেও ত্বরিত তারা তৈরি করে নিয়েছিলো নিজেদের। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই ছিল দশ রাউণ্ড গুলি এবং প্রত্যুত্তর দিয়েছিলো তারা তা দিয়েই।

অস্ত্রাগারের চাবি ছিল সুবাদারের কাছে। সিপাহীরা তাঁকে অস্ত্রাগার খুলে দিতে বললে তিনি জানিয়েছিলেন অস্বীকৃতি। সুবাদারের স্ত্রীও অনুরোধ জানিয়ে হয়েছিলেন প্রত্যাখ্যাত। সিপাহীরা এ পর্যায়ে সুবাদারকে হত্যা করে চাবি ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তখন ইংরেজরা হয়ে উঠেছিলো প্রবল এবং অস্ত্রের বা গোলাবারুদের অভাবে সিপাহীদের করতেক হয়েছিলো আত্মসমর্পণ।[১৬]

আরেকটি বিবরণে জানা যায়, ভোরে দুর্গ আক্রমণের সময় সিপাহীরা একেবারেই তৈরি ছিল না। কারণ, তখন তারা ব্যস্ত ছিল 'প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনে।'[১৭] এ বিবরণ রেবতীমোহন দাশের, যিনি ছিলেন ঢাকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি।

কিছুদিন আগে, আরেকটি সূত্র থেকে নতুন কিছু তথ্য পেয়েছি। শ্রুতিনির্ভর এ তথ্য বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে। সূত্রটি হলেন, জাতীয় একতা পার্টির সম্পাদক সরদার আবদুল হালিম। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে লালবাগের কথিত সুবাদার ছিলেন সরদার আবদুল হালিমের দাদার বাবা। আবদুল হালিম এ সম্পর্কে জেনেছেন তাঁর দাদীর কাছে থেকে। তাঁর ভাষ্য

সুবাদার ছিলেন পাঠান, নাম ছিল তাঁর আমীর হাবিবুল্লাহ খান। সস্ত্রীক থাকতেন তিনি পোস্তায়, লালবাগ কমিউনিটি সেন্টারের পেছনে [এ তথ্য বিশ্বাসযোগ্য, কারণ, সপরিবারে দুর্গের ভেতর নিশ্চয় সিপাহীদের থাকতে দেওয়া হত না] সুবাদার পোস্তা ও দুর্গ দু'জায়গায়ই থাকতেন প্রয়োজনানুযায়ী। হাবিবুল্লাহ খানের একমাত্র পুত্র আমীর উদ্দিনও থাকতেন পোস্তায়। অস্ত্রাগারের চাবি রাখতেন তিনি পোস্তায় স্ত্রীর কাছে [এ তথ্যটুকু বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি। অস্ত্রাগারের চাবি নিশ্চয় সুবাদারকে সবসময় নিজের কাছে রাখতে হতো।]

২১ নভেম্বর বিকেলে হাবিবুল্লাহ ফিরে গিয়েছিলেন স্ত্রীর কাছে পোস্তায় [খুব সম্ভব হৃদয়নাথ বর্ণিত, ব্যাটেলিয়নের ক্যাপটেনের সঙ্গে আলাপ করার পর]। স্ত্রীকে নিতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বিয়ের মোহারানা এবং কিনে দিয়েছিলেন নিজের জন্য কাফনের কাপড়। স্ত্রী এই আচরণে অবাক হয়ে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন।

]হাবিবুল্লাহ হয়ত তখন তাকে জানিয়েছিলেন, ইংরেজরা দেশী সিপাহীদের নিরস্ত্র করতে পারে এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত তিনি সংঘর্ষের আশংকা করেছিলেন। সন্ধ্যের দিকে সুবাদার ফিরে গিয়েছিলেন দুর্গে।

সুবাদারের পাশের বাসায় থাকতেন ব্যবসায়ী জমিদার গণি মিয়ার এক আত্মীয়া [নবাব আবদুল গনি যিনি এ বিদ্রোহে ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন এবং বিনিময়ে পেয়েছিলেন নবাব উপাধি। হাবিবুল্লাহর স্ত্রীকে বিষণ্ন দেখে গনি মিয়ার আত্মীয়া কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং সুবাদারের স্ত্রীও সুবাদারের আশংকার কথা জানিয়েছিলেন। আত্মীয়াটি তৎক্ষণাৎ অতিরঞ্জিত করে সংবাদটি দিয়েছিলেন গনি মিয়াকে। গনি মিয়া জানিয়েছিলেন কমিশনারকে এবং কমিশনার ইংরেজ সেনাধ্যক্ষকে। যে কারণে হয়ত ঐ দিন রাতেই ইংরেজরা দুর্গ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো।

ইংরেজরা দুর্গ আক্রমণ করলে সুবাদারের স্ত্রী খবর পেয়ে চাবি নিয়ে ছুটে এসেছিলেন দুর্গে [কিন্তু এটি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না, কারণ ঐ পরিবেশে চাবি হাতে একজন মহিলার দুর্গে আসা সম্ভব নয়। হৃদয়নাথ যে বর্ণনা দিয়েছেন, সুবাদারের স্ত্রী দুর্গে ছিলেন তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়]। খুব সম্ভব চাবি সুবাদারের কাছেই ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ত তিনি দোটানায় ভুগছিলেন যার ফলে অস্ত্রাগার খোলা সম্ভব হয় নি এবং গোলাবারুদের অভাবে সিপাহীরা ইংরেজদের আক্রমণও প্রতিরোধ করতে পারে নি।

যা হোক, এখানে থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশী সিপাহীরা এ ধরনের একটি ঘটনার জন্য হয়ত প্রস্তুত ছিল কিন্তু এতো শীঘ্রই যে তা ঘটবে তা হয়ত ভাবে নি। সে জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। ইংরেজরা বিনা প্ররোচনায় অতি আতংকের কারণে দুর্গ আক্রমণ করে নৃশংসভাবে দেশী সিপাহীদের হত্যা করেছিলো। সিপাহীদের পক্ষে নিহত হয়েছিলেন একচল্লিশ জন, তিনজনের মৃত্যু হয়েছিলো নদী পেরুতে গিয়ে। আহতদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। ইংরেজ পক্ষে আহত হয়েছিলো আঠারো জন। সুবাদারসহ গ্রেফতারকৃত কুড়িজন সিপাহীর দশজনকে [সুবাদারসহ] দেয়া হয়েছিলো ফাঁসি এবং দশজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।[১৯] যে সব সিপাহীকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিলো তাঁদের অনেককে দাফন করা হয়েছিলো সলিমুল্লাহ এতিমখানার দক্ষিণে, যে অঞ্চল পরিচিত ছিল ' গোরে শহীদ মহল্লা' নামে।[২০]

এরপর সুবাদারের পরিবারের কি হয়েছিলো সে সম্পর্কে আবদুল হালিমের ভাষ্য :

ইংরেজরা যখন দুর্গ আক্রমণ করেছিলো তখন হাবিবুল্লাহ এগারো-বারো বছরের পুত্র আমীর উদ্দিন পালিয়ে গিয়েছিলেন কলতা বাজারে। সেখানে কিছু পাঠান পরিবার বাস করতেন। এরকম একটি পাঠান পরিবারে তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন। কিন্তু তার মার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। হয়ত তিনি পলায়নরত সিপাহীদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য জানা যায় নি।

আমীর উদ্দিন ঐ পাঠান পরিবারেই বড় হতে লাগলেন [খান উপাধি তিনি ত্যাগ করেছিলেন]। যৌবনে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কুস্তিকে [ঢাকার পেশাদার ঐ

সব কুস্তিগীরকে তখন বলা হত ডনগীর]। আঠারো উনিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন তিনি বংশালের এক বাঙ্গালী মেয়েকে। প্রৌঢ় অবস্থায় জোড়পুলের কাছে সরকার থেকে পেয়েছিলেন তিনি কিছু খাস জমি যা এখনও তাঁর উত্তরাধিকাররা ভোগ করছেন।

আমিরউদ্দিনের ছিল পাঁচ ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলের নাম ছিল আবদুল হাকিম। যৌবনে আবদুল হাকিম সদ্য স্থাপিত জগন্নাথ স্কুলে শিক্ষকতার জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু চাকরি পান নি। তখন তিনি তাঁর দাদীর কাছ থেকে কিছু গিনি ও ঢাকার আদি নায়েব নাজিমদের সরকারের উত্তরাধিকারদের কাছ থেকে কিছু পুঁজি নিয়ে চামড়ার ব্যবসা করার জন্য চলে গিয়েছিলেন নীলফামারী। [ঢাকার আদি নায়েব নাজিমদের সরকারের উত্তরাধিকাররা থাকতেন নিমতলীর উল্টো দিকে। কায়েতটুলীতে যাবার মুখে অবস্থিত 'সায়েন্স ভিলায়' (মিত্র কুটির)]। চামড়ার ব্যবসায় কিছু অর্থোপার্জন করে আবদুল হাকিম ফিরে এসেছিলেন ঢাকায়। পঞ্চায়েতের সঙ্গেও যোগ ছিল তাঁর এবং তাঁর উপাধি হয়েছিলো সরদার। সরদার আবদুল হাকিমেরই পুত্র সরদাব আবদুল হালিম।

১৮৫৭ এর বিদ্রোহ চুকেবুকে গেলে, লালবাগ থেকে সেনানিবাস সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো। এবং পুলিশ রিজার্ভ ফোর্সকে স্থানান্তর করা হয়েছিলো লালবাগে।[২১] তখন থেকে খুব সম্ভব লালবাগ দুর্গ পুলিশ বাহিনীর ব্যারাক হিসাবেই ব্যবহৃত হতো। মনে হয় সরকার লালবাগ দুর্গে যখন সেনানিবাস স্থাপন করেছিলেন তখন ঢাকা কমিটি থেকে হয়ত ইজারার মালিকানা নিয়ে নিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন জানিয়েছেন, এ শতকের প্রথম দিকে, শায়েস্তা খানের বংশধর হিসেবে মির্জা রমজান আলী খাঁ বার্ষিক সেই ষাট টাকা পেতেন সরকার থেকে।[২২] নাজির হোসেন জানিয়েছেন, পরবর্তী কালে [অর্থাৎ রমজান আলী খাঁর পর] মজহার আলী খাঁ ও আল্লাইয়ার খাঁ নামক দু'ব্যক্তির মধ্যে ওয়ারিশান নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। এই বিবাদের সময় দু'পক্ষের লোকজন পরী বিবির সমাধি সৌধের 'মূল্যবান চন্দন কাঠের দরজা জানালা, মূল্যবান পাথর ও অন্যান্য দ্রব্যাদি' লুট করে নিয়ে যায়।[২৩] খুব সম্ভব, এ বিবাদের সূত্র ধরে সরকার সেই বার্ষিক ষাট টাকা দেয়া স্থগিত রেখেছিলেন।

এ শতকের প্রথম দিকে, সরকার দুর্গের উত্তর দিকের ফটকটি তুলেছিলেন নিলামে। উল্লিখিত জনাব নাজির হোসেনের আত্মীয় মঙ্গু ওস্তাগার পাঁচ টাকায় ফটকের দু'টি স্তম্ভ কিনেছিলেন। কিন্তু, সারাদিন কয়েকজন মিস্ত্রী নিয়ে ঠোকাঠুকি করার পর ফটকের একটি ইটও খসাতে পারেন নি।[২৩] মঙ্গু ওস্তাগারের শুধু পাঁচ টাকাই গচ্চা যায় নি, লোকজনেরও হাসি ঠাট্টার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো তাঁকে।

নাজির হোসেনও উল্লেখ করেছেন বৃটিশ আমল থেকেই দুর্গটি পুলিশরা ব্যবহার করতেন। ১৯৪৭ এর আগে এখানে থাকতেন গাড়োয়ালী পুলিশরা। ১৯৪৭ এর পর সেখানে ছিল আই, বি অফিস ও পুলিশ কর্মচারীদের বাসগৃহ। উত্তর দিকে ছিল থানা। তবে, এর বেশ আগেই লালবাগকে সংরক্ষিত কীর্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিলো।[২৪] অবশ্য কেউ সে বিষয়ে মাথা ঘামাতো বলে মনে হয় না।

১৯৪৮ সালে লালবাগে ঘটেছিলো আরেকটি ঘটনা যা আতংকিত করেছিলো পাকিস্তানী সরকারকে। ঘটনাটি হলো পুলিশ বিদ্রোহ। এ ঘটনাটি বেশীদিন আগে ঘটে নি কিন্তু এ সম্পর্কে লিখিত তথ্য প্রায় নেই।

তৎকালীন একটি পত্রিকার পাতায়ও এর সংবাদ দেখিনি। তাতে মনে হয়, সংবাদটি ছাপার ব্যাপারে সরকারী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিলো। এ সম্পর্কে খানিকটা তথ্য জানতে পারি নয়া পদধ্বনিতে প্রকাশিত তকীউল্লার একটি প্রবন্ধ থেকে। নিম্নোক্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঐ প্রবন্ধকে ভিত্তি করে।

বকেয়া বেতন, রেশন, বাড়ি, বাৎসরিক ছুটি ইত্যাদির দাবীতে ১৯৪৮ সনের ১৪ জুলাই ধর্মঘট করেছিলো ঢাকার পুলিশ বাহিনী। পুলিশ লাইন ছিল তখন লালবাগ দুর্গে। সশস্ত্র পুলিশরা খণ্ড মিছিল করে জমায়েত হয়ে— ছিলেন দুর্গে। অস্ত্রাগারও ছিল দুর্গে। সিটি পুলিশ সুপার চ্যাথাম নিদেৃশ দিয়েছিলেন সশস্ত্র পুলিশদের অস্ত্র জমা দিতে। জনাপঁচিশেক অস্ত্র জমা দেননি। তাঁরা জানিয়েছিলেন, সরকারের প্রতি তাঁরা বিশ্বস্ত, সুতরাং অস্ত্র জমা দেয়ার কথা উঠে না। চ্যাথাম তখন অস্ত্রাগারের শান্ত্রীর কাছে থেকে চাবি চেয়ে নিয়েছিলেন। শান্ত্রীও সরল মনে চাবি দিয়েছিলেন পুলিশ সুপারকে। এদিকে সরকার পক্ষ থেকে তলব করা হয়েছিলো সামরিক বাহিনী।

তখন রোজার মাস। মুসলিম লীগের প্রধানমন্ত্রী নাযিমুদ্দিন জানালেন, ধর্মঘটী পুলিশদের সঙ্গে তিনি আলাপ করতে চান। দুর্গের ময়দানে জমায়েত হলেন ধর্মঘটী পুলিশরা। কেউ কেউ সরকারী আক্রমণের আশংকা করে দুর্গের ভেতর টিলায় পজিশনও নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করতে চান শুনে তারাও পজিশন ছেড়ে চলে এসেছিলেন দুর্গের মাঝে ময়দানে।

অন্যদিকে পলাশী ব্যারাক, নবাবগঞ্জের রাস্তা ও জগন্নাথ সাহা রোড দিয়ে সামরিক বাহিনী এসে ঘিরে ফেলেছিলো দুর্গ। সুবিধামত জায়গায় পজিশনও নিয়েছিলো তারা।

নাযিমুদ্দিন জানালেন, অস্ত্র সমর্পণের আগে কোন দাবিই বিবেচনা করা হবে না। পুলিশ বাহিনী এদিকে দেখলো সামরিক বাহিনী তাঁদের ঘিরেও ফেলেছে। অস্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে ছুটলেন তারা অস্ত্রাগারের দিকে। কিন্তু চাবি তো নেই। একজন তখন গুলী করলেন অস্ত্রাগারের তালায়। আর তখনই সেনাবাহিনী চারদিক থেকে আক্রমণ করলো মেশিন গানের সাহায্যে। তখন ইফতারীর পূর্ব মুহূর্ত। যে কয়জন পুলিশের কাছে অস্ত্র ছিল তাঁরা শেষ পর্যন্ত লড়েছিলেন। এ সংঘর্ষে কতজন শহীদ হয়েছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য জানা যায় নি। তবে পরদিন ১৫ই জুলাই সাধারণ মানুষ আর ছাত্ররা লালবাগ দুর্গের চারিদিকের দেয়াল ছেয়ে দিয়েছিলো প্রতিবাদী পোষ্টারে পোষ্টারে।[২৬]

পুলিশ ব্যারাক এরপর লালবাগ থেকে সরিয়ে নেওয়া হলে তা পরিত্যক্ত অবস্থায়ই ছিল। সম্প্রতি, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সম্পূর্ণ দুর্গটিকে চমৎকারভাবে সংস্কার করেছে। মুঘল আমলে নির্মাণের ঠিক পর, লালবাগ দুর্গ কেমন দেখাতো, বর্তমানে দুর্গটি দেখলে তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যাবে।

তথ্যপঞ্জী

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Jadunath Sarkar, *'Bengal under Shaista Khan and Ibrahim Khan,'* Jadunath Sarkar (ed), *The History of Bengal,* vol II, Dacca, 1948.

২. *ঐ*

৩. লালবাগ দুর্গের স্থাপত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন— Nazimuddin Ahmed, *Mughal Dacca and the Lalbagh Fort*, (Date and Place of Publication not mentioned).

৪. Sharifuddin Ahmed, *Dacca*, London, 1986, p, 153.

৫. *Ibid.*

৬. Sayid Aulad Hasan, *Notes on the Antiquities of Dacca*, Dacca, 1904, pp, 5-7.

৭. যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, ঢাকা, পৃঃ ৩৩৪।

৮. Sharifuddin Ahmed, op cit, p. 153.

৯. *Ibid.*

১০. F. J. Halliday, *Minute by Lt Governor of Bengal on the Mutineers as they effected the Lower Provinces under the Government of Bengal,* Calcutta, 1858, p. 175.

১১. Brennand, *'Echoes of the Indian Mutiny at Dacca'* The Dacca Review, vol. v & vi, No.VII & VIII, 1915, p. 247.

১২. *Ibid.*

১৩. *'Despatch of Lt. Lewi's, Charles Rathbone Low*, History of the Indian Navy, London, 1877, Vol. II. p. 444.

১৪. *Ibid.*

১৫. Hridaynath Majumdar, *Reminiscenes of Dacca*, Calcutta, 1956, p. 20.

১৬. *Ibid.*

১৭. রেবতী মোহন দাস, *আত্মকথা*, কলকাতা, ১৩৪১, পৃঃ ৩।

১৮. এ সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন আমার বন্ধু মকবুল এলাহী চৌধুরী। সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিলো আশ্বিন, ১৩৯০।

১৯. এ লড়াইয়ে আহত-নিহতের সংখ্যার সঠিক হিসাব কেউ দিতে পারেন নি। কারণ, একেকজন একেক ধরনের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। এখানে উল্লিখিত সংখ্যা বাংলার লেঃ গভর্নর

হ্যালিডের। সরকারী উপাত্ত হিসেবে এখানে তা মেনে নেয়া হলো। হ্যালিডের প্রাগুক্ত বিবরণ দেখুন।

২০. এ তথ্য লালবাগ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নাজির হোসেনের। ঢাকা চর্চায় তিনি উৎসাহী। এ তথ্য জেনেছেন তিনি তাঁর বাবা-দাদার কাছ থেকে।

২১. A. L. Clay, *Principal Heads of the History and Statistics of Dacca Division,* Calcutta, 1868, p. 90.

২২. যতীন্দ্র মোহন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৪।

২৩. নাজির হোসেন, *কিংবদন্তির ঢাকা*, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ১১৫।

২৪. *ঐ*, পৃঃ ১১৭-১১৮।

২৫. *ঐ*, পৃঃ ১১৬।

২৬. তকীউল্লাহ, *নয়া পদধ্বনি*, ১৯৮০।

শব্দসূচি



ঢাকার হারিয়ে যাওয়া কামান

মুনতাসীর মামুন

ঢাকা শহর ঃ ইতিহাসের উপকরণ

আমরা অনেকেই হয়ত জানি না যে, অষ্টাদশ শতকের শুরুতে ঢাকা ছিল বিশ্বের দ্বাদশ বৃহত্তম নগরী। হয়ত জানি না যে, ইংরেজ আমলের ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূত্রপাত ঢাকার ইংরেজ কুঠির আক্রমণের মাধ্যমে। বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা এবং অনেকেই হয়ত জানি না যে, অনুশীলন সমিতি গড়ে উঠেছিল উয়ারীর এক বাড়িতে। যে নাটক বাংলা সাহিত্যের মাইল-ফলক হিসেবে পরিচিত সেই 'নীলদর্পণ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। আমরা যে ঢাকা নগর বিষয়ে জানতে আগ্রহী নই তা নয়, আসলে আমাদের সামনে এ সব কেউ তেমনভাবে তুলে ধরেননি।

মুঘল আমলে বাংলায় স্থাপিত তিনটি রাজধানীর মধ্যে ঢাকা সবচেয়ে পুরনো। ইসলাম খান ১৬১০ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজধানী [মতভেদে ১৬০৮]। ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়েছিলো ১৭০৪ সালে। আর নগর হিসেবে কলকাতার পত্তন হয়েছিলো সপ্তদশ শতকের শেষে। অথচ সব দিক থেকে কুলীন ঢাকা শহর সম্পর্কে লেখালেখি গবেষণা হয়েছে সবচেয়ে কম।

ঢাকা সম্পর্কে গবেষণা কম হওয়ার কারণ আছে। উনিশ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের প্রধান শহর। বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীও ছিল অনেক দিন। অন্যদিকে, পূর্ববঙ্গ ছিল অহবেলিত জনপদ, যেখানে বৃটিশ আমলেও সিভিলিয়ানরা তাদের নিয়োগকে মনে করতেন 'শাস্তি'। ঢাকা পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ছিল বটে, কিন্তু গৌরব গরিমার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং বাংলা সম্পর্কিত অধিককাল গবেষণা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ অথবা কলকাতাকে কেন্দ্র করে।

ঢাকা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী। গত দু'দশক ঢাকাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে সব। ফলে, দেশ হিসেবে বাংলাদেশে আর নগর হিসেবে ঢাকার প্রতি সৃষ্টি হয়েছে আগ্রহের। যে কারণে লক্ষ্য করি, ঢাকায় ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক ও একটি দেশীয় সম্মেলন, হঠাৎ করে ঢাকা সম্পর্কিত গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও লেখালেখি।

ঢাকা নগর সম্পর্কে যারা গবেষণা শুরু করেছেন তাঁরা প্রায়ই অভিযোগ করে বলেন, ঢাকা সম্পর্কিত গবেষণার প্রধান প্রতিবন্ধকতা তথ্যের স্বল্পতা। শুধু তাই নয়,

কোথায় তা পাওয়া যাবে সে সম্পর্কেও অনেকের তেমন ধারণা নেই।

মুঘল, প্রাক-মুঘল ঢাকা সম্পর্কে গবেষণা করতে হলে ফার্সী ও আরবী জানা আবশ্যক। এখনও এই দুই ভাষায় লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন জায়গায় আছে যা ঐ সময়কার শহর সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারে। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কিছুদিন আগে এক প্রবন্ধে এ ধরনের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য সে সব যে সবই ঢাকা সম্পর্কিত তা নয়। ঐ দুই ভাষা সম্পর্কে আমার যেহেতু জ্ঞান নেই সেহেতু সে সম্পর্কে কিছু বলা থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

অষ্টাদশ শতক থেকে আমরা নির্ভর করতে পারি ইংরেজদের নথিপত্রের ওপর। কোম্পানী ও বৃটিশ সরকার সযত্নে নথিপত্র সংরক্ষণ করতো। উনিশ শতকের ওপর গবেষণার জন্য ওসব নথিপত্র ছাড়াও আমরা নির্ভর করতে পারি বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্র ও প্রকাশিত বই-পত্রের ওপর। তবে এখানে বলে রাখা ভালো, এসব নথিপত্রে যে ঢাকার ওপর প্রচুর তথ্য আছে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। না থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ, সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে ঢাকা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল না [অষ্টাদশ বা উনিশ শতকে]। তবে এসব নথিপত্র ধৈর্য ধরে ঘাঁটলে ঢাকা শহরের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত হয়ত কিছু না কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। এসব নথিপত্র সংরক্ষিত আছে লণ্ডনে ও ঢাকায়।

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে, [এখন বৃটিশ লাইব্রেরী] কোম্পানী ও পরবর্তী আমল সম্পর্কিত প্রচুর নথিপত্র সংরক্ষিত আছে। কি ধরনের নথিপত্র সেখানে আছে সে সম্পর্কে কয়েকটির উল্লেখ করা যাচ্ছে-

Despatches of Bengal
Home Miscellaneous Series
Report on Native Papers
Proceedings of the Government of Bengal
[Judicial, Municipal, Public words etc.]

এ ছাড়াও সেখানে আছে অনেক সিভিলিয়ানের ব্যক্তিগত কাগজপত্র। এদের অনেকে আবার কোন না কোন সময় ঢাকায় কাজ করেছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকার্তা হিসেবে।

ঢাকার জাতীয় অভিলেখগার সরকারী অবহেলা ও গবেষকদের অনাগ্রহের অর্থ নিয়ে কর্তৃপক্ষ একটি কাজ সম্পন্ন করেছেন। তা' হলো বিভিন্ন জায়গা থেকে নথিপত্র এনে অভিলেখগারে জমা করেছেন। ফলে, ভবিষ্যৎ ধ্বংসের হাত থেকে আপাতত এগুলি রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু অভিলেখগারে নথিপত্রের কোন নির্ঘণ্ট নেই। কোথায় কি জড়ো করা আছে সে সম্পর্কে জানাও মুশকিল। কিন্তু এখানেই ঢাকা শহরের বিকাশ ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, আর্থ-সামাজিক বিষয় সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অজানা তথ্য পাওয়া

যাবে। যেমন—

District Records-Dacca
Miscellaneous Letters Received and Sent
by the Collector of Dacca
Proceeding of the Lt. Governer of Bengal
[Judicial, Miscellaneous etc.]

এ ছাড়া কমিশনার অফিসের নথিপত্রও নিয়ে আসা হয়েছে অভিলেখগারে। মূল্যবান আরো কিছু নথিপত্র আছে ঢাকা জেলা কালেকটরের রেকর্ড রুম ও ঢাকা পৌরসভার রেকর্ড রুমে।

ঢাকা পৌরসভার রেকর্ড রুমে পৌরসভার ও শহরের অবয়বগত বিকাশ সংক্রান্ত নথিপত্র পাওয়া যাবে। ডঃ শরিফউদ্দিন এই রেকর্ড রুমের কাগজপত্র ঘেঁটেছেন এবং কি কি নথিপত্র পাওয়া যেতে পারে সেখানে, সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে, নিম্নোদ্ধৃত তাঁর গ্রন্থপঞ্জী থেকে :

Miscellaneous Papers of the Dacca Municipal Committee, Letters to and from the Honorary Secretary, Municipal Committee. 1857-60.

Miscellaneous Correspondence of the Chairman of the Dacca Municipality, Letters sent 1866-67

Proceedings of the Commissioners of the Dacca Municipality, 1864-87

Collection of Files and Reports on Specific Subjects; [Administration Reports, Buckland Bund, Municipal Lands, Wari Khas Mahal etc.]

পৌরসভার সবচেয়ে অবহেলিত বিভাগ এই রেকর্ড রুম। এখানে সংরক্ষণ, সংগ্রহ এবং পড়ার কোন পরিবেশ নেই। এ ব্যাপারে আমরা অনেকবার পৌর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ করেছি কিন্তু পরিবেশ উন্নত করা যায় নি। ঢাকা নগর জাদুঘর প্রস্তাব করেছে, এই জাদুঘরের অধীনে পৌরসভার নথিপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার, যার ফলে গবেষকবৃন্দ উপকৃত হবেন।

জেলা কালেকটরেট রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত আছে "*Letter Recived by the Collector of Dacca* 1790-1885, *Thakbust Survey Report*" ইত্যাদি। শুনেছি এখানকার নথিপত্রও নাকি নষ্ট ও চুরি হয়ে যাচ্ছে।

এবার সালতামামি নেয়া যাক ঢাকা সম্পর্কিত প্রকাশিত বইপত্রের। ঢাকা সম্পর্কিত অধিকাংশ বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে উনিশ শতকে এবং বর্তমান শতকে। এসব বইপত্রের বেশীর ভাগ ইংরেজি এবং বাংলায় রচিত।

ঢাকা শহর সম্পর্কে ইংরেজ আমলে গবেষক সিভিলিয়ানরা বেশ খানিকটা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তবে, মনে রাখতে হবে সে আগ্রহের মূল ভিত্তি ছিল প্রশাসনিক। ঔপনিবেশিক আমলের ঢাকা শহর সম্পর্কে আমরা যে সব গ্রন্থ থেকে জানতে পারি প্রথমে এখানে তার একটি তালিকা দিচ্ছি। এসব গ্রন্থ রচনা করেছেন ইংরেজ সিভিলিয়ানরা [কোম্পানী এবং বৃটিশ সরকারের আমলের]—

Allen. B. C	*Eastern Bengal District Gazetteers-Dacca*, Vol. V. Allahabad. 1912
Ascoli. F. D	*Final Report of the survey and Settlement of Dacca.* 1910-17, Calcutta, 1917
Bradley, Birt F. B	*Romance of an Eastern Capital*, London, 1906
Clay. A. L.	*Principal Heads of the History and Sketches of Dacca Division*, Calcutta, 1886
Connan. W.	*Estimate of Dacca. Water Works Extension, with a Brief History of the Water Works*, 1886, Dacca, 1886
	Dacca Factory Records, Vol 1-6
D 'Oyly, C.	*Antiquities of Dacca*, London, 1824
Geddes, Patrick	*Report on Town, Planning* ; Dacca, Calcutta, 1911
Hedges, W.	*The Diary of William Hedges*, (ed H. Yule) London, 1887-89.
Hunter, W. W.	*A Statistcal Account of Bengal,* Vol. V. Dacca, London, 1875
Master, Streynsham	*The Diaries of Streynsham Master* (ed, by R. C. Temple) London, 1911
O Maley, M. S. S.	*District Gazetteer-Dacca, Calcutta*, 1896
Rennell, J.	*Memoir of Rennell, Memoir of Asiatic Society of Bengal,* vol. 11. Calcutta, Report of Dacca University Committee, 1912, Calcutta. 1912
Taylor, James	*A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca,* Calcutta, 1940
Taylor, James	*A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca*, London, 1851

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সবগুলি বই-ই ইংরেজ সিভিলিয়ানদের রচিত এবং সবগুলি বইয়ের রচনা পদ্ধতি, উপাত্ত, তথ্য প্রায় একই রকম।

ক্লে, হান্টার, টেলর [এমনকি রেনেল] এবং এসকলির বিষয় ঢাকা শহর নয়, ঢাকা জেলা। তৎকালীন ঢাকা জেলার ইতিহাস বর্ণনায় শহর তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ একক ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ গেজিটিয়ার গুলিতে [বা ধরনের] ঢাকা শহর সম্পর্কে সমকালীন বেশ কিছু তথ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা মূল্যবান। বিশেষ করে

টেলরের বইটি, যেখানে ঢাকার সমাজ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আছে যা বইটিতে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। এখনও ঢাকার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে অপরিহার্যভাবে টেলরের বইয়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

বাংলা একাডেমী টেলরের বইটির একটি অনুবাদ প্রকাশ করেছে। মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান কৃত অনুবাদটির শিরোনাম 'কোম্পানী আমলে ঢাকা'। অনুবাদটি আড়ষ্ট। তা'ছাড়া এ ধরনের বইতে যে ধরনের টীকা টিপ্পনী, নির্ঘণ্ট ইত্যাদি থাকার দরকার, তাও নেই। ফলে, অনুবাদটি তেমন মূল্যবান হয়ে ওঠেনি। কারণ, টেলরের বইয়ে বেশ কিছু বিভ্রান্তিকর শব্দ ও তথ্য আছে যার সঠিক বাংলা জানা না থাকলে [অনুবাদ] পাঠক কোন কোন বিষয়ে ভুল মূল্যায়ন করতে পারেন। চার্লস ডি অয়লির বইটির বিষয় অবশ্য ঢাকা শহর। এ শহরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তিনি। জানতেন শহরটিকে। তিনি প্রধানতঃ বর্ণনা করেছেন মুঘল যুগের ও শহরের প্রত্নসম্পদের ইতিহাস।

এ বইয়ের অন্যতম আকর্ষণ উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ঢাকা শহরের কিছু ছবি। ঢাকা শহর সম্পর্কিত এগুলিই সবচেয়ে পুরনো হাতে আঁকা ছবি। আর কে না জানে একটি ছবি দশটি পৃষ্ঠার থেকে বেশি কথা বলে। বইটির ছবিগুলির ডি. অয়লির আঁকা, গোটা দুয়েক চিনারির।

ব্রাডলি বার্টের বইটি অন্য ধরনের। এটি সাধারণ পাঠকনন্দিত, কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। বলা হয়ে থাকে, লণ্ডনে ছুটি কাটাতে যাবার জন্যে নাকি তাঁর ভাড়ার টাকা ছিল না। তই স্বল্প সময়ে কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি বইটি লিখেছিলেন। ভাষা মাঝে মাঝে এর কাব্যিক, গালগল্পও আছে বেশ কিছু। বাংলা একাডেমী বইটির অনুবাদ প্রকাশ করেছে, 'প্রাচ্যের রহস্য নগরী' নামে। বইটি অনুবাদ করেছেন রহীম উদ্দিন সিদ্দিকী। অনুবাদটি চমৎকার।

নগর পরিকল্পনাবিদদের জন্য গেডডেসের বইটি প্রয়োজনীয়। সংক্ষিপ্ত এই রিপোর্টে গেডডেস এ শতকের প্রথম দশকের ঢাকা নগরের অবয়ব বর্ণনা করেছেন এবং তারপর উল্লেখ করেছেন ব্যবস্থাসমূহ যা গ্রহণ করলে ঢাকা হয়ে উঠবে সুন্দর এক শহর। কিন্তু সরকারী অনেক রিপোর্টের মতোই গেডডেসের রিপোর্টের ওপর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

এসকলির রিপোর্টটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য বিশেষত এর 'রিপোর্ট অন দি লাখেরাজ ল্যাণ্ড ইন ঢাকা টাউন' অংশটুকু। সংক্ষিপ্ত এ রিপোর্টে আমরা ঢাকার আয়তন, জনসংখ্যা, সমাজ সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য পাই।

সিভিলিয়ানদের রচিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে পরবর্তী কালে রচিত গ্রন্থসমূহের ভিত্তি। এসব বই রচিত হয়েছে এ শতকের প্রথম দু'দশক এবং পঞ্চাশ দশক ও তারপরে। প্রথমে একটি তালিকা করা যাক এই সব বইয়ের—

Ahmed, Nazimuddin — *Mughal Dacca and the Lalbagh Fort*, Dacca.
Atiqullah, M. and — *Growth of Dacca City*.
Khan, F, Karim — *Population and Area, Dacca*. 1965

Azam, K. M.	*The Panchayat System of Dacca*, Dacca, 1912
Bridges, Harold	*The Kingdom of Christ in Eastern Bengal, Dacca*, 1984
Dani, A. H.	*Dacca : A Record of its Changing Fortunes*, Dacca, 1957
Gupta, N. K.	*Dacca : Old and New*, Dacca, 1940
Haider, Azimusshan	*Dacca : History and Romance in Place Names*, Dacca, 1967
Haider, Azimusshan (ed)	*A City and Its Civic Body-A Souvenir to mark the Centenary of Dacca Municiypality, Dacca*, 1966
Hasan, Sayid Aulad	*Notes on the Antiquities of Dacca*, Dacca, 1912
Hasan, Syed Mahmudul	*Dacca : The City of Mosques*, Dacca,, 1981
Hussain, Syed	*Echoes from old Dacca*, Calcutta. 1909
Islam, Sirajul (ed)	*District Records : Dacca*, Dacca, 1981
Karim, Abdul	*Dacca the Mughal Capital*
Luhani, G A K	*Dacca— Past and Present*, Allahabad, 1911
Rizvi, S. N. H (ed)	*Bangladesh District Gazetteers Dacca*- Dacca, 1975 *Report of the Dacca and East Bengal Baptist Mission for 1848*, Dacca, 1849
Sutton-Page, Rev. W	*In City and Jungle—A Brief Survey of the work of the Baptist Missionary Society in the City and District of Dacca. Eastern Bengal*, London, 1907
Taifoor, S. M.	*Glimpses of Old Dhaka*, Dacca, 1952.

আওলাদ হাসান যখন তাঁর বইটি লেখেন তখন ঢাকার পুরাতাত্ত্বিক অনেক নিদর্শন টিকে ছিল। তাঁর বইটি ঢাকার স্থাপত্য কীর্তির ওপর, এবং এর গুরুত্ব নিহিত স্থাপত্যসমূহের সমকালীন বর্ণনায়। আওলাদ হাসান প্রতিটি স্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত শিলালেখও মূল ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন। এসব শিলালেখ-র অনেক এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। এই সব শিলালেখ ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন হরিনাথ দে, যা এ বইটির প্রধান সম্পদ।

ঢাকার সামাজিক জীবনে এক সময় পঞ্চায়েতের ভূমিকা ছিল প্রধান, কিন্তু এই সামাজিক সংস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রায় নেই বললেই চলে। ঢাকা পঞ্চায়েতের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক খাজা আজমের গ্রন্থটি পঞ্চায়েত বিষয়ক একমাত্র বই। পঞ্চায়েতের উদ্ভব সম্পর্কে তিনি যে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন সেগুলি অনেকটা মনগড়া। তবে, পঞ্চায়েতের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে এটি এখনও একমাত্র নির্ভরযোগ্য রচনা।

এস. এম. তাইফুর ও আহমদ হাসান দানীর বই প্রায় একই সময়ের এবং উভয়ে উভয়ের গ্রন্থ রচনায় সাহায্যও করেছিলেন। তাইফুরের বইটি খানিকটা এলোমেলো।

তবে, নায়েব নাজিমদের সময়কার ঢাকা ও তৎকালীন ঢাকার অনেক পরিবার সম্পর্কে মূল্যবান সব তথ্য আছে গ্রন্থটিতে।

দানীর রচনাটিকে বলা যেতে পারে ঢাকা শহরের ওপর ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে লেখা প্রথম উল্লেখযোগ্য বই। এ বই তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে ঢাকার ভূগোল, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঢাকার ইতিহাস। এ অধ্যায় আবার কয়েকটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত—পাক্ মুঘল ঢাকা, মুঘল রাজধানী ঢাকা, নায়েব নাজিমদের ঢাকা, বৃটিশদের অধীনে ঢাকা [প্রথম পর্যায়], পূর্ব বঙ্গ ও আসামের রাজধানী ঢাকা, বৃটিশদের অধীনে ঢাকা [তৃতীয় পর্যায়], আধুনিক ঢাকা। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ঢাকার সৌধমালা, স্থাপত্য। এ ছাড়া ঢাকার আশেপাশের স্থাপত্যিক বিবরণও আছে।

দানী বিনয় করে বলেছেন তাঁর বইটি গাইড বুক। কিন্তু এ বইতেই আমরা প্রথম প্রাক-মুঘল যুগ থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত ঢাকার ধারাবাহিক ইতিহাস পাই। দানীর প্রধান কৃতিত্ব—বিভিন্ন সূত্র থেকে এ গ্রন্থে তিনি তথ্য জড়ো করেছেন। গ্রন্থের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের বর্ণনা। যেহেতু দানী এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সেহেতু ঢাকর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের টেকনিক্যাল বর্ণনার জন্য এটি নির্ভরযোগ্য।

মুঘল ঢাকা সম্পর্কে অনেক বইতেই কিছু না কিছু বর্ণনা আছে। কিন্তু অধ্যাপক আবদুল করিমই প্রথম মুঘল ঢাকা সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যসমূহ জড়ো করেছেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি বাংলা ও ইংরেজি ছাড়াও ব্যবহার করেছেন উর্দু ও ফার্সী উৎস। এ গ্রন্থেই প্রথম ঢাকা শহরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের বর্ণনা পাই আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায়। ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত অধ্যাপক করিমের গ্রন্থ-ভূমিকা, ঢাকার নওয়াব, ঢাকা শহরের বিকাশ, প্রশাসনিক সদর হিসেবে ঢাকা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা, এবং ঢাকা অর্থনৈতিক জীবন। এ গ্রন্থের তেরটি পরিশিষ্ট [অষ্টাদশ শতকের ঢাকা সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা নথিপত্র] ও মানচিত্রসমূহ গ্রন্থটিকে আরো মূল্যবান করে তুলেছে। এখন পর্যন্ত ঢাকা শহর সম্পর্কিত এ ধরনের মূল্যবান গ্রন্থ খুব কমই লেখা হয়েছে। আজিমুশ্শান হায়দার তাঁর 'প্লেস নেমস'-এ প্রথম বারের মত ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল, রাস্তা-ঘাটের নামের উদ্ভব ও ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলের নামকরণ সম্পর্কে এ বইটিকে এখন পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য হিসেবে ধরা হয়। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্বে, যেখানে তিনি পৌরসভার ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তা প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের অধিকাংশে ঢাকার স্থাপত্যকর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর একটি কারণ হতে পারে, লেখকরা এর মাধ্যমে ঢাকার গৌরবগাথা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

ইংরেজি ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষায় ঢাকা সম্পর্কে লেখা হয়েছে সবচেয়ে কম। কারণ স্বাভাবিক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরই কেবল বাংলা ভাষা গুরুত্ব পাচ্ছে।

বাংলা ভাষায় ঢাকা সম্পর্কিত এ পর্যন্ত যে সব বই বেরিয়েছে এখানে তার একটি তালিকা দেওয়া হল :

আব্দুল করিম	*ঢাকাই মসলিন*, ঢাকা, ১৯৬৫
আবু যোহা নূর আহমদ	*উনিশ শতকে ঢাকার সমাজ জীবন*, ঢাকা, ১৯৭৫
কেদারনাথ মজুমদার	*ঢাকার বিবরণ*, ঢাকা, ১৯১০;
	ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস, ঢাকা, ১৮৭৫
নাজির হোসেন	*কিংবদন্তীর ঢাকা*, ঢাকা, ১৯৭৬
নির্মল গুপ্ত	*ঢাকার কথা*, কলকাতা
মুনতাসীর মামুন	*ঢাকার থিয়েটার*, ঢাকা, ১৯৭৯
"	*ঢাকার কথা*, চট্টগ্রাম, ১৯৮০ *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর*, ঢাকা. ১৯৮৫
"	*স্মৃতিময় ঢাকা*, ঢাকা, ১৯৮৮
"	*পুরনো ঢাকার ঘরবাড়ি ও উৎসব*, ঢাকা, ১৯৮৯
"	*কর্ণেল ডেভিডসন যখন ঢাকায়*, ঢাকা, ১৯৯০
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ	*হাকিম হাবিবুর রহমান*, ঢাকা, ১৯৮১
যতীন্দ্রমোহন রায়	*ঢাকার ইতিহাস*, ঢাকা, ১৩১৯
রফিকুল ইসলাম	*ঢাকার কথা*, ঢাকা, ১৯৮২
সত্যেন সেন	*শহরের ইতিকথা*, ঢাকা, ১৯৭৪
হরিদাস বসু	*ঢাকার কথা*, ১৯৪৯
	অনুবাদ
এফ বি ব্রাড্‌লী বার্ট	*প্রাচ্যের রহস্য নগরী* [রহীমউদ্দীন সিদ্দিকী অনূদিত], ঢাকা, ১৩৭২
জেমস টেলর	কোম্পানী আমলে ঢাকা, [মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত] ঢাকা, ১৯৭৮
মুনশী রহমান আলী তায়েশ	তাওয়ারিখে ঢাকা [আ. ম. ম. শরফুদ্দীন আহমদ অনূদিত], ঢাকা ১৯৮৫

যতীন্দ্রমোহন ও কেদারনাথের বই দু'টি রচিত হয়েছে সিভিলিয়ানদের গেজেটিয়ারের আদলে। দু'খণ্ডে ১০৮০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির ভূমিকায় যতীন্দ্রমোহন লিখেছিলেন— 'ঢাকার ইতিহাস ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ভৌগোলিক বিবরণ, ভূতত্ত্ব, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বন্দর, জমি ও জমা, প্রাচীন কীর্তি তীর্থস্থান ও পুণ্যস্থান, দেবালয় এবং ঐতিহাসিক স্থান প্রভৃতির বিবরণ প্রথম খণ্ডে লিখিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ড

হইতে প্রকৃত ইতিহাস তথ্য লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দু শাসনকাল হইতে বারভূঞার আমল পর্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে মোঘল ও ইংরেজি শাসনকালের ইতিহাস লিখিত হইবে। চতুর্থ খণ্ডে বিভিন্ন পরগণার বিবরণ। পল্লী বিবরণ এবং জমিদারদিগের বিষয় আলোচনা করিব।' যতীন্দ্রনাথ প্রথম দু'খণ্ড রচনা করে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর তথ্যের ভিত্তি ছিল পূর্বোক্ত সিভিলিয়ানদের গ্রন্থসমূহ। ঢাকা শহর সম্পর্কে বিশালায়তন এ গ্রন্থে শ'দুয়েক পৃষ্ঠার বিবরণও আছে কিনা সন্দেহ। তবু বলা যেতে পারে, বাংলা ভাষায় রচিত যতীন্দ্রনাথের এ গ্রন্থ ঢাকা জেলা ও ঢাকা শহর সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের জানার আগ্রহ মিটিয়েছিলো।

কেদারনাথের বইটির ধরনও একই রকম— 'জেলার সাধারণ ও ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লইয়া ঢাকার বিবরণ লিখিত হইল।'

নির্মল গুপ্তের বইটি সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ। নতুন কোন তথ্যই নেই তাঁর গ্রন্থে। আবু যোহা নূর আহমেদ আসলে কি বলতে চেয়েছিলেন বা 'সমাজ' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা বোঝা যায় না। বইটির বেশীর ভাগ পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন তিনি খাজা পরিবারের ওপর, যা গালগল্পে ভরা। তবে এ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের ঢাকার থিয়েটার, খাবার দাবার সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে গ্রন্থটিতে।

রফিকুল ইসলাম ঢাকা শহরের এবং মোগল শাসন কর্তাদের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করেছেন প্রধানতঃ দানী, তাইফুর ও করিমের বই অবলম্বন করে। সাধারণ পাঠকদের বইটি ভালো লাগতে পারে।

নাজির হোসেনের বইটি মূলতঃ আজিমউশ্‌শানের 'প্লেস নেমস'-এর অনুবাদ, তাও বিশৃঙ্খল ভাবে। ব্যতিক্রম আবদুল করিম ও সত্যেন সেনের বই দু'টি। আবদুল করিমের বইতে আমরা প্রথম ঢাকাই মসলিন ও তাঁতীদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারি, যা ঢাকা শহরের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সত্যেন সেনের বিষয় এ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের ঢাকা। শহরের নাট্য আন্দোলন, উঠতি লক্ষপতি ফটিকচাঁদ, রিকশার চলাচল, রূপলাল সাহার পরিবার এসব বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ে তিনি লিখেছেন। এটি শহরের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। বিভিন্ন বিষয়ে নিবন্ধ। এসব প্রবন্ধের ভিত্তি লেখকের স্মৃতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার। এ শহরের প্রথম পঞ্চাশ বছরের সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসের জন্য গ্রন্থটি প্রয়োজনীয়। তবে সত্যেন সেন ঐতিহাসিক ছিলেন না। ফলে, অনেক তথ্য তাঁর পক্ষে যাচাই করা সম্ভব হয়নি, পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকাও স্বাভাবিক। এ বইটি ব্যবহারের সময় সন তারিখ সম্পর্কে খানিকটা সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।

অনেকের আত্মজীবনীতেই ঢাকার উল্লেখ আছে। কারো আত্মজীবনীর সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে আছে ঢাকা, কারো আত্মজীবনীর ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ঢাকা সম্পর্কে। আত্মজীবনীর এ ধরনের অংশগুলি একত্র করতে পারলেও উনিশ ও বিশ শতকের ঢাকার চমৎকার বর্ণনা পাব আমরা। এ ধরনের কয়েকটি বই—

পরিতোষ সেন	*জিন্দাবাহার*, কলকাতা, ১৩৮৬
বুদ্ধদেব বসু	*আমার ছেলেবেলা*, কলকাতা, ১৯৭৩
ভবতোষ দত্ত	*আট দশক*, কলকাতা, ১৯৮৮
রমেশচন্দ্র মজুমদার	*জীবনের স্মৃতি দীপে*, কলকাতা, ১৯৭৮
দীনেশচন্দ্র সেন	*ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৬৯
Clay. A. L	*Leaves from a Diary in Eastern Bengal*, London, 1898
Majumdar. Hridaynath	*The Reminiscence of Dacca*, Calcutta, 1926

এসব বইয়ের মধ্যে ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে হৃদয়নাথের বইটি সবচেয়ে মূল্যবান। হৃদয়নাথের পুরো বই-ই ঢাকাকে ঘিরে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ঢাকা শহরের আয়তন, সমাজ, শিক্ষাসংস্কৃতি সম্পর্কে এটি একটি মূল্যবান আকর গ্রন্থ।

পরিতোষ সেন প্রথিতযশা শিল্পী। জিন্দাবাহারে'র নয়টি রচনা যেন রংয়ে ঝলমল ন'টি ক্যানভাস। এ শতকের প্রথম তিন দশকের সমাজ সংস্কৃতির চমৎকার আলেখ্য ফুটে উঠেছে পরিতোষ সেনের লেখায়। ভবতোষ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখায়ও আমরা ঐ সময়ের ঢাকা শহর, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানতে পারি। ঢাকার মহামারী সম্পর্কে চমৎকার এক বিবরণ আছে দীনেশচন্দ্রের লেখায়। ক্লে ঢাকার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ১৮৬৭ সালে। ঐ সময়ের ঢাকার একটি সাধারণ বিবরণ আছে তাঁর রোজনামচায়। এ ধরনের আরো অনেক তথ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন জনের স্মৃতিকাহিনীতে।

আগেই উল্লেখ করেছি ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ঢাকা সম্পর্কে বেশ ক'টি মূল্যবান বই রচিত হয়েছে, যার কিছু পাণ্ডুলিপি আকারে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ বইগুলি খুব একটা ব্যবহৃত হয়নি। নীচে এর তালিকা দিচ্ছি—

নওয়াব নুসরত জং	*তাওয়ারিখ ই নুরসরাত জঙ্গী* [হরিনাথ দে সম্পাদিত] মেমোয়ার অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, কলকাতা
মীর্জা নাথান	*বাহারিস্তান ই গায়েবী* [ইংরেজি অনুবাদ এম আই বোরাহ], গৌহাটি, ১৯৩৬
হাকিম হাবিবুর রহমান	*আসূদ গানে ই ঢাকা*, ঢাকা, ১৯৪২
,,	*ঢাকা আজ সে পচাশ বরস্ পহলে*, লাহোর, ১৯৪৯
রহমান আলী তায়েশ	*তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা*, আরা ১৯১০ *তাওয়ারিখ-ই-খাওয়াজগান*।

নুসরত জং ছিলেন ঢাকার নায়েব নাজিম। তাঁর বইয়ের মূল বিষয় ঢাকার স্থাপত্য।

হাকিম হাবিবুর রহমানের 'ঢাকা আজ সে পচাশ বরস্ পহলে' ষাটের দশকে 'দৈনিক আজাদে' ধারাবাহিক ভাবে অনূদিত হয়েছিল বলে শুনেছি। কিন্তু সে ফাইল খুঁজে পাইনি। তাঁর অন্য বইটি এখনও অনূদিত হয়নি। তবে, বিভিন্ন গ্রন্থে বা প্রবন্ধে তাঁর গ্রন্থ দু'টি থেকে যেসব তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে [ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ] বিক্ষিপ্তভাবে, তা থেকে মনে হয় বই দু'টি ইংরেজি বা বাংলায় অনূদিত হলে পাঠক সমাজ নতুন তথ্য জানতে পারবেন উনিশ শতকের শেষার্ধের ঢাকা শহর ও সমাজ সম্পর্কে। 'বাহারিস্তানে'র অনুবাদ তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমী। অনুবাদ করেছেন খালেকদাদ চৌধুরী।

তায়েশের বইটি সম্প্রতি বাংলা অনুবাদ করে আ. ম. ম. শরফুদ্দীন আহমদ বাঙ্গালী পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ৩১টি অধ্যায়ে সমাপ্ত এ বইয়ের ২৩ থেকে ৩১তম অধ্যায় ক'টি বিশেষ মূল্যবান। একটি অধ্যায়ে ঢাকা শহরের অভিজাত পীর, ফকির, সরদার, নায়েব, নাজিম, গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্পর্কে নতুন তথ্য আছে।

বই পুস্তক, দলিল দস্তাবেজ ছাড়াও ঢাকা শহর, সংস্কৃতি সমাজের ইতিহাস নির্মাণের জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপাদান সংবাদ সাময়িকপত্র। বিশেষ করে উনিশ শতকের। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঢাকা শহর থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা এখন লুপ্ত, তিনটি পত্রিকার ফাইলের সন্ধান পাওয়া গেছে :

Bengal Times 1974-1905
Dacca News 1856-58
ঢাকা প্রকাশ-১৮৬৪-১৯৬০

প্রথম দু'টি পত্রিকার প্রায় সব কপি রক্ষিত আছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে। 'ঢাকা প্রকাশে'র প্রায় একশো বছরের ফাইল রক্ষিত আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। তবে অযত্নে অবহেলার কারণে শেষোক্ত পত্রিকার ফাইলটি খুব শীঘ্র ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এ সব পত্রিকায় উনিশ শতকের শেষ পঞ্চাশ বছরের ঢাকার বিভিন্ন দিক, যেমন, শহরের বিস্তার, পৌর কার্যক্রম, সংস্কৃতি, ব্যক্তি বিষয়ক অজানা অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

এসব বইপত্র পত্রিকা ছাড়াও ঢাকা শহর সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যার একটি পঞ্জী তৈরি করা উচিত। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক নজরুল ইসলামের পরিচালনায়, নগরগবেষণা কেন্দ্র সমকালীন ঢাকার নগরায়নের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছে, প্রকাশ করেছে কিছু রিপোর্ট। কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা নগর জাদুঘরও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ঢাকা নগর সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহের।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, ঢাকা সম্পর্কে এখনও দু'ধরনের কাজ করা যায়। এক, ঢাকা সম্পর্কিত তথ্যসমূহের সমন্বয় সাধন করে

শহরের ধারাবাহিক ইতিহাস ও নতুন তথ্য সংগ্রহ; দুই ঢাকা শহরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আর্থ-সামাজিক ভিত্তিতে নগরায়ন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা। এ প্রসঙ্গে এখানে দু'টি বইয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত এ গ্রন্থ দু'টি, এখন পর্যন্ত প্রকাশিত ঢাকা সম্পর্কিত বইয়ের মধ্যে ব্যতিক্রম এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বই দুটি হ'ল :

Ahmed, Sharfuddin — *Dacca*, London, 1986
Siddiqui, Kamal etal — *Social Formation in Dhaka*, Dhaka, 1990

শরিফউদ্দিন আহমদের বইয়ের পুরো নাম 'ঢাকা ঃ এ স্টাডি ইন আরবান হিস্ট্রি অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট'। বইটি তাঁর পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর অভিসন্দর্ভের ভিত্তিতে রচিত। ১৮৪০ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত ঢাকা শহরের বিস্তারিত ইতিহাস তিনি তুলে ধরেছেন। এ সময়টুকুতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন কি ভাবে ক্ষয়িষ্ণু একটি শহর থেকে ঢাকা আস্তে আস্তে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। অজস্র অজানা তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে এ গ্রন্থে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় অধ্যাপক করিমের গ্রন্থের পর, এ পর্যন্ত ঢাকার ওপর রচিত এ গ্রন্থটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রথম একটি বই রচিত হয়েছে ঢাকা সম্পর্কে, যেখানে অবলম্বন করা হয়েছে বিশেষ একটি পদ্ধতি, তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে বাছাই করে এবং বিষয়বস্তুর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে সাবলীল ভাষায়। টেইলরের বইয়ের ঠিক দেড়শো বছর পর আরেকজন সিভিলিয়ান ডঃ কামাল সিদ্দিকীর নেতৃত্বে প্রকাশিত হয়েছে একটি বড় মাপের বই 'সোস্যাল ফরমেশন ইন ঢাকা সিটি' বা ঢাকা শহরের সমাজগঠন। সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার গ্রন্থটি রচনা করেছেন চারজন গবেষক— কামাল সিদ্দিকী, সৈয়দা রওশন কাদির, সিতারা আলমগীর এবং সাঈদুল হক।

১৯৮৪ সালে গবেষক চারজন এই গবেষণার কাজ শুরু করেন। প্রধানতঃ 'জরীপ' পদ্ধতি নিয়ে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। পাঁচ বছর পরিশ্রমের পর তাঁরা পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করতে পেরেছেন। এদিক থেকে দেখলে, ঢাকা শহরের ওপর এ পর্যন্ত এটিই বড় ধরনের জরীপ।

টেইলরের বইটি এখনও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর সমাজ-সংলগ্নতা। ওয়ালটার্সের প্রবন্ধে আছে নিছক কিছু পরিসংখ্যান। বর্তমান বইটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, ঐ দু'টি প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা হয়েছে এ গ্রন্থে। বইটি সমাজসংলগ্ন ত' বটেই, অধিকন্তু এর সারণী সংখ্যাও কম নয়, একশো পঁচিশটি।

আলোচ্য 'সোস্যাল ফরমেশন' শীর্ষক বই-এ অধ্যায়ের সংখ্যা আট। অধ্যায়গুলি হচ্ছে—ঢাকা শহরের সামগ্রিক পর্যালোচনা, গৃহস্থালী জরীপ, সরকারী কলোনীতে বসবাসরত বাসিন্দা, ঢাকার বড়লোক, ফরম্যাল এবং ইনফরম্যাল সেকটরের দরিদ্র, ভিক্ষুক, পতিতা ও অপরাধী এবং ঢাকা শহরের সমাজ-পরিবর্তনের উপাদান। গবেষক চারজন এ গ্রন্থের মাধ্যমে ঢাকার সমাজের অন্তর্নিহিত ডিনামিক্স ধরতে চেয়েছেন

এবং এ প্রক্রিয়া চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। শুধু ঢাকার সমাজ গঠন নয়, বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ গঠন বোঝার জন্যও বইটি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে. যতদিন যাবে এ বইয়ের মূল্য ততই বৃদ্ধি পাবে। এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের পক্ষে এ বই এড়িয়ে ঢাকার সমাজ সম্পর্কিত গবেষণা দুরূহ হয়ে উঠবে।

ঢাকা শহর সম্পর্কে এ পর্যন্ত যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে পেশাদার ঐতিহাসিকের সংখ্যা কয়েক জনের বেশী হবে না। অধিকাংশ বইতে পুরাতত্ত্বই বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে। অধ্যাপক করিম ও শরিফউদ্দিনের বই ছাড়া শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে নগরীর ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি। তবে এখন পেশাদার ঐতিহাসিক এবং ঢাকা সম্পর্কে যাঁরা গবেষণায় আগ্রহী তাঁদের কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছেন পূর্বোক্ত গ্রন্থকাররা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও উল্লেখ্য যে, এ শহর সম্পর্কে তথ্যের স্বল্পতা বা অন্য কথায় সংরক্ষিত নথিপত্রের অভাব চোখে পড়ার মত। এ কারণে ঢাকা সম্পর্কিত অধিকাংশ বই-ই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এখন পেশাদার ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাজ শুধু পদ্ধতিগত শৃঙ্খলার সঙ্গে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে শহরের ইতিহাস রচনাই নয়, নথিপত্র, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বয়োবৃদ্ধদের স্মৃতিচারণ সংরক্ষণ, যাতে পরবর্তীকালে আরো নতুন তথ্যের আলোকে সুষ্ঠুভাবে এ শহরের ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়।

অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী ও ঢাকা শহর

[আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক অধ্যাপক আহমদ হাসান দানীর নতুন করে পরিচয় দেয়া নিষ্প্রয়োজন। ১৮৫০-এর দিকে তাঁর পূর্বপুরুষ কাশ্মীর ছেড়ে চলে এসেছিলেন ছত্রিশগড়ের গন্ডে। দানীর ভাষায়, কাশ্মীর থেকে এসে তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন ছত্রিশগড়ে 'সংস্কৃতি বিকাশে'। তিনি নিজেও তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, যৌবনকাল অতিবাহিত করেছিলেন পূর্ববঙ্গে, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ঢাকায়। সক্রিয়ভাবে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এখানকার শিক্ষা-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে।

বাল্যকালে শিক্ষালাভ করেছিলেন তিনি গ্রামের পাঠশালায় এবং পরে মার্কিন মিশনারী কলেজে। তারপর নাগপুর কলেজ থেকে পাস করে ভর্তি হয়েছিলেন বেনারস হিন্দু কলেজে। স্নাতক পর্যায়ে সংস্কৃত ভাষা ছিলো তাঁর অন্যতম বিষয়। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, করেছিলেন ইতিহাসে। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ছিলেন তিনি রেকর্ড মার্কস পেয়ে। তাঁর সেই রেকর্ড (১৯৪৪) আজ ৪৪ বছর পরও কেউ ভাঙতে পারেন নি।

বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম ছিলো যিনি এ-ধররনের ফল করবেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে যাবেন। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এই নিয়মও ছিলো যে, হিন্দু ছাড়া কেউ শিক্ষক হতে পারবেন না। দানীর ভাষায়, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পড়লেন মুশকিলে। আইন আনুযায়ী আমি শিক্ষক হয়ে বেতন পেতে লাগলাম। কিন্তু আরেক আইন অনুযায়ী আমি শিক্ষক নই। উপাচার্য রাধাকৃষ্ণ বললেন, তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানে বন্দোবস্ত করে দেবো। হায়দ্রাবাদের নিযামের ওখানেও আমার একটা চাকরি হয়ে গেলো। বেতনও পেতে লাগলাম।

এ সময় তক্ষশীলা খনন করতে এলেন স্যার মর্টিমার হুইলার। তিনি ছ'মাসের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করেছিলেন। 'বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে পাঠালো সেখানে।' ছ'মাস পর হুইলার তাঁকে বললেন তাঁর সহকর্মী হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে যোগ দিতে। ১৯৪৫ সালে দানী সেখানেই যোগ দিলেন।

ভারত বিভাগের সময় তিনি ছিলেন দিল্লীতে। তিনি পাকিস্তানে চলে আসতে চাইলে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল পূর্ব বাংলায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ছিলেন তিনি এখানে। তারপর পেশোয়ার, করাচী বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে, এখন প্রফেসর এমেরিটাস

হিসেবে আছেন ইসলামাবাদের কায়েদে আযম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ-ছাড়াও জড়িত আছেন তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে।

অধ্যাপক দানী বলেছিলেন, 'আমার কোনো পেনশন নেই।' কারণ, একই জায়গায় তিনি সবসময় চাকরি করেন নি। অধ্যাপনা করেছেন বিভিন্ন দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর পেনশন নেই বটে, কিন্তু ছাত্র ও গুণগ্রাহীরা ছড়িয়ে আছেন দেশে-বিদেশে।

সত্তর ছুঁইছুঁই সুপুরুষ অধ্যাপক দানী এখনও কর্মঠ। ১৯৮৮ সালে ঢাকায় প্রথম সার্ক ইতিহাস সম্মেলনে যোগ দিতে আসার আগে গিলগিটের ওপর প্রায় ছ'শ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন করে এসেছিলেন।

অধ্যাপক দানী অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বর্তমান জাতীয় জাদুঘর বিকাশে করেছেন সহায়তা, উদ্যোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিদ্বৎসভা 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। ঢাকা শহরের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার কৃতিত্বও তাঁর। ঢাকা শহর সম্পর্কে লিখতে গেলে এখনও দ্বারস্থ হতে হয় তাঁর 'ঢাকা : এ রেকর্ড অফ ইটস চেনজিং ফরচুনসের।'

এ নিবন্ধ ঐতিহাসিক হিসেবে অধ্যাপক দানীর মূল্যায়ন নয়। এ নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে ঢাকা শহরে অবস্থানকালে তাঁর কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে প্রতিষ্ঠান গড়ায় তাঁর ভূমিকা। বর্তমান নিবন্ধটি রচিত হয়েছে প্রথম সার্ক ইতিহাস সম্মেলন উপলক্ষে (এপ্রিল মাসে) তিনি যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন নেয়া তাঁর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

আত্মজৈবনিক এ সাক্ষাৎকার নেয়ার একপর্যায়ে অধ্যাপক দানী বলেছিলেন, 'পাকিস্তানে আমার ওপর দু'টি ডকুমেন্টারী হয়েছে। কিন্তু সেখানে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্ব, ঢাকা পর্ব অনুপস্থিত। এ বিষয়ে বলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে, যিনি ছিলেন আমার ছাত্র। কূটনৈতিক বিধায় তিনি এতে অংশ নিতে পারেন নি। যাক, এখন আমার যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়, ঢাকার কথাও বলা হয়ে গেলো']

চৌদ্দ আগস্ট, ১৯৪৭। সৃষ্টি হলো পাকিস্তানের। অধ্যাপক দানী তখন দিল্লীতে। ১৫ আগস্ট রওয়ানা হলেন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দিকে। কলকাতায় দেখা হলো প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিনটেন্ডেন্ট শামসুদ্দিন আহমদের সঙ্গে। দানী ছিলেন সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট। শামসুদ্দিন আহমদের ধারণা ছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সদর দফতর হবে মুর্শিদাবাদ। কিন্তু জানা গেল, মুর্শিদাবাদ পড়েছে ভারতে। সুতরাং তল্পিতল্পা গুটিয়ে দু'জনে চলে এলেন রাজশাহী।

একে দেশভাগ হয়েছে, তার ওপর সরকারের সবচেয়ে অবহেলিত দফতর হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব। সুতরাং রাজশাহী এসে দফতর দূরের কথা নিজেদের থাকার জায়গাও পেলেন না তাঁরা। রাজশাহী নেমে, প্রথম রাতটা কাটালেন তাঁরা দু'জন বরেন্দ্র জাদুঘরের বারান্দায়, 'এবং সেদিন বুঝলাম', বললেন অধ্যাপক দানী, 'বাংলাদেশের মশা কি জিনিস'।

রাজশাহীর ডেপুটি কমিশনার তখন একজন বাঙালি। কমিশনার ছিলেন টি. আই নূরন্নবী। দানীর বয়স তখন ছাব্বিশ সাতাশ, উৎসাহে ভরপুর। দেখা করলেন কমিশনার

ও ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে। 'কাজ করতে চাই।' কমিশনার একটি টাইপরাইটার ছাড়া আর কিছুই দিতে পারলেন না। ঐ টাইপরাইটার নিয়েই শুরু হলো প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাজ। মৌলবী শামসুদ্দিন আহমদের একজন আত্মীয় ছিলেন রাজশাহীতে। সেখানে সাময়িকভাবে আশ্রয় মিললো। দিন পনেরো পর দানী নিজের এবং দফতর খোলার জন্য বাড়ি পেলেন। এর একমাস পর প্রথম ঢাকায় এলেন দানী। সঙ্গে তাঁর সুপারিনটেন্ডেন্টও। ঢাকায় তখন থাকার জন্য হোটেলের ব্যবস্থা ছিল না। তবে, মেসের সংখ্যা ছিল অনেক। সেই উনিশ শতক থেকেই এ ধরনের ব্যবস্থা চালু ছিল। তার রেশ তখনও কাটেনি। মৌলবী শামসুদ্দিন উঠলেন এক মেসে। দানী গুলিস্তানের মোড়ে রমনা রেস্ট হাউসে। 'তখন ঢাকা ছিল কেমন?' অধ্যাপক দানীর ভাষায় 'ছোট শহর ঢাকা। রমনা রেস্ট হাউসটা বলা যেতে পারে তখন মূল শহরের সীমান্তে। নওয়াবপুর ছিল গমগমে এলাকা। কিছু নতুন বাড়িঘর উঠছিল তোপখানা ও পুরানা পল্টনে। আজকের বঙ্গভবন তখন ছোট্ট এক অট্টালিকা, গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বোর্নের বাসভবন। অট্টালিকাটি আদতে কে তৈরি করেছিলেন তা জানি না। মতিঝিল তখন শুধু ময়দান। ধানমন্ডি জঙ্গল। সাতমসজিদ দেখতে গিয়েছিলাম খুব কষ্ট করে। সাইকেলে চেপে, পায়ে হেঁটে জলা-জঙ্গল পেরিয়ে। ধানমন্ডির ঈদগার কাছে মোগল আমলের পুরোনো সাঁকোটি তখনও ছিল। সাতমসজিদে একজন ফকির থাকতেন তখন। লোকজন নামাজ পড়তেও সেখানে যেতেন কিনা সন্দেহ। রমনার সিভিল লাইনে বাড়িঘর ছিল কিছু। তারপর শুধু গ্রাম।'

১৯৪৮ সাল। ডঃ মাহমুদ হাসান তখন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন কর্মকর্তা। একবার ঢাকায় এসে তিনি ডেকে পাঠালেন মৌলবী শামসুদ্দিন ও আহমদ হাসান দানীকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হাদী সাহেবের বাসায় বললেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। 'আমি অবশ্য জানতাম না, সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য', বললেন অধ্যাপক দানী। পরে অবশ্য শুনেছিলেন, ড. মাহমুদ হাসান এসেছিলেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক পদের ইন্টারভ্যু নিতে।

যা'হোক তাঁকে ডাকা হলো সাক্ষাৎকারের জন্য। দানীর বয়স তখন আটাশ। ড. মাহমুদ তাঁকে দেখেই বললেন, 'ইউ আর টু ইয়ং টু বিকাম ডিরেকটর।' 'কিসের ডিরেকটর?' জিজ্ঞেস করলেন দানী, 'আমি তো জানিই না আমাকে কেন ডেকেছেন। তা' আমার বয়স কম, সেটা কি আমার দোষ?'

উত্তর শুনে ক্রুদ্ধ হলেন ডঃ হাসান। বললেন, 'কি, তুমি খোদাকে দোষ দিচ্ছো?' তারপর ক্রুদ্ধ হয়েই বসতে বললেন দানীকে। তিনি বিনীতভাবে বললেন, 'না স্যার, দোষ দেবো কেন? মানে, আমার বয়স কম, তা আমি কি করতে পারি?'

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর শান্ত হলেন ডঃ মাহমুদ হাসান। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালের হিষ্ট্রি অফ বেঙ্গল পড়েছো?' 'পড়েছি', উত্তর দিলেন দানী, 'তবে, আমি ভিসি হলে বইয়ের ঐ ফরোয়ার্ড লিখতাম না।'

'মানে?' আবার যেন খানিকটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন ডঃ মাহমুদ হাসান।

এখানে বলে রাখা ভালো, 'হিষ্ট্রি অফ বেঙ্গল'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিলো

১৯৪৮ সালে। প্রকাশক ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ খণ্ডটি সম্পাদনা করেছিলেন যদুনাথ সরকার। মাহমুদ হাসান ছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ঐ বছরই তিনি চলে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা হিসেবে। খুব সম্ভব বইয়ের 'ফরোয়ার্ড'-এ মাহমুদ হাসানের একটি মন্তব্য প্রসঙ্গে দানী এ মন্তব্য করেছিলেন। মন্তব্য ছিলো 'বাট ফর দি এ্যাডমিরেবল প্রম্পটনেস এণ্ড স্কিল উইথ হুয়িচ হি মডিফাইড আওয়ার ওল্ড স্কিম টু স্যুট দি অলটারড কণ্ডিশন...' যা হোক, দানীর মন্তব্য শুনে মাহমুদ হাসান ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন., 'মানে?'

'বইটি সম্পাদনা করেছেন যদুনাথ সরকার। বইটি প্রকাশিত হয়েছে পাকিস্তান হবার পর। আমার মনে হয়, এখানকার মুসলমানদের গঠিত ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ হয় নি।' 'তুমি এবার যেতে পারো।' সাক্ষাৎকার শেষ। দানী হাদী সাহেব থেকে বিদায় নেবার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি ভি, সি'র সঙ্গে কথা সেরে এসে দানীকে বললেন, 'ভি, সি, আপনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার হিসেবে জয়েন করতে বলেছেন।'

এবার দানীর অবাক হবার পালা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একবারে রীডার হওয়া খুব সহজ কথা নয়। তারপর বাকি থাকে মাত্র একটি পদ; সেটি হলো প্রফেসরের। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন তখন খুব কম। রীডারের স্কেল ছিলো খুব সম্ভব চারশ' থেকে আটশ' টাকা। আর দানী তখন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম শ্রেণীর চাকুরে, যার বেতনের স্কেল চারশ' থেকে একহাজার টাকা। তাই রেজিষ্ট্রারের প্রস্তাব শুনে তিনি বললেন, 'না, আমি জয়েন করবো না, কারণ আমার বেতনের স্কেল এখানে বেশি।' অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ না দেয়ার অন্য আরেকটি কারণও ছিলো। তাঁর পরিবার তখন অমৃতসর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান এসেছেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে তখনও মিলিত হন নি। তাই তিনি চলে যেতে চাচ্ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান।

দানীর ওপর তখন ছিলেন দু'জন সিনিয়র। এদের একজন পশ্চিম পাকিস্তানে, তেমন শিক্ষিত নন, কিন্তু অনেক সিনিয়র। দানী পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি হবার আবেদন জানালেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে যিনি ছিলেন তাঁকে অন্যখানে পাঠানো যাচ্ছিলো না, কারণ সে যোগ্যতা তাঁর ছিলো না। ফলে দানীর আবেদন অগ্রাহ্য হলো। তিনি পদত্যাগ করলেন। গৃহীত হলো না সে পদত্যাগপত্র। এরপর চার-চারবার পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন তিনি কিন্তু কোনোবারই তা গৃহীত হয় নি।

তিক্ত-বিরক্ত হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। মঞ্জুর হলো সে আবেদন। সোজা করাচী চলে গেলেন তিনি।

মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের সময় দেয়া হলো সকাল ন'টায়। দানী ভোর সাতটায় গিয়ে বসে রইলেন। অপেক্ষা করলেন দুপুর দু'টা পর্যন্ত। মন্ত্রী কথা দিয়ে সাক্ষাৎকার দিলেন না। অপমানিত হয়ে তিনি আবার পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন এবং ঠিক করলেন পদত্যাগ গৃহীত হোক বা না হোক তিনি আর চাকরি করবেন না।

ইতোমধ্যে স্যার মর্টিমার হুইলার কেন্দ্রীয় সরকারের একজন পরামর্শদাতা হিসেবে যোগ দিয়েছেন। দানী ছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র। কার কাছে যেন তিনি শুনলেন, দানী

পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। খুঁজে পেতে দানীর ঠিকানা সংগ্রহ করে তিনি টেলিগ্রাম পাঠালেন, 'দেখা করো আমার সঙ্গে'।

বাধ্য ছাত্রের মতো দানী দেখা করলেন হুইলারের সঙ্গে। হুইলার বললেন, 'তোমার পদত্যাগ করা চলবে না। তুমি কাজ করবে আমার সঙ্গে' 'স্যার,' জবাব দিলেন ছাত্র, 'কাজ করতে হলে আপনার জন্যই করবো, মন্ত্রী ফজলুর রহমানের জন্য নয়।'

হুইলারের সঙ্গে মহেঞ্জোদারোতে কাজ করলেন ছ'মাস। তারপর, তিনি আবার দানীকে পাঠালেন পূর্ব বাংলায়।

হুইলার তখন 'ফাইভ থাউজ্যাণ্ড ইয়ারস অফ পাকিস্তান' নামে একটি বই লিখছেন। দানীর ওপর নিদের্শ ছিলো, ফিল্ড ওয়ার্ক করে তার ওপর রিপোর্ট পাঠানো। সারা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা চষে বেড়ালেন দানী। সারাদিন ফিল্ডে কাটালেন। বিকেলে ক্যাম্পে ফিরে রিপোর্ট লিখে তা আবার পরদিন হুইলারকে পাঠাতেন। ঐ সময় পাসপোর্ট-ভিসার ঝামেলা ছিলো না। তাই অবাধে ঘুরে বেড়াতে পেরেছেন। ঐ সময় [১৯৪৯] তিনি বিয়েও করলেন। বিয়ে হলো দিল্লীতে। 'কিন্তু হানিমুন করেছিলাম ট্রেনে', বললেন অধ্যাপক দানী, 'কলকাতা থেকে রাজশাহী, ট্রেনে আসার পথে।' হুইলার প্রচণ্ড খাটতে পারতেন। একটি উদাহরণ দিয়েছেন দানী। একবার হুইলার এসেছেন ঢাকায়। একদিন সকালে তিনি দানীকে নিয়ে বেরুলেন মুন্সীগঞ্জ বা ঐ ধরনের কোথায় একটি স্থাপত্য কর্ম দেখতে। দেখাটেখা শেষ করে নারায়গঞ্জ থেকে রওয়ানা হয়েছেন ঢাকায়। পথে জীপ গেলো নষ্ট হয়ে। দু'জনে মিলে জীপে ঠেলে এবং তারপর চালিয়ে রাত এগারোটায় পৌঁছলেন ঢাকায়। হুইলার চলে গেলেন গভর্ণমেণ্ট হাউসে। সেদিন সকালে তিনি চলে যাবেন করাচী। দানীকে বললেন, 'রিপোর্টটা লিখে আমাকে পৌঁছে দিয়ো।' গভীর রাতে রমনা রেস্ট হাউসে পৌঁছে রিপোর্ট লিখতে বসলেন দানী। ভোর চারটায় পৌঁছে দিলেন তা হুইলারকে। রিপোর্ট বগলদাবা করে হুইলার রওয়ানা হলেন করাচী। 'আমার সেইসব রিপোর্টের ভিত্তিতে স্থাপত্যের ওপর তাঁর সেই বইটি বেরিয়েছিলো', 'জানালেন আধ্যাপক দানী', 'কিন্তু হুইলারের নামে। সরকারী চাকরিতে তাই হয়।' অবশ্য এ কথা বলার সময় তাঁর গলার স্বরে কোনো ক্ষোভ ছিলো না, বরং ছিলো কৌতুকের ছোঁয়া।

ইতোমধ্যে হুইলার ত্যাগ করলেন পাকিস্তান। দানীর স্ত্রীও চলে গেলেন লাহোর তাঁর শাশুড়ীর কাছে। দানী ঢাকায়। কি করবেন ভাবছেন। চাকরির ইচ্ছে নেই। এমনি সময় একদিন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে নিয়ে গেলেন এ, জি, অফিসে তাঁর এক বন্ধুর কাছে। দানীর পরিচয় পেয়ে সেই বন্ধুটি বললেন, 'আরে আপনিই দানী! আপনি তো আমাদের অস্থির করে তুলছেন ভাই চিঠি দিয়ে দিয়ে।' 'কি করবো?' জানালেন দানী, 'আমি চাকরি করতে চাই না।'

'আরে সেটা তো খুব সোজা, 'বললেন বন্ধুর বন্ধু, 'এখানে এখনও সব টেম্পোরারি। সুতরাং আপনার চাকরিও টেম্পোরারি। এ ধরনের চাকরিতে একমাসের নোটিশই যথেষ্ট।'

সুতরাং এবার তিনি পদত্যাগের জন্য একমাসের নোটিশ দিলেন। পদত্যাগপত্র গৃহীত হলো না কিন্তু চাকরি করার বাধ্যবাধকতাও তাঁর রইলো না। ঠিক করলেন

তারপর লাহোর ফিরে যাবেন।

ঐ সময় রাজশাহী থেকে তিনি যখন ঢাকায় আসতেন তখন মাঝে মাঝে ঢাকা জাদুঘরে যেতেন পড়াশোনা করতে। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মৃত্যুর পর, ঢাকা জাদুঘরের ভার দেয়া হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যাপক এস, কে, ব্যানার্জীর ওপর। তাঁর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন দানী। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু অধ্যাপকের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো।

চাকরিতে নোটিশ দেয়ার পর যখন তিনি ঠিক করলেন লাহোর যাবেন তখন পকেটে তাঁর প্লেনের টিকিট ছাড়া অল্প কয়েকটি টাকা ছিলো মাত্র। যেদিন ঢাকা ছাড়বেন তার আগের দিন রাতে রেডিওতে তাঁর এক কথিকা পড়ার কথা। উর্দুতে। কথিকা পড়ে বন্ধু এস, কে, ব্যানার্জীর কাছে বিদায় নিতে এলেন। তখন শুনলেন, ইতিহাস বিভাগের ড: হালিম তাঁর খোঁজ করছেন। ভিসি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললের ভিসি ছিলেন তখন ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন] তিনি এখনও জীবিত]। রেডিওতে দানীর কথিকা শুনে তিনি ডঃ হালিমকে বলেছিলেন দানীকে পরদিন তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। ডঃ হালিম জানতেন এস, কে, ব্যানার্জীর সঙ্গে দানীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তাই এস, কে, ব্যানার্জীকে বলে দিলেন দানীর কথা।

দানী এতোসব জানতেন না। তিনি পরদিন ডঃ হালিমের সঙ্গে দেখা করলেন। ডঃ হালিম তাঁকে নিয়ে গেলেন ভিসি'র বাসায়। দু'জনের কেউ-ই জানতেন না ভিসি কেন ডেকেছেন তাঁদের।

ভিসি'র বাসায় গিয়ে দেখলেন তিনি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ঘরে ঢুকতেই ভিসি চেয়ার ছেড়ে উঠে দু'জনকে অভ্যর্থনা জানালেন। একজন ভিসি'র এ ধরনের আপ্যায়ন অভিভূত করেছিলো দানীকে। প্রাথমিক আলাপের পর ভিসি বললেন দানীকে, 'আমি গতকাল আপনার রেডিও টক শুনেছি। আমি চাই আপনি যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

দানী তো অপ্রস্তুত। বয়স তখন তাঁর অল্প, অখ্যাত। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র সম্মান তখন অনেক উপরে। আমতা-আমতা করে বললেন তিনি, 'মানে, আমি তো চাকরিতে রিজাইন করেছি। আমার স্ত্রী পশ্চিম পাকিস্তানে। আমি সেখানে যেতে চাই। তা'ছাড়া আমার টিকিটও কাটা হয়ে গেছে।'

'ওসব হবে-টবে না, বললেন ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, 'আমাদের এখন শিক্ষক নাই। আপনাকে রীডারশীপ দেবো।'

দানী ঠিক করতে পারছিলেন না কি করবেন, পাকিস্তানে তিনি বাস্তুহারা। স্ত্রী থাকেন লাহোরে এক বান্ধবীর সঙ্গে। তার ওপর তিনি তখন বেকার। বললেন, 'আমি ঠিক কি করবো এখানো জানি না।'

ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ভাবলেন, দানী বোধহয় বেতন নিয়ে চিন্তিত। তাই তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, কতো চাই, সাড়ে চার'শ। পাঁচ'শ।

দানী নীরব।

'ছয়'শ।

দানী ভেবে পাচ্ছেন না কি বলবেন।

'সাতশ, আটশ'।

এবার দানী অস্থির এবং বিব্রত হয়ে বললেন, ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, আমাকে একটু চিন্তা করতে দিন।'

'চিন্তা করার কিছু নেই।' বললেন ভিসি। তারপর পি, এ, কে ডেকে বললেন নিয়োগপত্র তৈরি করতে ইতিহাস বিভাগের রীডার হিসেবে। বেতন আটশ' টাকা। নিয়োগপত্র তৈরি হলে তা দানীর হাতে দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে একমাসের ছুটির মঞ্জুর করলাম। যান, বউ নিয়ে আসুন।'

পরদিন লাহোর পৌঁছলেন দানী। বিমানবন্দরে তাঁর স্ত্রী আসেননি লজ্জায়। কারণ, থাকেন তিনি বান্ধবীর বাসায়, স্বামী বেকার। বিমানবন্দরে এসেছিলেন তাঁর বোন ও বাবার এক বন্ধু। পাঞ্জাবের মুখ্যসচিব খাজা আব্দুর রহিমের পিতা ছিলেন দানীর বাবার এই বন্ধু। বিমানবন্দরে দানীকে বললেন তিনি, 'বাচ্চে কি করবে। সব তো ছেড়ে এসেছো।'

দানী তখন তাঁকে দেখালেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগপত্র। তিনি বললেন, 'বাচ্চে, তোমার প্রতি আমার আস্থা আছে। নিশ্চয় তুমি ভালো কিছু করেছো।'

'কিছু না', বললেন দানী, 'সব খোদার দান।'

এরপর দানীর স্ত্রী রাজি হলেন তাঁর সঙ্গে ঢাকায় আসতে। ছুটি শেষ হলে লাহোর থেকে ট্রেনে রওয়ানা হলেন ঢাকা। লাহোর, দিল্লী, কলকাতা হয়ে পৌঁছলেন ঢাকায়। যোগ দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডারই নয়, ঢাকা জাদুঘরের কিউরেটরের ভারও দেয়া হলো তাঁর ওপর।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে তাঁকে থাকতে দিয়েছিলো আজিমপুরের বিশ্ববিদ্যালয় ফ্লাটে। তারপর দানী এসে উঠলেন পুরনো জাদুঘরের বাসায় এবং ঢাকা ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত ছিলেন তিনি সে বাসায়।

২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান তখন খানিকটা নড়বড়ে। দেশ বিভাগের পর অধিকাংশ হিন্দু শিক্ষক চলে গেছেন ঢাকা ছেড়ে। ভারতে যাদের চাকরির ব্যবস্থা তখনও হয়নি, তাঁরা ছিলেন। তবে সে সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছিলো। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার অধ্যাপনা করছিলেন বৃটিশ, জার্মান, ফরাসী, ডাচ-ইউরোপের বেশ কিছু অধ্যাপক যা আবার বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছিলো কসমোপলিটান চরিত্র। তখনকার নতুন ঢাকায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ও এর অধ্যাপকদের সঙ্গে পুরোনো ঢাকার লোকজনদের তেমন একটা সম্পর্ক ছিলো না। অনেকটা আলাদা এনক্লেভের মতো ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়।

ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন তখন ডঃ আবদুল হালিম। শিক্ষক-ছাত্রের সংখ্যাও ছিলো অল্প। দানী যখন যোগ ছিলেছিলেন ইতিহাস বিভাগে তখন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সবমিলিয়ে ছাত্রের সংখ্যা একশ'-সোয়াশ'র বেশি ছিলো না। তাঁর তখন পিএইচডি ছিলো না। বিভাগে পিএইচডি ডিগ্রীধারী শিক্ষকের সংখ্যা ছিলো তিন।

নতুনভাবে পাঠক্রম তৈরি হলো ইতিহাস বিভাগের। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস পড়াবার জন্য ছিলেন তিনজন। এরমধ্যে পৃথিশ চক্রবর্তী ছিলেন একজন। তিনি ঠিক করলেন, আধুনিক যুগটাও তিনি পড়াবেন। ডঃ হালিম ঠিক করলেন তিনি পড়াবেন আকবর ও জাহাঙ্গীর। এবং দানীকে নির্দেশ দিলেন মুসলমান যুগ পড়াবার জন্য। 'আমি তো তা পড়িনি,' জানালেন দানী।

'তাতে কি, পড়ে নিলেই চলবে।' নির্দেশ দিলেন ইতিহাস বিভাগের প্রধান। দানী শুরু করলেন ইতিহাস বিভাগে মুসলমান যুগ পড়ানোর।

তখন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ছিলেন ডঃ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ। তাঁর সঙ্গে ডঃ হালিমের সম্পর্ক খুব একটা মধুর ছিলো না। কারণ, ডঃ হবিবুল্লাহ ইতিহাস বিভাগে আসতে চেয়েছিলেন। ডঃ হালিম তাতে রাজি হননি। জানালেন দানী। তবে অধ্যাপক হবিবুল্লাহর সঙ্গে দানীর সম্পর্ক ছিলো ভালো। তিনি তাঁকে অনুরোধ জানালেন ইসলামের ইতিহাস বিভাগে 'শিল্প ও স্থাপত্য' বিষয়টি পড়াতে। দানী সম্মত হলেন তাতে।

তখন পর্যন্ত দানীর উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণাপত্র রচিত হয়নি। শিক্ষকতায় যোগ দেয়ার পর এখানেই তিনি লিখলেন তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্র 'আর্লি মুসলিম কনট্যাকট উইথ বেঙ্গল।'

এ সময়ই তিনি বাংলার ইতিহাসে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং ঠিক করেন, বাংলার ইতিহাসের ওপর কিছু গবেষণা করবেন। এবং এ জন্য ঠিক করলেন ফার্সী এবং বাংলা শিখবেন।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ করার সময় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছিলেন তিনি। ঘুরে বেড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও শিখে নিয়েছিলেন কিছু। সংস্কৃত, হিন্দী। ইংরেজি তো জানতেনই। তারপর শিখলেন অহম, মারাঠী, কানাড়ী, গুজরাটী ও তামিল। রাজশাহীতে থাকার সময় নিজে নিজেই বাংলাটা শিখেছিলেন। ঢাকায় খুব শিগগিরই তা ভালোভাবে রপ্ত করে নিলেন। আরবীটা আগে কিছু জানতেন। এখন তা ঝালাই করে নিলেন আরবী শিক্ষক ডঃ সিরাজুল হক, অধ্যাপক ইসহাক ও মাসুমীর কাছ থেকে। তাঁর প্রবন্ধপত্রটি লেখার সময় আরবী পুঁথি-পত্র অনুবাদ করে তাঁরা সাহায্য করেছিলেন দানীকে। বাকি ছিল ফার্সী। বাবুপুরার এক মৌলবী জানতেন ফার্সী। দানী তাঁকে ঠিক করলেন ফার্সী শিক্ষক হিসেবে। মৌলবী সাহেব প্রথম দিন এসে প্রথম কিতাবের প্রথম সবক দিয়ে গেলেন। দানী রাতের মধ্যে প্রথম সবক তো বটেই প্রথম কিতাবই শেষ করে ফেললেন। মৌলবী দ্বিতীয় দিন বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় কিতাবের প্রথম সবক দিলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়

দিনও একই ঘটনা ঘটলো। দানী আসলে আরো বড় ধরনের বা 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' শুরু করতে চাচ্ছিলেন। চতুর্থ দিন মৌলবী সাহেবকে সে কথা জানাতেই পরদিন থেকে তিনি হাওয়া। ওরকম ছাত্র থেকে দূরে থাকাই বোধহয় তিনি নিরাপদ ভেবেছিলেন।

পঞ্চাশ দশকের ঢাকার বর্ণনা দিয়েছেন অধ্যাপক দানী এভাবে— 'তখন ঢাকার রাস্তা-ঘাট একরকম নির্জন ছিলো বলা চলে। গাড়ির সংখ্যা ছিলো তিন-চারটি। কয়েকটা মোটর-বাস। অল্প কিছু রিক্‌শা। ঘোড়ার গাড়ি ছিল কিছু। অধিকাংশ লোক হেঁটেই যাওয়া-আসা করতেন। কারণ, শহরের পরিধি ছিলো ছোট। সাইকেল ব্যবহার করতেন অনেকে। আমার নিজেরও একটা সাইকেল ছিলো। ঢাকার ওপর বই লেখার সময় এই সাইকেল করে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। ঢাকায় জিনিসপত্র ছিলো সস্তা। মাছ, তরিতরকারি, সবকিছু। মনে আছে, দু'পয়সায় পাওয়া যেতো একটি ডিম। সকালের নাস্তার জন্য পাউরুটি? না, তেমনভাবে পাউরুটি চালু হয়নি তখনও। পাওয়া যেতো হয়তো ক্বচিৎ-কখনো।

আমি ঠিক করেছিলাম, উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ড যাবো। তা নিজের টাকায় যেতে হবে। সুতরাং আমরা স্বামী-স্ত্রী ঠিক করেছিলাম বেতনের আটশ' টাকার মধ্যে চারশ' টাকা খরচ করবো আর চারশ' টাকা জমাবো। দু'বছর ধরে, অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে টাকা জমিয়েছিলাম। অথচ পরিবার আমার বেড়েছে। ঘরে এক ছেলে এক মেয়ে। অন্যান্য খরচ তো ছিলোই। কিন্তু, ঢাকার বাজারে তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের পরিধি বাড়ছিলো। জানিয়েছেন তিনি, 'হিন্দু অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিলো বেশি, কারণ আমি সংস্কৃত জানতাম। এ কারণে, বোধহয় আমাকে তাঁরা একটু ভিন্ন চোখে দেখতেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্ তখন সুপার নিউমারী টিচার। সংস্কৃত জানি বলে আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বলতেন, তুমি আমার একমাত্র সন্তান।' বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও বিভিন্ন সূত্রে তাঁর চেনা-জানার পরিধি বাড়ছিলো, যে কারণে প্রতিষ্ঠান গড়ায় তিনি সহায়তা পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করছি।

৩

নলিনীকান্ত ভট্টশালী ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন ঢাকা জাদুঘরের। আর অধ্যাপক দানীর কৃতিত্ব জাদুঘর বিকাশ ও ঢাকার সমাজে তা জনপ্রিয় করে তোলার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের সঙ্গে তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিলো ঢাকা জাদুঘরের ভার। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি ট্রাষ্টি বোর্ড পরিচালনা করতো জাদুঘরের কার্যক্রম। ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের ভিসি ছিলেন এ বোর্ডের প্রধান।

ঢাকা জাদুঘরের কার্যভার বুঝে নেবার সময় দানী জিজ্ঞেস করেছিলেন উপাচার্য

মোয়াজ্জেম হোসেনকে জাদুঘরের সংগ্রহ সম্পর্কে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'মূর্তি ছাড়া আছে কিছু হলুদ আর কিছু সাদা পয়সা।' তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার কথা বলছিলেন। এতে বোঝা যায়, জাদুঘর একটি ছিলো বটে কিন্তু এ সম্পর্কে সাধারণতঃ দূরের কথা, এলিটদেরও খুব একটা আগ্রহ ছিলো না। অধ্যাপক দানী সেই অনাগ্রহ আগ্রহে পরিণত করেছিলেন, জাদুঘরের সংগ্রহকে বিন্যস্ত করেছিলেন এবং একযুগের মধ্যে এই জাদুঘরটিকে পাকিস্তানের অন্যতম জাদুঘরে পরিণত করতে পেরেছিলেন।

জাদুঘরের দখলে ছিলো তখন একটি পুরোনো বিল্ডিং ও নায়েব নাজিমদের প্রাসাদের পুরোনো ফটকটি। এই ফটকে ছিলো জাদুঘরের অফিস আর পুরোনো বিল্ডিং-এ রাখা ছিলো সংগ্রহ।

সংগ্রহশালার সামনে ভট্টশালী নারকেল গাছ দিয়ে একটি বৃত্তের মতো করেছিলেন। প্রত্যেকটি গাছের নিচে ছিলো একটি করে মূর্তি। কিছু মূর্তি ছিলো সংগ্রহশালার ভেতরে। প্রাকৃতিক ও জীববিদ্যা সংক্রান্ত কিছু সংগ্রহও করেছিলেন ভট্টশালী। অফিসঘরে ছিলো মুদ্রা ও গ্রন্থ সংগ্রহ। 'এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো', জানালেন দানী, 'ভট্টশালী তাঁর আইকনগ্রাফীর ওপর যে বইটি লিখেছিলেন সেখানে যেসব মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন তার অর্ধেক ছিলো জাদুঘরের সংগ্রহের বাইরে। তিনি বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়াবার সময় এগুলো দেখে নোট নিয়েছিলেন।'

জাদুঘরের ঠিক উল্টোদিকে ছিলো বাস্তুহারাদের বস্তি, যাদের অধিকাংশ ছিলেন অবাঙ্গালী। এশিয়াটিকের কোণায় যে মসজিদটি আছে সেখানে তারা নামাজ পড়তে আসতেন। 'শুক্রবার দিন আমিও সেখানে যেতাম। কিছুদিন পর', বললেন দানী, 'আমি লক্ষ্য করলাম জাদুঘর তাদের মধ্যে তেমন জনপ্রিয় নয়। এর একটি কারণ, জাদুঘরের বাইরে মূর্তির সমাহার। স্থানীয় মোল্লা-মৌলবীরাও এতে ইন্ধন যোগাচ্ছিলেন। আমার কাছে কয়েকবার তারা অভিযোগ করে বলেছিলেন, মূর্তিগুলো তারা ভেঙে ফেলবেন।'

আসলে, পরিবর্তিত পরিস্থিতি হয়তো বাস্তুহারা অবাঙ্গালীদের এ অভিযোগ করতে সহায়তা করেছিলো এবং স্থানীয় সাধারণ মুসলমানদের মনে তারা এ ধরনের ধারণাও সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। দানী দেখলেন, জাদুঘরকে ঢাকা শহরে যদি বিকশিত করতে হয় তা হলে জাদুঘর সম্পর্কে সাধারণের ধারণা পাল্টাতে হবে, সাধারণের সঙ্গে সৃষ্টি করতে হবে যোগাযোগ, বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে। বেশ কিছুদিন ভাবনা-চিন্তার পর তিনি দেখা করলেন ভিসির সঙ্গে। বললেন, 'আই ওয়ান্ট টু ইসলামাইজ দি মিউজিয়ম।'

'সেটা আবার কি?'

'কিছু মুসলিম জিনিস সংগ্রহ করতে হবে।'

প্রথমে তিনি জাদুঘরের সামনে বৃত্তটা ভেঙে ফেললেন, মূর্তিগুলো ঘরের ভেতর নিয়ে এলেন। এতে সাধারণ মুসলমানদের ক্ষোভ খানিকটা দূর হলো। এরপর তিনি ইসলামী নিদর্শন সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন। জাদুঘরের আর্থিক সঙ্গতি এমন

ছিলো না যে, ইচ্ছা মাত্রই নিদর্শন কিনতে পারেন। এ সময়ই তাঁর সঙ্গে পরিচয় সৈয়দ মুহম্মদ তাইফুরের সঙ্গে।

সৈয়দ মুহম্মদ তাইফুরের পরিবার ছিলেন ঢাকার বনেদী পরিবারগুলোর মধ্যে একটি। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ ছিলো ঢাকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দানী সে সময় খবরের কাগজে দু'একটি করে লেখক লিখছেন। সে সূত্রে তাইফুর চিনতেন তাঁকে। তাইফুর থাকতেন বাবুপুরায় 'আলকাউসার' নামে অট্টালিকায়। দানীর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপের পর তা রূপ নিয়েছিলো ঘনিষ্ঠতায়। গল্প করতে দানী যেতেন তাঁর বাসায়, দেখতেন তাঁর সংগ্রহ। তাইফুর আসতেন জাদুঘরে দানীর বাসায়।

ইসলামী নিদর্শন সংগ্রহের প্রচেষ্টায় দানী অনুরোধ জানালেন তাইফুরকে তাঁর সংগ্রহ ঢাকা জাদুঘরকে দান করতে। তাইফুর রাজি নন। বলেন, 'এগুলো বংশ পরম্পরায় সংগৃহীত অনেক স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িত। এগুলো কাছ-ছাড়া করি কিভাবে?

অনেক ভেবে-চিন্তে দানী একদিন সস্ত্রীক তাইফুরকে নিমন্ত্রণ করলেন বাসায়, নৈশভোজের জন্য। তাইফুরের তখন তিন মেয়ে। এর মধ্যে লায়লা আর্জুমান্দ বানু গায়িকা হিসেবে ইতোমধ্যেই বিখ্যাত। পরিচিত আরেক মেয়ে লুলু বিলকিস বানুও। যাহোক নৈশভোজের পর, দানী বললেন—

'দেখুন তাইফুর সাহেব, মানুষ ক'দিন বাঁচে। আজ আপনি যে অমূল্য নিদর্শনসমূহ সংগ্রহ করেছেন আপনি না থাকলে এগুলো কে দেখবে? আপনার তো তিন মেয়ে। এতোদিনের সংগ্রহ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তারচেয়ে জাদুঘরে থাকলে এগুলো যুগযুগ ধরে থাকবে আপনার দান হিসেবে।'

দানীর ভাষায়— 'এভাবে আমি খুব বিষাদময় একটি চিত্র তুলে ধরলাম তাঁর সামনে। কিন্তু খুব একটা লাভ হলো না। রাজি হলেন না তিনি।'

এর কয়েকদিন পর, একদিন ভোর চারটেয় দানীর দরোজায় করাঘাত। অজানা আশংকায় দরোজা খুলে তিনি দেখলেন, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সৈয়দ মুহম্মদ তাইফুর। এবং তিনি কাঁদছেন। দু'চোখ বেয়ে পানি পড়ছে তাঁর। বিচলিত হয়ে দানী তাঁকে ভেতরে এনে বসালেন। তাইফুর বললেন, 'দানী সাহেব, রাতে আমি খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম আমার মৃত্যু হয়েছে আর আমার সংগ্রহ সব লুটপাট হয়ে গেছে। সে থেকে মন খারাপ। কিছুতেই আর ঘুমোতে পারিনি।'

দানী তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। চা খাওয়ালেন। একটু সুস্থির হয়ে তাইফুর দানীকে বললেন, 'চলুন আমার সঙ্গে বাসায়।' গেলেন দানী। তাইফুর তখন বললেন, 'আমার সব সংগ্রহ আমি জাদুঘরকে দান করে দিলাম।'

অধ্যাপক দানীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সে আমলে (আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগ) ঐ সংগ্রহের মূল্য কেমন ছিলো?' উত্তরে তিনি বললেন, 'যদি আমাকে সে সংগ্রহ কিনতে হতো তা হলে কমপক্ষে দু'লাখ টাকা দিতে হতো। তাইফুর সাহেব আমাকে একবার বলেছিলেন, তাঁর সংগ্রহের একটি পাণ্ডুলিপির দাম সে সময় কুড়ি

হাজার টাকা পর্যন্ত উঠেছিলো। তিনি বিক্রি করেননি। সে পাণ্ডুলিপির দাম এখন কমপক্ষে দু'লাখ টাকা। তিনি তখন ঢাকার ওপর একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করছিলেন। বললাম, প্রয়োজনে আমি সেটিকে সম্পাদনা করে দেবো এবং তা প্রকাশের অর্থ নেয়া হবে ঢাকা জাদুঘর থেকে। আমি সে কথা রেখেছিলাম। তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্কারণের ব্যয়ভার বহন করেছিলো ঢাকা জাদুঘর। যদিও তা প্রকাশিত হয়েছিলো লেখকের নামে।'

'তাইফুর সংগ্রহ' পাওয়ার পর সম্পূর্ণ জাদুঘরের চরিত্র বদল করে ফেললেন দানী। জাদুঘরের প্রধান গ্যালারীকে পরিণত করা হলো ইসলামী নিদর্শনসমূহের গ্যালারীতে। দারোজার ওপর লেখা হলো 'বিসমিল্লাহির রাহমানের রহিম।' এখন কেউ জাদুঘরে ঢুকলেই প্রথমে তাঁর নজরে পড়বে ইসলামী নিদর্শনসমূহ। এরপর বৌদ্ধ ও হিন্দু নিদর্শনসমূহের গ্যালারী। এমনভাবে নিদর্শনসমূহ সাজানো হলো যাতে একনজরে একটি বিশেষ সময়ের রূপেরেখা ভেসে ওঠে যা শিক্ষামূলক। তারপর লোকসংগ্রহ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিদর্শনসমূহ দান করে দেয়া হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ ও জীববিদ্যা বিভাগে। ফলে, যে জায়গা খালি হয়েছিলো তাতে অন্য নিদর্শনসমূহ রাখা সম্ভব হয়েছিলো। এরপর দানী আমন্ত্রণ জানালেন মুসলমানদের, যারা বিরোধিতা করছিলো জাদুঘরের। তারা তো এখন সব দেখে খুব খুশি। একবাক্যে সবাই বলতে লাগলো, 'না, জাদুঘর খুব ভালো জিনিস। আমাদের সবার জাদুঘরকে সাহায্য করা উচিত।' সে থেকে ঢাকাবাসীর কাছে আদরের বস্তু হয়ে উঠলো ঢাকা জাদুঘর।

তারপর দানী ভিসিকে আমন্ত্রণ জানালেন জাদুঘর দেখে যাওয়ার জন্য। ভিসিও খুব সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, 'ফজলুর রহমান সাহেবকে দেখাবার বন্দোবস্ত করেন।'

দানী বললেন, 'তাকে দেখাবার দরকার নেই।'

'বলেন কি?' বললেন ভিসি, 'তিনি মন্ত্রী, সিণ্ডিকেট নিয়ন্তা, যাকে বলে কিং মেকার।'

'তা ঠিক', বললেন দানী, 'কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো না।'

'ঠিক আছে', বললেন ভিসি, 'আমিই তাঁকে দাওয়াত করবো।'

যথারীতি মন্ত্রীকে দাওয়াত করা হলো। ভিসি তাঁকে নিয়ে জাদুঘর দেখতে এলেন। ঘুরে-ফিরে দেখে ফজলুর রহমানও খুশি। বললেন তিনি দানীকে 'এই দেখো, তুমি না পশ্চিম পাকিস্তান যেতে চেয়েছিলে, এখন তো এখানে একেবারে জেঁকে বসেছো।'

'তা ঠিক। তবে, চাকরির জন্যে তদবির করিনি।' বললেন দানী, 'যা পেয়েছি তা সবই খোদার ইচ্ছায়।'

'তাইফুর সংগ্রহ' পাওয়ার পর এবং তাইফুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ায়, দানীর পক্ষে সহজ হয়ে গেলো জাদুঘর গড়ার কাজটি। ঢাকার বনেদী পরিবারে দরোজা খুলে গেলে তাঁর জন্য। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, তা হলো ঢাকাবিষয়ক দানীর লেখালেখি। সাধারণের জন্য ঢাকাবিষয়ক প্রথম যে প্রবন্ধটি তিনি লেখেন তার নাম, 'স্পেলনডার দ্যাট ওয়াজ ঢাকা', ছাপা হয়েছিলো লাহোরের এক পত্রিকায়, এরপর ঢাকা ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি একটির পর একটি প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। এগুলো ছাপা

হতে লাগলো বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিশেষ করে 'পাকিস্তান অবজারভারে।' মওলানা আকরম খাঁর আবার সে সব প্রবন্ধের কোনা কোনোটির অনুবাদ ছাপতে লাগলেন তাঁর পত্রিকায়। ফলে, একদিকে যেমন ঢাকা শহর পরিচিত হয়ে উঠলো ও আগ্রহের সৃষ্টি করলো এলিট ও সাধারণ মহলে, তেমনি দানীর নামটিও হয়ে উঠলো পরিচিত। বিশেষ করে ঢাকা শহরের দরদী হিসেবে। সুতরাং তাঁর কার্যক্রম যে ঢাকা শহরের জন্যই এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না। নয়তো একজন বহিরাগত হিসেবে তাঁর পক্ষে কাজ করা মুশকিল হয়ে উঠতো। এবং এ কারণেই জাদুঘর গড়ার ও জনপ্রিয় করে তোলার তাঁর প্রেচেষ্টা হয়ে গেলো অনেক সহজ।

তাইফুর এরপর দানীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ঢাকার আরেক বনেদী পরিবারের কর্তা বেচারাম দেউড়ির আবুল হাসনাতের সঙ্গে। তাইফুর এর আগে দানীকে জানিয়েছিলেন যে, খান সাহেব আবুল হাসনাতের কাছে উনিশ শতকে আঁকা ঢাকার ঈদ ও মহররম মিছিলের বেশ কিছু ছবি আছে। দানী আগ্রহী ছিলেন ছবিগুলো দেখার ও জাদুঘরের জন্য সংগ্রহের ব্যাপারে। তাইফুরের মাধ্যমে খান সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি দানীকে আমন্ত্রণ জানালেন নৈশভোজের জন্য। দানীর ভাষায়— 'আতিথেয়তার জন্য ঢাকা ছিলো বিখ্যাত এবং তার রেশ তখনও ফুরিয়ে যায়নি। হাসনাত সাহেব আমার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন টিপিক্যাল সব ঢাকাই খাবার। সে এক এলাহী কাণ্ড। যেন কোনো নবাবের বাড়িতে খেতে এসেছি। খাওয়াদাওয়ার পর বললাম, মহররম ও ঈদ মিছিলের ছবিগুলো দেখতে চাই। সেগুলো ঝোলানো ছিলো একটি কামরায়। হাসনাত সাহেব সে ঘরে নিয়ে আমাকে বললেন, 'প্রফেসর দানী, দিস ইজ ইয়োরস অ্যাণ্ড ইউ ক্যান টেক দেম।' আমি তো হতবাক। আর হাসনাত সাহেব এমনই ভদ্রলোক যে,তিনি একবারও উল্লেখ করলেন না ছবিগুলো তাঁর দান হিসেবে গৃহীত হোক। জাদুঘরে তখন জায়গার অভাব। কিন্তু আমি ছবিগুলো নিয়ে এসে দেয়ালের বেশ উঁচুতে সেগুলো টাঙানোর ব্যবস্থা করলাম। এভাবে ঢাকা জাদুঘরের সংগ্রহে এলো অমূল্য এক সম্পদ।'

একজনের সূত্রে আরেকজনের সঙ্গে পরিচয় হয়। একজনের সূত্রে আরেকজন জানতে পারেন। দানীর ক্ষেত্রেও তাই হলো। তাইফুর এরপর তাঁকে নিয়ে গেলেন নওয়াব আব্দুল লতিফের নাতির কাছে। দানীর ভাষায়—

'নওয়াব আব্দুল লতিফের কথা আমি তখনও শুনি নি। তাঁর সম্পর্কে সম্যক পরিচয় পাওয়ার পর দেখা করলাম তাঁর নাতি কাজী সাহেবের সঙ্গে। একসময় তিনি জজ ছিলেন। তাইফুর সাহেবই নিয়ে গিয়েছিলেন। কাজী সাহেবের কাছে নওয়াব লতিফের অনেক জিনিসপত্র ছিলো। যেমন, আচকান, চিঠিপত্র, অস্ত্রশস্ত্র মহামেডান লিটারারি সোসাইটির সমস্ত প্রসিডিংস ইত্যাদি। সবকিছু তিনি দান করে দিলেন ঢাকা জাদুঘরকে। এরপর হাকিম হাবিবুর রহমান। তিনিও দান করলেন তাঁর কিছু 'সংগ্রহ'। এবং আশ্চর্য! এরা কখনও কিন্তু বিনিময়ে টাকা বা কিছু চান নি।'

'জাদুঘরের প্রতি এ আগ্রহ সৃষ্টির কারণ কি বলে মনে হয়?'

প্রশ্ন করলাম আমি।

'এর একটি কারণ বোধ হয়,' বললেন দানী, 'বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আবেদন জানিয়ে বলেছিলাম, জাদুঘরে আমি মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে চাই। এ আবেদন ঢাকার মুসলমান বিশেষ করে বনেদী পরিবারগুলোকে আবেগপ্রবণ করে তুলেছিলো। ঢাকা শহরে যে আমি তখন খুব বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব তা' নয়। তবে, আমি লিখতাম প্রচুর, খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রে। ফলে, সাধারণের মধ্যে আমার নামটা পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। বিভিন্ন ক্লাব বা মিটিংয়ে, বক্তা হিসেবে আমার ডাক পড়তো, অধ্যাপক হবিবুল্লাহ বা অধ্যাপক হালিমের নয়। এভাবে, অনেকের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিলো। এ দুটো কারণে, আমি এগোতে পেরেছিলাম। একবছরের মধ্যে এমন হলো যে, জিনিসপত্র রাখার জায়গা হয় না জাদুঘরে। যাঁদেরই সংগ্রহ আছে তাঁরাই দান করতে চান জাদুঘরে।'

৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো দানীর। বিশেষ করে বাঙ্গালী অধ্যাপকদের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে ছিলেন এ, বি, এম, হবিবুল্লাহ, মজহারুল হক, আব্দুর রাজ্জাক, সিরাজুল হক, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ। তবে, অধ্যাপক হবিবুল্লাহর সঙ্গে তাঁর পরিচয় কলকাতা থেকে।

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিলো হবিবুল্লাহর। তাই নিয়ে দানীর সঙ্গে প্রায়ই আলাপ হতো। ঢাকায় একটি বিদ্বৎসভার অভাব তাঁরা অনুভব করতেন। মনে হয়, এ অভাব তীব্রভাবে অনুভব করার কারণ এই যে, তাঁরা বড় হয়েছেন এমন সব শহরে, যেখানে শিক্ষা সংস্কৃতিচর্চা ছিলো প্রবল, আবহ ছিলো নাগরিক। অন্যদিকে, দু'জনই ছিলেন কর্মঠ ও কর্মচঞ্চল। ফলে ঢাকার মতো মফস্বলে এসে তাঁদের সেই অনুভব আরো তীব্র হয়ে উঠেছিলো।

যা হোক, শেষে একদিন থাকতে না পেরে দানী দেখা করলেন ভিসির সঙ্গে। বললেন, কলকাতার মতো এখানেও একটি এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করতে চান। ভিসি বললেন, 'অবশ্যই। করতেই হবে।' তারপর তিনি তৎকালীন প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল হামিদকে বৈঠক বসলো। আগ্রহী হলেন মন্ত্রীও। এবং মন্ত্রীর বাসায়ই এবিষয়ে বিদ্বৎজনদের বৈঠক বসলো। তারপর, দানীর ভাষায়—

'খুব সম্ভব আমরা দশ-পনেরোজন ছিলাম। তুমি এশিয়াটিক সোসাটির কাগজপত্র দেখলে নামগুলো পাবে। সভায় ঠিক হলো এই বিদ্বৎসভার নাম হবে এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান। এরপর খুব সম্ভব ডঃ হবিবুল্লাহ সম্পাদক হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করলেন। আমি অবশ্য এটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বললাম, আমি এ শহরে নতুন এবং বয়সেও বোধহয় সবার চেয়ে কম। আমি এ বিদ্বৎসভার সম্পাদক হই কিভাবে?

ডিসি বললেন, 'আপনার একটা অফিস আছে, টাইপরাইটার আছে। সুতরাং আপনাকেই হতে হবে। হতে হলো সম্পাদক। ঠিক হলো, সোসাইটির গঠনতন্ত্র খসড়া করবো আমি, হবিবুল্লাহ ও জুবেরী। গঠনতন্ত্র পাস হলো। তারপর প্রতিমাসে আমরা আলোচনা সভা বা মান্থলি মিটিং শুরু করলাম। অফিস হলো জাদুঘরে আমার অফিসেই। যাত্রা শুরু হলো এশিয়াটিক সোসাইটির।'

'এ সময় বোর্ড অফ রেভেনিউর সদস্য হয়ে ঢাকায় এলেন এস, এম ইকরাম। একসময় তিনি তথ্যসচিবও ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলো না, তবে, 'অবজারভার'- এ তিনি আমার লেখা পড়েছিলেন। তখনতো টেলিফোনের এমন চল ছিল না। তাই কোনো জানান না দিয়ে একদিন হঠাৎ তিনি এসে হাজির জাদুঘরে, বললেন, জাদুঘরের লাইব্রেরী দেখতে চান। তারপর থেকে তিনি প্রায়ই আসতেন লাইব্রেরীতে। ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন দানী তাঁর সঙ্গে। একদিন ইকরাম জিজ্ঞেস করলেন দানীকে, 'মমতাজ হাসানের সঙ্গে দেখা করতে চান?'

দানী জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কে?'

'বলেন কি!' অবাক হলেন ইকরাম, 'তিনি হলেন পাকিস্তান সরকারের অর্থসচিব।'

মমতাজ হাসান তখন ডাকসাইটে আমলা হিসেবে খ্যাত। অর্থসচিব হওয়ার কারণে, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো বেশি। সবাই তাঁর সুনজরে থাকতে চায়। দানী বললেন, 'তাঁর কাছে পৌঁছানোই তো মুশকিল।'

'চিন্তা করার কারণে নেই', বললেন ইকরাম, 'তিনি আমার বাসায় খেতে আসবেন রাতে, চলে আসুন, পরিচয় করিয়ে দেবো। পরে কাজে লাগবে।'

নির্দিষ্ট দিন দাওয়াত খেতে গেলেন দানী। আলাপ-পরিচয়ের পর মমতাজ হাসান জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে আর কি করছেন?'

'এশিয়াটিক সোসাইটি করেছি', বললেন দানী, 'মান্থলি মিটিং করি আমরা।'

'তা প্রকাশনা আছে কিছু আপনাদের?'

'না, কারণ টাকা নেই।'

'ঠিক আছে', বললেন অর্থসচিব, 'আমি আপনাদের সোসাইটি দেখতে যাবো।'

চিন্তায় পড়লেন দানী। অর্থসচিব বিরাট লোক। এদিকে সোসাইটির অফিস-টফিস দূরের কথা, খাতাপত্র রাখার আলমারিও নেই। ইকরামকে জিজ্ঞেস করলেন দানী, 'আচ্ছা ভদ্রলোক কিসে আগ্রহী?' 'সাহিত্য', বললেন ইকরাম, 'সাহিত্যচর্চার ঝোঁকও আছে তাঁর।'

দানী জাদুঘরে ফিরে, তাঁর অফিসে, প্রথমে একটি আলমারি খালি করে তাতে লিখলেন— 'এশিয়াটিক সোসাইটি।' তখন তাইফুর সংগ্রহ চলে এসেছে জাদুঘরে। তাঁর সংগৃহীত বইগুলো রাখা হলো আলমারিতে। বাঙ্গালী কবি যাঁরা উর্দুতে লিখেছেন তাঁদের কিছু পাণ্ডুলিপি ছিলো। সেগুলোও রাখা হলো আলমারিতে। বাংলায় আরবী লেখার পাণ্ডুলিপিও ছিলো। তাও রাখা হলো সেখানে।

নির্দিষ্ট দিন অর্থসচিব এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদককে এসে বললেন, 'কি দেখাতে চান।' সম্পাদক জাদুঘরের অফিসে রক্ষিত সে আলমারি দেখালেন। বইগুলো নেড়েচেড়ে অর্থসচিব সন্তুষ্ট। বললেন—

'ইফ আই গিভ মানি হোয়াট উইল ইউ ডু?'

'যে পেপার আছে মাহুলি মিটিংয়ের', বললেন দানী, 'তা পাবলিশ করবো।'

'ঠিক আছে, পাঁশ হাজার দেবো। আপনি অর্থসচিবকে এ ব্যাপারে একটি আবেদন করে কপি পাঠাবেন আমাকে', বললেন অর্থসচিব, 'না, দু'টোই পাঠাবেন আমাকে। না না, থাক, আপনি আবার কি লিখতে কি লিখবেন। তারচেয়ে এই সাদা কাগজে সই করে দেন।'

দানী সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে দিলেন। এবং অভাবনীয় কাণ্ড! এক সপ্তাহ পর করাচী থেকে পাঁচ হাজার টাকার চেক এলো এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের নামে।

পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে তিনি তিন হাজার দিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এর মধ্যে মমতাজ হাসান আবার ঢাকায় এলেন। দেখা হলো দানীর সঙ্গে। দানী জানালেন, তিন হাজার খরচ হয়েছে, দু'হাজার টাকা আছে। অর্থসচিব বললেন, ঠিক আছে, আরো দশ হাজার দেবো।' আগের মতো সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে দিলেন দানী। এক সপ্তাহ পর আবার দশ হাজার টাকার চেক এলো অনুদান হিসেবে। প্রকাশিত হলো এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালের দ্বিতীয় খণ্ড এবং 'এপেনডিক্স ভল্যুম' যা দানীর লেখা। এভাবে বিকশিত হতে লাগলো এশিয়াটিক সোসাইটি যা এখন বাংলাদেশের অন্যতম বিদ্বৎসভা।

৫

সৈয়দ মহম্মদ তাইফুর সে সময় ঢাকার ওপর একটি বই লিখেছিলেন। দানীও ঢাকার ওপর কিছু পড়াশোনা শুরু করেছিলেন। পত্রপত্রিকায় লিখছিলেন। ঢাকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে তিনি মোটামুটি অবহিত ছিলেন। হুইলার যে সময় 'ফাইভ থাউজ্যাণ্ড ইয়ারস অফ পাকিস্তান' লিখছিলেন সে সময় এসব নিদর্শন দেখে রিপোর্ট পাঠাতেন দানী। ফিরোজ খান নুন তখন গভর্ণর। লেডী নুন ঢাকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো ঘুরে দেখতে চাইলে দানী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সেগুলো দেখালেন। লেডী নুন তখন বললেন, ঢাকার ওপর বই লিখতে। দানীর ভাষায়—

'তাইফুর সাহেব তখন পাণ্ডুলিপি রচনায় ব্যস্ত। তিনি মাঝে মাঝে পাণ্ডুলিপি দেখাতে আনতেন। বলতেন, ঢাকার ওপর কিছু করা দরকার। ঐতিহাসিক হিসেবে আমার ট্রেনিং ছিলো, যা তাইফুরের ছিলো না। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর টেকনিক্যাল দিক সম্পর্কে আমি জানতাম যা তাইফুর জানতেন না কিন্তু মালমশলা তিনি বেশ সংগ্রহ

করেছিলেন। আমরা আইডিয়া এক্সচেঞ্জ করতাম। পরস্পরকে উৎসাহিত করতাম। তাইফুরের পাণ্ডুলিপি দেখে দিতাম। এসব মিলে আমিও উৎসাহিত হয়ে উঠলাম ঢাকা সম্পর্কে বই লিখতে। জাদুঘর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে ঢাকা সম্পর্কিত বেশ মালমশলা ছিলো। এরমধ্যে বাংলা ও ফার্সী শেখার ফলে আমার বেশ সুবিধা হয়ে গেলো। তাছাড়া, তাইফুর, হাসনাত ও কাজী সাহেবের কাছ থেকেও বেশ ইনফরমেশন পেলাম। নবাব হবিবুল্লাহ একদিন আহসান মঞ্জিলে নিয়ে গিয়ে সেখানকার সংগ্রহ দেখালেন। বলধা থেকেও সংগ্রহ করলাম মালমশলা।

এভাবে প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হলে, সাইকেলে চেপে তিনি ঢাকা শহর সার্ভে করা শুরু করলেন। তখন তাঁর দৈনন্দিন রুটিন তিনি এভাবে করে নিয়েছিলেন— সকালে নাস্তা করে জাদুঘরের অফিস। সে কাজ সেরে বারোটা পর্যন্ত পড়াশোনা। তারপর দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর ক্লাসগুলো ছিলো বিকেলে। ক্লাসের রুটিন এমনভাবে করলেন যাতে সপ্তাহে তিনদিন ক্লাস নিতে না হয়। সে তিনদিন দুপুরের খাবারের পর শহর পরিভ্রমণে বেরুতেন তিনি।

এভাবে অল্পদিনে বইয়ের কাজ শেষ করলেন দানী। তাঁর ভাষায়— '১৯৫২ সালে ঢাকায় ইতিহাস সম্মেলন হবে। ঠিক করলাম সে উপলক্ষে বইটি বের করবো। ঢাকায় তখন বই বের করার ঝামেলা অনেক। ভালো প্রেস নেই। তারপর টাকার অভাবতো আছেই। ডঃ হালিম তখন বললেন, সম্মেলনের ডেলিগেটদের দেয়ার জন্য তিনি কিছু বই কিনবেন। সে বাবদ কিছু অগ্রিমও দিলেন। প্যারামাউন্ট প্রেসে বই ছাপা হলো। প্রচ্ছদ আঁকলেন কামরুল হাসান। বই বের হলো। দেখা গেলো বইটির গ্রেট ডিমাণ্ড। খুব শিগগিরই শেষ হয়ে গেলো এর সংস্করণ। এটি ছিলো আমার একটি হাম্বেল এ্যাটেম্পট।'

'ঢাকা : এ-রেকর্ড অফ ইটস চেনজিং ফরচুনস', প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৭ সালে। দানী বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, ১৯৫২ সালে, ঢাকায় তৃতীয় পাকিস্তান ইতিহাস সম্মেলনের প্রাক্কালে বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন কিন্তু তখন তা ছাপা যায় নি। ১৯৫৭ সালে, আবার যখন ঢাকায় ইতিহাস সম্মেলন হলো তখন সে উপলক্ষে প্রকাশিত হলো বইটি। আর বইটি ছেপেছিলেন মোঃ নাসিরুদ্দিন, সওগাত প্রেসে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন দানী— 'টু মাই ফ্রেণ্ড সৈয়দ মুহম্মদ তাইফুর, দি লাষ্ট অফ দি ওল্ড এণ্টিকুয়ারিয়ান্স অফ ঢাকা।' সুতরাং, বলা যেতে পারে ১৯৫২ সালে বইটি প্রকাশের যে কথা তিনি বলেছেন, সে ক্ষেত্রে তাঁর স্মৃতি খানিকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

৬

ঢাকায় এসে তিন বছরের মধ্যে আহমদ হাসান দানী, জাদুঘরের সঙ্গে ঢাকাবাসীর যোগাযোগ সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠানটিকে বিকশিত করে তুলেছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

এশিয়াটিক সোসাইটি, লেখালেখি করে বিষয় হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন ঢাকা শহরকে, রচনা করেছিলেন বই। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পঠন পাঠনতো ছিলোই।

এ সময় তিনি ঠিক করলেন পিএইচডি করবেন। এজন্যে প্রথম রচনা করেছিলেন 'হাউস অফ গনেশ' নামে একটি অভিসন্দর্ভ। চেয়েছিলেন তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেবেন। তবে তার আগে গবেষণাপত্রটি পাঠালেন স্যার যদুনাথ সরকারের কাছে। যদুনাথ ওটা ছেপে দিলেন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। তখন তিনি ঠিক করলেন 'মুসলিম আর্কিটেকচার অফ বেঙ্গল'- এর ওপর পিএইচডি করবেন। হুইলারের অধীনে কাজ করার সময়ই এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা লিখেও ফেলেছিলেন।

স্কলারশীপের জন্য কয়েক জায়গায় আবেদন করলেন। ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও আরেকটি ইউরোপীয় দেশ স্কলারশীপ দিতে রাজি হলো। ইংল্যান্ডে নাফিল্ড স্কলারশীপের জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো। সব দেখেশুনে ঠিক করলেন যুক্তরাষ্ট্র যাবেন। এ ব্যাপারে জানালেন হুইলারকে। তিনি তখন লণ্ডনে। হুইলার দানীকে জানালেন, 'আমেরিকা যাওয়ার চলবে না। চলে এসো লণ্ডন।' দানী আর কি করেন। গুরুর আদেশ মেনে সব স্কলারশীপ ছেড়ে ইংল্যান্ড যাবার জন্য তৈরি হলেন। এ জন্যে প্রথম বছর থেকে মাসে যে চারশ' টাকা করে জমাচ্ছিলেন তা কাজে লাগলো।

তিনি যখন প্রায় প্রস্তুত ইংল্যাণ্ড যাবার জন্য তখন ডঃ হালিম তাঁকে বললেন, 'আপনি কেন ইংল্যাণ্ড যেতে চাচ্ছেন? আমি না মারা গেলে তো আপনি প্রফেসর হতে পারবেন না।' কারণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন নিয়ম ছিলো প্রত্যেক বিভাগে একজন প্রফেসর থাকবেন যিনি হবেন বিভাগীয় প্রধান। শুধু ব্যতিক্রম ছিলো বোধ হয় অর্থনীতি বিভাগ, যেখানে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক আয়ার ছিলেন রীডার।

'মুসলিম আর্কিটেকচারের' পাণ্ডুলিপি টাইপ করে, জাদুঘরের ভার ড: হবিবুল্লাহ ও এশিয়াটিক দায়িত্ব অধ্যাপক মাসুমিকে বুঝিয়ে দানী রওয়ানা হলেন লণ্ডনের পথে। এক্সচেঞ্জ রেটে লণ্ডনে পেতেন তখন তিনি পঞ্চাশ পাউণ্ড। এবং সে টাকায় সপরিবারের লণ্ডন থাকতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় নি।

৭

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতে গিয়ে দানী মুখোমুখি হলেন গর্ডন চাইল্ডের। তিনি বললেন, পিএইচডি করতে গেলে আগে কোর্স পরীক্ষা দিতে হবে। দানী জানালেন, যে কোনো সময় তিনি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। চাইল্ডের সঙ্গে দানী যখন আলোচনা করছেন সে সময় হুইলার এসে সেখানে উপস্থিত। তিনি চাইল্ডকে বললেন, 'দানী আবার কি পরীক্ষা দেবে? ওর পরীক্ষা-টরীক্ষার কোনো দরকার নেই।' দানীকে আর

পরীক্ষা দিতে হলো না। সরাসরি তাঁকে পিএইচডি করার অনুমতি দেয়া হলো। তাঁর গাইড নিযুক্ত হলেন কর্ডিংটন।

কর্ডিংটন দানীর নাম জানতেন। হুইলার তাঁকে বলেছিলেন দানীর কথা। দানী কর্ডিংটনকে জানালেন তাঁর থিসিসের বিষয় হবে, মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল'। রেজিষ্ট্রেশন হলো। তারপর দানী তাঁকে ঢাকা থেকে টাইপ করে আনা অভিসন্দর্ভটি দেখতে দিলেন। কর্ডিংটন অবাক হলেন খানিকটা কিন্তু অভিসন্দর্ভটি পড়ে জানালেন, চলবে। তবে দু'টি একাডেমিক সেশন না গেলে থিসিস জমা দেয়া যাবে না। কর্ডিংটন দানীকে তাই বললেন, খুশি মতো সেমিনারে যোগ দিতে, পড়াশোনা করতে।

দানী বিভিন্ন সেমিনারে যোগ দিতে লাগলেন। ফেলো হয়ে গেলেন রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি ও রয়েল এনথ্রোপলিজিকাল সোসাইটির। দু'এক জায়গায় বক্তৃতাও দিলেন।

একদিন রয়েল ইনস্টিটিউট অফ এনথ্রোপলিজিতে গিয়ে দেখেন এক মার্কিন ভদ্রলোক 'প্রি হিস্ট্রি অফ ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া'র ওপর একটি থিসিস জমা দিয়েছেন। থিসিসটি পড়লেন দানী। তাঁর ভাষায়— 'আমার মনে হলো কাজটি আপ টু দি মার্ক হয়নি। তাই সে বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম এবং কিছুদিন পর মনে হলো এ বিষয়ে থিসিস জমা দিলে মন্দ হয় না। এর অন্য একটি কারণও ছিলো অবশ্য। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শিক্ষক ছিলেন নাম এ, এইচ, ক্রিস্টি। পুরোনো আই, সি, এস প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন ভারতীয়দের। প্রকাশ্যে বলতেন, ইংরেজরা না গেলে ভারত অন্ধকারে থাকতো। অপমানিত বোধ করতাম কিন্তু করার কিছু ছিলো না। ক্রিস্টি পিএইচডি'র জন্য থিসিস করছিলেন ঐ একই বিষয়ে। আমি ভাবলাম, ক্রিস্টির বিষয়ে পিএইচডি করে তাকে শিক্ষা দিতে হবে।'

প্রাথমিক পড়াশোনা করে নিজের খরচে দানী আরো জানার জন্য ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন লাইব্রেরী, এবং ফ্রান্স, হল্যাণ্ডের লাইব্রেরী ঘুরে এলেন। তারপর মাস তিনেকের মধ্যে প্রস্তুত করলেন থিসিস। গেলেন তারপর গাইড কর্ডিংটনের কাছে। বললেন, 'আমি পিএইচডির বিষয় বদলেছি।' বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী তা সম্ভব ছিলো।

'কি বিষয়?' খুব অবাক হয়ে জানতে চাইলেন কর্ডিংটন।

'প্রি হিস্ট্রি অফ ইষ্টার্ণ, ইণ্ডিয়া।

এবার অকূল পাথারে পড়লেন কর্ডিংটন। বললেন, 'একবছরে সেটা কিভাবে সম্ভব? তা ছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্রিস্টিও একই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন পাঁচ বছর।'

'তিনি কাজ করছেন পাঁচ বছর', বললেন দানী, 'আর আমি কাজ শেষ করেছি। আমাকে থিসিস জমা দিতে না দিলে আমি তা প্রকাশ করবো। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি এটি প্রকাশ করতে রাজি হয়েছে।'

কর্ডিংটন আর কি করেন। ক্রিস্টি, দানী ও আরো কয়েকজনসহ মিটিং ডাকলেন। সবাই একই কথা বললেন। দানীও একই উত্তর দিলেন, ক্রিস্টি মহা উত্তেজিত হয়ে

বললেন, কবে থিসিস শেষ করেছো?' 'সেটা আমার বিষয়।' বলে দানী টাইপ করা থিসিসটি টেবিলে রাখলেন। সিদ্ধান্ত হলো ক্রিস্টি থিসিসটি পড়ে এক সপ্তাহ পরে মতামত জানাবেন। এক সপ্তাহ, দু'সপ্তাহ করে একমাস গেলো। ক্রিস্টির কোনো সাড়া নেই। দানী কর্ডিংটনকে জানালেন। আবার মিটিং বসলো। দানী জিজ্ঞেস করলেন ক্রিস্টিকে, 'আর ইউ স্যাটিসফাইড?' মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন ক্রিস্টি। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, মিঃ দানী, ইউ হ্যাভ ডান ইট।'

দানী বললেন, 'মিঃ ক্রিস্টি, দেয়ার আর অলসো সাম ডার্ক পিপল ইন দা ওয়ার্ল্ড ফ্রম হুজ ফেস লাইট সাইনস, দো আই অ্যাম নট সো ডার্ক।'

'আমি মেনে নিলাম', জবাব দিলেন ক্রিস্টি, 'তুমি এই থিসিস সাবমিট করতে পারো।'

দানী 'প্রি হিষ্ট্রি অফ ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া' শিরোনামে থিসিস জমা দিয়ে ১৯৫৫ সালে পিএইচডি ডিগ্রী পেলেন। ডিগ্রী পাওয়ার পর ক্রিস্টিকে তিনি বলেছিলেন, মিঃ ক্রিস্টি, এবার থেকে আপনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিষয়ে পিএইচডি করার জন্য থিসিস প্রস্তুত করবেন আমিও সে বিষয়ে থিসিস জমা দেবো।' এ, এইচ ক্রিস্টির আর পি এইচডি করা হয়নি জীবনে।

৮

১৯৫৫ সালে দানী ফিরে এলেন ঢাকায়। সে থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন তিনি ঢাকায়, মাঝে একবার গিয়েছিলেন লণ্ডন এবং সেখানে আবার ক্রিস্টির সঙ্গে আরেক কৌতুকপ্রদ ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেটি পরে উল্লেখ করবো।

ফিরে এসে বিভাগে যোগ দেয়ার পর ডঃ হালিম বললেন তাঁকে, 'পিএইচডি করেছেন ভালো কথা, কিন্তু প্রফেসর তো হতে পারবেন না।' কারণ, প্রফেসরের পদ নেই। ব্যতিক্রম ঘটেছিলো আবার অর্থনীতি বিভাগে। সেখানে প্রফেসরের একটি পদ বিজ্ঞাপিত হলো। আবেদন করলেন ডঃ এম, এন, হুদা ও ডঃ নূরুল ইসলাম। ডঃ হুদা ছিলেন তমিজউদ্দিন খানের জামাই। ডঃ ইসলাম ছিলেন তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্ণর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের জামাই। বিশ্ববিদ্যালয় ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তখন দু'জনকে (দু'জনেই যোগ্য ছিলেন) প্রফেসর করার জন্য প্রফেসরের একটি বাড়তি পদ সৃষ্টি করেছিলো। ইতিহাসে তো আর সেটা সম্ভব না। আর দানী নিজেও সে বিষয়ে মাথা ঘামান নি।

তিনি যখন ফিরে এসেছেন তখন উপাচার্য জেন কিনস। দানীর মতে, তাঁর আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক অগ্রগতি হয়েছিলো। বিদেশী অধ্যাপক যাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চ পদে, এ সময় চলে গিয়েছিলেন ঢাকা ছেড়ে। ফলে, স্থানীয় যাঁরা এতোদিন নিম্নপদে ছিলেন এবং প্রমোশন পাচ্ছিলেন না তাঁদের প্রমোশান হলো। বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিও

ছিলো শান্ত।

১৯৫৫-৫৮ এর মধ্যে ইতিহাস বিভাগের দু'জন প্রাক্তন ছাত্র, দানীর অধীনে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রী পেলেন। এঁদের একজন হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল করিম। আরেকজন হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মঈনউদ্দিন আহমেদ খান। দু'জনেই পরে ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। ১৯৪৭ সালের পর অধ্যাপক করিমই প্রথম ইতিহাস বিভাগ থেকে পিএইচডি করেছিলেন। ঐ সময় দানীর মতে, পাকিস্তানে সব দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো এক নম্বরে।

হামুদুর রহমান যখন ভিসি তখন কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএ [ইন্সটিটিউট অফ বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন] খুলতে চাইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা নব্বই ভাগ শিক্ষক বিরোধিতা করলেন এ প্রস্তাবের। তাঁদের মতে, কমার্স নামে একটি বিষয় আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, সুতরাং আইবিএ-র দরকার কি? তখন মার্কিন প্রভাব প্রবল। ভিসি বললেন, না। খুলতেই হবে ঐ বিভাগ। কর্তৃপক্ষ সরাসরি এ আদেশ দিয়েছে। তা ছাড়া টাকাও আছে। সে সময় থেকে ভিসি'র সঙ্গে শিক্ষকদের বা অন্য কথায় সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠলো।

লণ্ডন থেকে ফিরে অধ্যাপক হবিবুল্লাহর কাছ থেকে দানী ঢাকা জাদুঘরের ভারও গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময় জাদুঘরের সংগ্রহ বাড়ছে। কিন্তু জাদুঘরে জায়গা হচ্ছে না।

আতাউর রহমান খান তখন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তার ছোট ভাই ওদুদুর রহমান ছিলেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক, দানীর সহকর্মী। তাঁর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দানীর খানিকটা আলাপ-পরিচয় ছিলো। দানী তাই মুখ্যন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানালেন জাদুঘর দেখতে আসার। মুখ্যমন্ত্রী জাদুঘর পরিদর্শন করে খুশি হয়ে দু'লাখ টাকা মঞ্জুর করলেন জাদুঘরের আয়তন বাড়াবার জন্য।

টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো। দানী দু'লাখ টাকা রাখলেন জাদুঘরের ফাণ্ডে। এটা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর খানিকটা মন কষাকষি হয়েছিলো।

এর কিছুদিন পর অপসারিত হলেন আতাউর রহমান খান। তিনি হামুদুর রহমান নিজের প্রচারের জন্য চাইলেন জাদুঘরের নতুন বর্ধিত অংশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। তিনি দানীকে কিছু না জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলীকে নির্দেশ দিলেন সব ব্যবস্থা করতে। প্রকৌশলী সব ব্যবস্থা করে অতিথিদের আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিলেন। দানী ঠিক করলেন যে, তিনি অনুষ্ঠানে থাকবেন না। কারণ, ভিসি তাঁকে এ ব্যাপারে বলার সামান্য সৌজন্যটুকুও দেখাননি। দানী চলে গেলেন কুমিল্লা। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে এসে অতিথিরা [যাঁরা জানতেন ও চিনতেন দানীকে।] বলাবলি করতে লাগলেন, জাদুঘরের অনুষ্ঠান, কিউরেটর কই? এতে আরো অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হলেন হামুদুর রহমান।

তবে, প্রাদেশিক সরকার তখন আগ্রহ দেখাচ্ছিলো জাদুঘরের প্রতি। ঐ কয়েক বছরে সরকারী চেষ্টায় জাদুঘরের সংগ্রহে এসেছিলো বলধার জমিদারদের সংগ্রহ,

দিনাজপুর ও ময়মনসিংহের মহারাজাদের সংগ্রহ। দানী নিজে চষে বেড়ালেন বাংলাদেশ। এ সময় জাদুঘরের বর্তমান মহাপরিচালক ডঃ এনামুল হককেও তিনি সঙ্গে নিলেন। ডঃ হক তখন বেশ কিছুদিন পাস করে বেরিয়েছেন কিন্তু চাকরি-বাকরি ছিলো না। তিনি ছিলেন দানীর ছাত্র। দানী ভাবলেন, এভাবে তাঁকে নিয়ে ঘুরলে হয়তো তিনি জাদুঘর সম্পর্কে কিছুটা জানবেন এবং পরে কিছু একটা ব্যবস্থা হয়তো হয়ে যাবে।

ঐ পরিভ্রমণের সময় দানী বিনামূল্যে জাদুঘরের জন্যে বেশ কিছু নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন, কিছু অবশ্য কিনেও ছিলেন। সামান্য একটি সংগ্রহশালা থেকে ঢাকা জাদুঘরের জাতীয় জাদুঘরে উত্তরণের ভিত্তি এভাবে অধ্যাপক দানী সুদৃঢ় করে দিয়ে গিয়েছিলেন, যার ফলে এর চলার পথ পরবর্তীকালে ছিলো মসৃণ।

লণ্ডন থেকে ফিরে ১৯৫৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির ভারও দানীকে বুঝে নিতে হয়েছিলো। এবং ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮-এর মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটিকে তিনি সাবালক করে দিতে পেরেছিলেন।

লণ্ডন থেকে ফিরে দানী অর্থসচিব মমতাজ হাসানের সঙ্গে আবার এশিয়াটিক সোসাইটির ব্যাপারে দেখা করলেন। অর্থসচিব সোসাইটির বার্ষিক অনুদান দশ হাজার টাকা থেকে উন্নতি করে দিলেন পনেরো হাজার টাকায়। সে টাকায় সোসাইটির আজকের যে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার তার ভিত্তি দানী তৈরি করে দিয়েছিলেন। সোসাইটি নিয়মিত জার্নাল ও বই প্রকাশ শুরু করলো। দু'টি স্কলারশীপও চালু হলো। সোসাইটির কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য নিয়োগ করা হলো একজন কেরানী। প্রায় শূন্য থেকে দানী এভাবে ঢাকার মতো একটি শহরে এ ধরনের একটি বিদ্বৎসভা গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিলেন।

৯

১৯৫৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় দানীকে আমন্ত্রণ জানালো। বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি লিখলেন, ১৯৫৮ সালের আগে তিনি যেতে পারবেন না। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাতে সম্মতি জানালো।

লণ্ডনে এই সময় প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক এ, এল, ব্যাশামের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। ব্যাশাম তাঁকে দুঃখ করে বললেন, 'উপমহাদেশ থেকে অনেকেই আসে। ভারতীয় প্যালিওগ্রাফির ওপর কাজ করতে অনুরোধ করি। রাজি হয়। কিন্তু কিছুদিন পর তা ছেড়ে অন্য বিষয়ে ডিগ্রী নেয়।'

দানীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো একবছরের জন্য। ব্যাশামের কথা শুনে তিনি বললেন, ভারতীয় প্যালিওগ্রাফির ওপর তিনি লিখবেন। শুরু করলেন ঐ বিষয়ের ওপর পড়াশোনা। মাসখানেকের মধ্যে মৌর্য যুগ পর্যন্ত লিখে ফেললেন। পরে দানীর 'ইণ্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো।

এই সময় মিঃ এ, এল, ক্রিস্টির সঙ্গে আবার যোগাযোগ হলো দানীর। ক্রিস্টি

ইউনেস্কোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি কালপঞ্জী তৈরি করে দেয়ার ব্যাপারে। দানীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ক্রিস্টি দানীকে সে কথা জানিয়ে বললেন, 'কিন্তু প্যালিওগ্রাফি ছাড়া এই কালপঞ্জী তৈরি করা যাচ্ছে না, দানী কি পারবেন সেটি তৈরি করতে।' দানী জানালেন, পারবেন। কিন্তু তা লেখার সময় তাঁর নেই। ক্রিস্টি জিজ্ঞেস করলেন, লিখতে কতোদিন লাগবে? দানী জানালেন, তিন মাস। ক্রিস্টি বললেন, দানীকে তিনি তিন মাসের টাকা দেবেন। দানী একমাসে কাজ শেষ করে টাকা চাইলেন। ক্রিস্টি তাঁকে এক মাসের টাকা দিলেন। দানী বললেন, তাঁকে শর্ত অনুযায়ী তিন মাসের টাকাই দিতে হবে, কাজ তিনি যতোদিনেই শেষ করুক না কেন।

এ বিষয় নিয়ে তারপর ক্রিস্টির বক্তৃতা দেয়ার কথা রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে। ক্রিস্টি দানীর লেখাই পড়বেন নিজের নামে। কিন্তু তা সবাইকে জানাতে মানা করেছিলেন। দানী শুধু ব্যাশামকে ঘটনাটি জানিয়েছিলেন।

বক্তৃতার দিন দানীও ছিলেন। বক্তৃতা শেষে, সবাই ক্রিস্টির বক্তৃতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন। কারণ, প্যালিওগ্রাফি যিনি জানেন না তিনি কিভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্যালিওগ্রাফির ওপর বক্তৃতা করেন। নিশ্চয় এটা অন্যের লেখা। পরে ব্যাপারটি জানাজানি হলে অধ্যাপক বেইলি বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে দানীকে বলেছিলেন, 'তুমি ওটা কেন করতে গেলে?' 'জী, টাকা দিয়েছে তাই করেছি', দানীর সাফ জবাব, 'পড়ার অনুমতিও দিয়েছিলাম।' পরে, অক্সফোর্ড থেকে ব্যাশাম দানীর এই লেখা নিয়ে একটি বই বের করেছিলেন।

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করা হলো পাকিস্তানে। দানী তখন লণ্ডনে। ঐ সময় তিনি বেশ অর্থও পেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'বেশ রাজার হালে ছিলাম। গ্রান্টের টাকা ছাড়া লেখালেখি করেও বেশ আয় করেছিলাম। সপরিবারের ভালোভাবে থাকতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। টাকা এতো জমেছিলো যে, সেই প্রথম একটি গাড়ি কিনে ফেললাম। এবং তা নিয়ে চলে এলাম ঢাকায়।'

১০

ঢাকায় ফিরে আবার নিজের কাজে মেতে উঠলেন দানী। এশিয়াটিক সোসাইটি তখন পরিচিত এক প্রতিষ্ঠান। ঐ সময়ই দানীর 'মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল' প্রকাশিত হয় সোসাইটি থেকে। বইটি প্রকাশের জন্য বি এন আর অর্থ সাহায্য করেছিলো এবং তা সম্ভব হয়েছিলো আনোয়ারুল হকের জন্যে। প্রায় একই সময় কলকাতা থেকেও প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর থিসিস।

এশিয়াটিকের সাধারণ বার্ষিক সভার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় দানী ঠিক করলেন গুলাম মহম্মদকে আমন্ত্রণ জানাবেন। গুলাম মহম্মদ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সভার আয়োজন করা হলো কার্জন হলে। কারণ, দানীর ভাষায়, 'আমি একটা

বিগ শো করতে চাইলাম। এছাড়া এখানকার মুসলমান সমাজকে আমি জানতাম। তাই ঠিক করেছিলাম এ উপলক্ষে একটি ইসলামী শিল্পকলার প্রদর্শনীও করতে হবে যা সবাইকে ইমপ্রেস করবে।'

এর কিছুদিন আগে হায়দ্রাবাদ থেকে আগত এক অ্যান্টিক ডিলার দানীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁর সংগ্রহে দুর্লভ অনেক নিদর্শন ছিলো। জাদুঘরের ফাণ্ডে তখন এমন টাকা নেই যে, নিদর্শনগুলো কেনা যায়। তাই দানী তাঁকে বললেন, 'তুমি বরং আমার প্রদর্শনীর জন্য জিনিসগুলো দাও। এমনও হতে পারে যে এগুলো দেখিয়ে আমি ফাণ্ড যোগাড় করতে পারবো।' রাজি হলো ডিলার। কার্জন হলের বক্তৃতা কক্ষের ওপরে অলিন্দে আয়োজন করা হলো প্রদর্শনীর। গুলাম মহম্মদ এবং অভ্যাগতরা আয়োজন দেখে চমৎকৃত। গভর্ণর জেনারেল প্রদর্শনীর নিদর্শনাদি কেনার ফাণ্ড দিয়ে দিলেন, তবে ঢাকা জাদুঘরকে নয়, করাচী জাদুঘরকে। সেই ডিলারের সব নিদর্শনই করাচী জাদুঘর কিনে নিয়েছিলো, খুব সস্তায়, সম্ভবত এক-দেড়লাখ টাকায়। সেই সংগ্রহের মূল্য এখন কোটি টাকার ওপরে। এরপর এশিয়াটিক সোসাইটির অনুদান উন্নীত হয়েছিলো বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকায়।

এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য তখন আলাদা কার্যালয় দরকার। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের প্রদত্ত অনুদানে জাদুঘরের বর্ধিতাংশ নির্মিত হয়েছে। ফলে, জাদুঘরের কার্যালয় মূল ভবনে নিয়ে গেলে নবাবী ফটকটি খালি হয়ে যায়। এবং সেখানে স্থাপন করা যায় এশিয়াটিক কার্যালয়। এ বিষয়ে দানী কথা বললেন উপাচার্যের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'আমার কিছু করার নেই। আপনি যা ভালো বোঝেন করেন।' দানী তখন ঢাকা জাদুঘরের কিউরেটর হিসেবে, এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক, অর্থাৎ নিজেকেই নবাবী ফটকটি দান করলেন। বা সোজা কথায়, জাদুঘর তার কার্যালয় দান করলো এশিয়াটিককে। বিশ্ববিদ্যালয়ও এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করে নি। এশিয়াটিকের নতুন ভবন না হওয়া পর্যন্ত সেই ফটকেই ছিলো এশিয়াটিকের কার্যালয়, গ্রন্থাগার, সবকিছু। পঞ্চাশের দশকে শূন্য থেকে যাত্রা করে একদশকে [ষাটের দশকে] এশিয়াটিক সোসাইটি এভাবে পূর্ণতা লাভ করেছিলো।

একদশকেই দানী ঢাকায় নিজের স্থান দখল করে নিয়েছিলেন। বিদ্বৎসমাজে এবং সাধারণে তিনি ছিলেন পরিচিত। গভর্ণর আজম খান থেকে সাধারণ লোকের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিলো। প্রিয় ছিলেন ছাত্রদের কাছেও। দানী বললেন, 'আমার লেখালেখি, জাদুঘর ও এশিয়াটিক, সবকিছু মিলে এই পরিচিতিটা হয়েছিলো। যে কারণে, অনেক জায়গায় আমার ডাক পড়তো। ১৯৫৭ সালের যে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়েছিলো ঢাকায় তা অর্গানাইজ করতে বলা হয়েছিলো আমাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের কথাতো আগেই বলেছি। এর বাইরেও অনেকের সঙ্গে পরিচয় ছিলো। যেমন আবুল হাশিম আমাকে খুব স্নেহ করতেন। চোখে দেখতেন না ঠিক, কিন্তু গলার স্বর শুনলেই চিনতে পারতেন। আরেকটি কারণ ছিলো। সে সময় অনেক অবাঙ্গালী শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু

তাঁরা কেউ বাংলা বলতেন না। আমার পরিবারের সবাই বাংলা জানতো, বলতো, ফলে, স্বাভাবিকভাবেই বাঙ্গালী শিক্ষকদের সঙ্গে মেলামেশায় আমার অসুবিধা হয় নি। যাঁরা আমাকে জানতেন না, তাঁরা বলতেন, আমি পাঞ্জাবী। কিন্তু, আমরা তো আর পাঞ্জাবী ছিলাম না। তবে কয়েকবার এ কথা শুনে বউকে বললাম, চলো পাঞ্জাবীটা শিখে নিই। অধ্যাপক জিলানীর সাহায্যে শেখা শুরু করলাম, পাঞ্জাবী, এবং এ ঢাকা শহরেই আমরা শিখে গেলাম পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলতে।'

১১

ষাটের দশকে, রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়েছিলো। এমন একটা সময় এলো, অধ্যাপক দানীর ভাষায়, 'যে যখন প্রায়ই কারফিউ থাকতো। বিশেষ করে আমি যে এলাকায় [নিমতলি] থাকি। বের হতে পারতাম না। কাজকর্ম সব শিকেয় উঠলো। আই বিকাম সিক অফ দি সিচুয়েশন।'

ডঃ মাহমুদ হুসাইন তখন উপাচার্য। সেটা খুব সম্ভব '৬১-৬২ সালে হবে। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের জন্য একটি বিজ্ঞাপন বের হলো পত্রিকায়। দানীর স্ত্রীও আর এই অস্থির অবস্থায় ঢাকায় থাকতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন দানীকে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে। দানী দেখা করলেন উপাচার্যের সঙ্গে। বললেন, যে অবস্থা চলছে তাতে কোনো কাজকর্ম করা যাচ্ছে না। সুতরাং তিনি করাচী যেতে চান। ডঃ হুসাইন সব শুনে বললেন, 'বলেন কি? ঐ পোস্ট তো আমার জন্য বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। আমি কি ঢাকায় থাকবো নাকি? আমি তো চলে যাবো। সুতরাং এখন যেই ঐ পদে আসবেন তিনিই হবেন টেম্পোরারি।'

নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন দানী। বেশ কয়েকদিন পর, একদিন বসে আছেন ঘরের বারান্দায়। পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেলো। পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র চিঠি। তিনি লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খোলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন ঢাকায় একজন বিশেষজ্ঞ আছেন এ বিষয়ে, তাঁকে যেন নিয়ে আসা হয়। ভিসি অনেক খুঁজে পেতে জানতে পেরেছেন সেই বিশেষজ্ঞ হলেন আহমদ হাসান দানী।

দানীর সঙ্গে আইয়ুব খানের পরিচয় হয়েছিলো ১৯৪৮ সালে। ঢাকায় আইয়ুব খান তখন জিওসি। তাঁর অফিস পুরোনো হাইকোর্টের একাংশে। একদিন দানীর বন্ধু এক কর্নেল দানীকে নিয়ে গিয়েছিলেন আইয়ুব খানের কাছে। দানী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, 'মেজর জেনারেল আইয়ুব খানের সঙ্গে আমি প্রত্নতত্ত্ব থেকে শুরু করে অন্য অনেক বিষয়ে ঘণ্টা তিনেক কথা বললাম। আমি অবাক হয়েছিলাম এ ভেবে যে, একজন মেজর জেনারেল এতোসব বিষয়ে খবর রাখেন। তখন থেকে আইয়ুব আমাকে জানতেন। এরপর যখনই দেখা হতো হাসি, কুশল বিনিময় হতো। তবে তিনি আমার নাম ভুলে

গিয়েছিলেন। চেহারা মনে ছিলো।'

আইয়ুব খানের বিষয়ে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন তিনি। আজম খানকে সরিয়ে দেয়ার ঠিক আগে আইয়ুব খান এসেছিলেন ঢাকায়। সেই উপলক্ষে গভর্ণর হাউসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু পর্যায়ের শিক্ষকদের ডাকা হয়েছিলো। দানীর ভাষায়—'আমরা নির্দিষ্ট সময়ে অপেক্ষা করে আছি কিন্তু গভর্ণর বা প্রেসিডেন্টের কারো দেখা নেই। তাঁরা ওপরে কথা বলছেন। একঘণ্টা পর দু'জন এলেন। আইয়ুব খান বক্তৃতা দিয়ে চলে গেলেন। পরদিন শুনলাম আজম খানকে অপসারিত করা হয়েছে। আজম খানের জনপ্রিয়তাই ছিলো বোধহয় এর কারণ।'

যা হোক পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি পেয়ে তিনি আবার দেখা করলেন ভিসি'র সঙ্গে। তিনি বললেন, 'আরে দূর, আপনি ঢাকা ছাড়বেন কি ভাবে? আপনি তো বাঙ্গালী। আপনার আগে আমিই ঢাকা ছাড়বো। আপনাকে ছাড়া যাবে না।'

দানী বললেন, 'ঢাকার এ পরিস্থিতি আমার আর ভালো লাগে না। নিত্য কারফিউ। আমি কাজ করতে চাই।'

ঐ সময় পেশোয়ারে গরমকালে তিন মাসের একটি স্পেশাল কোর্স চালু ছিলো। ভিসি দানীকে বললেন, 'আপনি সে কোর্সে যেতে পারেন। গিয়ে দেখেন কেমন লাগে।'

দানী পেশোয়ার যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। যদিও প্রাথমিকভাবে যাচ্ছিলেন তিন মাসের জন্য কিন্তু স্থির করেছিলেন সেখানেই পড়াবেন। তাই ঢাকায় কাউকে জানালেন না। আশংকা ছিলো, জানাজানি হয়ে গেলে হয়তো যাওয়া নাও হতে পারে। কিন্তু জানাজানি হয়ে গেলো। অনেকেই এসে আপত্তি জানাতে লাগলেন। দানী বললেন, তিনি যাচ্ছেন সামার কোর্সে পড়াতে। আসলে প্রাথমিকভাবে তাই ঠিক ছিলো, কিন্তু দানীর স্ত্রী ঠিক করেছিলেন আর ঢাকায় ফিরবেন না। তাই যারা এলেন দানী তাঁদের বললেন, 'আমি তো চাকরি ছেড়ে যাচ্ছি না। আমি ছুটি নিয়ে যাচ্ছি।'

১৯৬২-তে তিনি ঢাকা ছেড়ে গেলেন। 'যাবার আগে' বললেন দানী, 'ঢাকার ওপর বইটির দ্বিতীয় পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ তৈরি করে গেলাম। এবং তা উৎসর্গ করলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে।'

ঢাকার হারিয়ে যাওয়া কামান

ঢাকায় পর্যটকদের এক সময় আকর্ষণ করতো লালবাগ দুর্গ বা বড় কাটরা নয়, আকর্ষণের বস্তু ছিল মুঘল যুগের একটি কামান। বিখ্যাত ভূগোলবিদ রেনেল তাঁর স্মৃতিকথায় ঢাকার ঐ কামানের কথাই বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন। তারপর, রবার্ট লিণ্ডসের কথা ধরা যাক। ১৭৭৬ সালে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি এসেছিলেন ঢাকায়। লিখেছেন তিনি, 'ঢাকার গর্ব করার মতো তেমন কিছু নেই।' লালবাগ দুর্গ, বড় কাটরা, তাঁতি বাজার আর টঙ্গীর পুল কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করেনি; যদিও আমার ধারণা, সেগুলি তখনও মোটামুটি জাঁকালো ছিল। শুধু একটি জিনিসই তাঁকে আকর্ষণ করেছিলো। ঢাকার একটি কামান। ঢাকার এক সময়ের ম্যাজিস্ট্রেট ও বিখ্যাত গ্রন্থকার ডি. অয়লিও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে একই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ডি. অয়লি সেই কামানটি না দেখেই লিখেছিলেন। কারণ, ঐ কামান তখন গিলে নিয়েছে বুড়ীগঙ্গা। তিনি দেখেছিলেন, বর্তমানে ওসমানী উদ্যানের সামনে রক্ষিত কামানটি যা পরিচিত আমাদের কাছে 'বিবি মরিয়ম' নামে। এবং উল্লেখ্য যে, বিবি মরিয়ম দেখেও অনেকে হতবাক হয়ে যেতেন।

ঢাকায় মুঘল আমলে ব্যবহৃত যেসব কামান অষ্টাদশ শতকে ছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দু'টি বৃহদাকারের কামান। একটি 'বিবি মরিয়ম' অপরটি তলিয়ে গেছে বুড়ীগঙ্গায়। জনশ্রুতি অনুযায়ী বুড়ীগঙ্গায় তলিয়ে যাওয়া কামানটির নাম ছিল 'কালে জমজম'। কালে ছিল মরিয়মের সঙ্গী। এই কালে জমজম কবে তলিয়ে গেলো, বা ঢাকার মানুষজনের কি ধারণা ছিল সে সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানি না। সম্প্রতি প্রাপ্ত কিছু তথ্যের ভিত্তিতে সে সম্পর্কে আলোকপাত করছি।

প্রথমে দেখা যাক, কামানগুলি ঢাকায় এলো কিভাবে? এ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কেউ কিছু বলতে পারেননি। তবে, ডি. অয়লি জানিয়েছেন, সপ্তদশ শতকে বারংবার মগ বা আরকানদের হামলা ঠেকাবার জন্যই কামান দু'টি নির্মাণ করা হয়েছিলো। ডি. অয়লির বক্তব্য সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এবং ধরে নিতে পারি, ঢাকাতেই কামান দু'টি নির্মিত হয়েছিলো। কারণ, এতো বিশাল ও ওজনে ভারী জিনিস জলপথে হাজার মাইল দূর থেকে আনা প্রায় অসম্ভব। ঢাকায় হয়ত মুঘল প্রকৌশলীদের নির্দেশনায় দেশীয়

কারিগররা তৈরি করেছিলেন কামান দু'টি।

সপ্তদশ শতক পর্যন্ত কিন্তু বিখ্যাত ছিল 'কালে খাঁ' বা 'কালে জমজম', 'মরিয়ম' নয়। প্রথমোক্তটি সম্পর্কে রেনেল এবং লিগুসের বিবরণ থেকে জানা যায়। এবং তারা দু'জন 'কালে খাঁ'র কথাই উল্লেখ করেছন, 'মরিয়ম'-এর কোন উল্লেখই করেননি। তাতে বোঝা যায়, 'কালে খাঁ'র তুলনায় মরিয়ম নেহায়েৎ অনুল্লেখ্য ছিল। 'কালে খাঁ' হারিয়ে যাওয়ার পর সবার দৃষ্টি পড়ে মরিয়মের দিকে। এবং মরিয়ম হয়ে ওঠে বিখ্যাত। সেই থেকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকে 'মরিয়ম'ও হয়ে ওঠে ঢাকার একটি দ্রষ্টব্য।

'কালে খাঁ'র প্রথম উল্লেখ পাই রেনেলের স্মৃতিকথায়। ভূগোলবিদ হিসেবে জেমস রেনেল বিশ্ববিখ্যাত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকায় তিনি কোম্পানীর চাকুরে হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর এক কন্যার কবর এখনও আছে নারিন্দার খৃস্টান গোরস্থানে।

রেনেল খুব সতর্কভাবে কামানটি পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর বিবরণ—

'আমি সতর্কভাবে পুরো কামানটির মাপ নিয়েছি এবং আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি অংশের মাপ হিসেব করেছি। পেটানো লোহা দিয়ে নির্মিত হয়েছে কামানটি। জিনিসটি বিশাল এক টিউবের মতো যার ভিত্তি বারো খণ্ড লোহার লম্বা টুকরো। এগুলির ওপর দু'থেকে তিন ইঞ্চি পুরু চাকা [রিং] দিয়ে পিটিয়ে মসৃণ করা হয়েছে। সুতরাং দেখতে এটি চমৎকার।' পিতলের আগ্নেয়াস্ত্রের মতো যদিও এর সমানুপাত ত্রুটিপূর্ণ।

সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য	২২ ফুট ১০ (১,২) ইঞ্চি
কামানের পেছনের দিকে আয়তন	৩ ফুট ৩ ইঞ্চি
কামানের মুখ থেকে চার ফুট পর আয়তন	২ ফুট ১০ ইঞ্চি
কামানের মুখের আয়তন	২ ফুট ২ (১,২) ইঞ্চি
ছিদ্র	১ ফুট ৩ (১,৮) ইঞ্চি

কামানটিতে ব্যবহৃত হয়েছে ২৩৪, ৪১৩ কিউবিক ইঞ্চির শক্ত লোহা, [যাতে মরচে ধরে না] ওজন ৬৪,৮১৪ পাউণ্ড [ষোল আউন্সে এক পাউণ্ড হিসেবে] বা এগারোটি বত্রিশ পাউণ্ডার কামানের ওজনের সমান। গোলার ওজন ছিল ৪৬৫ পাউণ্ড।'

এবার দেখা যাক লিগুসের বিবরণ

'কামানটি ছিল ছত্রিশ ফুট লম্বা, পেটানো লোহার তৈরি। চৌদ্দটি লোহার টুকরোর ওপর লোহার চাকা পিটিয়ে এটি নির্মিত। সুতরাং দেখতে জিনিসটি মন্দ নয়, তবে তা সমানুপাত নয়। কামানের পাশে আছে একটি পাথরের গোলা যা এর ক্যালিবারে থাকে। শক্তিশালী একজন লোক খুব বেশি হলে গোলাটি হাঁটু পর্যন্ত ওঠাতে পারবে। যদি গোলাটি ধাতু নির্মিত হতো তাহলে এর ওজন হতো বারোশো পাউণ্ডের মতো। কামানটির ওজন নিশ্চয় ৬৪, ৮১৪ পাউণ্ড।'

এখানে লক্ষণীয় যে রেনেল ও লিণ্ডসের বর্ণনা একই রকম, একটি ক্ষেত্র ছাড়া। রেনেল যেখানে বললেন, কামানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় তেইশ ফুট সেখানে লিণ্ডসে বলছেন ছত্রিশ ফুট। এ ক্ষেত্রে রেনেলের ভাষ্যই সঠিক বলে মেনে নেয়া উচিত।

লিণ্ডনে আরো লিখেছেন—

'দেশীয়রা কৃৎকৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ। সুতরাং কিভাবে এটি নির্মিত হলো এবং যুদ্ধের সময় কিভাবে তা ব্যবহৃত হতো তা ভেবে বের করা অসম্ভব।

লিণ্ডসের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, দেশীয়দের মনেও এটি বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলো। এবং ঐ সময়ের [১৭৭৬-৮০] স্থানীয়রা নিজেদের মতো করে এর ব্যাখ্যা দিতেন। লিণ্ডসে লিখেছেন—

'তারা বলে যে স্বর্গ থেকে এটি পতিত হয়েছে। এবং এ কারণে কামানটি পূজিত। এর সম্মানে আবহমানকাল থেকে এর ভেতরে জ্বেলে রাখা হয়েছে একটি প্রদীপ। ১৭৮০ সালে হারিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কামানটিকে 'পবিত্র স্থান' [অবতার] হিসেবে পূজো করা হয়েছে।'

লিণ্ডসে এবং তাঁর বন্ধু জন কোয়ি একবার পরিকল্পনা করেছিলেন, দ্রষ্টব্য হিসেবে কামানটিকে কলকাতায় পাঠাবেন। কোয়ি দক্ষ ছিলেন কৃৎকৌশলে। ঢাকাতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো লিণ্ডসের। এর আগে স্পেন-আমেরিকার যুদ্ধের সময় হাভানায় তিনি লড়েছিলেন। লিণ্ডসে যখন ঢাকায় তখন কোয়ি এক রেজিমেণ্ট সেবুন্দি বা দেশীয় সৈন্যের কমাণ্ডার হিসেবে ছিলেন। ১৮১৮ সালে কোয়ির মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যা হোক, ঐ পরিকল্পনা সম্পর্কে লিণ্ডসে লিখেছেন—

'ঢাকা শহরের উল্টোদিকে একটি চরে ছিল কামানটি। নদী চরটির কূল ভাঙ্গছে। আমার বন্ধু জন কোয়ির সঙ্গে একবার পরিকল্পনা করেছিলাম যে, একটি নৌযান তৈরি করে এটিকে কলকাতায় পাঠাবো, কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার আগেই আমাদের চলে যেতে হলো ঢাকা ছেড়ে।' আক্ষেপ করে লিণ্ডসে লিখেছেন যে, তাঁর ওপরঅলারা এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। অথচ তারা সক্রিয় হলে এই কীর্তিটি রক্ষা পেতো। 'অক্ষমনীয় অবহেলায়' তারা দ্বীপটির তীর ভাঙ্গতে দিলেন। নদী আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিলো দ্বীপটিকে 'এবং কামানটি এখন শুয়ে আছে বুড়ীগঙ্গার তলদেশে। স্থানীয়দের মতে, এটি যে আবার হারিয়ে গেছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। স্বর্গ থেকে তা এসেছিলো এবং স্বর্গেই তা আবার গেছে চলে।'

লিণ্ডসের বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ১৭৮০-এর দিকে 'কালে জমজম' বুড়ীগঙ্গার অতলে স্থান নিয়েছে। এ বিবরণ থেকে সে সময়কার সাধারণ লোকদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কেও পরিষ্কার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

লিণ্ডসের পরের বিবরণটি ওয়লীর। তিনিও উল্লেখ করেছেন কামানটি সম্পর্কে এবং লিখেছেন এটি ছিল বুড়ীগঙ্গার মাঝে 'মোগলানী চরে'। তারপর তিনি এসেছেন 'বিবি মরিয়ম' প্রসঙ্গে।

'কালে খাঁ তলিয়ে যাওয়ার পর সবার দৃষ্টি পড়ে 'মরিয়ম'-এর ওপর। [এখানে অবশ্য বলে রাখা ভালো কামান দু'টিরম নামকরণ কে করেছিলেন তা জানা যায়নি। তবে, লোক মুখে এ দু'টি নামই প্রচারিত হয়েছে]। যারা কালে খাঁকে দেখেননি তারা তখন মরিয়মকে দেখেই বিস্মিত হতেন, জানিয়েছেন ডি. অয়লি। তাঁর মতে, বিবি মরিয়মকে মীর জুমলা স্থাপন করেছিলেন বড় কাটরার সামনে, সোয়ারীঘাটে।

বড় কাটরার সামনে কামানটিকে স্থাপন করার একটি কারণ থাকতে পারে। মীর জুমলার সময় বড় কাটরা ছিল ঢাকার বৈশিষ্ট্যময় একমাত্র জাঁকালো অট্টালিকা। তাইফুর জানাচ্ছেন, সুবাদার মীর জুমলা কামানটিকে ব্যবহার করেছিলেন আসাম অভিযানের সময় এবং তারপর তার আবার ফিরিয়ে এসেছিলেন ঢাকায়। তাঁর এ মতের বিরোধিতা কেউ করেন নি। হতে পারে, আসাম অভিযানের পর তিনি এটিকে কাটরার সামনে স্থাপন করেছিলেন যুদ্ধ জয়ের স্মারক বা দ্রষ্টব্য হিসেবে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ডি. ওয়লীর যখন ঢাকায় কর্মরত তখন তিনি দেখেছেন, কামানটির অর্ধেক ডেবে গিয়েছিলো বালিতে আর বর্ষাকালে থাকতো তা পানির নীচে।

হয়ত 'কালে জমজম'-এর মতো মরিয়মও তলিয়ে যেতো। কারণ, বিশাল এই কামানটিকে বালির নীচ থেকে যে ওঠানো সম্ভব হতে পারে এ কথা তখন কেউ ভাবেন নি। এ কথা জানিয়েছেন কর্ণেল ডেভিডসন, যিনি ১৮৪০ সালে এসেছিলেন ঢাকায়। ঐ বছরেই ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ালটার্স তৎকালীন আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কামানটিকে সোয়ারীঘাট থেকে তুলে এনে, বেদী করে বসিয়েছিলেন চক বাজারের মাঝে। ওয়ালটার্স ঢাকার অনেক পূর্ত কাজের সঙ্গে জড়িত। তাঁর কর্মকাণ্ডের একটি পরিচয় 'মরিয়ম' উদ্ধার। আর চকবাজারে স্থাপনের কারণ, চক ছিল তখন শহরের কেন্দ্র।

চকবাজারে বেদীর ওপর কামানটি স্থাপিত হলে তা আবার পূজো পেতে থাকে 'কালে জমজমের' মতো। 'কালে খাঁ' যে অবতার ছিল তা লোকশ্রুতিতে ছিল। মনে হয় সে লোকশ্রুতি ও কামানের আকৃতির কারণে 'মরিয়ম' পূজো পেতে থাকে। এর শরীর ও বেদী, দুধ ও সিঁদুরে চর্চিত এবং ফুলে ফুলে শোভিত থাকতো।

ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী যখন ঢাকা যাদুঘরের কিউরেটর তখন তাঁর প্রচেষ্টায় 'মরিয়ম'কে আবার স্থানান্তর করা হয় সদরঘাট। কারণ, শহরের বিশেষ আকর্ষণ ও স্থান তখন সদরঘাট। পাকিস্তান আমলে, গুলিস্তান যখন গড়ে উঠছে তখন এলাকার শোভাবর্ধনের জন্য তা নিয়ে আসা হয় গুলিস্তানে। এখন 'মরিয়ম' ওসমানী উদ্যানে। এ স্থানান্তর প্রক্রিয়ার বোঝা যায়, মরিয়ম সব সময়ই ছিল ঢাকার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ঢাকার লোকজন কিন্তু 'কালে জমজম'কে ভোলেনি। মরিয়ম প্রসঙ্গ এলেই 'কালে খাঁ'র প্রসঙ্গ উঠতো। আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের একটি জনশ্রুতির কথা উল্লেখ করছি। পুরনো ঢাকার বাসিন্দারা বলতেন, বুড়ীগঙ্গা থেকে নাকি মাঝে মাঝে গুরুগম্ভীর কামানের গর্জন ভেসে আসতো। তাঁরা বিশ্বাস করতেন , এ গর্জনের অর্থ

'কালে খাঁ' তার সঙ্গিনী 'মরিয়ম'কে ডাকছে। এবং তারা হলপ করে বলতেন যে, ঐ গুরুগম্ভীর আওয়াজ তারা শুনেছেন এবং তারা তা বিশ্বাসও করতেন। আজকের প্রজন্মের কাছে 'মরিয়ম' নেহায়েত একটি পুরনো কামান। কিন্তু পুরনো মানুষের কাছে 'মরিয়ম' আকৃতি প্রকৃতি এবং তার সঙ্গের সাথী 'কালে খাঁ'র ঘটনা মিলিয়ে ছিল ভয় ভক্তি রোমাঞ্চের বস্তু।

'মোগলানী চর' বুড়ীগঙ্গার কোথায় ছিল তা ভূগোলবিদরা চেষ্টা করলেই বের করতে পারবেন। খুব সম্ভব তা ছিল সোয়ারীঘাটের বিপরীতে। স্থানটি চিহ্নিত করতে পারলে, ঢাকার এক সময়ের দ্রষ্টব্যটিকে উদ্ধার করা সম্ভব। এবং উদ্ধার করতে পারলে যে তা হবে ঢাকার প্রধান আকর্ষণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শব্দসূচি